হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

(সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী)

সম্পাদক শ্রীযতীন্দ্রনাথ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং ২২০।২৮
শ্রেণী সং

অষ্টবিংশতি ভাগ অষ্টবিংশতি বর্ষ।

(১৩২৯ সালের বৈশাখ মাস হইতে ১৩২৯ সালের চৈত্রমাস পর্য্যন্ত
দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।)

কলিকাতা—হাটখোলা দত্তবাটী ৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,
জন্মভূমি-কার্য্যালয় হইতে
সত্ত্বাধিকারী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত
ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

CALCUTTA
Printed by N, Dutt at the
Janmabhuml Press,
39, Manjck Bose's Ghat Street.
1923. ৩৯২

[বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা।] [ডাঃ মাঃ ।৵০ ছয় আনা।]

অষ্টবিংশতি বর্ষের সূচীপত্র।

সংখ্যা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।
১।	অধ্যয়ন	শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেন এম-এ,	৩১৯
২।	অদৃষ্ট ও পুরুষাকার	শ্রীযুক্ত শিবেশনারায়ণ ঠাকুর	৩৫৬
৩।	আগমনী	শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ,	১৬৯
৪।	আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারের উপায় নির্ণয়	কবিরাজ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র সেন	১৭৪
৫।	আর্য্য দর্শনে বেদের স্থান	শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম-এ,	৩৯০
৬।	আমার আত্মকথা প্রফেসার	শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায়	২২
৭।	আবাহন গাথা	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত	২৪
৮।	আবাহন	শ্রীযুক্ত জীবঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২০৭
৯।	আতিথেয়তা	শ্রীযুক্ত শৈলেপ্রনাথ ঘোষ	৩৪৫
১০।	ঈশানী	শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩২৪
১১।	উদ্দেশ্য	ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-বি,	১৫৪
১২।	উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম ও স্ত্রী চরিত্র	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ	৩০২,৩১১,৩৪০
১৩।	কোষ্ঠীর ফল	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাহিত্য বিশারদ	১১৮
১৪।	কোষ্ঠী-শিক্ষা	শ্রীযুক্ত পশুপতি সরকার	৩০,৬২,৯৭,১৬৬,২৩১
১৫।	কীর্ত্তন	শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ কাব্যতীর্থ বিরচিত	
১৬।	কালী স্তুতি	শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ কাব্যতীর্থ বিরচিত	১৮৭
১৭।	কাব্য ও কবি	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	৩৮৫
১৮।	গোকুল কাহিনী	শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম-এ	২০৩
১৯।	গুরু শিষ্য সংবাদ	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন	২৭৩,৩০৫,৩৩৮,৩৬৯
২০।	চণ্ডীকথা	শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম-এ	৭৩,১০৬
২১।	চৈতন্য লাইব্রেরি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ	শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন	২৯১
২২।	জামাই বাবু	... ...	৯৫

সংখ্যা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।
২৩।	জিজ্ঞাসা	শ্রীযুক্ত পশুপতি সরকায়	৪৯৮
২৪।	জীবন কানু	শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়	৩৪৭
২৫।	জগন্নাথদাস	শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী	৩৪৮
২৬।	ডেপুটীর দাদা	শ্রীযুক্ত ...	৭৭৩
২৭।	তত্ত্বপ্রসঙ্গ	শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার পাত্র	১৩৭
২৮।	দুঃখোচ্ছাস	ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-বি	২১
২৯।	দাদা থাকতে দিদি বিধবা হল কি করে?	...	১৮৮
৩০।	নালু বাবু	শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১৫৬
৩১।	নববর্ষ	... ...	১
৩২।	নারদের মোহ	শ্রীযুক্ত হরিদাস ব্রহ্মচারী	২৫
৩৩।	নৈরাশ্যে	ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভটাচার্য্য এম-বি	১০৩
৩৪।	ন্যাংটা	ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভটাচার্য্য এম-বি	৩৭৫
৩৫।	নব বধূর দাবী	শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেন এম-এ	৩১৯
৩৬।	পুনর্যাত্রা	শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ কাব্যতীর্থ বিরচিত	৮৮
৩৭।	প্রতিহিংসা	শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সিংহ	২২২
৩৮।	প্রসার	ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভটাচার্য্য এম-বি	২৬৮
৩৯।	বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বরবাদ	শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী	৩৮৯
৪০।	বঙ্কিম প্রশস্তি	শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ দত্ত-বি-এ	৩৮৪
৪১।	বিবাহে	ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভটাচার্য্য এম-বি	৩২২
৪২।	বৃদ্ধের অভিযোগ	ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভটাচার্য্য এম-বি	২৮৯
৪৩।	বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ	... ...	২৮৮
৪৪।	বঙ্কিম বরণ	শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র এম-এ	৬১
৪৫।	বুদ্ধির দৌড়	... ...	১৯০
৪৬।	বাবু	... ...	৩৮২
৪৭।	ভক্তি	শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী	৯০
৪৮।	ভক্তি পরীক্ষা	... ...	১৯১
৫০।	ভ্রান্তি	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ বেদান্ত শাস্ত্রী	২৬৯
৫১।	ভক্ত ও ভগবান	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস	২৮০
৫২।	ভক্তের ভিক্ষা	শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী	১৬৫

সংখ্যা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।
৫৩।	মহাসক্ষ্মী	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত	৭,৪৭,৮২
৫৪।	মহাকবি মনুসূদন	... ...	১২৯
৫৫।	মাতৃশক্তি	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস	১৯২
৫৬।	রামায়ণ ও মহাভারত	শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ	৩৫
৫৭।	রথযাত্রা	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত	৮৬
৫৮।	রথ দর্শন	শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার পাত্র	৯৯
৫৯।	ললিতা	শ্রীযুক্ত বাণীকুমার গুপ্ত	১৫৮
৬০।	বোঝা পড়া	শ্রীযুক্ত জীবঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৫১
৬১।	বর্ণ দেবতার অমর্য্যাদা	শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ	২৪১
৬২।	বিজয় গীতি রায় সাহেব	শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত	১৫
৬৩।	বিজয়নাথ মজুমদার	... ...	১৭
৬৪।	বিদ্বান জামাই	... ...	২০৫
৬৫।	বর্ত্তমান বাঙ্গালী চরিত	... ...	২০৬
৬৬।	বিজয়ার অভিবাদন	... ...	২০৯
৬৭।	বর্ষা	শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ বি-এ	২১৬
৬৮।	বিজয়া	শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যাবিনোদ	২২৮
৬৯।	বিবিধ প্রসঙ্গ	...	৩৩৬,৩৬৭
৭০।	শকুন্তলা বিদায় দৃশ্য	শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী	২
৭১।	শ্যামা মা	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত	৬৬
৭২।	শ্রীসরস্বতী বন্দনা গীতি	শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ	৩১১
৭৩।	শ্রীশ্রীবিশ্বনাথাষ্টক	শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সমাজদ্বার বিদ্যারত্ন	৩৯৪
৭৪।	সাধক কমলাকান্ত	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৪, ৪১, ৭৬, ১১১, ১৪৭, ১৮২, ২১৬, ২৪৫	
৭৫।	সমালোচনা	... ৭২, ১০৪, ১৬৮, ২৭২	
৭৬।	সখ	... ...	২৩৫
৭৭।	সত্যজ্ঞান	কবিরাজ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত রায় সিংহ তর্করত্ন	২৭৫
৭৮।	সভাপতির মন্তব্য	... ...	২৯৭
৭৯।	স্বর্গীয় আনন্দ গোপাল চক্রবর্ত্তী-কণ্ঠাভরণ	...	২৯৯
৮০।	সতী পরীক্ষা	... ...	৩৫৯

শ্রেণী সং

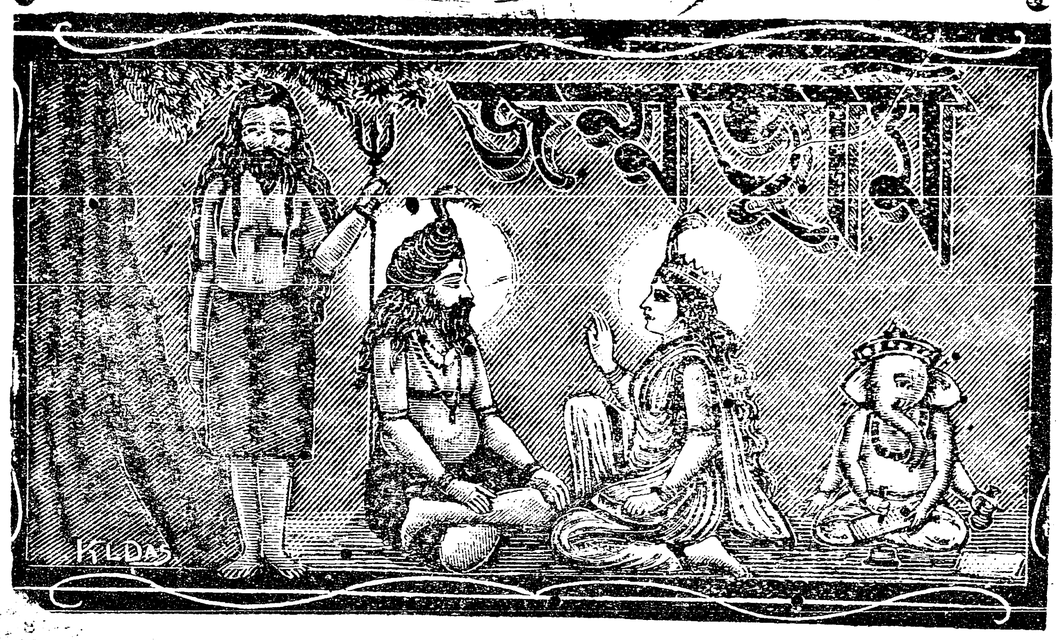

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

২৮শ, বর্ষ | ১৩২৯ সাল, বৈশাখ। | ১ম, সংখ্যা

নববর্ষ।

পরমকারুণিক জগৎ-পিতা ও জগন্মাতা মা! জগদম্বার কৃপায়,—জন্মভূমি মাসিক পত্রিকা অষ্টাবিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিল;—যাঁহার কৃপায় "জন্মভূমি" দীর্ঘ জীবন লাভ ঘটিল,—আমরা সর্ব্ব প্রথমেই সেই বিশ্ব-নিয়ন্তাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশে আন্তরিক ভক্তি সহকারে শ্রীচরণে প্রণাম করি।

জন্মভূমির গ্রাহক অনুগ্রাহক ও পাঠক লেখক, উৎসাহদাতা মহোদয়গণকে যথাযোগ্য নববর্ষের অভিবাদন করিতেছি। যে সকল মহানুভবের সহানুভূতিতে জন্মভূমির বিস্তৃতি ও প্রতিপত্তি, আগামী বর্ষে তাঁহাদের আনুকূল্য লাভ করিতে বঞ্চিত না হই, শ্রীশ্রীমা! জগদম্বার শ্রীচরণে ইহাই প্রার্থনা!

শকুন্তলার বিদায় দৃশ্য।

লেখক,—শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

শকুন্তলা আজ পতিগৃহে যাইবে, তপস্বিনী রাজ-রাণীর আসনে বসিবে কি আনন্দের কথা! কিন্তু সেই আবাল্য পরিচিত আশ্রম, সেই সমদুঃখসুখা একপ্রাণা সখীগণ, সেই সন্তান নির্ব্বিশেষে পালিত তরুলতা পশু পক্ষী ছাড়িয়া যাইতে হইবে, ইহাও কি কম কষ্টের কথা? সখীরা কতদিন শকুন্তলাকে সাজাইয়া দিয়াছে কিন্তু আজ সেই সখীদের হাতে তার শেষ সাজা—মনে করিয়া শকুন্তলার চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল। পতি সমাগমে লালায়িতা হইয়া শকুন্তলা যদি হাসিতে হাসিতে তপোবন ছাড়িয়া যাইত, তাহা হইলে তাহাকে আমরা হৃদয়হীনা, বিলাসিনী, ভোগ পরায়ণা বলিয়া ভাবিতাম। বাপ, মা, ভাই, ভগ্নী, সখা, সখীদের ছাড়িয়া যাইতে যার কষ্ট না হয়, সে কেমন রমণী! এমন স্বার্থপর, আত্মভোগ সর্ব্বস্ব রমণী শকুন্তলা নহে।

স্নানোত্তীর্ণ ঋষি বাষ্পভরাবরুদ্ধ বচন, চিন্তাজড় দর্শন, উৎকণ্ঠিত হৃদয় লইয়া শকুন্তলার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শকুন্তলা লজ্জায় নতনয়না হইয়া পিতাকে কেবল প্রণাম মাত্র করিল। মুখ দিয়া তখন তার কোন কথাই ফুটিল না। মহর্ষি (কণ্ব) আশ্রমের তরুদিগের নিকট শকুন্তলার বিদায়-প্রার্থনা জানাইলেন। যাহাদিগকে জলসেচন-তৃপ্ত না করিয়া শকুন্তলা নিজে জল খাইত না, ভূষণ-প্রিয়া হইয়াও যাহাদিগের উপর স্নেহবশে পল্লব গ্রহণ করিত না, যাহাদের নব কুসুম উদ্গম হইলে যার উৎসব বলিয়া মনে হইত—সেই শকুন্তলা আজ পতিগৃহে যাইতেছে। সন্নিহিত দেবতা, তপোবন তরু, তোমরা অনুজ্ঞা দাও। তরুরাও তখন কোকিল কল কণ্ঠ ধ্বনিতে সে অনুজ্ঞা প্রদান করিল।

মনে হয়, যেন তপোবনের তরুগুলি রক্তমাংসে গড়া, হৃদয়-সমন্বিত সচেতন জীব। অচেতনে প্রাণের প্রতিষ্ঠা করা, জড়কে মূর্ত্তিমান্ করিয়া তোলাই মহাকবির এক অক্ষয় কীর্ত্তি। এ ছবি হৃদয়ে শান্তি ও পবিত্রতা আনিয়া দিয়া এবং অভিনব স্বর্গের সৃষ্টি করে। এ যেন একাধারে নন্দন বনের সুষমা, ভাগীরথীর পুণ্যপ্রপাত। এ যেন স্বপ্নের ফুল, আরাধনার ফল।

শকুন্তলা জনান্তিকে—আর কেহ শুনিতে না পায় এমন ভাবে—প্রিয়ম্বদাকে কহিল, "সখি, যদিও আমি আর্য্যপুত্র দর্শনের জন্য সমুৎসুকা হইয়াছি, কিন্তু তবু আমার চরণ যে তপোবন ছাড়িয়া যাইতে চাহে না।" শকুন্তলা যেমন তপোবন বিরহে কাতরা, শকুন্তলার আসন্ন বিরহে তপোবনের অবস্থা সেই একই প্রকার। হরিণীরা তৃণ-কবল মুখে করিয়াই রাখিয়াছে, ময়ুরীরা তাহাদের নৃত্য ছাড়িয়া দিয়াছে, লতারা পাণ্ডুপত্র ফেলিয়া দিয়া শোকবাষ্প ত্যাগ করিতেছে। কাব্যের অলঙ্কার গুলি সজীব হইয়া ফুটিয়া উঠিল। হৃদয়ের ভাব নিয়ে মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিল।

শকুন্তলা তখন ভগ্নীরূপা মাধবীলতার নিকটে গেল। বাহু আলিঙ্গনে তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়া বলিল, "লতাবহিন, তোমার শাখাময় বাহু দিয়া আমাকে আলিঙ্গন কর, আজ আমি তোমাদের ছাড়িয়া অনেক দূরে চলিলাম।" পিতার দিকে ফিরিয়া স্নেহময়ী কন্যা অনুরোধ জানাইল, "বাবা, ইহাকে আমারই মত ভালবাসিও।" সখীদের নিকট গিয়া কহিল, "এই মাধবীটিকে তোমাদের হাতে সঁপিয়া দিয়া গেলাম।" শকুন্তলার সহোদরা ছিল না, মাধবীকে দিয়াই সে সাধ মিটাইয়া লইয়াছে, ভগিনীকে ভগিনীদের হাতে দিয়া সে এখন নিশ্চিন্ত হইল।

গর্ভভারমন্থরা মৃগবধূ আসিয়া ধীরে ধীরে নিকটে দাঁড়াইল। তখন শকুন্তলা বাবাকে অনুনয় করিয়া কহিল, "বাবা, উটজ-চারিণী মৃগবধূর যখন সুখপ্রসব হইবে, তখন সে সংবাদ পাঠাইতে আমাকে ভুলিও না।"

তখনই পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া বসনাগ্র টানিতে লাগিল, শকুন্তলা ফিরিয়া দেখে—যাহার কুশ-সূচি-বিদ্ধ মুখে কত আদর করিয়া সে ব্রণ-নাশক ইঙ্গুদীতৈল সেচন করিয়াছে, যে মাতৃহারা সন্তানটীকে সে হাতে করিয়া নীবারমুষ্টি খাওয়াইয়া বড় করিয়া তুলিয়াছে—সেই মৃগশিশুটী আজ ছল ছল নেত্রে সম্মুখে উপস্থিত। শকুন্তলার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

তখন কাঁদিতে কাঁদিতে শকুন্তলা সেই চিরপরিচিতা সরসীর তীরে বটতরুর ছায়ায় গিয়া বসিল। তথায় নলিনীপত্রান্তরালে লুক্কায়িত চক্রবাক্ ও তার প্রিয়ার কথার উত্তর দিতেছেনা। মৃণালখণ্ড মুখে রাখিয়া চিত্র লিখিত ছবি খানির মত একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে। এইবার তপোবনের সীমানা ছাড়াইয়া পথে উঠিতে হইবে, শকুন্তলা তখন পিতাকে শেষ আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "বাবা, তোমার কাছ ছাড়া হইয়া মলয় পর্ব্বতচ্যুতা চন্দন-লতার মত কেমন

করিয়া আমি বাঁচিয়া থাকিব?" সখীদের কাছেও শেষ বিদায় লইয়া বলিয়া গেল, "সখী, তোমরা দুইজনে আমাকে একসঙ্গে আলিঙ্গন কর।" পথে উঠিয়া আবার পিতার দিকে শেষ কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রার্থনা জানাইয়া গেল,—"বাবা, কবে আবার তপোবন দেখিতে পাইব?" শকুন্তলার যাওয়া ত আর দুই এক মাসের জন্য বা দুই এক বৎসরের জন্য নহে। পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করার পর তবে পতির সহিত আবার তপোবনে আসা ঘটিবে। সে কত কাল?

সাধক-কমলাকান্ত।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সাধক কমলাকান্তের ধনাঢ্য শিষ্য অম্বিকায় প্রত্যাগত হইয়া গুরুপুত্রের সঙ্গীতদ্বারা লোকবিমোহনের অপূর্ব্বক্ষমতা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের নিকট বর্ণন করিয়াছিলেন। এখন সকলে তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া যারপর নাই সুখী হইলেন। প্রতি দিনই এক এক স্থানে বৈঠক হইতে লাগিল। সাধক কোকিল কণ্ঠে কালী গুণানুকীর্ত্তনে, ভক্তি ও প্রেমের উচ্ছ্বাসে পাষণ্ডকেও বিচলিত করিতে লাগিলেন। লোকসমাজে যশের প্রতিবন্ধক অহঙ্কার ও অভিমান। সাধক সেই অভিমান ও অহঙ্কারকে জগদম্বার নিকট বলি দিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন। এক দিন ধনাঢ্য শিষ্যের পুত্র সাধককে বলিলেন, "গুরুদেব! আপনি যেখানে সেখানে কালীনাম সংকীর্ত্তন করেন। লোক-বিচার, স্থান বিচার, অবস্থা বিচার করেন না। হাড়ী, ডোম, চণ্ডালেরও অনুরোধে স্থান বিচার না করিয়া কালীগুণ গান করেন। আমার বিবেচনায় তাহাতে আপনার গুরুত্বের লাঘব হয়।" সাধক হাসিয়া কহিলেন, "কেন বাবা! কালীনামের কি কালাকাল স্থানাস্থান আছে? প্রেম পরমবস্তু, ভক্তিদেব বায়ু আবরণ বিহীন স্থানে বড় সুখস্পর্শ হয়। বিষয়ী লোকের হৃদয়ের আবরণ বিষয়। সেখানে প্রেম-বাতাস বড় সুখে সঞ্চারিত হয় না, যদি

সঞ্চারিত হয়, বিষয় আবরণ থাকাতে বাতাসে একটু গন্ধ থাকে। যদি বিষয়ী ব্যক্তি হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিতে পারেন, বিষয়ের প্রকৃত আবর্জ্জনা দূরে নিক্ষেপ করিতে পারেন, তাহা হইলে ত্যাগশীল তাঁহার উদার হৃদয়-কুসুম উত্থান হয়, প্রেম-কুসুমের সৌরভে নিজে উন্মত্ত হইয়া দশজনকে আকুল করিতে পারেন। তাদৃশ ব্যক্তির মুক্তিফল লাভ অতি সুলভে হইয়া থাকে, কিন্তু এরূপ ব্যক্তি সংখ্যায় অতি অল্প। সংসারে যাহারা গরীব, সংসারে যাহারা দুঃখী, তাঁহাদের হৃদয়ে বিষয় বাসনা বড় স্থান পায় না। আবর্জ্জনা শূন্য বলিয়া প্রেমের বাতাস সহজে সঞ্চারিত হয়। যেখানে প্রেম সেই খানেই মহাশক্তির আবির্ভাব। হৃদয় উদার না হইলে প্রেম আসে না। কুটিল ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উদার চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ। উদার হৃদয়ে কালীনাম বীজ বপন করিলে শীঘ্র শীঘ্র ভক্তি-তরু বর্দ্ধিত হইয়া সুফল প্রদান করে। কিন্তু বাবা, ইহা ত জানা নাই কাহার হৃদয় উদার, কে ভক্তিমান, আমি জানি আমার মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে। ভাল মন্দর বিচার তিনিই জানেন।" সাধক গাহিলেন:—

মা! একথা আমারে বল, তোমার কেবা মন্দ কেবা ভাল।
বিদ্যারূপে দিয়ে জ্ঞান কারে কর পরিত্রাণ,
কারে অবিদ্যা আবৃত করে, মোহ গর্ত্তে টেনে ফেল॥
জীবমাত্রে শিব বটে একথা অনেকে রটে,
যে সদানন্দ তারে কেন, নিরানন্দ হতে হল॥
কমলা-কান্তের কালী মনের কথা মাকে বলি,
কারু সুখের উপর সুখ, কারু দুখে কেন জনম গেল॥

সাধক বলিলেন, "বাবা! কে মন্দ কে ভাল একথা বুঝিবার আমাদের ক্ষমতা নাই। আজ যে অতি মন্দ, কাল সে অতি ভাল হয়। মানব-মনের অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহার শত শত উদাহরণ শাস্ত্রে পাইবে। ভাল মন্দ করা পরমাপ্রকৃতির ইচ্ছা। বাবা! মানুষ মাত্রেই সকলেই ভাল, সকলেই সমান, তবে কেহ দুষ্কৃতি বশতঃ অবিদ্যার আশ্রয় লয়, ঘৃণা, অহঙ্কার, দ্বেষ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি অবিদ্যার বশীভূত হয়, কেহ বা সংসারের সৎগুণ রাশির সুশীতল ছায়া অবলম্বন করিয়া কালী-কল্পতরু-মূলে চারিফল লাভ করে। পণ্ডিত জ্ঞানী ব্যক্তি জীবমাত্রকেই শিবভাবে দর্শন করা কর্ত্তব্য। সদানন্দের আবার নিরানন্দ কি? তাই বলি, মানবের ভেদ জ্ঞান আমাদের অজ্ঞান

বশত হয়। তাই কাহাকে উচ্চ, কাহাকে নীচ কাহাকে সুখী, কাহাকেও বা দুঃখী দর্শন করি। এ অজ্ঞান আঁধার ঘুচাইবার একমাত্র ঔষধ কৃপাময়ীর ভক্তি প্রসূত জ্ঞানজ্যোতিঃ। বাবা ছোট, বড় কেহই নাই, সকলেই বড় হইতে চায়। এই পৃথিবীর ভিতর আমরা কীট পতঙ্গ, আমাদের আবার ছোট বড় কি ?" শিষ্য লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আপনি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আপনাদের মত নির্ব্বিকার সাধু পুরুষের সুজন, কুজন নাই, কিন্তু বাবা ! আমাদের ত সাধু সঙ্গ চাই। নীচমনা, নীচ কুলোদ্ভব, কদাচারি লোকের সহবাসে আমার বিশ্বাস প্রকৃতি দুষিত হয়। আপনি কি আমাকে উন্নত মনা সদ্বংশজাত ব্যক্তিগণের সহিত সহবাস করিতে উপদেশ দেন না ?" সাধক হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি তোমাকে সৎ সহবাস করিতে বলি, কিন্তু নীচ বংশজাত ব্যক্তিগণকে ঘৃণা করিতে বলিনা। বাবা একথা মনে রাখিবে, মানুষ ধনে বড় হয় না, মনে বড় হয়, পাণ্ডিত্যে, আচার বিচারে বড় না, মনের শুদ্ধ ভক্তি ও তৎপ্রসূত জ্ঞানে বড় হয়। বড় বলিতে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হওয়া বুঝিবে। কাহার ভিতর কি আছে কে জানে। যার কালীনামে হৃদয় দ্রব হয়, তিনি আমার পরম আত্মীয়। কালীনাম অমৃত পানে যাঁর সতত পিপাসা, তিনি আমার মাথার চূড়ামণি।" সাধক আবার গাহিলেন :—

আচার বিচার নিত্য নয়।
যে সাধকের দার্চ্যভাব সে সত্যময় ॥
দেখ, একবস্তু নানামত সে পঞ্চতত্ত্বে অনুগত,
যাহাতে উপজে পুন তাহাতেই প্রলয় ।
ধ্যান স্থির যে জনার, সেই ব্যক্তি সদাচার,
সে ব্রহ্মরূপ ভাবিয়ে আনে ব্রহ্মময়।
কমলা কান্তের চিত, তটেতে তরণী পাত,
নানা দেশ ভ্রমণে কেবল দুঃখ চয় ॥

সাধক বলিতেছেন, "আচার বিচারে কি হয় বাবা ! সে সব অনিত্য। কেবল মাত্র দৃঢ়াভক্তি সংসার সাগর পার হইবার একমাত্র উপায়। মানুষের মন দেখিয়া বিচার। দৃঢ়াভক্তি মনের। মন অপূর্ব্ব জিনিস। মানুষে কি আছে, ক্ষিতি, অপ ইত্যাদি পঞ্চভূতের বিকার মাত্র। এই পঞ্চভূত হইতে মানুষ জন্মিতেছে, আবার লয় হইতেছে, আবার জন্মিতেছে।

ক্রমশঃ

মহালক্ষ্মী।

লেখক,— শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রথম পল্লব।

আশা পথে—

বৃহৎ একখানি অট্টালিকা; সংস্কারাভাবে মলিন হইয়া রহিয়াছে, সদর দরজার কবাট প্রায় আধখানা কীটজীর্ণ হইয়া ভগ্নপ্রায়, সদর বাড়ীর উঠানে মুথাঘাস, কাঁটা-নটে ও ছোট ছোট কচুগাছ জন্মিয়াছে। উত্তরদিকে তিন ফুকুরে পূজার দালান, থামের গায়ের ঠাঁই ঠাঁই চুণবালি খসিয়া পড়িয়াছে, উঠানের তিনধারে জোড়া জোড়া থাম দেওয়া বারাণ্ডা, চকবন্দী, সে সকল থামের চুণ বালির ভিতর দিয়া ছোট ছোট ইটগুলি উকি মারিতেছে, এইরূপ দুর্দ্দশা। সদর বাড়ীতে জন মানবের সঞ্চার নাই।

অন্দর মহলে ঘরগুলিও জনশূন্য, একটি ঘরের একধারে পুরাতন খাটে নেটের মশারি ফেলা বিছানা, মেঝের দুইধারে দুইখানা চৌকিপাতা, দুই চৌকিতেই দুইটা আধ ময়লা তাকিয়া, পূর্ব্বধারে চাবিখোলা একটা পুরাতন আলমারি, কড়িকাষ্ঠে মাকড়সার জালে ঝালর দেওয়া মস্ত একখানা টানাপাখা। কোন দিকেই মানুষ নাই, কেবল একটি চুলপাকা বুড়ী এক একবার ব্যস্ত-পদে এঘর ও ঘর ছুটা ছুটি করিতেছে।

বৈশাখ মাস, বেলা প্রায় আড়াই প্রহর, সেই সময় সদর বাড়ীর উঠানে একখানা পাল্কি আসিয়া নামিল, পাল্কির ভিতর হইতে গৃহিণী-ধরণের একটি স্থূলাঙ্গি স্ত্রীলোক বাহির হইয়া মন্থর পদে অন্দরে প্রবেশ করিলেন ; যে ঘরে বিছানা, সেই ঘরেই প্রবেশ। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে এদিক ওদিক চাহিয়া গৃহিণী ঠাকুরাণী "শ্যামীর মা, শ্যামীর মা" বলিয়া ডাকিলেন ; শ্যামীর মার উত্তর না পাইয়া বিরক্ত বদনে তিনি একখানা চৌকির উপর বসিয়া পড়িলেন।

গৃহিণীর বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ বৎসর, কপালের দিকের অর্দ্ধেক চুল পাকিয়াছে, অর্দ্ধেক গুলি কাঁচা আছে, সীমন্তে সিন্দুর নাই, বিধবা ; নাম গণেশ

জননী। পূর্ব্বেই বলা আছে,—গৃহিণীটি স্থূলাঙ্গী। মুখখানি প্রায় চক্রাকার, রৌদ্রের উত্তাপে প্রায় রক্তবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মধারা।

গৃহিণী বসিয়া আছেন, পশ্চিম দিকের একটা ঘর হইতে সেই বুড়ী একখানা পাখা হাতে করিয়া সম্মুখে আসিয়া হাজির হইল। পাঠক মহাশয় জানিয়া রাখুন, সেই বুড়ীই শ্যামীর মা, এ বাড়ীর পুরাতন চাকরাণী।

গৃহিণীকে ঘন ঘন বাতাস করিতে করিতে শ্যামির মা বলিতে লাগিল, "তাই তো গা, একেবারে যে ঘামে ঘামে নেয়ে পড়েছ! আমি তো বলেছিলাম, এত রৌদ্রে বেরিও না, শুন্‌লে না আমার কথা, গোঁ ভরে বেরিয়ে গেলে। পাল্কিতে এসেছ, তবু এখনও হাঁপাচ্চ, মুখখানি রাঙা হয়ে উঠেছে।"

এই সব কথা বলিয়া, পাখাখানা রাখিয়া, শ্যামীর মা নিজের আঁচল দিয়া গৃহিণীর মুখখানি মুছাইয়া দিতে আরম্ভ করিল। কোন কথার উত্তর না দিয়া চঞ্চলস্বরে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে মেয়েমানুষটি এসেছে?"

শ্যামীর মা উত্তর করিল, "এখনো আসে নি, খবর পাঠিয়েছে, শেষ বেলায় আস্‌বে।"

কষ্টে ধৈর্য্যধারণ করিয়া শ্যামীর মার সহিত গৃহিণী তখন সংসার ধর্ম্মের অন্য কথা পাড়িলেন, সে সব কথা ফুরাইলে তিনি একটু কাতর বচনে বলিলেন, "তাই তো! তিন দিন হলো, মাসীর বাড়ী যাই বোলে নরেশ সেই যে চলে গেছে, আজও ফিরে এলোনা। আহা! দুঃখের ভাবনা ভেবে ভেবে বাছা আমার একেবারে কালিবর্ণ হয়ে গেছে, তার মুখ দেখে আমি আর চক্ষে জল রাখ্‌তে পারি না; সাক্ষাতে কাঁদি না, আমি কাঁদ্‌লে নরেশের চক্ষে জল আসে, তাই জন্যে সাম্‌লে যাই, ভিতরে ভিতরে গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদি। তাই তো! কেন এত দেরি হচ্ছে বল্‌তে পারিস্?"

চক্ষু মুছিয়া শ্যামীর মা বলিল, "হয় ত কোন কাজ পড়েছে, তাইতেই আস্‌তে পাচ্ছেন না, আজ আর থাক্‌বেন না। কালি হয়ে গেছেন বোল্‌ছ, হবারই ত কথা। বাবুর ছেলে বাবু, এত বয়স পর্য্যন্ত সুখে কাটিয়েছেন, এত কষ্ট কি সহ্য হয়? আহা! বাছাকে আমি হাতে গোড়ে মানুষ করেছি, তোমার যত, ততটা না হউক নরেশের জন্য আমার কতটা দরদ, তা তুমি জান। বাবুর ছেলে হয়ে বাছা আমার পরের চাকরি কর্‌বার জন্যে উমেদারি করে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এ দুঃখ কি আমার প্রাণে সয়? তা—আজ আর কোথাও থাক্‌বেন না, সন্ধ্যা হবার আগে বাড়ী আস্‌বেন। (গৃহিণীর

মুখের দিকে চাহিয়া চমকিয়া) ওমা! তাই ত! তোমারও মুখখানি যে কালি মেরে আস্‌ছে! এখনও যে হাঁপাচ্চ! রোসো রোসো, বাতাসা ভিজিয়ে সরবত করে রেখেছি, একটু খাও।"

এই বলিয়া শ্যামীর মা সেই আলমারির ভিতর হইতে খুরি ঢাকা এক গেলাস সরবত আনিয়া দিল, এক চুমুক পান করিয়া গৃহিণী তখনি গ্লাসটি দাসীর হাতে ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন, "আর খাবো না, বুক্লে যাবে।"

চৌকির নীচে গ্লাসটি রাখিয়া শ্যামীর মা আরও খানিকক্ষণ কাছে বসিয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পল্লব।

মহালক্ষ্মী।

গৃহিণী একটু সুস্থ হইলেন। বেলাও ক্রমে শেষ হইয়া আসিল। নিশ্বাস ফেলিয়া গৃহিণী পুনর্ব্বার বলিলেন, "কৈরে, সে মেয়েটি তো এখনো আস্‌ছে না।"

গৃহিণীর কথা শেষ না হইতে হইতেই একটি মলিন বসনা কামিনী সেই গৃহে প্রবেশ করিল। পরমাসুন্দরী, বয়স অনুমান সপ্তদশ কি অষ্টাদশ বৎসর, অল্প ঘোম্‌টায় ভ্রূযুগল পর্য্যন্ত ঢাকা, মুখখানি ম্লান।

কষ্টে মৃদু হাসিয়া গৃহিণী বলিলেন, "এসো মা, এসো, বোসো, এই সবে তোমার নাম হচ্ছিল, অনেক দিন বাঁচবে।"

সেই চৌকির উপর গৃহিণীর পদতলে কামিনী বসিল, পাখাখানি হাতে করিয়া শ্যামীর মা একবারে দেওয়ালের ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কামিনীর মুখের দিকে চাহিয়া গৃহিণী বলিলেন, "পাঁচুর পিসীর চিঠি আমি পেয়েছি, তোমার কথাই লিখেছেন। তুমি চাকুরি চাও। তোমার এই রূপ, এই বয়েস, দেখ্‌তে যেন রাজার মেয়ে, তুমি চাকরি কর্‌বে? এটা যেন আমার তামাসা মনে হচ্ছে।"

কামিনী বলিল, "না মা, তামাসা নয়, আমি চাকরি কর্‌ব। আমার মা বাপ নেই, বড় মানুষের মেয়ে ছিলাম বটে, গায়ে অনেক টাকার গহনাও ছিল বটে, বাবার অনেক গুলি টাকা আমার হাতে পড়েছিল বটে, কিন্তু ডাকাতেরা আমার সর্ব্বস্ব লুটে পুটে নিয়েছে, পেটের ভাতে বঞ্চিত হয়েছি। পাঁচুর পিসীকে আমি পিসী বলি, তাঁদের বাড়ীতেই থাকি, তিনি দুটি দুটি খেতে

দেন, আমি তাঁর কাজকর্ম্ম করি, কিন্তু তাঁদের সংসারেও বড় কষ্ট। তিনি মাকে বলেছিলেন, নরেশ্বর বাবুর মা একজন রাঁধুনী চান, আমি রাজী ছিলাম, তিনিও সেই ভাবে নরেশ বাবুর মাকে পত্র লিখে ছিলেন, আপনি নরেশ বাবুর মা ?''

গৃহিণী বলিলেন, "হ্যাঁ বাছা, নরেশের মা আমি ; তোমার রূপ দেখে এখন তোমারও মা হলেম্। সত্যি যদি তুমি আমার কাছে থাকতে চাও, স্বচ্ছন্দে থাকো, মায়ের মতন যত্ন পাবে, কোন কষ্ট হবে না। আমার সংসারও এখন ততটা স্বচ্ছল নয়, তবু তোমাকে আমি স্থান দিতে পারব। আমারও কেউ নাই, ছেলেটি আছে, আর আমি আছি, আর আমার মায়ের মতন শ্যামীর মা আছে। আমি বুড় হয়েছি কিনা, রাঁধাবাড়া সব পেরে উঠি না, সেই জন্য মেয়ের মতন একটি মেয়ে পেলে রাখি, এই আমার ইচ্ছা। তুমি এসেছ, বেশ হয়েছে, থাকো। আজ অবধি থাকবে কি ?"

মৃদুস্বরে কামিনী বলিল, "না মা, আজ না, কাল বৈকালে আমি আস্‌ব, দু এক খানি কাপড় চোপড় যা আছে আন্‌ব; কাল অবধিই থাকব।"

আরও দুটি পাঁচটি কথা হইল, গাত্রোত্থান করিয়া কামিনী বলিল, "সন্ধ্যা হয়, আজ তবে আমি আসি; অনেক দূর যেতে হবে, অন্ধকার হলে যেতে পারব না।"

গৃহিণী বলিলেন, "হ্যাঁ মা, তবে এসো, শ্যামীর মা বরং খানিক দূর এগিয়ে দিয়ে আসুক। হ্যাঁ; ভাল কথা—তোমার নামটি কি ?"

মাথা হেট করিয়া কামিনী উত্তর করিল, "মা আমার নাম রেখে ছিলেন মহালক্ষ্মী।"

দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া সানন্দে গৃহিণী বলিলেন, "আহা হা! মহালক্ষ্মী! যেমন রূপ, যেমন মিষ্টি মিষ্টি কথা, তেমনি সুন্দর নামটি! তুমি থাকো, আমার সংসারে মহালক্ষ্মী হও।"

মহালক্ষ্মীকে এই কথা বলিয়া, শ্যামীর মার দিকে চাহিয়া গৃহিণী তখন বলিলেন, "যা শ্যামীর মা, মহালক্ষ্মীকে এগিয়ে দিয়ে আয়, পারিস্ তো বাড়ী পর্য্যন্ত রেখে আসিস্।"

শ্যামীর মা যাইতে উদ্যত, বাধা দিয়া মহালক্ষ্মী বলিল, "না না তোমাকে আর কষ্ট করে যেতে হবে না, এখনও একটু একটু আলো আছে, আমি বেশ যেতে পারব।"

শ্যামীর মা গেল না, মহালক্ষ্মী একাকিনী বাহির হইল। সম্মুখের আর একটা ঘর পার হইয়া বারাণ্ডা দিয়া নামিয়া আসিতে হয়, মহালক্ষ্মীর কটিদেশে ছোট একখানি রুমাল জড়ানো ছিল, দ্বিতীয় ঘরের দরজার পাশে সেই রুমাল খানি লুকাইয়া রাখিয়া আপন মনে হাসিতে হাসিতে মহালক্ষ্মী নামিয়া আসিল, গৃহিণী অথবা শ্যামীর মা সেই রুমালের রহস্য দেখিতে পাইল না।

সে বাড়ী হইতে পাঁচুর পিসীর বাড়ী প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূর। মহালক্ষ্মী সরাসর পাঁচুর পিসীর বাড়ীতে গেল কিনা, সে তত্ত্বটি অজ্ঞাত রহিল।

তৃতীয় পল্লব।

রুমাল।

সন্ধ্যা হইয়া গেল, শ্যামীর মা একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া, গঙ্গাজল ছড়াইয়া, ঘরে ধুনা দিল। গৃহিণী বলিলেন, "আমি অনেকটা সুস্থ হয়েছি, একখানা পাল্কি ডেকে আন, আমি আর একবার যাব, উকীল বাবু তখন বাড়ী ছিলেন না, দেখা হয় নি, সন্ধ্যার পর দেখা হবে শুনে এসেছি।"

শ্যামীর মা পাল্কি ডাকিয়া দিল; গৃহিণী উকিল বাড়ী চলিয়া গেলেন। তিনি বাহির হইবার অর্দ্ধঘণ্টা পরে নরেশ বাবু আসিয়া উপস্থিত। শ্যামীর মা আহ্লাদে ব্যস্ত হইয়া পা ধোবার জল আনিয়া দিল, গায়ের জামা চাদর খুলিয়া লইল, চৌকিতে বসাইয়া, জননীর প্রসাদী সরবৎটুকু খাইতে দিয়া, বাতাস করিতে করিতে ছল্ ছল্ চক্ষে চাহিয়া, সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল, "এত দেরি হল কেন বাবা ?"

নরেশ্বর উত্তর করিলেন, কাজের ঝঞ্ঝাটে কোথায় কখন দেরি হয়, কিছুই বলা যায় না। কি জান ঝি মা, আমার কপাল বড় মন্দ; এত কষ্ট আমার হবে, স্বপ্নেও জান্‌তাম না! এমনি অদৃষ্ট, কোথাও একটা চাকরি জুট্‌ছে না। তুমি এক কাজ কর; বংশী বাবুর ডাক্তার খানা থেকে আমায় এক শিশি গোলাপ জল এনে দাও; রোদে রোদে ঘুরে ঘুরে মাথাটা বড় ধরেছে।

নরেশ্বর একটি সিকি বাহির করিয়া দিলেন, শ্যামীর মা গোলাপ জল আনিতে গেল। ঘটনার বিচিত্র গতি। একাকী বসিয়া থাকিতে না পারিয়া নরেশ্বর উঠিয়া বারাণ্ডায় যাইতে ছিলেন, সম্মুখের ঘরের দরজার পাশে কি একটা সাদা জিনিস পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন, তুলিয়া লইয়া দেখিলেন

একখানি রুমাল ; ভাবিলেন, কি আশ্চর্য্য ! আমার তো রুমাল নাই, এ রুমাল কোথা হইতে আসিল ? ভাবিতে ভাবিতে তিনি ফিরিলেন, যে ঘরে প্রদীপ জ্বলিতে ছিল, সেই ঘরে পুনঃ প্রবেশ করিয়া, উলটিয়া পালটিয়া রুমাল খানি ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন ; এ রুমাল কাহার, মনে মনে এই তর্ক। দুই তিনবার দেখিতে দেখিতে রুমালের একটি কোনে তাঁহার নজর পড়িল, প্রদীপের অতি নিকটে লইয়া গিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, সবুজ রেশমে সুঁচে তোলা একটি নাম। কি নাম ?—পড়িয়া দেখিলেন, "মহালক্ষ্মী।"

আনন্দে ও বিস্ময়ে নরেশের গাত্র রোমাঞ্চিত হইল ; দুই তিন বার রুমাল খানির আঘ্রাণ লইয়া ধীরে ধীরে সেই চৌকিতে গিয়া বসিলেন, হাতের রুমাল হাতেই রহিল, দৃষ্টি কিন্তু চঞ্চল।

এ দৃষ্টি কি চায় ?—কে জানে কি চায়। বারম্বার রুমাল খানি নাসারন্ধ্রের নিকটে লইয়া গিয়া নরেশ যেন কি একটি সুগন্ধ অনুভব করিলেন, মানসে তর্ক তুলিলেন, ঝিমা তো গোলাপ জল আনিতে গেল, ইতি মধ্যে এ রুমালে গোলাপ মাখাইল কে ?

নরেশ এরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় একটি সুন্দরী নারী মূর্ত্তি সেই ঘরে প্রবেশ করিল। কে ?—মহালক্ষ্মী।

মুখামুখী উভয়ের দর্শনমাত্রে অতি আশ্চর্য্য ভাবের প্রকাশ। উভয়ের অধরে আনন্দের হাসি ধরে না। পাঠক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, অর্দ্ধক্রোশ দূর হইতে এত অল্প সময়ের মধ্যে মহালক্ষ্মী আবার কিরূপে ফিরিয়া আসিল ? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা জানি না। মহালক্ষ্মী অর্দ্ধক্রোশ দূরে গিয়া ছিল কিনা, মহালক্ষ্মীই তাহা জানে। নরেশ্বর বাবু সাদরে হস্ত ধারণ পূর্ব্বক মহালক্ষ্মীকে নিকটে বসাইলেন। মা গিয়াছেন উকীল বাড়ী, ঝি গিয়াছে ডাক্তার খানায়, দুই ঠিকানাই নিতান্ত নিকট নয়, ব্যবধান কালে অন্ততঃ আধঘণ্টা সময় পাওয়া যাইবে, এই স্থির করিয়া নরেশ বাবু মহালক্ষ্মীর সহিত চুপি চুপি বাক্যালাপ আরম্ভ করিলেন। রমণী মূর্ত্তির প্রবেশ মাত্রে রুমাল খানি তিনি লুকাইয়া ফেলিয়া ছিলেন, স্বকৌতুকে সঙ্গিনীকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, অকস্মাৎ তুমি এখানে কোথা হইতে আসিলে ?

মধুর অধরে মৃদু হাসিয়া মহালক্ষ্মী বলিল, "একটু আগে আর একবার আমি আসিয়া ছিলাম, আমার রুমাল খানি এইখানে ফেলিয়া গিয়াছি ; লইতে আসিয়াছি, আমার রুমাল দাও।"

কৌতুকে বিস্ময় জানাইয়া নরেশ্বর বলিলেন, "তোমার রুমাল ?— তোমার রুমাল আমি কোথায় পাইব, সত্য যদি তুমি ফেলিয়া গিয়া থাক, অন্বেষণ কর। এইমাত্র আমি বাড়ীতে আসিতেছি, কোথায় কাহার রুমাল, আমি তাহার কি জানি ?"

পূর্ব্ববৎ মৃদু হাসিয়া মহালক্ষ্মী বলিল, "আমার সমস্ত জিনিষ তোমার কাছেই ছিল, কেবল রুমাল খানি ছিল না, ইহা কি সম্ভব ? নিশ্চয়ই তোমার কাছে আছে ; আমার রুমাল দাও।"

মোহিনীর সব কথাগুলি নরেশ্বরের কর্ণে প্রবেশ করিল না, "ছিল" কথাটা শুনিয়াই তাঁহার বুক ধড়্ ফড়্ করিতে লাগিল। কাতর কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সমস্ত জিনিস আমার কাছে ছিল ! মহালক্ষ্মী এ ব্যাকরণ তুমি কত দিন শিখিয়াছ ? অতীত ক্রীড়ায় 'ছিল' শব্দ প্রয়োগের——

নরেশের মুখের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই একটু যেন মলিন বদনে একটু যেন নিরশ কণ্ঠে মহালক্ষ্মী বলিল, "সে সব কথা ভুলে যাও ! আমার আশা পরিত্যাগ কর ! বড় ভালবেসে ছিলাম, বড় ভাল বেসে ছিলে, বিধাতা বাদ সেধেছে ! আমি আর তোমার হলেম না, হতে পারলেম না, তুমিও আমার হলে না ? আমার আর সেদিন নাই ! আমি এখন পথের কাঙ্গালিনী ! ডাকাতেরা আমার সর্ব্বস্ব লুটে নিয়েছে, কেবল প্রাণটি মাত্র রেখেছে, আমি এখন পরের বাড়ীতে অন্নদাসী। আমি তোমাদের বাড়ীতে চাকরি করতে এসেছি, এই বাড়ীতেই আমি থাকবো. তোমার মা আমারে মেয়ের মতন ভাল বাস্‌বেন বোলেছেন, কাল আমি আস্‌ব, এখন আমি চল্‌লেম, তুমি আমার রুমাল দাও।"

বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া নরেশ্বর খানিকক্ষণ চিত্রকরা পুতুলের মতন মহালক্ষ্মীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, অবশেষে এক নিশ্বাস ফেলিয়া করুণ স্বরে বলিলেন, "মহালক্ষ্মী ! ইন্দ্রদেবের পূজা কর, বজ্র চাহিয়া লও, সেই বজ্র আমার বুকে হানো, তোমাধনে বঞ্চিৎ হইয়া নরেশ্বর পৃথিবীতে জীবিত থাকিবে, মনের কোনেও এমন কল্পনাকে স্থান দিও না ! তুমি ধনেশ্বরী ছিলে, আমি কি ধন লোভে তোমার ভালবাসা কামনা করিয়াছিলাম ? আমি গরীব হইয়াছি, জানিয়াও কেন তুমি এই গরীব নরেশকে ভালবাসিয়া ছিলে ? ডাকাতেরা তোমায় ধনহীনা করিয়াছে হৃদয়েশ্বরি ! সেই জন্য কি আমি তোমারে ভাল বাসিতে পেছু পা হইব ? তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন ! তোমার সর্ব্বস্ব ধন আমার কাছে গচ্ছিত ছিল, এই কথা তুমি বলিতেছ ? ঐ কথা শুনিবার অগ্রে

আমার প্রাণ কেন বাহির হইল না? রুমালেশ্বরী! এই লও, তোমার রুমাল। নরেশ্বর মিত্র জন্মের মত তোমার কাছে বিদায়!" এই বলিয়া নরেশ্বর সেই রুমালখানি বাহির করিয়া দিলেন।

ইতঃস্তত চাহিয়া দেখিয়া হাসিতে হাসিতে মহালক্ষ্মী বলিল, "জন্মের মত পৃথিবী হইতে আমি বিদায় হইবার পূর্ব্বে আমার নরেশ্বর বিদায় হইবে, তাজ্জব ব্যাপার? তুমি গরীব আছ, আমি গরীব হইয়াছি ভালই হইয়াছে, আমার ধনের অভাব কি? তুমি আমার হৃদয়ের ধন—সর্ব্বস্ব ধন, তোমার ভালবাসায় আমি বঞ্চিৎ হইব না, তুমিও আমারে ধনহীনা বলিয়া ঘৃণা করিবে না, আমার হৃদয় অনুক্ষণ সেই কথা আমার কাণে কাণে বলিয়া দিতেছে। আজ সূর্য্যদেব অস্তে গিয়াছেন, কাল আবার উদয় হইবেন, তাঁহাকে সাক্ষী রাখিয়া কাল আমি তোমার হস্তে আত্ম সমর্পণ করিব। তোমাদের বাড়ীতে আমি চাকরি করিব, সর্ব্বক্ষণ তোমারে দেখিব, পলকের জন্যও বিচ্ছেদ ঘটিবে না। তোমার মা যদি আমাদের এ শুভ মিলনে বাদিনী হন, তাহা আমি শুনিব না, তাঁহার কাছে আমি চাকরি করিব না, তোমারে লইয়া দূরদেশে চলিয়া যাইব। পূর্ব্বে পূর্ব্বে রাজাদের মেয়েরা স্বয়ম্বরা হইত, আমি বাঙ্গালীর মেয়ে কাঙ্গালিনী হইয়াছি, কাঙ্গালী বাঙ্গালীর মেয়ে স্বয়ম্বরা হইল, চন্দ্র সূর্য্য তাহা দেখিবেন। এ রুমাল তুমি রাখ, এখন আমি চলিলাম; কুমুদিনী যেমন চন্দ্রোদয়ে হাস্য করে, কল্য দিবা-ভাগে আমি কুমুদিনী হইয়া তোমার চন্দ্রানন দর্শন করে সেই রূপে হাস্য করিব।

অল্পক্ষণ হতাশের পর আকাশের চাঁদ যেন হাতে পাইয়া নরেশ্বর মিত্র মহা-নন্দে বিভোর হইয়া বলিলেন, "যতদিন প্রাণ থাকিবে, ততদিন তোমারে অবি-চ্ছেদে ভালবাসিব, তোমারে হৃদয় রাজ্যের রাণী করিয়া আমি যেন স্বর্গ পুরের রাজা হইব।" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি তখন মহালক্ষ্মীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সদর দরজা পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিলেন; রুমাল খানি তাঁহার কাছেই রহিল; মহালক্ষ্মী সে রাত্রে আর ততদূরে পাঁচুর পিসীর বাড়ীতে যাইবে না, রাত্রিবাসের যোগ্য অদূরে উপযুক্ত নিরাপদ আশ্রয় আছে, ইহাও তিনি শুনিয়া আসিলেন।

ঘরে ফিরিয়া আসিয়া নরেশ্বর নিজাসনে উপবেশন করিয়াছেন, অব্যবহিত পরেই শ্যামীর মা আসিয়া তাহার হস্তে গোলাপের শিশি অর্পণ করিল, তখনি আবার শিশিটি লইয়া নিজেই নরেশের মস্তকে গোলাপজল সিঞ্চন করিল, নরেশ্বর হাস্য করিলেন।

ক্রমশঃ

বিজয়-গীতি।*

লেখক,—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত।

রামকৃষ্ণ হরিবোল, আবার উঠিল রোল,
ছাড়িয়া মায়ের কোল মহাভক্ত ধীর।
সংসারের ধূলা খেলা, সাঙ্গ করি ভবলীলা,
ভবার্ণবে পেয়ে ভেলা, পাড়ি দিল বীর॥
জয় জয় শ্রীবিজয়, ত্যাগী ভক্ত উচ্চাশয়,
দীন দ্বিজ মহাশয়, আর্ত্তের সহায়।
পূতচিত শুদ্ধমতি, রামকৃষ্ণ ভক্তিস্মৃতি,
মহোৎসবে পূজা প্রীতি চির ভাবময়॥
নীরব করম বীর, রুগ্ন দেহে কার্য্য ধীর,
এক লক্ষ্য মতি স্থির, গম্ভীর ধারণা।
ইষ্টপদে সমর্পণ, আপনারে বিসর্জ্জন,
গভীর বিশ্বাস ধন, নাহিক তুলনা॥
স্পর্দ্ধাভরে গেছে বলে, "শেষ জনম" উচ্চকুলে,
আর না আসিবে ফিরে, সংসার কারায়।
ইষ্টধ্যানে ইষ্টজ্ঞানে, মগ্ন রবে রাত্রি দিনে,
সেই দিব্য দেবধামে "শ্রীরাম" যথায়॥
আদর্শ তাঁহার "নাগ", দীনোত্তম মহাভাগ,
রামের মহিমা-রাগ প্রচ্ছন্ন তাঁহায়।
বন্ধু প্রতি ভালবাসা, পর হিতে সদা আশা,
দয়া ক্ষমা স্নেহে পূর্ণ ছিল তিতিক্ষায়॥
কিবা গৃহী, কি সন্ন্যাসী, দীন দুঃখী প্রতিবাসী,
সকলের সনে ছিল প্রীতির বন্ধন।
লক্ষ্মী মার কৃপাপাত্র, পতিতের প্রিয় মিত্র,
আর তাঁর যত্র তত্র জীবন ধারণ॥

* বিজয়নাথ মজুমদার মহাশয়ের নিয়োগে বিরচিত।

পতিপ্রাণা পত্নী তাঁর, তাঁর পুণ্যে গৃহ তাঁর,
ছিল পুণ্য তপোবন, শান্তির আলয়।
তিনটী শিশুর সনে; কাঁদে সাধ্বী শূন্যমনে,
পিতা মাতা সহোদর করে হায় হায়॥
অকালে সোণার দীপ, নিবায়েছে সদা-শিব,
গুরুরূপী ইষ্ট তাঁর ইহাই সান্ত্বনা!
আরো উচ্চ আছে কাজ, তাই নাই কাল ব্যাজ,
রামকৃষ্ণ লোকে আজ উজ্জ্বল নিশানা॥
অগ্রেতে রাখালরাজ, শ্রীভূপতি মহারাজ,
পশ্চাতে দীনের সাজে বিজয় গমন।
দেবেন্দ্র গিরীশ যথা, প্রবেশ করিল তথা,
ভক্তি বলে, অবহেলে স্পর্শে যে আসন॥
সুধীর স্বভাব করি, "প্রভাতী গীতার" ছবি,
আছে তাঁর হাতে আঁকা মিষ্ট পদাবলী।
দিন যাবে, নাম রবে, পদাঙ্ক ধরিবে সবে,
এ পথের পথিকের পরমার্থ ধূলি॥
স্বজন বিয়োগ শোকে, ত্রিতাপ দহন বুকে,
জীবন্মৃত মনে সুখে, চোখে নাহি জল।
তোমাদের আছে জল, কর চিত সুশীতল,
'রামকৃষ্ণ হরিবোল' পথের সম্বল॥
লও সখে হৃদিফুল, থেকো চির-অনুকূল,
জীবনে মরণে ভুল আর যেন নয়।
টেনে লয়ে নিজ স্থানে, ঠাকুরের শ্রীচরণে,
শেষ জন্ম—এই শেষ, মোরও যেন হয়॥

বিজয়নাথ মজুমদার।

জন্মস্থান—চেঙ্গুটিয়া, যশোহর। জন্ম—সন ১২৮২ সাল।

মহাপ্রস্থান—সন ১৩২৯ সাল, ২৩শে বৈশাখ।

যুগাবতার পতিত-পাবন ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গগন হইতে গত ৩ বৎসর মধ্যে তাঁহার সাঙ্গ পাঙ্গ ও লীলা সহচরগণ অনেক গুলি সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক-ও তারকাগণ তাঁহার এই বিশাল লীলাক্ষেত্র আলোকিত করিয়া অর্থাৎ কত শত পথভ্রষ্ট নরনারীকে ধর্ম্মপথে অগ্রসর করাইয়া, কত শত যুবককে বিবেক-বৈরাগ্যে অনুপ্রাণিত করিয়া, কত শত মানবকে আধারোপযোগী শাস্ত্রের নিগূঢ়-তত্ত্ব বুঝাইয়া, দুর্ভিক্ষ ও উৎকট ব্যাধিক্লিষ্ট কত শত নিরাশ্রয় আর্ত্ত দীন হীন গৃহস্থকে সময়োপযোগী অভাব পূরণ ও শান্তি প্রদান করিয়া এবং আনুসঙ্গিক স্ব স্ব কার্য্য সমাপনান্তর লোক চক্ষুর অন্তরালে গমন করিয়াছেন। শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) লাটু মহারাজ (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) ভূপতি মহারাজ, কালী মহারাজ (স্বামী যোগবিনোদ) রাম-কৃষ্ণ বসু, ভাই কুঞ্জলাল (কুঞ্জ বিহারী শীল) হায়! সকলে এক্ষণে কোথায় বিরাজ করিতেছেন? চক্ষুষ্মান যাঁহারা তাঁহাদের দৃষ্টির বহির্ভূত কেহই হন নাই। আর আমার মতন যাহাদের অদ্যাবধি সে দৃষ্টি খোলে নাই, তাহারাই অভাব অনুভব করিতেছে।

এখনও দুই মাস কাল গত হয় নাই, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের শীর্ষস্থানীয় সর্ব্বলোক প্রিয় রামকৃষ্ণদেবের মানস পুত্র মদীয় নিত্য প্রণম্য দেবতা রাখাল মহারাজজীকে লীলাময় আকর্ষণ করিয়া লইলেন। সত্য বটে, কৃষ্ণসখা ব্রজের রাখাল না হয় মরধাম হইতে নিত্য ব্রজধামে গেলেন; কিন্তু ইহাতে ভারতের যে কি ক্ষতি হইল,—ভারতবাসী যে, কি মহারত্ন হারাইলেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না—যেন রামকৃষ্ণ গগন হইতে সহসা একটি ইন্দ্রপাত হইল। মহারাজের সহিত ত্রিবিধ ভাবে এ দাসানুদাসের ক্ষুদ্র হৃদয় আকর্ষিত থাকায় তাঁহার সহসা ইহ-জগত হইতে অন্তর্ধান হেতু বিষম মর্ম্মব্যথায় কথঞ্চিৎ উপশম হইতে না হইতে আর একটি নিদারুণ শেল আসিয়া হৃদয়ে আরও গুরুতর আঘাত করিল। মদীয় গুরুভ্রাতা পরম সুহৃদ বিজয়নাথ মজুমদার জন্ম সমাকুল

৩

ইহ-সংসারের মায়া পাশ ছিন্ন করিয়া—কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান সংশ্লিষ্ট গুরু ভাইদিগকে কাঁদাইয়া মহাসম্মীলন জন্য গুরুসকাশে গমন করিয়াছেন। ব্যাথার উপর ব্যথা—নিরুপায়—লীলাময়ের ইচ্ছা।

গত ২৩ শে বৈশাখ শনিবার বেলা ১২॥০ সাড়ে বারটার সময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানস্থিত স্বনাম প্রসিদ্ধ মহাত্মা রামচন্দ্রের অন্যতম প্রিয় শিষ্য বিজয়নাথ মজুমদার ৪৭ বৎসর বয়সে বৃদ্ধ পিতা মাতা, অনুজ ভ্রাতা ভগ্নী, সাধ্বী পত্নী ও নাবালক পুত্র কন্যাত্রয় এবং পরিজনবর্গের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করতঃ ইষ্টগুরু ধ্যান-মগ্ন চিত্তে ব্যাধিজীর্ণ পাঞ্চভৌতিক নশ্বর দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাঞ্ছিত রামকৃষ্ণলোকে শ্রীশ্রীগুরু সন্নিধানে গমন করিয়াছেন। ইহ জীবনের শেষ নিশ্বাসত্যাগের কয়েক মিনিট পূর্ব্বে বিজয় বাবুর জনৈক আত্মীয় শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণীর ফটোগ্রাফ আনিয়া বিজয় বাবুর সম্মুখে ধারণ পূর্ব্বক তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিন্তে পার কি?" বিজয় বাবু ফটোগ্রাফের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া "মা" এই কথাটি মাত্র বলিলেন। আর দ্বিতীয় বাক্য নিঃসরণ হইল না, বোধ হয় যেন মা আদ্যাশক্তি ব্রহ্মময়ী জগর্জ্জননীর একাক্ষরী "মা" নাম উচ্চারণ করিতে করিতে মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিলেন।

বিজয়নাথ যশোহর জেলার অন্তর্গত চেঙ্গুটীয়া গ্রামে ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণকুলে সন ১২৮২ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু কাশীনাথ মজুমদার। ইহাঁদের প্রকৃত উপাধি "ঘোষাল।" "মজুমদার" নবাব প্রদত্ত উপাধি। কাশীনাথ বাবুর হরিনাম সংকীর্ত্তনাদিতে বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং এখনও যে অন্তরে প্রবলভাবে জাগরূক আছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়; যাঁহার প্রভাবে তিনি তাঁহার এই প্রিয়তম জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয়নাথের বিয়োগ-জনিত পুত্রশোক বৃদ্ধবয়সে অবাধে সহ্য করিয়া যথা কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন। ভাগ্যবান বিজয়নাথ সে পিতৃসম্পদে বঞ্চিত হইবেন কেন?

কৈশোরবয়স হইতে যথা নিয়মে গ্রাম্যপাঠশালা এবং স্কুলের লেখাপড়া তিনি একরূপ শেষ করিয়া যৌবনের প্রথম উন্মেষকালে বিজয়নাথের হৃদয়ে ঈশ্বরানুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

দেখিতে দেখিতে শুভ ১২৯৭ সাল আরম্ভ হইল—যে বৎসর ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনচরিত মহাত্মা রামচন্দ্র কর্ত্তৃক রথযাত্রার দিন প্রকাশিত হয়। সেই বর্ষ হইতেই রামকৃষ্ণ মহাসিন্ধু পানে বিজয়নাথের প্রাণে একটী নূতন আকর্ষণ দেখা দিল, শুনিয়াছি, ঠাকুর রামকৃষ্ণ লীলাচ্ছলে তাঁহার কঠোর সাধন পর্য্যায়

সমাপনান্তে দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির ঠাকুর বাটীর ছাদে উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে ভক্তদিগকে ডাকিতেন। জানি না মহাত্মা রামচন্দ্র ১৩২৬২৭ সালে ঠাকুরের ন্যায় ভক্তগণকে ডাকিতেন কিনা,—ভক্তগণের প্রাণ আকর্ষণ করিতেন কিনা? কেন না—দেখা যায় যে, ঐ সময় হইতেই মহাত্মার নিকট স্কুল কলেজের তত্ত্ব জিজ্ঞাসু ছাত্র ও পরিণত বয়স্ক ভদ্রলোকদিগের সমাগম হইতে লাগিল। এই সময়ে এ অধমের সৌভাগ্য সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কাঁকুড়গাছি রামকৃষ্ণ সমাধি মন্দির সংলগ্ন যোগোদ্যানে বিজয়নাথের সহিত শুভ সম্মীলন হইল।

কলিকাতার পূর্ব্ববর্ত্তী কাঁকুড়গাছি পল্লি মধ্যে এই পরম পবিত্র যোগোদ্যানে মহাত্মার নিকট যাতায়াত এবং পরে ধর্ম্ম জীবন গঠনের জন্য তথায় বিজয়নাথের অবস্থান কালীন তিনি কেমিক্যাল এক্‌জামিনার আফিসে (Chemical Examiners Office) কিছু দিন কর্ম্ম করিয়া ছিলেন। প্রায়ই দেখা যায় যে, উচ্চ কার্য্যে বাধা বিঘ্ন পদে পদে উপস্থিত হয়। সাধক জীবন যাপন করিতে করিতে বিজয়নাথের মনে সংসার ভোগ আস্বাদ লাভ করিবার বাসনার উদয় হইল। তিনি অন্তর্যামী গুরুদেবকে স্পষ্টভাবে জানাইলেন। তিনি বিজয়নাথের তৎকালীন মানসিক অবস্থা বুঝিয়া তাঁহার ইচ্ছা না থাকিলেও ইহার গতিরোধ করিলেন না। কারণ সংসার আশ্রমেরও শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের অনেক শিখিবার আছে। আর যখন ধূলা পড়া মন্ত্র শিখিয়া সাপ ধরিতে যাইতেছে, তখন সর্প দংশন জনিত জ্বালায় সংসারের অসারতাই পাকা অনুভব হইবে,—মরিবে না। অগত্যা সংসাররূপ আমড়ার অম্বল বিজয়নাথকে কিছু আস্বাদন না করাইয়া মহামায়া ছাড়িলেন না।

সংসার আশ্রয় কালীন যখন তিনি নিজ গ্রামে থাকিতেন, তথায় প্রতিবাসী জনগণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া ঠাকুরের নামগুণ গান, মাহাত্ম্য প্রচার, সাময়িক বা বাৎসরিক উৎসবের প্রতিষ্ঠা করা, ধর্ম্ম প্রবন্ধ লিখিয়া তত্ত্বমঞ্জরী এবং অন্যান্য পত্রিকায় প্রচার করা, এই রূপ কার্য্যে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন।

কলিকাতা ও ঢাকুরিয়ায় অবস্থান কালীন সংসার প্রতিপালনের জন্য বাধ্য হইয়া কেরাণীগিরী চাকুরিও করিতেন এবং পূর্ব্বোক্ত কার্য্যে সমভাবেই রত থাকিতেন। সভা-সমিতিতে সময় সময় ধর্ম্মবিষয়িণী বক্তৃতা প্রদান করিতেন। চেঙ্গুটীয়া রামকৃষ্ণোৎসবে কলিকাতা বিডন ষ্ট্রীটস্থ "চৈতন্য লাইব্রেরীতে" সময়ে সময়ে কয়েকটী বক্তৃতা প্রদান করিয়া ছিলেন। এই সকল কার্য্যে কলিকাতা

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত ও তাঁহার ভ্রাতাগণ বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন।

বিজয়নাথ একজন সত্যনিষ্ঠ কর্ম্মী সাধক ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে যৌবনের প্রারম্ভেই শ্রীগুরু সকাশে বহুদিন ঠাকুরের পূজা ও ভক্ত সেবায় নিরত থাকায় মানব-জীবন বা সাধক জীবন ধন্য করিয়া ছিলেন। তিনি মিষ্টভাষী এবং লোকপ্রিয় ছিলেন বলিয়া বহু রামকৃষ্ণভক্ত এবং অন্যসম্প্রদায় ভুক্ত ভক্ত জনগণের নিকট সুপরিচিত ছিলেন। ইহা ব্যতীত তাঁহাতে আরও সদ্‌গুণের বিকাশ ছিল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী না হইলেও তাঁহাতে কবিত্ব শক্তি বর্ত্তমান ছিল। ঠাকুর রামকৃষ্ণের নাম লইয়া, প্রার্থনা সঙ্গীত ও বিবিধ পদ্য রচনা করিয়া ছিলেন।

তিনি একজন সাহিত্য-সেবীও ছিলেন। শ্রীগুরুদেব (মহাত্মা রামচন্দ্র) প্রবর্ত্তিত "তত্ত্বমঞ্জরী" নামক মাসিক পত্রিকায় তাঁহার রচনা প্রবন্ধ, পদ্য ও সঙ্গীত প্রকাশিত হইলেও সন ১৩১৩ সাল হইতে পত্রিকার সম্পাদন ও প্রচার কার্য্যের ভার লইয়া ছিলেন এবং অতিযত্ন সহকারে ও বিচক্ষণতার সহিত কয়েক বৎসর তিনি সম্পন্ন করিয়া এ জগতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন এবং প্রভুর লীলা-মাহাত্ম্য ও তাঁহার অমৃতময় উপদেশ প্রচার কল্পে নানা সভাস্থলে বক্তৃতা প্রদান সমাধিস্থানে রামকৃষ্ণ উৎসবের সূচনা ও প্রতিষ্ঠা এবং নিম্ন লিখিত সাত খানি গ্রন্থপ্রকাশ করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞভাজন ও নশ্বর শরীর ধারণ করিয়া রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্যে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

১। রামকৃষ্ণ লীলাসার।
২। অষ্টকালীন পদাবলী।
৩। রামকৃষ্ণ গীতা, ১ম খণ্ড।
৪। রামকৃষ্ণ গীতা ২য় খণ্ড।
৫। উক্তি শতক।
৬। পূজার ফুল।
৭। রামকৃষ্ণ পূজাপদ্ধতি।

ধন্য ভাই বিজয়নাথ! প্রাণের কথা,—মরমের কথা—পরস্পরের অন্তরের ভাব বিনিময়ের কথা—পরমার্থ সঙ্গীতাঙ্গে চোখোচোখিও মাতোয়ারা মধুর ভাবরাজ্যের কথা—কখন তাহা ভুলিবার নয়। যদিও তুমি এ অধম ভায়ের স্থূল চক্ষুর বাহিরে গিয়াছ বটে, কিন্তু মানস চক্ষুর অন্তরাল হইতে ত পার নাই। এখন তুমি কর্ম্মভোগের নশ্বর তনু ত্যাগ করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়া বোধ হয় ধন্য হইয়া থাকিবে, তাহা হইলেও আমাদের ভুলিও না! আর এ দীন

গুরু ভায়াদের কথা এবং মরমের ব্যথা ভাই শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে জানাইবে। যেন গুরু ইষ্টপদে অটল বিশ্বাস অচলাভক্তি সদা জাগরূক থাকে, আর তাহার নাম গুণ গান করিতে করিতে তাঁহারই কায়াতে, অন্তরে বাহিরে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে ইহ-জীবনের পরিসমাপ্তি হয়।

ভাই বিজয়নাথ! তোমার স্মৃতি গুরুভাই সকলের অন্তরে জাগরূক রাখিবার জন্য গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার ইটালী অর্চ্চনালয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের ও গুরুদেবের বিশেষ পূজাদির অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এবং ঠাকুর প্রসাদ মাহাত্ম্য বোধ করি তুমি উপস্থিত হইয়া, পূর্ব্বের মত কীর্ত্তন করিতে করিতে ঠাকুরের ভক্তগণকে প্রসাদ বিতরণ করিয়া ছিলে। আজ ভাই এই পর্য্যন্ত, যেন ভুলিও না।

দুঃখোচ্ছ্বাস।

লেখক,—ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি।

হৃদয়ের শতদ্বার করি অধিকার,—
কেন আজ দুঃখস্রোত বহে অনিবার।
বিষাদের ঢেউ কেন রহিয়া রহিয়া—
হৃদয়ের কূল আজি উঠেরে ছাপিয়া!
এ বিশ্ব সে বিশ্ব বলি মনে নাহি লয়
দুঃখের তিমিরে ঘেরা, বলি বোধ হয়।
নীরব প্রকৃতিরাণী; ভুলে গেছে তান;
সেতো আর নাহি বাজে মাতাইতে প্রাণ।
তারকার মাঝে বসি দেব সুধাকর—
ছড়ায় না আর সেই অমিয়ার ধার।
পাপিয়ার শ্রুতিসুখ মধুর কূজন—
আর নাহি বয়ে যায় কাঁপাইয়া বন।

আমার আত্মকথা।

লেখক,—প্রফেসর শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায়।

লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী একটী উপনগরে আমার পিতা মাতার বাস। তাঁহারা ধনী না হইলেও বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন। দশের কাছে তাহাদের বিলক্ষণ মান সম্ভ্রমও ছিল। সংসারে অভাব অপ্রতুল কিছুই ছিল না; দাস দাসী সকলই ছিল—এক কথায় সুখের সংসার সুখেই চলিত।

আমি পিতার তৃতীয়া কন্যা। আমার পূর্ব্বে আর দুইটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল,—এবার পিতা মাতা আশা করিয়া ছিলেন, একটী পুত্র সন্তান হইবে, আমাদের দেশে একটী প্রবাদ আছে তিনবারের বার প্রায়ই ছেলে হয়, কিন্তু আমার বেলায় এই নিয়মের ব্যভিচার দেখিয়া মাতা ভগ্ন-হৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিলেন; পিতাও যারপর নাই দুঃখিত হইলেন। ডাক্তার এবং ধাত্রী পিতা মাতাকে বলিয়াছিলেন, এবার নিশ্চয় তোমার পুত্র হইবে। সুতরাং আমাকে জন্মিতে দেখিয়া পিতার আর দুঃখের সীমা রহিল না।

আমার দুইটী ভগ্নি দেখিতে সুন্দরী ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তাহাদের মত সুন্দরী হইলাম না। একে কন্যা তাহাতে শ্রীহীনা দেখিয়া মাতা আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। আমি আমার বাড়ীতে সকলেরই ঘৃণিত হইয়া রহিলাম।

সন্তান জন্মিবার পর আমাদের দেশে বাপ্তাইজ করিবার জন্য একটা উৎসব সম্পন্ন হয়। আমার দুই ভগ্নীর বেলায় বিশেষ জাঁকজমকের সহিত সেই উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল—কিন্তু আমার বেলায় না করিলে নয়, এরূপ ভাবে ক্রিয়া সমাধা হইল. আমার পিতার তিনটী ভগ্নি। দুইটী বিধবা এবং স্বামীর ত্যক্ত প্রভূত সম্পত্তির অধিকারিণী। আর একটী ভগ্নির বিবাহ হয় নাই—কুমারী অবস্থায় বৃদ্ধা হইয়াছেন। অর্থ সম্পত্তিও কিছু ছিল না। কায়ক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। আমার দুই ভগ্নির ধর্ম্মমাতা হইলেন—আমার পিতার দুই বিধবা ভগ্নি। তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি কিছুই ছিল না, সুতরাং আমার দুই ভগ্নি অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন। আর আমার ধর্ম্ম মাতা হইলেন—বৃদ্ধা দরিদ্রা পিসি। পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছেন, পিতা মাতা আমাকে কিরূপ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

আমার বয়স যখন দশ বৎসর—আমার পিসিমাতার মৃত্যু হইল। তিনি আমায় একটু স্নেহের চক্ষে দেখিতেন বটে, কিন্তু সে স্নেহটুকু হইতে জগদীশ্বর আমায় বঞ্চিত করিলেন। আমি কর্ণধার হীন জীর্ণতরীর ন্যায় সংসার তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিলাম। আমার মুখের দিকে চায় এমন কেহই রহিল না। আমি মাতা পিতার চক্ষের শূল,—প্রতিবেশীরাও কেহ ভাল বাসেন না, ভগ্নিরা কলহ করে, ভগ্নিদিগের পোষাক পরিচ্ছদ বেশ সুন্দর, আর আমার পোষাক নিকৃষ্টজাতীয় বালিকার ন্যায়। কাজেই আমি পল্লীর চাষাভূষো লোকেদের ছেলের সহিত খেলা করিতাম। বাড়ীতে বড় থাকিতে পাইতাম না।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি—আমি পল্লির ইতর-শ্রেণীর বালক বালিকার সহিত খেলা করিতাম। তাহাদের মধ্যে একজনের লোহিত জ্বর (Scarlet fiver) হইয়াছিল। সেই বিষ আমার শরীরে সংক্রামিত হওয়ায় আমিও সেই জ্বরে আক্রান্ত হইলাম। পিতা মাতা আমাকে বাড়ীর বাহিরে একটী সামান্য গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। আমি এইবার মরিব, এই ভাবিয়া তাঁহাদের একটু আনন্দ হইয়াছিল বোধ হয়। চিকিৎসার কোন বিশেষ বন্দোবস্ত করিলেন না, পল্লীতে একটী সামান্য ডাক্তার ছিলেন। তিনি আসিয়া একটু একটু ঔষধ দিয়া যাইতেন, ক্রমে আমি আরোগ্য লাভ করিলাম। পিতা মাতার তাহাতে যে আনন্দ হইল, এমন বোধ হইল না; তাঁহারা মনে করিলেন আমি ইচ্ছা করিয়া এই সংক্রামক ব্যাধি আনিয়া তাঁহাদিগকে সংক্রামিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছি, ইহাও আমার একটা অপরাধ।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি—আমার ধর্ম্মমাতার মৃত্যুর পর পুরাতন ধরণের একটা 'ব্রোচ্' আর একটা রূপার বাটী প্রাপ্ত হইয়া ছিলাম। এই তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব। আমি সেই যথাসর্ব্বস্বের অধিকারিণী হইলাম।

ভগ্নিরা প্রায়ই আমায় প্রহার করিত। আমি একদিন রাগের বশে তাহাদের একজনের চুল ছিঁড়িয়া লইয়া ছিলাম। তাহারা দুইজনে মিলিয়া আমাকে নখাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিল। যথাকালে পিতা মাতার নিকটে বিচার হইলে বিচারে আমি অপরাধিনী হইলাম, এবং তাঁহারা আমাকে অপরাধের সমুচিত দণ্ডও দিতে ত্রুটি করিলেন না। ক্রমে আমার হৃদয় কঠোর হইয়া উঠিল, আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক মাতা পিতার ত্রিসীমাও মাড়াইতাম না। আহারের সময় তাঁহারা দুই ভগ্নির মধ্যে একত্রে আহার করিতেন। আমার জন্য রান্নাঘরের

একটী কোনে আহারের স্থান নির্দ্দেশ হইল। আমি সেখানে একাকিনী ভোজন করিতাম। মাতা পিতা আমাকে যখন তখন ধমকাইতেন, আমি কিছুই গ্রাহ্য করিতাম না। কেবল ভাবিতাম—কেমন করিয়া আমি ইহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইব। ইহার কিছুদিন পরে একদিন শুনিলাম, আমার মা বাবাকে বলিতেছেন,—"এ মেয়ে যেরূপ অবাধ্য হইয়াছে, ইহাকে আর এখানে রাখা চলেনা। ইহাকে কোন স্কুলে পাঠাইতে হইবে।" আমার পিতাও সেই মতে মত দিলেন। আমাদের গ্রামের কিছু দূরে একটী সামান্য রকমের বোর্ডিং স্কুল ছিল। আমাকে সেখানে পাঠাইতে স্থির করিয়া আমাকে বলিলেন। আমি তাহাতে একটু আনন্দিত হইলাম। পিতা মাতার অবজ্ঞা, ঘৃণা, ও অবিচার সহ্য হইতে ছিল না। আমি কেন মেয়ে হইয়া ছিলাম—কেন আমি সুন্দর হই নাই—এই আমার অপরাধ। যথাকালে আমাকে স্কুলে পাঠান হইল। আমি একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।"

ক্রমশঃ

আবাহন গাথা।

লেখক,—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত।

এস এস হরি গোলক বিহারী
বিরাজ' মুরারি হৃদি-বৃন্দাবনে।
বাসনা অন্তরে অন্তরে অন্তরে
নেহারি তোমারে জুড়া'ব জীবনে॥

ভকতি-যমুনা কুলে শ্যামরায়—
জ্ঞান-কদম্বেরি মূলে আজি হায়,
দাঁড়াও বামে হেলে বিমল বিভায়,
"রাধা" বোলে বাঁশী বাজাও সঘনে॥

বেণু রবে ব'বে যমুনা উজান,
পুলকে পূরিবে তাপিত পরাণ,
ভব জ্বালা সব হবে অবসান,
রূপহেরি হরি এড়া'ব শমনে॥

আমার বলিতে তোমা বিনে আর
এ ভব সংসারে কে আছে আমার,
এস হৃদিনিধি হৃদে একবার,
পাপী ব'লে যেন ঠেল'না চরণে॥

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

নারদের মোহ।

লেখক,—শ্রীযুক্ত হরিদাস ব্রহ্মচারী।

নারদ সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করেন। এক দিবস দ্বারকায় আসিয়াছেন; তাঁহার অবারিত দ্বার, একেবারে দেবী রুক্মিণীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, রুক্মিণী তালবৃন্ত হস্তে ভগবানকে বীজন করিতেছেন। জগৎপ্রভু নারদকে দেখিয়া শশব্যস্তে আসিয়া নারদের হস্ত ধারণপূর্ব্বক পালঙ্কের উপর বসাইলেন, এবং স্বাগত প্রশ্নের পর পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান করিয়া ভোজন করাইলেন। তখন নারদ বলিলেন, "হে জগন্নাথ জগন্নিবাস! আপনার জয় হউক! আপনাকে চেনা কাহার সাধ্য, যে জন আপনার ভক্ত সেই আপনাকে কিছুমাত্র বোঝে বোধ করেন। আমি অহর্নিশ বীণাযন্ত্রে আপনার নামগুণ গাঁথা গান করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া থাকি। আজ আপনাকে একটী কথা বলিব, দেখুন, আপনি বিশ্বব্যাপী; নিখিল জগৎকে আপনার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু আমায় আপনার মোহিনীমায়া কিছুই করিতে পারিল না।" জগৎপ্রভু দেবদেব, নারদের বাক্যে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "দেবর্ষি! তুমি আমার ভক্ত, অনুরক্ত দিবানিশি আমার নামগুণ গান কর, আমি দেই নাই বলিয়া হয় নাই।" কিন্তু ভগবান্ মনে করিলেন, একবার নারদকে দেখাইয়া দিই।

এই মনে করিয়া নারদকে বলিলেন, "নারদ! তুমি অনেক দিনের পর দ্বারকায় এলে, চল দুজনে একটু রৈবতক পর্ব্বতে বেড়ান যাউক।" এই বলিয়া নারদকে লইয়া বেড়াইতে চলিলেন। উভয়ে তখন নানারূপ কথোপকথন করিতে করিতে রৈবতকাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। যখন প্রায় পর্ব্বতের উপরিভাগে উঠিয়াছেন, নারদ বড় পিপাসার্ত্ত হইল। অনেক ধৈর্য্য অবলম্বনেও শান্তি হইল না। কি করিবেন, অগত্যা প্রভুকে জানাইতে হইল। বলিলেন, "হে কৃষ্ণ! পিপাসায় আমার কণ্ঠতালু শুষ্ক হইতেছে, প্রাণ যায়, রক্ষা কর। এ তোমার দ্বারকাধাম, তুমি নিশ্চয় জান, নিকটে কোথায় জল আছে।" ভগবান্ বলিলেন, নারদ! তুমি এককাজ কর, ঐ যে অদূরে পর্ব্বত নিম্নে যে মাঠ দেখা যাইতেছে, উহার পরবর্ত্তী আর একটি মাঠ আছে, তাহার পরেই এক সুবিস্তীর্ণ কানন, সেখানে জলাশয় আছে। তুমি শীঘ্র গিয়া জল পান করিয়া আইস, আমি ততক্ষণ তোমার অপেক্ষায় এখানে বসিয়া রহিলাম।" নারদ কহিলেন, "তবে আমার এই বেণুটি লইয়া এখানে অবস্থিতি করুন, আমি জলপান করিয়া আসি, বলিয়া প্রভুর হস্তে বেণুটি দিয়া দ্রুতগতি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।"

নারদের প্রবলপিপাসা, যত শীঘ্র পারেন, পর্ব্বত হইতে নামিয়া সমতল ভূমিতে আসিলেন, তাহার পর ময়দান অতিক্রম করিয়া আর একটি ময়দানও পার হইলেন। তাহার পর দেখিতে পাইলেন, ফুল ফল শোভিত এক বৃহৎ কানন। সেখানে জলাশয় আছে প্রভু বলিয়াছেন। ক্রমে কোথায় আছে, লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে চলিলেন; ক্রমশঃ জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন জলাশয়ের নিকট হইতে রোদনধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। ক্রমে ঐ রোদনধ্বনি লক্ষ্য করিয়া সেই স্থলে আগমন করিয়া দেখিলেন যে, এক সুন্দরী যুবতী নারী সেই জলাশয়ের ধারে বসিয়া রোদন করিতেছে। তাহা দেখিয়া নারদের পিপাসা উড়িয়া গেল; এত যে, পিপাসা সে কথা আর মনে নাই। তখন রমণীর ক্রন্দন দেখিয়া তাহার সন্নিকট হইয়া স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাঁদিতেছ কেন? বারংবার জিজ্ঞাসিত হইয়াও কোন প্রত্যুত্তর না পাইয়া, নারদ নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ক্রন্দনের কারণ কি বল, আমি তোমার কোন্ উপকার করিব? আমার দ্বারা তোমার কোন্ উপকার হয় ত আমি আনন্দের সহিত তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। তখন সুন্দরী বস্ত্রাঞ্চলে মুখ মুছিয়া নারদের

দিকে তাকাইয়া দেখিলেন। নারদ তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "তোমার ক্রন্দনের কারণ কি? আমাকে বল।"

সুন্দরী। আমার ক্রন্দনের কারণ শুনিয়া তোমার কি হইবে?

নারদ। শুনিয়া যদি তোমার কোন উপকার হয়, তাহা করিব।

সুন্দরী। আমি বিবাহের নিমিত্ত কাঁদিতেছি।

নারদ। আমি তোমাকে বিবাহ করিব।

সুন্দরী। তোমার শুভ্র কেশ; বৃদ্ধাবস্থা, তোমাকে বিবাহ করিয়া বৈধব্য কে ভোগ করিবে?

নারদ। আমরা দেবতা, ইচ্ছা করিলে রূপগুণযুত যৌবনলাভ করিতে পারি।

সুন্দরী। আচ্ছা, তাহা আগে আমাকে দেখাও।

নারদ তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে দিব্য নবযৌবন সম্পন্ন সুন্দর পুরুষমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাহা দেখিয়া সুন্দরীর বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইল। বলিল, "আমি তোমাকে বিবাহ করিব, কিন্তু আমার তিনটি প্রতিজ্ঞা আছে, যে কেহ তাহা ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া পালন করিবে, তাহাকেই আমি বরমাল্য প্রদান করিব।

নারদ। তোমার প্রতিজ্ঞা কি বল।

সুন্দরী। যে আমাকে বিবাহ করিবে, তাহাকে আমার ভরণ পোষণের ভার লইতে হইবে। সংসারের কাজকর্ম্ম সমস্তই তাহাকে করিতে হইবে। আমি ইচ্ছা মত করিব। দ্বিতীয়তঃ—আমার গর্ভে যে সন্তান হইবে, তাহাদের লালন পালন প্রভৃতি সমস্ত ভার তাহাকে লইতে হইবে। তৃতীয়তঃ—আমি যখন যাহা বলিব, অবিচারে তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিতে হইবে। এই নির্দ্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি যিনি ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া করিবেন তিনিই আমার ভর্ত্তা হইবেন।

নারদ বলিলেন, আমি ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া স্বীকার করিতেছি যে, তুমি যে তিনটি প্রতিজ্ঞার কথা যাহা বলিলে আমি তাহা অবশ্য পালন করিব। তখন উভয়ের সেই স্থানেই গন্ধর্ব্বমতে বিবাহ হইল। নারদ সেই বনে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, উভয়ে স্ত্রী-পুরুষের ন্যায় বসবাস করিতে লাগিলেন। সেই বনের ফল ফুল তাহাদের উপজীবিকা হইল। এইরূপে কিছুদিন যায়, ক্রমে সম্বৎসরের মধ্যে নারদের এক পুত্র সন্তান জন্মিল। স্ত্রী পুরুষ বেশ মনের আনন্দে থাকেন। সংসারের কাজ কর্ম্ম নারদ সুচারুরূপে সম্পাদন করেন। এইরূপে কতদিন গেলে। দ্বিতীয় বৎসরে নারদ আর একটী

কুমারের মুখ দর্শন করিলেন। ক্রমে সে বনের ফল ফুল প্রায় নিঃশেষিত হইল। তখন দুই জনে পরামর্শ করিয়া সেই বন হইতে অন্য আর একটু দূরবর্ত্তী বনে উঠিয়া গিয়া কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। সেই বনে অপর্য্যাপ্ত ফল মুল পাওয়া যায়, এইরূপে নারদ স্ত্রী পুত্রাদির সহিত আনন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। তৃতীয় বৎসরে নারদের একটী কন্যা সন্তান হইল। নারদ পুত্র কন্যাগণকে যত্নের সহিত পালন পালন করিতে লাগিলেন। বড় ছেলেটী এখন "বাবা" বলিয়া ডাকিতে শিখিয়াছে; অপরটী হামা দেয়। নারদ মনে মনে কতই আনন্দ অনুভব করেন। এইরূপে চতুর্থ বৎসরে নারদের আর একটী কন্যা সন্তান হইল। এই সময়, একদিন তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, হে নাথ! আমার গঙ্গাস্নান করিতে বাসনা হইয়াছে, অতএব চল, আমাকে গঙ্গাস্নান করাইয়া আন। নারদ প্রথমতঃ স্ত্রীকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু স্ত্রী কিছুতেই বুঝিলেন না। গঙ্গাস্নানে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নারদ বলিলেন, "দেখ, গঙ্গা এখান হইতে অনেক দূর, বিশেষ পুত্রকন্যাগণ এখনও হাঁটিতে শিখে নাই; তাহাদের বহন করিয়া লইয়া যাইতে তোমারও আমার বড় ক্লেশ পাইতে হইবে; এই জন্য আমি নিষেধ করিতেছি; বরং সন্তানেরা হাঁটিতে শিখিলে, তখন একদিন তোমাকে লইয়া গিয়া গঙ্গাস্নান করাইয়া আনিব। স্ত্রী তখন অনন্যোপায় হইয়া বিবাহকালীন ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া যে প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন। নারদ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বলিলেন "তবে চল, বলিয়া, পুত্র দুটীকে স্কন্ধে একটী কন্যাকে কোলে লইয়া অপর ছোট কন্যাটীকে স্ত্রীর কোলে দিয়া, স্ত্রীকে লইয়া গঙ্গাস্নানে চলিলেন। দ্বিপ্রহর অতীত হইল, আশ্রম হইতে অনেকদূর আসিয়াছেন; এখনও অনেক পথ বাকী। পুত্র কন্যাগণকে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর দেখিয়া একস্থানে একটু বিশ্রাম করিয়া তাহাদের কিছু আহার দিয়া আবার চলিতে লাগিলেন। এইরূপে চলিতে চলিতে এক নদীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, নদীতে বেশী জল নাই। মধ্যে মধ্যে বালুকারাশির স্তূপ দেখা যাইতেছে। দুই জনে ধীরে ধীরে নদীতে নামিয়াছেন, পার হইবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় আকাশে মেঘ গর্জ্জন শব্দ হইল; ক্রমে আকাশ ঘোর ঘন ঘটাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পাত হইতে লাগিল। তখন নারদ স্ত্রীকে সত্বর নদী পার হইতে বলিলেন। স্ত্রী বলিলেন, "হে নাথ! নদী যদিও বিস্তীর্ণ, কিন্তু মধ্যস্থলে বেশী জল নাই,

কারণ জলের ভিতর বালুকা দেখা যাইতেছে, তবে মেঘগর্জ্জন ঘন-ঘটার যেরূপ আড়ম্বর হইতেছে, একটু সতর্কতার সহিত শীঘ্র পার হইয়া যাইব।

এরূপ কথা হইবার পর দুজনে দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিলেন। যেমন নদীর মধ্যস্থলে আসিয়াছেন, অমনি ঝড়, বৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাত করকাপাত শিলাবৃষ্টি বিদ্যুৎ বজ্রপাত, দেবরাজ ইন্দ্রের যেখানে যাহা ছিল, সমস্তই নারদের নদীপার হইবার সময় প্রয়োগ করিলেন। অধিক বৃষ্টিপাতে নদীর জল ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে স্রোতের বেগ প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল। নারদ বড় ফাঁপরে পড়িলেন; কেমনে স্ত্রী ও ছোট ছোট শিশু সন্তানগণের প্রাণ বাঁচাইবেন ভাবিয়া আকুল হইলেন, ইত্যবসরে দেখিতে না দেখিতে নদীতে বান্ আসিতেছে। এত প্রবলবেগে বান্ গর্জ্জন করিতে করিতে আসিতেছে যে, সেই বানে স্ত্রী পুত্র কন্যাগণকে নিমেষের মধ্যে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল, তাহার আর সন্ধান হইল না। নারদ অতি কষ্টে হাবুডুবু খাইয়া কিনারায় উঠিলেন। ঝড় বৃষ্টি তখন প্রায় থামিয়া গিয়াছে। নারদ কিনারায় উঠিয়া, হায়! আমার কি হইল! আমার প্রাণাধিক স্ত্রী পুত্র কন্যাগণ কোথায়! আমি যে তোমাদের বিহনে জীবন ধারণে সক্ষম হইতেছি না। হায় আমার কি সর্ব্বনাশ হইল! যখন স্ত্রী পুত্র কন্যাহারা হইলাম, তখন আমার জীবনে ফল কি, এখনই এ জীবন বিসর্জ্জন দিব।

এই বলিয়া নারদ সেই নদীর অনতিদূরে এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষের দিকে ধাবমান হইলেন, উদ্দেশ্য আজ এই বৃক্ষে উদ্বন্ধন বা উলম্ফন দ্বারা জীবন বিসর্জ্জন করিয়া এ জ্বালা জুড়াইব, এই মনে করিয়া যেমন নারদ বৃক্ষে আরোহন করিয়াছেন, ভক্তবৎসল ভগবান্ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, নারদের অভিপ্রায় বুঝিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তথায় আসিয়া নারদকে ডাকিতেছেন। বলিতেছেন, কেন নারদ! তুমি বৃক্ষে উঠিয়াছ কেন? নামিয়া আইস। কি হইয়াছে? রোদন [illegible] না, শীঘ্র বল, কেন এত অধৈর্য্য হইয়াছ? নারদ তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন, আর ঠাকুর! আমি আর এ জীবন রাখিব না। আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, স্ত্রী পুত্র কন্যাগণ হারা হইয়া, আমি শোকাবেগ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। আমি এই বৃক্ষ হইতে উলম্ফন দ্বারা জীবনের শেষ করিব, বলিয়া বৃক্ষে উঠিয়াছি। অনন্তর নারদ প্রভুর কথায় বৃক্ষ হইতে নামিলেন। তখন ভগবান হৃষীকেশ প্রসন্ন হইয়া নারদের অঙ্গে পদ্মহস্ত স্পর্শ করিলেন; নারদ প্রকৃতিস্থ হইলেন। ভগবান মৃদু হাস্য

করিয়া নারদের হস্তে বীণা প্রদান করিয়া কহিলেন, "কি নারদ! তবে নাকি তুমি আমার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হও না? এখনি যদি আমি না আসিতাম তাহা হইলে ত' উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে। এই তোমার বেণু লও—মনে পড়ে কি, আমাকে রৈবতকে বসাইয়া তুমি পিপসার জল খুজিতে সরোবরে আসিয়াছিলে।" তখন নারদ বলিলেন, "ওঃ কি ভয়ঙ্কর! ধন্য আপনার মোহিনী মায়া! ঠাকুর! তুমি কাহারও দর্প রাখ না, আমার এই দর্প আজ চুর্ণ করিলে।"

কোষ্ঠী-শিক্ষা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত পশুপতি সরকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শনির ভাব ফল।

শনি শয়ন ভাবে থাকিলে জাতক ক্ষুধিত, বিকল, গুহ্য ও কোষ পীড়াযুক্ত হয়। কিন্তু পঞ্চম, সপ্তম, নবম, ও দশম স্থানে শনি শয়ন ভাবে থাকিলে জাতক সুখী, ধার্ম্মিক ও পুত্রবান হয়।

শনি উপবেশন ভাবে থাকিলে জাতক শ্লীপদী, দদ্রুযুক্ত, ধন ও পুত্রহীন হয়।

শনি নেত্র পানি ভাবে থাকিলে জাতক ধনী, ধার্ম্মিক, বহুভাষী, দ্বিপত্নী-যুক্ত, ক্রোধী, পিত্তশূলী ও উদর পীড়ায় পীড়িত হয়।

শনি প্রকাশন ভাবে থাকিলে জাতক রাজপ্রিয়, নানাগুণে গুণী, ধনী, ধার্ম্মিক ও শুচি হয়।

শনি গমনেচ্ছা ভাবে থাকিলে জাতক মহাধনী, বহুপুত্রযুক্ত, পণ্ডিত, গুণবান, দাতা ও উত্তম মনুষ্য বলিয়া খ্যাত হয়।

শনি গমন ভাবে থাকিলে জাতক দন্তাঘাত প্রাপ্ত, মহাক্রোধী, কৃপণ ও পরনিন্দক হয়।

শনি সভায় বসতি ভাবে থাকিলে জাতক ধনপুত্র পরিবারযুক্ত ও নানারত্ন সম্পন্ন হয়।

শনি আগমন ভাবে থাকিলে জাতক মহাক্রোধী পীড়িত, সর্পাদিদষ্ট ও ভ্রাতৃবিনাশ দুঃখে দুঃখী হয়।

শনি ভোজন ভাবে থাকিলে জাতক মন্দাগ্নি পীড়িত অর্শরোগী ও চক্ষু-পীড়াযুক্ত হয়।

শনি নৃত্যলিপ্সা ভাবে থাকিলে জাতক ধনবান ও সুখী হয়। কিন্তু পঞ্চম, সপ্তম, ও নবম স্থানে থাকিলে বিবিধ পীড়া ও অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে।

শনি কৌতুক ভাবে থাকিলে জাতক রাজমন্ত্রী, ধনী, দাতা, ভোক্তা, পরোপকারী, ধার্ম্মিক, পণ্ডিত ও শুচি হয়।

শনি নিদ্রাভাবে থাকিলে জাতক ধনবান, পণ্ডিত, শুচি, চক্ষুরোগী পিত্তশূলী ও বহুপুত্রযুক্ত হয়।

রাহুর ভাব ফল।

রাহু শয়ন ভাবে থাকিলে জাতক বহুক্লেশযুক্ত, শ্লীপদী ও বহুদোষে দোষী হয়। কিন্তু রাহু, মিথুন, কন্যা, সিংহ ও কর্কট রাশিতে থাকিলে জাতকের বহুসুখ লাভ হয়।

রাহু উপবেশন ভাবে থাকিলে জাতক দুষ্টরোগী ও ধনহীন হয়।

রাহু নেত্রপানি ভাবে থাকিলে জাতক নিশ্চয় চক্ষুরোগী, সর্পব্যাঘ্র কর্ত্তৃক ভীত, অধার্ম্মিক, ক্রুর, মহাবীর ও গুহ্যরোগী হয়।

রাহু প্রকাশন ভাবে থাকিলে জাতক ধনবান, ধার্ম্মিক, নিত্যপ্রবাসী, উৎসাহী, সাত্ত্বিক ও রাজসেবক হয়।

রাহু গমনেচ্ছা ভাবে থাকিলে জাতক বহুপুত্রযুক্ত, ধনী, পণ্ডিত, ধনবান, দাতা ও মনুষ্য মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়।

রাহু গমন ভাবে থাকিলে জাতক রোগী মহাক্রোধী, খল, পরনিন্দক, ব্যাঘ্র সর্পাদি কর্ত্তৃক ভীত, স্ত্রীপুত্র ও বন্ধুহীন হয়।

রাহু সভায় বসতি ভাবে থাকিলে জাতক কৃপণ, ধনী, গুণী, ধার্ম্মিক, পণ্ডিত ও শুচি হয়। কিন্তু লগ্ন পঞ্চম ও দশম স্থানে থাকিলে জাতক স্ত্রীপুত্র ও ধনহীন হয়।

রাহু আগমন ভাবে থাকিলে জাতক দুঃখী বন্ধুহীন ও নানা দষ্টান্বিত হয়।

রাহু ভোজন ভাবে থাকিলে জাতক লোভী, মন্দাগ্নি বিশিষ্ট ও কলহ-প্রিয় হয়।

রাহু নৃত্যলিপ্সা ভাবে থাকিলে জাতক খঞ্জ, রোগী, দুর্দ্ধর্ষ ও চক্ষুরোগী হয়।

রাহু কৌতুক ভাবে থাকিলে জাতক পিত্তশূলী, বহুগুণী ও ধনবান হয়। কিন্তু পঞ্চ, সপ্তম ও দশম স্থানে থাকিলে জাতক অশুভ ফললাভ করে।

রাহু নিদ্রা ভাবে থাকিলে জাতক শোক গ্রস্ত, দুঃখী, ধনপুত্র বর্জ্জিত হয়। পঞ্চম বা সপ্তমে থাকিলে শুভ ফল হয়।

গ্রহগণের দীপ্তাদি দশভাব।

মহাজ্ঞানী জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ গ্রহগণের দশটী ভাবের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যথা—দীপ্ত, দীন, সুস্থ, মুদিত, সুপ্ত, প্রপীড়িত, মুষিত, পরিহীয়-মান বীর্য্য, প্রবুদ্ধ বীর্য্য ও অধিক বীর্য্য।

গ্রহগণ উচ্চস্থানে থাকিলে দীপ্ত, নীচ স্থানে থাকিলে দীন, স্বগৃহে থাকিলে সুস্থ, মিত্রগৃহে থাকিলে মুদিত, রিপুগৃহে থাকিলে সুপ্ত, অন্য গ্রহ কর্ত্তৃক পরাজিত, হইলে প্রপীড়িত, অস্তমিত হইলে মুষিত, নীচাভিমুখী হইলে পরিহীয়মান বীর্য্য উচ্চাভিমুখী হইলে প্রবৃদ্ধ বীর্য্য এবং শুভবর্গস্থিত হইলে অধিক বীর্য্য বলা যায়।

দীপ্তাদি দশভাবের ফল।

জন্ম সময়ে গ্রহগণ দীপ্ত ভাবে থাকিলে সিদ্ধিলাভ। দীনভাবে থাকিলে জাতক দৈন্য, সুস্থভাবে থাকিলে শ্রীকীর্ত্তি সৌখ্যাতি লাভ, মুদিতভাবে থাকিলে আমোদ ও অভীপ্সিত ফল লাভ, সুপ্তভাবে থাকিলে বিপদ, প্রপীড়িতভাবে থাকিলে শত্রু কর্ত্তৃক পীড়াগ্রস্ত, মুষিতভাবে থাকিলে অর্থক্ষয়, প্রবুদ্ধ বীর্য্যভাবে থাকিলে ভূমি ও রত্নাদি লাভ, অধিক বীর্য্যভাবে থাকিলে সম্পদ লাভ এবং পরিহীয়মান বীর্য্যভাবে থাকিলে জাতক নিঃস্ব হয়।

অষ্টম অধ্যায়।

অধিপতি গ্রহভাব ফল।*

লগ্ন পতি।

লগ্নপতি লগ্নস্থানে থাকিলে জাতক সুন্দর, উপার্জ্জন শীল, মনস্বী, চঞ্চল ও দুই স্ত্রীযুক্ত হয়।

লগ্নাধিপতি ধন বা আয় স্থানে থাকিলে জাতক লাভবান, রুগ্ন, সুশীল, ধার্ম্মিক, গুণী ও বহু স্ত্রীযুক্ত হয়।

লগ্নাধিপতি ভ্রাতৃ বা শত্রু স্থানে থাকিলে জাতক বলবান, ঐশ্বর্য্যশালী, মানী, দুই স্ত্রীযুক্ত, মতিমান ও সুখী হয়।

লগ্নাধিপতি মাতৃ বা কর্ম্মস্থানে থাকিলে জাতক মাতা পিতা কর্ত্তৃক সুখী অনেক ভ্রাতাযুক্ত, গুণী ও সুন্দর হয়।

লগ্নাধিপতি পুত্রস্থানে থাকিলে জাতক মানী, প্রথম পুত্রহীন, মধ্যম পুত্র কর্ত্তৃক সুখী, ক্রোধী ও রাজপ্রিয় হয়।

লগ্নাধিপতি পত্নীস্থানে থাকিলে জাতক নিশ্চয়ই স্ত্রীহীন কিন্তু তেজস্বী হইয়া থাকে।

লগ্নাধিপতি ব্যয় বা মৃত্যুস্থানে থাকিলে জাতক সিদ্ধবিদ্যা বিশারদ, দ্যূত-ক্রীড়াপটু, চৌর, ক্রোধী ও পরস্ত্রী অভিলাষী হয়।

লগ্নাধিপতি ভাগ্যস্থানে থাকিলে জাতক লোকপ্রিয়, বিষ্ণুভক্ত, নিপুণ, বক্তা ও ধনপুত্র সুখে সুখী হয়।

দ্বিতীয়াধিপতি।

দ্বিতীয়াধিপতি ধন স্থানে থাকিলে জাতক ধনবান, গর্ব্বিত, অনেক স্ত্রীযুক্ত ও পুত্র হীন হয়।

দ্বিতীয়াধিপতি ভ্রাতা বা মাতৃ স্থানে থাকিলে জাতক বলবান, সুমতিযুক্ত, গুণী, পরদার রত, লোভী ও দেবদ্বেষী হয়।

* এই ফল বিচার করিতে গ্রহগণের বলাবল দেখা নিতান্ত আবশ্যক। গ্রহ পূর্ণবলী হইলে ফল সর্ব্বতোভাবে মিল হয়। আর গ্রহ বলহীন হইয়া থাকিলে ফল মিলে না।

দ্বিতীয়াধিপতি তনু বা পুত্র স্থানে থাকিলে জাতক কুলাঙ্গার, ধনবান, নিষ্ঠুর, কামী ও পরকার্য্যে রত হয়।

দ্বিতীয়াধিপতি শত্রু স্থানে থাকিলে জাতক শত্রুর নিকট ধনলাভকারী ও গুহ্য স্থানে পীড়াযুক্ত হয়।

দ্বিতীয়াধিপতি পত্নী স্থানে থাকিলে জাতকের মাতা ও স্ত্রী ব্যভিচারিণী হয়। ইহা মহামুনি পরাশর উল্লেখ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়াধিপতি মৃত্যু স্থানে থাকিলে জাতক ভূমি জমি দ্রব্য লাভকারী এবং স্ত্রী ও ভ্রাতৃ সুখ হীন হয়।

দ্বিতীয়াধিপতি আয় বা ভ্রাতৃ স্থানে জাতক ধনী, উদ্যোগী, নিপুণ, বাল্যে রোগী ও পশ্চাৎ সুখী হয়।

দ্বিতীয়াধিপতি কর্ম্মস্থানে থাকিলে জাতক মানী, কামী, পণ্ডিত, বহু স্ত্রী ও ধনযুক্ত কিন্তু পুত্র হীন হয়॥

দ্বিতীয়াধিপতি ব্যয় স্থানে থাকিলে জাতক মানী, সাহসী, ধনহীন ও রাজকর্ম্মচারী হয়। কিন্তু জাতক জ্যেষ্ঠপুত্র হইতে সুখী হয় না।

তৃতীয়াধিপতি।

তৃতীয়াধিপতি তনু বা আয় স্থানে থাকিলে জাতক নিজহস্তে প্রচুর ধনোপার্জ্জন কারী, মুর্খ, রোগী, সাহসী ও পরাধীন হয়।

তৃতীয়াধিপতি ধনস্থানে থাকিলে জাতক স্থূলকায় বিশিষ্ট, পরস্ত্রী ধনে অভিলাষী, দীর্ঘসূত্রী ও সৌখিন হয়।

তৃতীয়াধিপতি ভ্রাতৃস্থানে থাকিলে জাতক বলবান ধনও পুত্রযুক্ত, মহাহৃষ্ট ও সুখী হয়।

তৃতীয়াধিপতি মাতা পুত্র ও কর্ম্মস্থানে থাকিলে জাতক বলবান, বুদ্ধিমান, সুখী ও ক্রয়ীভার্য্যা হয়।

তৃতীয়াধিপতি শত্রু স্থানে থাকিলে জাতক ধনবান মাতুল সুখহীন, দুষ্ট ভ্রাতাযুক্ত ও মাতুলানী ভোগেচ্ছুক হয়।

তৃতীয়াধিপতি ব্যয় ও ভাগ্যস্থানে থাকিলে জাতক স্ত্রী কর্ত্তৃক ভাগ্যবান হয়। এবং জাতকের পিতা মহাচারী, সুখে ও দুঃখে দৃষ্টকারী হয়।

তৃতীয়াধিপতি পত্নী বা মৃত্যু স্থানে থাকিলে জাতক পরদার রত ও বাল্যে কষ্ট ভোগী হয়। এই জাতকের রাজদ্বারে মৃত্যু সম্ভাবনা।

ক্রমশঃ

রামায়ণ ও মহাভারত।

লেখক,—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ।

বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত দুইখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত অপর কোন গ্রন্থের সহিত এই দুই গ্রন্থের তুলনা হয় না। ইহাতে যেমন ভারতীয় প্রাচীন রাজগণের জীবন চরিত্র, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, হিতোপদেশ প্রভৃতি বহু বিষয়ের সমাবেশ দেখিতে পাই। এক কথায় বলিতে গেলে এমন কোন জিনিস নাই, যাহা উভয় গ্রন্থ মধ্যে দৃষ্ট হয় না।

মহাকবি বাল্মিকী আদি কবি বলিয়া খ্যাত। লৌকিক ভাষায় তিনিই সর্ব্ব প্রথম রামায়ণ কাব্য রচনা করেন। যে সময়ে বৈদিক রীতি পরিত্যাগ করিয়া লৌকিক রীতিতে সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হইতে ছিল, বাল্মিকীর মূল রামায়ণ সেই সময়ের গ্রন্থ।

রামচন্দ্রের আদর্শ চরিত্র বর্ণনাই মূল রামায়ণের উদ্দেশ্য, তাঁহার দেবত্ব বা অবতার বাদ ঘোষণা করা মূল রামায়ণের উদ্দেশ্য নহে। এই কারণে রামায়ণের যে যে স্থানে রামচন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই সেই অংশ প্রকৃত বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন।

মহাভারতে বনপর্ব্বে রামের জন্ম হইতে তাহার রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে, উত্তর কাণ্ডের রাম-সম্বন্ধীয় বিবরণ গুলি মহাভারতে বর্ণিত হয় নাই। যবদ্বীপ হইতে কবি ভাষায় পরিণত যে রামায়ণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে ঐরূপ রামের রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে।

রামায়ণ।

নানাপুরাণ ও রামায়ণের টীকাকারগণের উক্তি হইতে মনে হয় যে, বাল্মিকী রচিত রামায়ণের পূর্ব্বেও রাম চরিত প্রচলিত ছিল। রামানন্দ "অগ্নি বেশ্য রামায়ণ" ও বিমলবোধ "বৌধায়ণের রামায়ণের উল্লেখ করিয়াছেন। অগ্নিবেশ্য ও বৌধায়ণের রামায়ণ ঐ বাল্মীকির পূর্ব্ববর্ত্তী কিনা, তাহা বুঝা গেল না। তবে বাল্মীকি রামায়ণের পরে যে মহাভারতীয় রামচরিত, পদ্মপুরাণীয় পাতালখণ্ড বর্ণিত রামোপাখ্যান, অধ্যাত্ম রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, আনন্দ রামায়ণ রচিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাল্মীকি রামায়ণ সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত। ইহা অবলম্বন করিয়া বহুশতবর্ষ হইতে চলিল, ভারতের সকল দেশীয় ভাষায় রামায়ণ রচিত হইয়াছে। ভারতে ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বে যে সকল দেশী রামায়ণ পাওয়া যায়, তাহার সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে, মারহাট্টী ভাষায় ৮, তৈলঙ্গি ভাষায় ৫, তামিল ভাষায় ১২, উৎকল ভাষায় ৬, হিন্দি ভাষায় ১১, এবং বঙ্গ ভাষায় ২৫ জনের রচিত রামায়ণ পাওয়া গিয়াছে। এতন্মধ্যে কম্বনের রচিত তামিল রামায়ণ খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে কৃত্তিবাসের বাঙ্গালা রামায়ণ খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে এবং তুলসী দাসের ভারত প্রসিদ্ধ হিন্দি রামায়ণ খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে রচিত হয়। (বিশ্বকোষ রামায়ণ শব্দ দ্রষ্টব্য।)

তুলসীদাসী রামায়ণ।

শুনা যায়, রামায়ণ শেষ হইবার পরে একদিন তুলসীদাস মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিতেছেন, এমন সময় একজন সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত আসিয়া তাঁহাকে বলেন, "সাধু! আপনি সংস্কৃত জানেন, তবে ভাষায় এরূপ রামায়ণ রচনা করিলেন কেন?" তুলসীদাস হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমার ভাষা নিতান্ত নীচ বটে, কিন্তু আপনার নায়িকা বর্ণন অপেক্ষা অনেকাংশে উত্তম।"

অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ—রামানন্দ ঘোষের "রামায়ণ," রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (নদীয়া সেটেলীগ্রাম নিবাসী) রামায়ণ বাঙ্গলা পদ্যে অনুবাদ করেন।

রাজকৃষ্ণ রায় পদ্য রামায়ণ রচনা করেন।

যবদ্বীপ হইতে কবি ভাষায় রচিত যে রামায়ণ আবিষ্কৃত হইয়াছে,—তাহাতে রামের রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। যবদ্বীপের রামায়ণ অতি বৃহৎ হইলেও তাহাতে কাণ্ড বিভাগ নাই, আদ্যোপান্ত অধ্যায় বিভাগ আছে। কবি ভাষায় উত্তরকাণ্ড পাওয়া যায় বটে, তাহা মূল রামায়ণের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য নহে, স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়াই পরিচিত। প্রায় ৫ম শতাব্দে মূল রামায়ণ যবদ্বীপে আনিত হয়।

মহাভারত।

প্রচলিত মহাভারতের অনুক্রমণিকাখ্যাত মহাভারত প্রধানতঃ ১৮শ পর্ব্বে সম্পূর্ণ, আবার এই অষ্টাদশ পর্ব্বের মধ্যে ১০০ শত পর্ব্বাধ্যায় আছে। তৎপরে উহার খিল অর্থাৎ পরিশিষ্ট স্বরূপ হরিবংশ ও ভবিষ্য পর্ব্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে।

পূর্ব্বকালে সমুদয় দেবগণ মিলিত হইয়া একদিকে চারিবেদ ও একদিকে এই ভারত রাখিয়া তুলাদণ্ডে ওজন করেন, তাহাতে এই ভারত অবহায্য চতুর্ব্বেদ হইতে ওজনে ভারি হয়, তদবধি লোকে ইহাকে মহাভারত কহে। ইহা মহত্বে ও গুরুত্বে বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সুতরাং মহত্ব ও গুরুত্ব হেতু মহাভারত নাম হইয়াছে। মহামতি ব্যাস প্রণীত ইহা একখানি ইতিহাস শাস্ত্র। কুরু পাণ্ডব প্রসঙ্গ লইয়াই ইহা প্রধাণতঃ রচিত হইয়াছিল। আদি পর্ব্বের ২য় অধ্যায়ের শেষাংশে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে।

মহাভারতে সকল শাস্ত্রের সমাবেশ থাকায় যে, যে ভাব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সেই ভাব লইয়া থাকেন।

মহাভারতের বঙ্গটীকা পাওয়া যায়। এই সকল টীকার মধ্যে সকল গুলি সুপ্রাচীন নহে। দেবস্বামী, বৈশম্পায়ন ও বিমলবেকধর টীকাই অতি প্রাচীন, ইহাতে ব্যাসকূটের অর্থ ও দুষ্কর শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অন্য গুলি তত প্রাচীন নহে।

যবদ্বীপে রামায়ণের ন্যায় মহাভারতও কবি ভাষায় বহুদিন হইল, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও শল্য পর্ব্ব বারত বা ভরতযুদ্ধ নামে অনূদিত হইয়াছিল। ভারত বর্ষের সকল ভাষাতেই মহাভারতের অনুবাদ ও মর্ম্মানুবাদ হয়।

শ্রুতি সুখকর উপাখ্যান, শ্রেষ্ঠতমইতিহস, সমুদয় পুরাণ ও আখ্যান ইহার অন্তর্গত। ইহা সর্ব্বপ্রধান কাব্য, কোন কাব্যই ইহার সদৃশ হইতে পারে না।

হুলে কাণাড়ায় কুমার ব্যাসের অনুবাদ পাওয়া যায়, এই গ্রন্থ খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দ বল্লাল বংশীয় বিষ্ণুবর্দ্ধনের সময় অনূদিত হয়। বল্লিপুলে অলবার নামক রামানুজ মতাবলম্বী একজন মোহান্ত দ্রাবিড় ভাষায় মহাভারতের কোন কোন পর্ব্ব অনুবাদ করেন। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে মরাঠী ভাষাতেও ভারতানুবাদ হইয়াছিল; উৎকল ভাষায় একখানি প্রাচীন অনুবাদ পাওয়া যায়।

জৈমিনি ভারতকে অনেকেই আধুনিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। জৈমিনি রচিত সম্পূর্ণ মহাভারতের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কেবল অবশেষ পর্ব্ব পাওয়া যায়। মহাভারতে ও জৈমিনীয় আশ্বমেধিকে আকাশ পাতাল প্রভেদ, সম্যক আলোচনা করিলে কখনই ইহা প্রাচীন বলিয়া মনে হইবে না। তবে মহাভারতের ন্যায় প্রাচীন না হইলেও নিতান্ত আধুনিক নহে। দাক্ষিণাত্যের নানা ভাষায় এই অশ্বমেধিক অনুবাদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু এগুলি তেমন প্রাচীন নহে। বাঙ্গলায় সঞ্জয়ের অনুবাদই সর্ব্ব প্রাচীন, সঞ্জয় আদি

পর্ব্ব হইতেই জৈমিনির দোহাই দিয়াছেন, কিন্তু তাহার অশ্বমেধ পর্ব্ব ব্যতীত অপর পর্ব্বগুলি জৈমিনির বলিয়া বোধ হয় না। জৈমিনি ভারত কৌতুহল জনক গল্পময়, সেই জন্য সহজেই সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করে। এই কারণে গল্পপ্রিয় বঙ্গদেশে এক সময়ে জৈমিনি ভারতের যথেষ্ট সমাদর হইয়াছিল। সঞ্জুয় ব্যতীত ছুটিখাঁর আদেশে শ্রীকর নন্দী, দ্বিজ অভিরাম, অনন্তরাম, দ্বিজ রমিচন্দ্র খান, গলাদাস সেন, দ্বিজ কৃষ্ণরাম, দ্বিজ রঘুনাথ, দ্বিজ রামকৃষ্ণ ও ভরত পণ্ডিত প্রভৃতি অশ্বমেধ পর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছেন, এ পদ্যানুবাদ গুলি অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত; আধুনিক সময়ে বঙ্গভাষায় কতকগুলি গদ্যানুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে।

বাঙ্গলা ভাষাতেও মহাভারতের ভাবানুবাদ প্রকাশ করিয়া অনেক কবি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। প্রাচীন যুগে ঐ সকল মহাভারত বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে গীত হইত, এই সকল অনুবাদের মধ্যে বিজয় পণ্ডিতের 'বিজয় পাণ্ডব কথা' সর্ব্ব প্রাচীন। চারিশত বর্ষেরও পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। ইহার পর সঞ্জুয় ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত অনুবাদ করেন। তৎপরে কৃষ্ণানন্দ বসু, অনন্ত মিশ্র, নিত্যানন্দ ঘোষ, দ্বিজ কবিচন্দ্র, উৎকল কবি সারণ, ষষ্ঠীবর, গঙ্গাদাস সেন, রাজেন্দ্র দাস, গোপীনাথ দত্ত, রাজারাম দত্ত প্রভৃতি অনেকে ভারত কথা প্রকাশ করেন। ইহারা অনেকে কাশীরাম দাসের পূর্ব্ববর্ত্তী। কাশীরামের মহাভারত প্রকাশিত হইলে পূর্ব্বতন কবিগণের নাম অনেকটা লোপ পায়। কাশীরামের পর তৎপুত্র নন্দরাম দাস, দ্বৈপায়ন দাস, মধুসূদন নাপিত, শিবচন্দ্র সেন, ভৃগুরাম দাস প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। ইদানীন্তন যে সকল অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ ও বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে প্রকাশিত গদ্যানুবাদই সর্ব্ব প্রধান।

(প্রতাপ রায়ের গদ্যানুবাদ ও রাজকৃষ্ণ রায়ের গদ্যানুবাদ উল্লেখ যোগ্য।)

পাঠকগণের জ্ঞাতার্থ, আমরা নিম্নে কয়েক খানি বিশেষ বিশেষ রামায়ণ ও মহাভারত ব্যতীত যে সকল রামায়ণ ও মহাভারতের আজ পর্য্যন্ত হস্ত লিপি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার একটী তালিকা প্রদান করিলাম। উহাতে লেখকের নাম, লিখিত পুঁথির পত্রাঙ্ক বা অধ্যায় নির্ণয় এবং তৎকাল নির্ণীত হইয়াছে। ইহা হইতে এ দেশবাসীগণ সহজেই এ দেশের বিদ্যাচর্চ্চা, ধর্ম্মানুশীলন ও সামাজিকতার স্পষ্ট চিত্র দর্শন করিতে পারিবেন

"The genious walks along a line; and perhaps our greatest pleasure is in suing it see often near falling, without being ever actually down." Oliver Gold Smith.

রামায়ণ।

রামায়ণ	অযোধ্যাকাণ্ড	শঙ্কর রচিত		সম্পূর্ণ	৩৬
,,	আদিকাণ্ড			,,	২৭
,,	সুন্দরাকাণ্ড			খণ্ডিত	২০৫০
,,	কৃত্তিবাস—উত্তরকাণ্ড		১২৪৫	সম্পূর্ণ	২৬৭
,,	,, ,,		১০০৯	খণ্ডিত	১৩৩-১৬১
,,	তরণীসেন বধ	শঙ্কর	১২৪০	সম্পূর্ণ	১৪
,,	আদিকাণ্ড	দ্বিজ লক্ষণ		,,	২০
,,	সীতার পরীক্ষা	,,		,,	৯
,,	লঙ্কাকাণ্ড	দ্বিজ রামরূপ			
,,	অঙ্গদের রায়বার	ঘোষাল শর্ম্মা		সন ১০৮৮ সাল।	
,,	,,	কবিচন্দ্র		সন ১০৫৯ সাল।	
,,	সীতাহরণ	,,		সন ১২৩২ সাল।	
,,	লঙ্কাকাণ্ড	মাণিকচন্দ্র।	মহাভারত	শক্তিশেল	দ্বিজ লক্ষণ।
,,	লক্ষণ দিগ্বিজয়	ভবানী দাস।	,,	কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড	ভবানী শঙ্কর
,,	শঙ্কর রচিত	আদি, অযোধ্যা, সুন্দরকাণ্ড			
,,	কৃত্তিবাস	উত্তরাকাণ্ড	১২৪৫ সাল	সম্পূর্ণ।	
,,	,,	,,	১০০৯ সাল	খণ্ডিত।	
,,	তরণীসেন বধ	শঙ্কর	১২৪০ সাল	সম্পূর্ণ।	
,,	দ্বিজ লক্ষণ	আদিকাণ্ড		সম্পূর্ণ।	
,,	,,	সীতার পরীক্ষা		,,	
,,	কৃত্তিবাস	আদি, লঙ্কা, উত্তরা ও সুন্দর	১১৬৪ ও ১২৩৪		
,,	,,	অযোধ্যাকাণ্ড	সন ১০০৮ সাল	সম্পূর্ণ।	
,,	লক্ষ্মণের শক্তিশেল	কবিচন্দ্র	সন ১২৬৬ সাল	সম্পূর্ণ।	
,,	লক্ষ্মণের শক্তিশেল	কবিচন্দ্র	সন ১২৫৩ সাল		
,,	রামলীলা	কবিচন্দ্র	সন ১৯৫০ সাল		
,,	লক্ষ্মণ ভোজন	কৃত্তিবাস	সন ১২৫০ সাল		
,,	সীতাহরণ	কবিচন্দ্র	সন ১২৩২ সাল		
,,	গয়াকৃত্য	কৃত্তিবাস	সন ১২৩২ সাল		
,,	লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়	ভবানী দাস			
	রুক্মাঙ্গদের একাদশী	কৃত্তিবাস।	রামায়ণ	কবিচন্দ্র।	

"এত শুনি মোহিনীলেন ইন্দ্র পাশ।
রুক্মাঙ্গদের একাদশী গাইল কৃত্তিবাস॥" পুথি ১২৪১ সাল।

মহাভারত।

মহাভারত	শান্তিপর্ব্ব	কৃষ্ণানন্দ বসু	সন ১১৯৯ সাল সম্পূর্ণ।
,,	বিরাট	(স্মরণ)	সন ১২৬৬ সাল
জৈমিনি ভারত		ঘনশ্যাম দাস	সন ১০৩৫ সাল
,,		অনন্ত মিশ্র	সন ১২৬১ সাল
মহাভারত		নিত্যানন্দ ঘোষ	
,,		সঞ্জয়	
,,	দ্রোণপর্ব্ব	নন্দরাম দাস	সন ১২৬২ সাল
,,		দ্বিজ কৃষ্ণরাম	সন ১২০৮ সাল
,,		দ্বৈপায়ন দাস	২০০ বৎসর পূর্ব্বের।
,,	অশ্বমেধ পর্ব্ব	পুরুষোত্তম দাস	সন ১০২৭ সাল খণ্ডিত।
,,		পুত্র চন্দন দাস	
,,	বিরাট পর্ব্ব	গঙ্গাদাস সেন	
,,	অশ্বমেধ পর্ব্ব	ঘনশ্যাম দাস	সন ১০৪০ সাল সম্পূর্ণ।
,,	স্বর্গারোহণ পর্ব্ব	বিজয় পণ্ডিত	
,,	কর্ণপর্ব্ব	কবীন্দ্র	
,,	গদাপর্ব্ব	কবিচন্দ্র	সন ১০৮২ সাল
,,		অভিরাম দাস	৩০০ বৎসর পূর্ব্বের।
,,	শান্তিপর্ব্ব	কৃষ্ণানন্দ বসু	সন ১১৯৯ সাল সং ৫৫
জৈমিনি ভারত		ঘনশ্যাম দাস	সন ১০৩৫ ১৬৭ পত্র
,,		অনন্ত মিশ্র	সন ১২৬১ সম্পূর্ণ ১২৮
,,		দ্বিজ অভিরাম	সন ১২৩৮ সম্পূর্ণ
মহাভারত		কৃত্তিবাস	সন ১১১৪ সাল
	আদি, লঙ্কা, উত্তরা ও সুন্দরাকাণ্ড		সন ১২৩৪ সাল
,,	অশ্বমেধ পর্ব্ব	নিত্যানন্দ ঘোষ	খণ্ডিত।
,,		সঞ্জয় কৃত	৩০৫ পত্র
,,	উদ্যোগ, বন, আদি, ভীষ্ম, বিরাট, কর্ণ, সভা সৌতিক, ঐষিক, নারী ও শান্তিপর্ব্ব		নিত্যানন্দ ঘোষ
,,	দ্রোণপর্ব্ব	নন্দরাম দাস	সন ১২৬২ সাল
,,		দ্বিজ কৃষ্ণরাম	সন ১২০৮ সাল
,,	স্বর্গারোহণ	বিজয় পণ্ডিত	শকাব্দা ১৬৭৯ সম্পূর্ণ।
,,	গদাপর্ব্ব	কবিচন্দ্র	সন ১০৮২ সাল খণ্ডিত।
,,		অভিরাম দাস	৩০০ বৎসরের অধিক।
,,		কবীন্দ্র পরমেশ্বর	

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

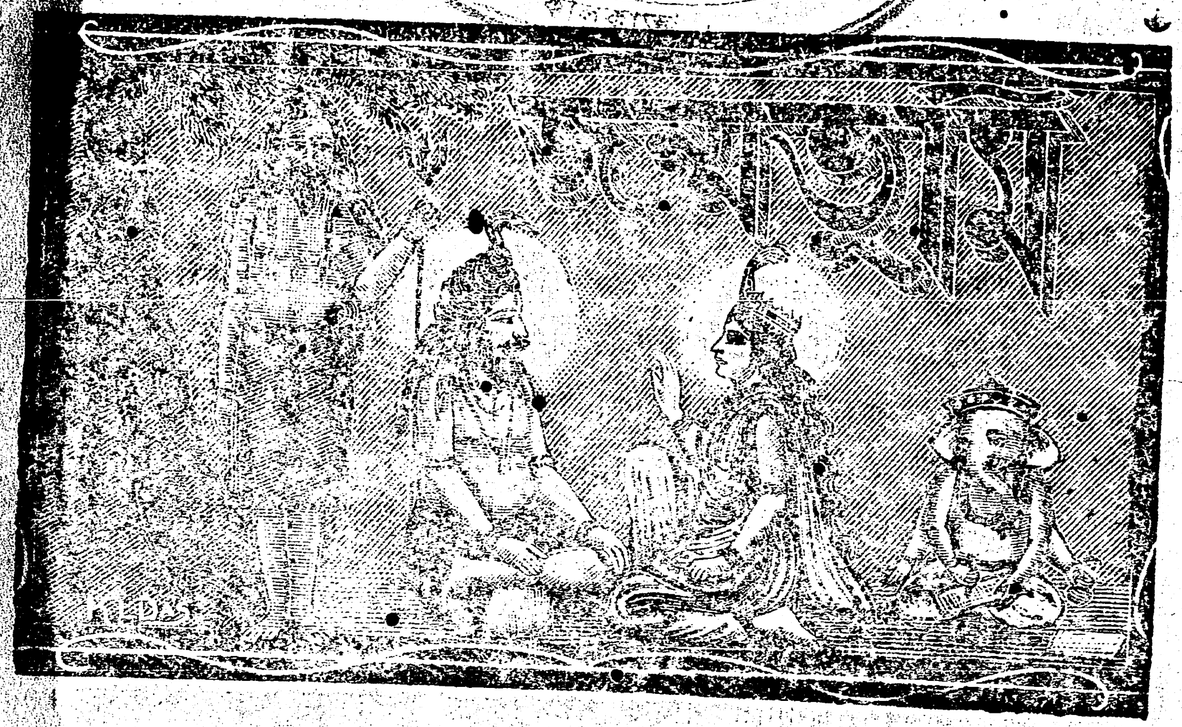

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

২৮শ, বর্ষ। ১৩২৯ সাল, জ্যৈষ্ঠ। ২য়, সংখ্যা।

সাধক-কমলাকান্ত।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যে ব্যক্তি ধ্যানে স্থির, সে ব্যক্তি পঞ্চমতত্ত্ব হইতে মনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া মনকে পরমব্রহ্মে লীন করিতে পারে, এবং সেই ব্যক্তি-সদাচারী। বাবা বেশ ভূষাতে সদাচারী হয় না, পাণ্ডিত্যে বিচার হয়, কিন্তু মনের উপর বল পাণ্ডিত্য প্রদান করিতে পারে না। মন শরীরের রাজা, শরীর লইয়া দেশ-দেশান্তরে যাইবে কি, মন যে বাঁকা, নদী পার হইবে কি, কূলেই নৌকা ভাসিয়া গেল, মন বেঁকে বসিল। কাশী গিয়া যদি কেবল সংসার চিন্তা আইসে কাশী না যাওয়াই ভাল। বাবা বোধ হয়, বেশ ভাল বুঝিলে না। ব্রহ্মজ্ঞান অজ্ঞানের

পার। আচার বিচার পাণ্ডিত্য এ সকল অহঙ্কারের অঙ্গ, অতএব অজ্ঞান। অজ্ঞানের পর ভক্তি, তারপর জ্ঞান, তারপর ব্রহ্মলাভ। ঈশ্বরে শুদ্ধা ভক্তি হইলে আচার-বিচার, অহঙ্কার থাকে না, শুদ্ধাভক্তি বিমল-জ্ঞান প্রসব করে, সেই শুদ্ধাভক্তি মনের। মন যার উচ্চ, মন যার বশ, মন যার কেবল মাত্র ঈশ্বর চিন্তায় রত, ঈশ্বর-প্রেমে উন্মত্ত সেই সাধক, তার আবার জাতি,ভেদ কি? তার আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কি? শুদ্ধাশুদ্ধ কি? সেই আমার গুরু, সেই আমার বন্ধু। কাহার মধ্যে কি জিনিস আছে, কে বলিতে পারে। মুচি হয়ে শুচি হয়, যদি কৃষ্ণ ভজে। কালীনাম বিতরণের পাত্রাপাত্র নাই। কালীনাম তাই আমি লোকবিচার, স্থানবিচার না করিয়াই কালীনাম ছড়াইয়া থাকি। শিষ্য পদস্পর্শ করিয়া কহিলেন, "আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন," বুঝিলাম, আমরা অহঙ্কার অন্ধকারে রহিয়াছি, উপর দিকে হাত বাড়াইয়া মনে হয়, বুঝি আমা অপেক্ষা এ জগতে বড় আর কেহ নাই।"

সাধক কিছুদিন জননীর সহিত পরম সুখে শিষ্যগৃহে বাস করিলেন। শিষ্যগণেরও অপরাপর আত্মীয়-স্বজনের মুখে পুত্রের গুণানুবাদ শুনিয়া জননীর আনন্দের সীমা রহিল না, কিন্তু এই দুঃখের সংসার সুখের দিন স্থায়ী হয় না। প্রবল দুঃখ গ্রীষ্মের মধ্যে সুখের বায়ু ক্ষণকালের জন্য তাপিত অঙ্গকে শীতল করে, আবার যে গ্রীষ্ম সেই গ্রীষ্ম, যে জ্বালা, সেই জ্বালা। প্রচণ্ড কালের পীড়নও ভীষণ। মাস, দিন মুহূর্ত্ত তাহার ভুল হইবার নহে। প্রতিদিন দৃশ্যমান রবি-চন্দ্রের ন্যায় ভবিতব্যের উদয় অস্ত অতি নিশ্চিত, কিন্তু সংসার বিধাতার ইচ্ছায় সে ভবিতব্য মানব চক্ষে যাদুকরের হস্তস্থিত গুটিকার ন্যায়, তাহার অস্তিত্ব, আবির্ভাব, তিরোধান মানব চক্ষে শূন্য আকাশের ন্যায়।

সেই ভবিতব্যের বিধাত্রী জগদম্বা নিতান্ত শরণাগত সাধকের প্রতি সদয়, তিনি সাধকের সংসার বন্ধন ক্রমে শিথিল করিলেন। কিছু দিন শিষ্যগৃহে বাস করিয়া সাধক জননী পীড়িতা হইলেন। পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সাধক সহোদরকে চান্না হইতে আনাইলেন। শিষ্যগণ সুবৈদ্য দ্বারা জননীর চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করাইতে লাগিলেন। কিন্তু মৃত্যু রোগের ঔষধ নাই। জীবনী শক্তি না থাকিলে ঔষধ সকল ফলদায়ী হয় না। জননীকে জাহ্নবীতীরস্থ করা হইল। সাধক পৃথিবী শূন্য দেখিতে লাগিলেন। তিনি যাঁহার অকৃত্রিম স্নেহে সংসারে বদ্ধ ছিলেন, সেই জননীকে মৃত্যু শয্যায় শায়িত দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সংসারের মায়া এমনি ভয়ঙ্কর,

উদার হৃদয়কেও ব্যথিত করে। রক্তমাংসময় শরীর ধারণ করিয়া সকলকেই তাহার শাসন সহ্য করিতে হয়। যে দেহকে মায়া জন্মের মত পরিত্যাগ করিবে, তাহাকে দৃঢ়রূপে দংশন না করিয়া পরিত্যাগ করে না। সাধক অপার দুঃখে, কাতর নয়নে, রোগ কাতরা, ক্ষীণ কলেবরা, সংসারের সর্ব্বদুঃখ বিনাশিনী জননীর প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সে দৃশ্য অসহ্য। সাধক সর্ব্বদুঃখ বিনাশিনী বিমলাকে হৃদয় মধ্যে ধ্যান করিলেন, কিন্তু আনন্দময়ীর প্রসন্ন বদন দেখিতে পাইলেন না। আনন্দময়ীর আবির্ভাবে হৃদয়ে দুঃখের অধিকার থাকে না। শত দুঃখ, শত শোক, শত আপদ বিপদের ব্যাকুলতা আনন্দময়ীর প্রেম স্রোতে কোন দিকে চলিয়া যায়, কিন্তু জীবন সর্ব্বস্ব জননীর মৃত্যুশয্যা পাশে বসিয়া, তাঁহার কাতর নয়নের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সাধক আনন্দময়ীকে পূর্ণভাবে হৃদয়ে দর্শন করিতে পারিলেন না। তিনি মধ্যে মধ্যে বিষন্নতর বিষণ্ণ হইতে লাগিলেন। জননীর অন্তিমকাল পর্য্যন্ত সংজ্ঞা ও বাক্‌শক্তির লোপ হয় নাই। কাতর নয়নে ক্ষীণকণ্ঠে পুত্রবৎসলা পুত্রকে আবার সেই অনুরোধ করিলেন, "কমল! বিরাগী হয়ে দেশ ছেড়ে যেয়োনা, ভাইকে দেখো বউমাকে শ্রদ্ধা করো।" জননীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কমলাকান্তের কমল হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তিনি বাষ্পপূর্ণ নয়নে, গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিলেন, "মা! আপনার আজ্ঞা কখনও অবহেলা করি নাই, করিবও না, আপনার আশীর্ব্বাদে আমাদের কোন অভাব হইবে না।" এই বলিয়া জননীকে এ সময় মায়ামোহ দুঃখে কাতর করা উচিত নহে, ভাবিয়া কহিলেন, "মা! সর্ব্ব দুঃখহারিণী শমন ভয় বারিণী ভবানীকে ডাকুন।" জননী বলিলেন, "বাবা! তুমি কালীনাম শোনাও তোমার মুখে কালীনাম বড় মধুর।" সাধক জননীর শিয়রে বসিয়া সজল নয়নে হৃদয়ভেদী-স্বরে "কালী কালী" বলিয়া নাম শুনাইতে লাগিলেন। জননীর হৃদয় প্রেম পরিপূর্ণ হইল। তিনি কৃতান্ত দমনী নবজলধর বরণীকে হৃদয় মন্দিরে স্থাপন করিয়া সংসারের মায়ামোহ দূরে নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইলেন। মানুষের পবিত্র ভাবে জীবন যাপনের পরিচয় তাহার মৃত্যুকালে পাওয়া যায়। কথাই আছে "জপ তপ কর কি, মরতে জান্‌লে হয়।" নরজীবনের একমাত্র ভীষণ শঙ্কট সময় মৃত্যুকাল। সেই সময়েই কেবল মানুষের স্বরূপত্ব আসে, সে সমস্ত জীবন যে ভাবে যাপন করিয়াছে, কেবল তাহারি অভিনয় করে। জননী মায়ামুগ্ধ হইলেও সাত্ত্বিকভাবে জীবন-যাপন করিয়াছেন, চৈতন্যরূপিনীকে চিত্ত পিঞ্জরে মাঝে মাঝে বাঁধিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন, আজ তাই পরিবারবর্গে

বেষ্টিত হইয়াও মহামায়াকে মায়া হইতে পৃথক করিয়া এই শঙ্কট সময়ে হৃদয়-পদ্মে দেখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মৃত্যুশয্যায় পতিত হইয়া অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যে স্থিরভাব, পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়াও ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ, অপরিসীম প্রেম ভক্তি, অভ্যাস ব্যতীত কখনই সম্ভব নহে। মৃত্যুর সময় ব্যাকুলতা বদ্ধজীবের লক্ষণ। গত কৃত-পাপকর্ম্মের অনুশোচনা, তৎকর্ত্তৃক মর্ম্মপীড়া, প্রলাপ ও তদনু অজ্ঞান ভাব পাপাত্মার পরিচয়। জননী পুত্রমুখ নিঃসৃত কালীনামামৃত পান করিতে করিতে ক্ষীণস্বরে অস্পষ্ট ভাবে "কালী কালী" বলিতে লাগিলেন। বদন প্রসন্ন, তিনি যেন কোন পরিচিত সুখের স্থানে যাইতেছেন, যেন কত কষ্টের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতেছেন। ক্রমে জননীর চরম সময় উপস্থিত। তাঁহাকে অন্তর্জলী করা হইল। অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে স্থাপিত হইল। জননী জাহ্নবী দর্শন করিয়া চিরকালের জন্য নয়ন মুদ্রিত করিলেন। সাধকের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল, অবিরল ধারায় নয়ন জল বিসর্জ্জন করিতে করিতে চিরকালের জন্য জননীর মুখ নিরীক্ষণ করিলেন। যথাবিধি সতী-অঙ্গ দাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। সাধক গঙ্গাস্নান পূর্ব্বক নববস্ত্র পরিধান করিলেন। নববস্ত্র কেন? শাস্ত্রের বিধান। শাস্ত্রের বিধান কি উদ্দেশ্য বিহীন? কখনই নয়। নববস্ত্র পরিধানে মনের প্রসন্নতা আসে; প্রসন্নতা ও দুঃখে আলো ও অন্ধকার এক স্থানে অবস্থান করিতে পারে না; বিলাস দ্বারা দুঃখ দূরীকরণ—এই কি উদ্দেশ্য? অথবা রোগ মাত্রেই সংক্রামক, রোগীর সংস্রবের বস্ত্র পরিত্যাগ, এই কি, নববস্ত্র পরিধানের উদ্দেশ্য? অথবা "যেমন জীর্ণবাস পরিত্যাগ করিয়া মানুষ নববস্ত্র পরিধান করে তেমনি আত্মা জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া নব কলেবর আশ্রয় করে; গীতার এই বাক্য শোকের সময় সুধীগণের স্মরণ করাইয়া শান্তি প্রদানই কি নববস্ত্র পরিধানের উদ্দেশ্য? যাহা হউক, সাধক ও কনিষ্ঠভ্রাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়গণ নববস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহ প্রবেশ করিলেন। শিষ্যগণ যথাসাধ্য সাধক ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার শোক-শান্তির চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদেরই চেষ্টায় সাধক-জননীর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া গঙ্গাতীরে যথাবিধি সম্পন্ন হইল। সাধক মাতুল ভ্রাতা ও স্বজনগণের সহিত অতি দুঃখিত মনে চাঁপায় প্রত্যাগমন করিলেন।

জননী বিয়োগে সাধক সংসার শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন, গৃহে বাস করিতে অক্ষম। অন্তরে অভয়া বরদা, নয়নে জননী মূর্ত্তি নৃত্য করিতে লাগিল। হৃদয় আকাশে বৈরাগ্য ঘনাবলি গাঢ়তম হইতে লাগিল, তাহার মধ্যে মধ্যে

শোকের বায়ু ভক্তি ও প্রেমধারা বর্ষণে তাঁহার হৃদয়কে সবল ও সারবান করিবার ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। তিনি ভীত হইলেন। ভ্রাতা নবীন, বিবেক বিহীন, অতএব তাঁহা অপেক্ষা অধিক শোকাতুর। ভ্রাতার সান্ত্বনা অতি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন। পান্থ নিবাসের ন্যায় গৃহ শূন্য বোধ হইলেও অধিকাংশ সময়ই গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। সংসারের ব্যয়ভার অধিকার শিষ্য গ্রহণ করেন। ভ্রাতার বিবাহ হইল, সাধক-পত্নী চাঁপায় আসিলেন। সাধককে বাধ্য হইয়া অনেক সময় সংসার চিন্তা করিতে হয়। এইরূপে কিছু দিন অতিবাহিত হইল।

সাধক অন্তর্দৃষ্টি জগদম্বার চরণে রাখিয়া গৃহকর্ম্ম করিতেছেন। সময় পাইলে, নির্জ্জন পাইলে শরীর, মন প্রাণ পরমেশ্বরীর চরণ-পদ্মে সমর্পণ করেন, বালকের ন্যায় কাঁদেন, অবিরল ধারায় অশ্রু বিগলিত হয়, যেন কোন অজানিত দেশে, অজানিত গৃহে কি কারাগারে মহাকষ্টে আছেন। সতত ভয়, পাছে মাকে হারাই, মনের মত মনকে হারাই। তিনি বেশ বুঝিয়া ছিলেন, স্ত্রী পুত্র ভ্রাতা-ভগিনী ভরা ঘরটী মানুষকে প্রেম ঘরের সন্ধান করিতে দেয় না। পরমানন্দপূর্ণ ঘরের কথা, একেবারে ভুলাইয়া দেয়। মহামায়া ক্রমে মনের চারিধারে মায়ার পর্দ্দা ফেলিয়া দেন। তাই সাধকের এত ব্যাকুলতা। এ সংসারে দুঃখ, বিয়োগ যন্ত্রণা ভোগ করিতেই হইবে, কিন্তু যাহার ভীষণ দুঃখে ও শোকে প্রজ্ঞা বিনষ্ট না হয়, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী, তিনিই শ্রেয়োলাভ করিতে পারেন। সাধকের মহাদুঃখেও বিশুদ্ধ জ্ঞানের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তিনি ক্ষণকালের জন্যও সর্ব্বদুঃখহরা জ্ঞান-দায়িনীকে বিস্মৃত হন নাই।

জীবনে দুঃখের দুঃখ আইসে। সুখের সুখ আইসে, ইহা প্রকৃতির নিয়ম; জলের উপর জল হয়; রৌদ্রের উপর রৌদ্র হয়। দুঃখ নিগূঢ়ভাবে সুখের কারণ হইলেও মানব ভবিষ্যতের উপর ভরসা করিয়া হাস্য মুখে দুঃখ সহ্য করিতে পারে না। যাহারা সুখ দুঃখে অনুদ্বিগ্ন-চিত্ত মহাদুঃখে কেবল তাঁহাদেরই প্রজ্ঞা ও শান্তি বিনষ্ট হয় না। সাধকের জীবনের স্রোত অন্য দিকে ফিরাইবার জন্য পূর্ব্বজন্মকৃত সুকৃতি অদৃশ্যভাবে কার্য্যকর হইতেছে। সাধক পত্নী পীড়িতা, পীড়া গুরুতর; আরোগ্যের আশা নাই। সাধকের শ্বশুর ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন সকলেই উপস্থিত। সকলেই নির্ব্বাক ও নতমুখে অবস্থান করিতেছেন। সাধকের শ্বশ্রূদেবী প্রিয়তমা কন্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ ও অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। সাধক গৃহ প্রবেশ পূর্ব্বক কাতর কণ্ঠে কহিলেন; "তুমি

চলিলে যাও" আর বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি বাহিরে আসিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আকাশের দিকে দৃষ্টি করিলেন; দেখিলেন, আকাশের কোলে ভুবন-মোহিনী এলোকেশী, সেই মুখ, দুঃখের লেশ মাত্র নাই, অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে তাঁহার পত্নী জগদম্বার পার্শ্বে বসিয়া প্রেমপূর্ণ নয়নে হাস্য মুখে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। সাধক ভাবিলেন. আমার পত্নীই ধন্য, আমার সহবাস প্রিয় না হওয়াতে তিনি পূর্ণানন্দময়ীর সহবাস পাইয়াছেন। আমি কি, আমার চির অভিলাষিত ওই সহবাস পাইব। আকাশের পানে তাকাইয়া মাকে হৃদয়ে, আকাশে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত দেখিয়া সাধক বালকের মত কত কি বলিতেছেন; এমন সময়, গৃহে ক্রন্দন ধ্বনি উঠিল, তিনি দেখিলেন, তাঁহার গৃহ হইতে এক জ্যোতিঃ বিদ্যুতের ন্যায় আকাশ ভেদ করিয়া ছুটিতেছে, অবিচলিত ভাবে সেই জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া যুগপৎ বিস্ময়, হর্ষ ও দুঃখে নিমগ্ন হইয়া গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক বস্ত্রাচ্ছাদিত মৃত দেহের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যাকুলিত হইল, তিনি পরক্ষণেই প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবিলেন, "আধারভূতাজগতস্ত্বমেকা" তবে আমাদের আসা যাওয়া কি? যেখানে আছি, সেই খানেই থাকিব, আবার ভাবিলেন. তাঁহাতেই আছি এ কথা সত্য, বীজ ত মাটিতেই থাকে, রস গ্রহণের শক্তি চাই, তবে বীজ অঙ্কুরিত ও ফলবান হয়, সাধনা দ্বারা আমাদিগকে রস গ্রহণের শক্তি উপার্জ্জন করিতে হইবে; ভ্রাতা কাঁদিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, "দাদা! আমরা অল্পদিন হ'ল মা হারায়েছি, আজ আবার ঘরের লক্ষ্মী চলে গেলেন, দাদা একি! হল।" সাধক কহিলেন, "কেঁদোনা ভাই, সকলি জগদম্বার ইচ্ছা, আমাদের ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে, বিধির লিখন কারো খণ্ডিবার হাত নাই, কাঁদিলে কি হবে, চল সৎকারের উপায় দেখি।" অল্প ক্ষণের মধ্যে এ সংসারে মানবের শেষ সঙ্গী বাঁশের দোলা আনীত হইল। পথের সম্বল ছেঁড়া ক্যাথা, পাঁচকড়া কড়ি, কলসী ও কাচা মাত্র গৃহলক্ষ্মীর সঙ্গে দেওয়া হইল। সমুদয় গ্রাম শোকার্ত্ত, মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনিতে মনের উদাস্য জন্মাইয়া, শবদেহ শ্মশানে সমানীত হইল।

ক্রমশঃ

মহালক্ষ্মী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

চতুর্থ পল্লব।

মাতা ও পুত্রের মন্ত্রণা।

মা উকীল বাড়ী গিয়াছেন, বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই শ্যামীর মার মুখে নরেশ্বর সে সংবাদ পাইয়াছিলেন। সম্ভ্রান্ত ভদ্রগৃহস্থের পরিবার স্বয়ং উকীল বাড়ী কেন যান, ইহার একটু কৈফিৎ দেওয়া আবশ্যক। উকীলের নাম হরেন্দ্রকৃষ্ণ শ্রীমানী, গণেশজননীকে তিনি মা বলেন; সেই সম্পর্কে বিষয় কর্ম্মের মামলার সময় ওকালতী খরচা গ্রহণ করেন না, অধিকন্তু ঐ নরেশ্বর ব্যতীত গণেশজননীর এখন অন্য কোন অভিভাবক নাই, দুঃখের অবস্থায় নানা ধান্দায় নরেশ্বরকে নানাস্থানে গতিবিধি করিতে হয়, অবকাশ থাকে না, সেই কারণেও গণেশজননী নিজে যান। উকীলকে ডাকিয়া পাঠাইলেও ত মাতৃ আহ্বানে তিনি আসিতে পারেন, তাহাতেও বাধা আছে; উকীলের অবসর অল্প, সন্ধ্যাকালে পরিশ্রান্ত, তজ্জন্য স্নেহবশে গণেশজননী নিজে যান। বিশেষ প্রয়োজন পড়িলে উকীল বাবু রবিবার আসিয়া দেখা করেন। প্রায় বৎসরাবধি এইরূপ চলিয়া আসিতেছে।

রাত্রি নবম ঘটিকার সময় গৃহিণী গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। পুত্রকে প্রত্যাগত দেখিয়া তাঁহার দুশ্চিন্তা দূর হইল, তাঁহার গম্ভীর বদনে হাস্য দেখা দিল। স্নেহাস্পদ পুত্রের নিকটে বসিয়া, সস্নেহে গাত্রে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি তখন কত কথাই বলিলেন, এ আখ্যায়িকার সহিত তাহার নিকট সম্বন্ধ অল্প। আসিতে দেরি হইল কেন, একটু বিস্তৃত বিবরণে নরেশ্বর সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তৎপরে অবস্থার কথা প্রসঙ্গে বিষয় কর্ম্মের কথা উঠিল। একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "আর তো পারি না বাছা। কর্ত্তা যা কিছু আমার হাতে রেখে গিয়েছিলেন, তাই থেকে এই কয় বৎসর সংসার চালাচ্ছি, মহাজনের সুদ যোগাতে বৎসর বৎসর অনেক টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে; আর তো চলেনা, বড় জোর আর বছর খানেক কষ্টে শ্রষ্টে চালাতে পারি, তারপর কি উপায় হবে?"

ক্ষণেকের জন্য গৃহিণীর কথা একটু বন্ধ রাখিয়া একটি আনুসঙ্গিক কথার উল্লেখ করিতে হইল। অনেক টাকার সুদ যোগাইতে হয়, গণেশজননীর এত ঋণ কিসের?—গণেশজননীর ঋণ নহে, কর্ত্তার আমলের ঋণ। নরেশ বাবুর দুটি ভগ্নী ছিল; কনিষ্ঠটি এখনও বর্ত্তমান আছে, শ্বশুরালয়ে বাস করে, জ্যেষ্ঠটির অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছে। কায়স্থ ব্রাহ্মণের বিবাহের বাজার আজ কাল যতদূর আগুণ হইয়াছে ইতিপূর্ব্বে এতদূর ছিল না বটে, তথাপি ঐ দুটি কন্যার বিবাহে যজ্ঞেশ্বর বাবুর অনেক টাকার ঋণ হইয়াছিল। নরেশ্বরের পিতার নাম যজ্ঞেশ্বর মিত্র। মান সম্ভ্রম ছিল, সাহেবের মুচ্ছুদ্দীগিরি কার্য্যে দশ টাকা আয়ও ছিল, কিন্তু নিজে তিনি অতিশয় খোরচে লোক ছিলেন, দানে, ব্রতে ও পূজা পার্ব্বণাদি ক্রীয়া-কলাপে অর্জ্জিত ধন প্রায় সমস্তই ফুরাইয়া যাইত, বেশী কিছু জমাইতে পারিতেন না, অথচ মান বজায় রাখিবার জন্য কন্যা দুটির যথেষ্ট অলঙ্কার দিতে ও বিবাহের সময় সম্মানুযায়ী আড়ম্বর করিতে ঘরের টাকায় কুলায় নাই, ঋণ করিতে হইয়াছিল। সেই ঋণের দরুণ বাড়ীখানি বন্ধক। তিন বৎসর মেয়াদে বন্ধকী খৎ; মেয়াদ পূর্ণ হইবার অগ্রেই কর্ত্তার লোক লীলা সম্বরণ; মৃত্যুর পর দশবৎসর অতীত হইয়াছে, এক দশ বৎসরে নূতন নূতন মিয়াদে তিনবার খৎ বদল হইয়াছে, আসল টাকা পরিশোধ হইতেছে না। পুনরায় খৎ বদলের সময় আগত; সেই বিষয়ের পরামর্শের নিমিত্ত নরেশ্বরের জননী উকীলের বাসাবাড়ীতে যাতায়াত করিতেছেন।

হেতু নির্দ্দেশ করা হইল, এক্ষণে পুনরায় মাতা পুত্রের কথা। "তারপর কি উপায় হবে?" এই কথা শুনিয়া নরেশ্বর বলিলেন, "আমার দ্বারা এখন কি উপায় হইতে পারে? কতদিন ধরিয়া চাকরি অন্বেষণ করিতেছি, কোথাও কিছু ঘটিয়া উঠিতেছে না; লেখাপড়া শিখিয়াছি, সাহেবের আফিসে কাজ চালাইতে পারি, কিন্তু ভাগ্যদোষে জুটিতেছে না, কি করি? বৎসরাবধি তোমাকে আমি যে উপায় বলিতেছি, তাহা তুমি শুনিতেছ না; কেবলই সুদ যোগাইতেছ, কেবলই সুদ যোগাইতেছ। এখনও আমি বলি, বাড়ীখানি বেচিয়া ফেল; তাল গাছ নাই, জল নাই, শুষ্ক তালপুকুর নাম লইয়া কি লাভ? বেচিয়া ফেল; যে মহাজনের কাছে বন্ধক আছে, উচিত মূল্যে তাহাকেই ছাড়িয়া দাও; ঋণ শোধ হইয়া যাহা কিছু বাঁচিবে, সেই টাকায় অন্য পাড়ায় ছোট একখানা বাড়ী কিনিয়া বাস করিলেই চলিবে।"

মস্তক সঞ্চালন করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "সেটা কি ভাল দেখায়? পাড়ার

লোকে বোল্‌বে কি? কর্ত্তা চলে গিয়েছেন, নাম আছে, মান আছে, [illegible] আছে, ডাক নামটা খুব বড়, বাড়ীখানা বিকিয়ে গেলে সে নাম, সে মান [illegible] সব ডুবে যাবে। আমার হাতে টাকা কম, সব টাকা প্রায় ফুরিয়ে [illegible] লোকে এখনো ততটা জান্‌তে পারেনি, বাড়ীখানা বিক্রী হয়ে গেলে চতুর্দ্দিকে ঢাক বেজে উঠ্‌বে। সে অপমান আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না; তার চেয়ে বরং গলায় দড়া দিয়ে মরা ভাল।"

শেষ কথাটি বলিবার সময় গৃহিণীর দুটি চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া আসিয়াছিল; পুত্রকে চক্ষের জল দেখিতে দিবেন না, এই তাহার সংকল্প; অতএব হাঁচিবার ছলে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া অঞ্চলে নেত্র মার্জ্জন পূর্ব্বক পরক্ষণেই তিনি পুত্রের মুখপানে চাহিলেন। মুখখানি স্বভাবতই নিখুঁৎ সুন্দর, কষ্টের কথা শুনিবার সময় উজ্জ্বল গৌরবর্ণের উপর রক্তিম আভার বিকাশ হওয়াতে আরও সুন্দর দেখাইতেছিল; পুত্রের সেই সুন্দর মুখ সন্দর্শনে জননী অস্ফুট স্বরে আপন মনে বলিলেন, "ঠিক সাজবে, সেটি যেমন, এটিও তেমনি!" পুত্র স্থির দৃষ্টিতে জননীর মুখ দেখিতেছেন, জননীও অন্তরানন্দে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন; কাহার মনে যে কি ভাবের উদয় হইতেছে, তাহা অনুভব করা দুর্ঘট।

ভদ্রকুলের সুন্দর সুন্দর যুবাপুরুষগণের রূপ দেখিয়া লোকে প্রশংসা করিয়া বলে "কন্দর্পের মত রূপ, ছেলে যেন কার্ত্তিক!"—সুন্দর কুমারীদের রূপের প্রশংসা করিয়া প্রাচীনা গৃহিণীরা বলেন, "সাক্ষাৎ ভগবতী!"

কন্দর্পকে আমরা দেখি নাই, কার্ত্তিককেও দেখি নাই, কার্ত্তিক প্রসূতি ভগবতীকেও দেখি নাই; লোকেরা বলে, তাহাই শুনি, কল্পনা বলে কবিরা বর্ণনা করেন, পুস্তকে পুস্তকে তাহাই পাঠ করি। আর কিসে উপমা নাই?—সুদক্ষ ভাস্করের ও কুম্ভকারের গঠনে এবং সুনিপুণ চিত্রকরের চিত্রপটে! কারিকরেরা কি দেখিয়া গঠন করে, চিত্রকরেরা কি দেখিয়া চিত্র করে? আদর্শ নাই; ঋষি প্রণীত দেবতা-পূজার ধ্যান আছে। ধ্যান আর কিছুই নহে, শুদ্ধরূপ বর্ণনা। দেবতা গঠনে ও দেবদেবীর প্রতিরূপ চিত্রণে যাহারা লব্ধ প্রতিষ্ঠ, সেই সকল ধ্যানের মন্ত্র শুনিয়া শুনিয়া তাহারা গঠন কার্য্য ও চিত্রকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। উপমাচ্ছলে তাহাই গ্রাহ্য।

বাবু নরেশ্বরমিত্র পরম রূপবান যুবাপুরুষ, কার্ত্তিকের মত রূপ, অনিমেষ নয়নে জননী সেইরূপ অপরূপ রূপ দর্শন করিতে করিতে প্রফুল্ল বদনে বলিলেন,

আজি যাথি যুঁথি বেলা শিহরে'
ঢালে চরণে অর্ঘ্য রাণি গো ॥ ২
আজি জড়তা গিয়াছে ছুটিয়া
আজি দুঃখ গিয়াছে ঘুচিয়া,
আজি সবে একসাথে মিলিয়া
তব পদ-পঙ্কজে নমি গো। ৩
আজি সুপ্ত বাঙ্গালী জেগেছে
তব স্নেহের পদ পরশ পাইয়া,
প্রাণে প্রীতির উৎ ঝরিছে
বুঝি তব কৃপাবলে দেবী গো ॥ ৪
তবে উঠ দেখি ভাই বাঙ্গালী
তব কর্ম্ম রাশিরে ফেলিয়া,
দেখ মা যে আজি তব দুয়ারে
এবে মিছে কাজ কি যে সাজে গো। ৫
হৃদি নিভৃত নিলয় মাঝারে
আজি হৈম আসন পাতিয়া,
লহ ভকতি অরঘ সাজায়ে
দেহ মাতৃ চরণে ঢালি গো ॥ ৬
আজি এসেছি সাজায়ে যতনে
ভরি মানস কুসুমে ডালিটী,
আজি সাজাব ও রাঙ্গা চরণ
মম হৃদয় শোণিত ঢালি গো। ৭
মম মঙ্গলময়ী দেবি গো
আমি কি দিয়া পূজি মা তোরে,
মোর যা কিছু সকলি দিয়াছি
এবে নয়ন বারিতে বরি গো ॥ ৮

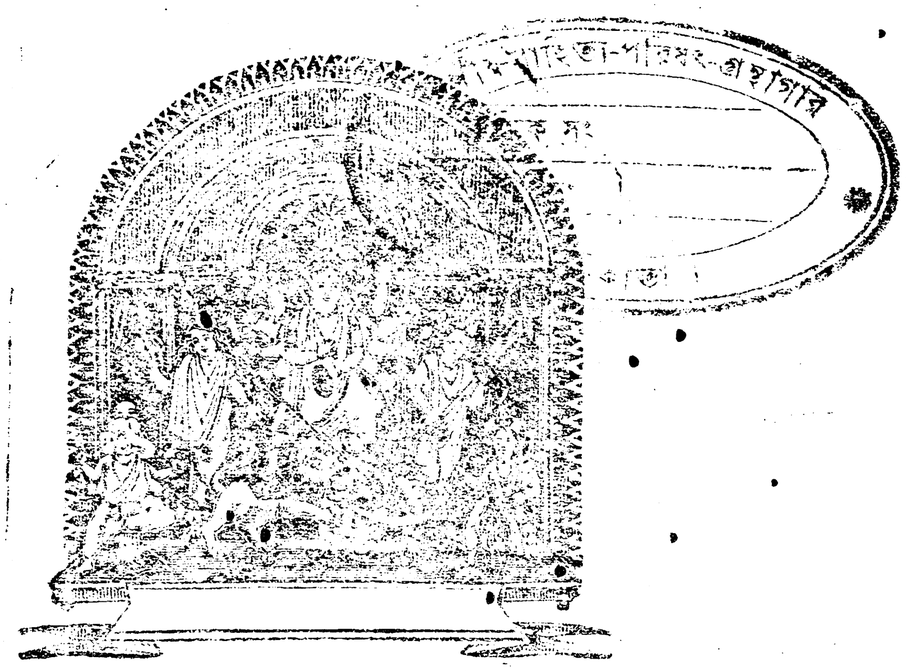

জন্মভূমি

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

২৮শ, বর্ষ। | ১৩২৯ সাল, আশ্বিন। | ৬ষ্ঠ, সংখ্যা।

আগমনী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,

মা আসিতেছেন। তাই মা-হারা ছেলে আমোদে আটখানা হইয়াছে। আবার গালপোরা, বুকভরা মা নামে ডাকিতে পারিবে, আবার মায়ের কাছে দাঁড়াইয়া মায়ের মুখখানি নয়ন ভরিয়া দেখিতে পারিবে, আবার মায়ের প্রসাদ খাইবে, আবার ব্যথার কথা—অভিমানের কথা মায়ের কাছে বলিতে পারিবে—মায়ের কোলে মুখখানি লুকাইয়া কাঁদিতে পারিবে; তাই কত সুখে, কত আশায়, কত ভরসায় মা-হারা ছেলে মায়ের আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছে।

মা—এমন মধুর নাম কি আর আছে? মা বলিলে পাপ-তাপ থাকে না। মার মতন মধুময় সম্বন্ধ আর আছে কি? মা বলিলে প্রাণ জুড়ায়, সংসারের সকল জ্বালা দূর হয়। যাহাকে মা বলিয়া ডাকি, তাহাকে যেন ষোল আনা

এসে আমার কাজ কর্ম্ম কোচ্ছে, দেখেছ, তুমি তাকে জান? ভাল ঘরের মেয়ে, দুঃখের দশায় পড়েছে, আমার জানাশুনা একটী স্ত্রীলোকের সুপারিস্ নিয়ে আমার কাছে এসেছিল, যত্নকোরে আমি রেখে দিয়েছি। কেমন, ভাল করিনি? আমি বৃদ্ধ হয়েছি, সব দিক সামলাতে পারি না, ঐ মেয়েটিকে পেয়ে আমার অনেকটা আসান হয়েচে। মেয়েটি লক্ষ্মী—খুব ধীর, খুব শান্ত; মুখে বেশী কথা নেই, দিব্য লজ্জাশীলা, আমাকে বেশ ভক্তি যত্ন করে। শ্যামীর মাও ওটিকে ভাল বেসেছে।"

মনের ভাব চাপিয়া রাখিয়া নরেশ্বর বলিলেন, "তা বেশ হয়েছে। সংসারে তোমার ঐ রকম একটী দোসর থাকা ভাল। আমিও দেখেচি, খুব ধীর, বেশ লজ্জাশীল, ভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকবার যোগ্য।"

ঐ পর্য্যন্ত কথা। কোথা থেকে এসেছে, কোন কুলের মেয়ে, কি নাম, কি বৃত্তান্ত, নরেশ্বর সে সব কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, গৃহিণীও আর কিছু বলিলেন না।

গৃহিণী কিছু না বলুন, মহালক্ষ্মীর পরিচয় সম্বন্ধে আমরা দুই চারি কথা বলিয়া রাখি। নগর হইতে দুইক্রোশ দূরে মহালক্ষ্মীর পিত্রালয়। উহার পিতা ঘোষ বংশীয় কুলীন কায়স্থ, নাম ছিল রসময় ঘোষ; জমিদারিতে ও তেজারতিতে তাঁহার প্রায় লক্ষটাকার বেসাত ছিল; তিনি অতি সদাশয় লোক ছিলেন; হিন্দু সংসারের প্রথামতে কন্যাটী বিবাহ যোগ্যা হইলে, পাঁচ সাতটী সম্বন্ধ আসিলে একটা না একটা বাধা প্রযুক্ত শীঘ্র শীঘ্র বিবাহ হয় নাই। মহালক্ষ্মীর যখন দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম, সেই সময় রসময় ঘোষের মৃত্যু হয়, দুই মাস পরে মহালক্ষ্মীর গর্ভধারিণীও লোকান্তর যাত্রা করেন, সহোদর ভ্রাতা অবিদ্যমানে মহালক্ষ্মী বিষয়াধিকারিণী হয়; দাস দাসী গোমস্তা সরকার ও দরোয়ান রাখিয়া মহালক্ষ্মী তত অল্প বয়সেই জমিদারি করিতে থাকে, বিবাহের কথা একটিবার মনেও আনে না। চারি বৎসর পরে নাবালিকাকাল উত্তীর্ণ হইয়া যায়, বাটীর উপর ও বিষয়ের উপর প্রভুত্ব করিবার পূর্ণ অধিকার জন্মে। মহালক্ষ্মীর জননী ব্রহ্মময়ী দাসী বিদ্যাবতী ছিলেন, জননীর নিকটে মহালক্ষ্মীর যথাসম্ভব বিদ্যা শিক্ষা হয়, মহালক্ষ্মীর পিতারও স্ত্রী শিক্ষায় উৎসাহ দান ছিল, পল্লীর একজন বিপ্রসন্তান গৃহশিক্ষক হইয়া মহালক্ষ্মীকে কাব্য, ইতিহাস, গণিতাঙ্ক ও জমিদারী সেরেস্তার খাতাপত্রের প্রণালী শিখাইয়া ছিলেন; নিরবধি চর্চ্চা থাকাতে মহালক্ষ্মী আত্ম যত্নে অনেকটা উন্নতি লাভ করিয়াছে। পিতৃ মাতৃ বিয়োগের

পর হইতে পল্লীর দুটি পাঁচটি সমবয়স্কা গৃহস্থ কন্যা মহালক্ষ্মীর বাড়ীতে বেড়াইতে আসিত; যদবধি মহালক্ষ্মীর ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হয় নাই, প্রতিবেশিনী কন্যারা তদবধি তাহার কাছে বিবাহের কথা তুলিলে সন্তোষকর উত্তর পাইত না। মহালক্ষ্মী যখন ষোড়শী, তখন একটি ষোড়শী যুবতী তাহাকে বিবাহের নামে মন্ত্র দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, মাসাবধি সেই সকল মন্ত্র শুনিয়া শুনিয়া মহালক্ষ্মী একদিন বলিয়াছিল, "এ দেশে তো মা বাপে মেয়ের বিয়ে দেন, আমার তো মা বাপ নাই, আপনার বোলে আদর যত্ন করেন, তেমন কোন অভিভাবকও নেই, কে আমার বিবাহ দিবে? আমার বিবাহ হইবে না। ভাগ্যে যদি থাকে, যদি আমি বিবাহ করি, তবে আমি স্বয়ম্বরা হব।" মন্ত্র দায়িনী সে কথার উপর আর কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করে নাই, বরং উপহাস করিয়াছিল, পাড়ার মেয়েদের কাছেও লজ্জাহীনা বলিয়া নিন্দা করিয়াছিল।

যে সময়ের কথা, নরেশ্বর মিত্র সেই সময় চাকরির উমেদারিতে দূরে নিকটে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি, মহালক্ষ্মীর বয়স সপ্তদশ কি অষ্টাদশ বর্ষ, বাস্তবিক ঠিক নহে; মহালক্ষ্মী আজিও সপ্তদশের সীমা অতিক্রম করে নাই। স্বয়ম্বরা হইব, বলিয়া যে বৎসর তাহার উপহাস লাভ হয়, তাহার পর বৎসরের দুর্গা পূজার ছুটির সময় নরেশ্বর মিত্র একটি উমেদারি উপলক্ষে মহালক্ষ্মীর বাটীর সমুখ দিয়া যাইতে ছিলেন। সেই গ্রামের একটি বাবু বঙ্গের এক প্রসিদ্ধ জেলার প্রধান সদর আমীন, বাক্যান্তরে সদর আলা (এখনকার সবজজ); তাঁহার কাছে নরেশ্বরের উমেদারি। নরেশ্বর যাইতেছেন, বিনা উদ্দেশ্যে হঠাৎ একবার উপর দিকে চাহিলেন; বাটীর বাহির দিকের বারাণ্ডায় একটি সুন্দরী দাঁড়াইয়াছিল, বদন অনাবৃত; সেই সুন্দরী মুর্ত্তি দেখিয়া নরেশের বিস্ময় জন্মিল, তাঁহার দিকেও সুন্দরীর নজর পড়িল। বস্,—এই পর্য্যন্ত। নরেশ্বর গন্তব্য পথে চলিলেন; চলিতে চলিতে ভাবনা—"এ সুন্দরী কে?" আরও আটদশ দিন এই পথে আমি যাতায়াত করিয়াছি, একদিনও ইহাকে দেখি নাই। কি চমৎকার রূপ! যুবতী গৃহস্থ-কামিনী অনাবৃত মুখে রাস্তারধারের বারাণ্ডায় একাকিনী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, ভাব কি? ফিরিয়া আসিবার সময় ঐ ভাবে যদি থাকে, পাড়ার একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া সন্ধান জানিতে হইবে।

নরেশ্বরের এই ভাবনা,—ওদিকে সুন্দরীও মনে মনে তর্ক করিতে লাগিল

ঐ সুন্দর যুবা পুরুষটি কোথা হইতে আসিল ? এ গ্রামের এ পাড়ায় ত বাড়ী নয়, কে ওটি ? রূপে যেন কার্ত্তিক ! এই পথে যদি আবার ফেরে; একবার ডাকাইয়া পরিচয় লইব ; সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এইখানেই দাঁড়াইয়া থাকিব।

বেলা তখন তৃতীয় ঘটিকা ; একঘণ্টা পরে নরেশ্বর ফিরিয়া আসিলেন ; সেই পথ ধরিয়াই আসিতেছেন, সেই বাড়ীর নিকটেই দণ্ডায়মান। তখন বারাণ্ডার উপর সেই সুন্দরী সেইখানে। পাঁচ মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিয়াই, উপর দিকে আর একবার চাহিয়াই, নরেশ্বর পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। সবে তিনি বিশপঁচিশপদ অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় পশ্চাত হইতে একটি লোক দ্রুত আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, "বাবু ! একবার ঐ বাড়ীতে আপনাকে আস্‌তে হচ্ছে, আপনাকে ডাক্‌চেন।"

চমকিয়া চাহিয়া নরেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ?"

লোকটি উত্তর করিল, "আমাদের বাবুর মেয়ে।"

স্ত্রীলোক ডাকিতেছে, চেনা নাই, শুনা নাই, এটা কি রকম ! যাই কি, না যাই, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য, নরেশ্বর এরূপ স্থির করিলেন। যে লোকটি ডাকিতে আসিয়াছিল, সে ঐ বাড়ীর দপ্তরখানার সরকার ; ফিরিয়া দাঁড়াইয়া নরেশ্বর সেই সরকারের সহিত সেই বাড়ীর নিকটে আসিলেন, সদর দরজার সম্মুখে দাঁড়াইলেন ; সরকার বলিল, "আসুন !"

অল্প সঙ্কোচে প্রবেশ করিয়া নরেশ্বর সেই সরকারের সহিত উপরে গিয়া উঠিলেন। সুন্দরী ইতিমধ্যে বারাণ্ডা হইতে সরিয়া আসিয়া সম্মুখের একটি সুসজ্জিত কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়াছিল, নরেশ্বরকে সম্মুখে দেখিয়া সম্মানাদরে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কক্ষমধ্যে লইয়া গেল, সরকার নামিয়া আসিল।

কক্ষমধ্যে বাঙ্গালাকেতায় ঢালা বিছানা, সারি সারি তাকিয়া, একধারে মখমল মোড়া একখানি অপ্রশস্ত কৌচ ; বিনম্রমিষ্ট বচনে নরেশকে বসিতে বলিয়া, স্বয়ং উচ্চাসনে বসিবার জন্য ক্ষমা চাহিয়া, সুন্দরী সেই কৌচের উপর পা ঝুলাইয়া বসিল, দুটি তাকিয়া সরাইয়া লইয়া নিচের বিছানায় নরেশ্বর বসিলেন।

শনৈঃ শনৈঃ কথোপকথন আরম্ভ হইল ; সংক্ষেপে নাম গোত্র ও জাতি কুলের পরিচয় হইলে সুন্দরী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি থাকেন কোথায় ! ওদিকে কোথায় গিয়ে ছিলেন ?"

নরে। থাকি কলিকাতায়, গিয়াছিলাম এই গ্রামের হরশঙ্কর বাবুর বাড়ীতে তিনি পূর্ণিয়া জেলায় সদরয়ালা তাঁর কাছে আমি একটি চাকরি চাই।

সুন্দরী। কি তিনি বোল্লেন ?

নরে। তিনি বোল্লেন, কালীপূজার পর তুমি পূর্ণিয়ায় যেও, বিবেচনা করা যাবে।

সুন্দরী। (একটু চিন্তা করিয়া) চেহারায় বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আপনি যেন রাজার ছেলে, আপনাকে চাকরি কোত্তে হবে ?

নরে। পূর্ব্বে আমাদের অবস্থা ভাল ছিল বটে, পিতৃ-বিয়োগের পর আমি গরীব হয়েছি।

সুন্দরী। (পুনরায় চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, আপনাকে চাকরি কোত্তে হবে না ! মাঝে মাঝে এক একদিন আমার সঙ্গে দেখা কর্‌বেন, আমি আপনার অভাব মোচনের উপায় কোত্তে পার্‌ব।

নরে। (উৎসাহে) মাঝে মাঝে কেন, বলেন যদি নিত্যই আমি আস্‌তে পারি।

সুন্দরী। (কুণ্ঠিত ভাবে) আপনি আমারে অত সম্মানে বলেন, করেন, বোল্‌বেন না ; তুমি বোলে সম্ভাষণ কোল্লেই আমি তুষ্ট হব। আচ্ছা, তবে তাই ভাল, অবকাশ কালে নিত্য এক একবার আস্‌বেন, বেশ হবে। আমার সেরেস্তায় অনেক কাজ ; আমারও পিতৃবিয়োগ হয়েচে, তেমন মাতব্বর অভিভাবকও কেহ নাই, সেরেস্তা আম্‌লাদের উপর আপনি কর্ত্তৃত্ব কোর্‌বেন, আপনার যা কিছু আবশ্যক, আমি দিব।

অন্তরে প্রচুর আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া বিনীত ভাবে নরেশ্বর কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। সঙ্কুচিতা হইয়া সুন্দরী বলিল, "ও রকম তোষামোদ আমি ভালবাসি না, আপনি আস্‌বেন। হ্যাঁ,—আর একটি কথা ;—আপনার বিবাহ হয়েচে ?"

নরেশ্বর বলিলেন, "গরীবকে কন্যাদান কোত্তে বড় লোকে রাজী হয় না, সম্বন্ধ কর্‌বারও লোকাভাব, সেই জন্য বিবাহ হয় নাই।"

সুন্দরী বলিল, "হা, বুঝ্‌লেম। আচ্ছা, আপনার নামটি আর একবার বলুন, আমি আমার পাঁজির গায়ে লিখে রাখ্‌ব।"

নরেশ্বর বলিলেন, "আমার পূর্ণ নাম নরেশ্বর মিত্র, ছোটবেলা আর একটি ডাকনাম হয়েছিল বরু। সে নামটি এখন চাপা পড়ে গিয়েছে, আসল নামটির মূল কাটিতে এখন আমার ডাক নাম হয়েছে নরু।"

মৃদু হাসিয়া সুন্দরী বলিল, "বেশ নাম। দুটি নামই আমি লিখে রাখব।"

পূর্ব্বেই উভয়ের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরিচয় হইয়াছিল, শেষকালে আরও দুটি পাঁচটি বাক্য বিনিময়ের পর নরেশ্বর বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সেই প্রথম সাক্ষাতের পর দিন হইতে নরেশ্বর প্রতিদিন সেই সুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎলাভ করিতে আরম্ভ করেন; সেরেস্তার কাজ কর্ম্মের কথা একদিনও উঠে না, অন্য প্রকারের সাংসারিক কথার আলাপে দুই চারি ঘণ্টা কাটিয়া যায়। এইরূপ প্রায় সাতমাস। ক্রমে ক্রমে যুবক যুবতী সুলভ দুই একটি অনুরাগের কথাও ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে বাহির হয়। কৈশোরে পিতৃ মাতৃ হীনা, সেই কারণে কন্যাটি এ পর্য্যন্ত কুমারী অবস্থায় আছে, ইহাও নরেশ্বরের জানা হয়। সাতমাস পূর্ণ হইবার পাঁচদিন বাকি থাকিতে সুন্দরী কিঞ্চিৎ সলজ্জ বচনে নরেশকে জিজ্ঞাসা করে বিলাতে বিবাহের পূর্ব্বে কুমার কুমারীদের নির্জ্জনে যে প্রিয়সম্ভাষণ হয়, ইংরাজীতে সেটাকে কি বলে?"

নরেশ। কোর্টশিপ্।

সুন্দরী। হাঁ কোর্টশিপ্; আপনাতে আমাতে এক রকমে সেই প্রকার কোর্টশিপ্ হয়ে থাকল; আমার কপালে বিধাতা যদি বিবাহ লিখে থাকেন, যদি কখন আমার বিবাহ হয়, তা হলে তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও আমি পতিত্বে বরণ করব না, এই আমার প্রতিজ্ঞা।

সুন্দরীর মুখপানে চাহিয়া নরেশ্বর একটু লজ্জিত হইলেন, শেষ দিনের শেষ শুনিয়া তিনি আর সেখানে অধিকক্ষণ বসিলেন না, শীঘ্র শীঘ্র বিদায় হইলেন। এইখানে বলা থাকুক, এই সাত মাসের মধ্যে সুন্দরীটি দফায় দফায় নরেশ বাবুকে সহস্র মুদ্রা দান করিয়া ছিলেন।

পাঠক মহাশয় বুঝিলেন, সেই সুন্দরীটি আমাদের এই মহালক্ষ্মী। শেষ কথা দিনের কথা শ্রবণ করিয়া অবধি নরেশ্বর দুই মাস কাল মহালক্ষ্মীর সহিত আর সাক্ষাৎ করেন নাই; মহালক্ষ্মী এখন তাঁহার জননীর নিকটে পরিচারিকা হইয়া রহিয়াছে।

"কল্য আসিব" বলিয়া মহালক্ষ্মী প্রথমদিন চলিয়া গিয়াছিল, পরদিন ঠিক সেই সেই অঙ্গিকার পালন করিয়াছিল। তদবধি নিয়মিতরূপে বেশ যত্ন পূর্ব্বক সংসারের কাজ কর্ম্ম করিতেছে গণেশজননী পরম সন্তুষ্ট।

বলা হইয়াছে, নরেশের সহিত মহালক্ষ্মীর দেখা হয়, কথা হয় না। যে রাত্রে উভয়ে রুমাল লইয়া খেলা হইয়াছিল, সেই রাত্রে মহালক্ষ্মী বলিয়াছিল,

"কল্য আসিয়া তোমার হস্তে আমি আত্ম সমর্পণ করিব।" অন্তরে অন্তরে সে অঙ্গিকার পালিত হইয়াছিল, কার্য্যে মিলন হইবার অবসর ঘটে নাই। বৈশাখী পূর্ণিমার পর একমাস গত হইয়া গেল, জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা; সেইদিন গণেশজননী একটি নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। পাঁচুর পিসীর নবজাত দৌহিত্রের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ, পাঁচুর পিসীর সহিত গণেশজননীর অনেক দিনের আলাপ, সে রাত্রে গণেশজননী সেইখানেই যাপন করিবেন, এইরূপ কথা।

রাত্রি চারিদণ্ড, আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয়, দক্ষিণদিক হইতে মৃদু মৃদু বাতাস বহিতেছে, নরেশ্বর আপন শয়ন কক্ষে বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছেন, সম্মুখে একটি উচ্চ ত্রিপদীর উপর সামাদানে বাতি জ্বলিতেছে, নিকটে কেহই নাই। গৃহিণী অনুপস্থিত, সুতরাং স্বামীর মা আজ বড়ই ব্যস্ত; নানা কাজে এঘর ওঘর ছুটা ছুটি করিতেছে, এক একবার দোকানে ছুটিয়া যাইতেছে, একদণ্ড স্থির হইয়া বসিবার অবকাশ নাই।

যে ঘরে নরেশ্বর উপবিষ্ট, একখানি রেকাবে দুটি পাকা আম ও চারিখানি ক্ষিরের বরফি সাজাইয়া, একগ্লাস জল লইয়া মহালক্ষ্মী ধীরে ধীরে সেই ঘরে প্রবেশ করিল, যে চৌকিখানির উপর নরেশের পুস্তকখানি স্থাপিত, সেই চৌকির পায়ার কাছে রেকাব গেলাস নামাইয়া রাখিয়া, যেন কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আমি একটা সেলাই কাজে অন্যমনস্ক ছিলেম, তোমারে জলখাবার দিতে ভুলে গিয়েছিলেম; পড়া এখন রাখো, জল খাও।" এই বলিয়া মৃদুভাষিণী সেই চৌকিখানির সন্নিকটে একখানি আসন পাতিয়া বসিল।

উভয়ের বদনে উভয়ের নয়ন আকৃষ্ট; কেবল নয়ন নয়, উভয়ের হৃদয় মন সমসূত্রে আকৃষ্ট। "জল খাও—জল খাও" বারম্বার এই কথা বলিয়া মহালক্ষ্মী হৃদয়ের আগ্রহ জানাইল, নরেশ্বর কিন্তু সেই জলযোগ সামগ্রী স্পর্শ করিলেন না, পলকশূন্য নয়নে মহালক্ষ্মীর অকলঙ্ক বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার অন্ধকার হৃদয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, হৃদয়ের অমা-রজনীতে সহসা যেন চন্দ্রোদয়।

মনোভাব বুঝিতে পারিয়াও মহালক্ষ্মী তাঁহাকে জল খাইবার অনুরোধ করিতে ছাড়িল না; ছাড়া ছাড়ি কি, নিজেই হাতে করিয়া আম সন্দেশ তাঁহার মুখে তুলিয়া দিল, দ্বারের দিকে একবার চাহিয়া তিনিও একখানি বরফি

মহালক্ষ্মীর চন্দ্রাধরে অর্পণ করিলেন। সহসা তাঁহার মনে কি একটা ধোঁকা আসিল, মহালক্ষ্মীকে তিনি বলিলেন, "ঝি-মাকে একবার এইখানে ডাক।"

শ্যামীর মা তখন দোকান হইতে আসিয়া নরেশকে কিছু বলিবার জন্য সেই ঘরের দিকে আসিতেছিল, ডাকিতে হইল না নিকটে আসিলে নরেশ্বর তাঁহাকে বলিলেন, "আজ আবার আমার মাথাটা ভারি ধরেচে, আজ আবার সেই ডাক্তারখানায় একবার যাও মা, একটু গোলাপ জল আনো।"

শ্যামীর মা বলিল; "সোণামুদী একটী টাকা চাচ্ছে, কি বোল্‌ব।" নরেশ বলিলেন, "বোল্‌তে কিছু হবে না, দাও গে; টাকাটি তাকে দিয়ে অমনি অমনি ডাক্তার খানায় চলে যেও।"

একটি শিশি হাতে করিয়া শ্যামীর মা বাহির হইল, গৃহে রহিলেন, নরেশ আর মহালক্ষ্মী।

দিব্য নির্জ্জন, দিব্য অবসর। কিঞ্চিৎ ম্লান বদনে মহালক্ষ্মী বলিল, "বোধ করি, আমার ভাগ্য ভাল নয়। কিক্ষণে আমার মুখ দিয়ে ইংরাজী কোর্টশিপের কথাটা বেরিয়েছিল, সেই অবধি দু'মাস তুমি আর আমায় দেখা দিলে না! কি অপরাধ আমি করেছি? মনঃপ্রাণ তোমারে চায়, মনের কথাই আমি তোমারে বোলে ছিলেম্, সেই দোষেই কি অদর্শন? তোমার অদর্শনে আমি যে কতকাণ্ড কোরেছি, সে সব কথা আমার মনেই আছে; জন্মে কখন আমি মিথ্যা কথা বলি নাই, তোমারে পাবার জন্য মিথ্যা কথাও বোলেছি! অনেক কথা। সে সব কথা এখন শোনবার কি তোমার সময় হবে।"

বিস্মিত নয়নে চাহিয়া নরেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিথ্যা কথা? কি এত মিথ্যা কথা বলেছ? তোমার কথা শোনবার সময় আমার অনন্ত; সমস্ত রাত শুন্‌লেও ক্লান্তি বোধ হবে না। কি তোমার কথা, শীঘ্র বল, শীঘ্র বল!"

মহালক্ষ্মী বলিল, "সত্যই সব কথা বোল্‌তে রাত্রি প্রভাত হয়ে যাবে, বড় বড় কথাগুলি সংক্ষেপে সংক্ষেপে বলি, মন দিয়ে শোন।"

মহালক্ষ্মী কথা আরম্ভ করিল, পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া নরেশ্বর একমনে শুনিতে লাগিলেন।

একবার উঠিয়া, ঘরের দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া আসিয়া, আবার সেই আসনে বসিয়া, মহালক্ষ্মী বলিতে লাগিল, "আগে তোমার আশ্বাসের কথা বলি; তোমার মনটা বড় উড়ু উড়ু আছে, সেইটে আগে ঠাণ্ডা করি।" এই বলিয়া ধীরে ধীরে করতালি দিয়া, মৃদু মৃদু হাসিয়া, মধুরভাষিণী মধুর স্বরে

আরম্ভ করিল, "সব মিথ্যা! সব মিথ্যা! সব ছলনা! সব ছলনা! তোমার জন্য আমি ছলনা শিখেছি! আমার জমিদারীও যায়নি, বাড়ীও যায়নি, টাকা কড়িও ডাকাতে চুরি করেনি, সত্য আমি কাঙ্গালিনীও হইনি, যা ছিলেম, তাই আমি আছি। দু'মাস তোমার অদর্শনে, আমার প্রতি তোমার অবহেলা অনুমান কোরে, আমি বড় ব্যাকুলা হই, পিসীর বাড়ী যাবার ছল কোরে বাড়ী থেকে আমি বেরুই, কলিকাতায় এসে পাঁচুর পিসীর বাড়ীতে আমি থাকি তোমার জননীকেও সেই কথা আমি বোলেছি। পাঁচুর পিসী আমারও পিসী হয়; পিতার সহোদরা নহে, সম্পর্কে ভগ্নী। পাঁচুর পিসী বেশ বুদ্ধিমতী, আমার উপর তাঁর তারি স্নেহ, যথার্থ হিতৈষিণী; লজ্জাকে একটু খাটো কোরে আগাগোড়া আমাদের সকল কথা তাঁকে খুলে বলি! আরো—এই দুই মাসের মধ্যে লোক মুখে আমি শুনেছিলেন, তোমার মা, অন্য একটি পাত্রীর সঙ্গে তোমার বিবাহ দিবার চেষ্টায় আছেন; পাঁচুর পিসীকে সে কথাও আমি বলি; কি কৌশলে তোমারে আমি পাই, সেই বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। পাঁচুর পিসী আমারে ছলনা শিখায়। আমার সর্ব্বস্ব ডাকাতে লুটে নিয়েচে, আম খেতে পাইনা, পথের ভিখারিণী হয়েচি, তোমার মা একটি রাঁধুনী চান, তাঁর কাছে আমি চাকরি চাইতে আসি, এই ফিকির পাঁচুর পিসী আমারে শিখিয়ে দেয়; তোমার মায়ের কাছে চাকরির জন্য এক পত্র লিখে সুপারিস্ করে; তাই তোমাদের বাড়ীতে আমি দাসী হয়ে রয়েচি। তুমি তিন দিন বাড়ীতে ছিলেনা, পাঁচুর পিসী সে কথা শুনেছিল, সেই তিন দিনের মধ্যে এক দিন আমারে আস্‌তে বোলেছিল, তাই আমি প্রথম দিন এসেছিলেম, তোমার সাক্ষাতে তোমার মায়ের কাছে ছলনা সাজানো কথা বলা হবে না, তুমিও আমারে চিনে ফেল্‌তে, সেই জন্যেই ঐ ফিকির। সব কথা এখন আমি তোমারে বোলে ফেল্‌লেম, এখনকার যা উপায়, এখনকার যা কর্ত্তব্য, সে ভার তোমার উপর।"

আশা, আনন্দ ও বিস্ময়, এই তিন ভাব একসঙ্গে মিলিত হওয়াতে নরেশের চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল, গদ্‌গদস্বরে তিনি বলিলেন, "হৃদয়েশ্বরি! তোমার সকল কথাই সত্য, একদিনের তরেও তোমাকে আমি ভুলি নাই; কোর্টশিপের কথায় আমার লজ্জা হয়েছিল, সেই জন্য নিত্য নিত্য দেখা দিই নাই, দুই মাসের মধ্যে অতি কম পাঁচ সাত দিন তোমার বাড়ীতে আমি গিয়েছিলেম, আমলারা বোলেছিল, তুমি পিসীর বাড়ী গিয়েছ, কাজেই আমি তোমার

ফিরে আস্‌বার অপেক্ষা কোর্‌ছিলেম। যে রাত্রে তুমি কমাল খেলার ছল কোরে ছিলে, সেই রাত্রে তোমার মুখে ডাকাতির কথা শুনে আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আজ মা দুর্গার কৃপায় সব সন্দেহ দূর হয়ে গেল, শুভ মিলনের শুভক্ষণের উদয় হলো, আমি যেন অমরাবতীর সুখ উপভোগ কোর্‌লেম। এখনকার কি কর্ত্তব্য, সেটা অবধারণের ভার আমার উপর রাখ্‌চ, আমি তার কি উপায় কোর্‌তে পারি? উপায় কারিণী তুমি, শান্তি দায়িনী তুমি, তুমিই উপায় কর।"

গাত্রবস্ত্র কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত করিয়া স্মিত বচনে মহালক্ষ্মী বলিলেন, "আমি?—আমি উপায় কোর্‌বো? আচ্ছা, তোমার আদেশ অবশ্য পালন করা কর্ত্তব্য। আজ অতি শুভদিন, শুভ তিথি পূর্ণিমা; এই দেখ, আমার কণ্ঠে কর্ত্তব্য পালনের উপায় গাঁথা।" বলিতে বলিতে কণ্ঠ হইতে একছড়া বকুল আর একছড়া বেলফুলের মালা খুলিয়া, সলজ্জ সহাস্যবদনে সতীলক্ষ্মী সেই দুই ছড়া পুষ্পহার নরেশের গলদেশে অর্পণ করিলেন, শ্লাঘা করিয়া বলিলেন, "আমি স্বয়ম্বরা কন্যা, আজ আমার স্বয়ম্বর, স্বয়ম্বর বিধানে আজ আমাদের এই গান্ধর্ব্ব বিবাহ!

মাল্যগ্রহণ পূর্ব্বক একছড়া খুলিয়া, নরেশ্বর তৎক্ষণাৎ প্রসন্নবদনে প্রণয়িনীর গলদেশে পরাইয়া দিলেন, গান্ধর্ব্ব বিবাহ সুসিদ্ধ হইল। নরেশ্বর একবিংশতি বর্ষীয় যুবা, মহালক্ষ্মী সপ্তদশ বর্ষীয়া যুবতী, রূপে একটি কন্দর্প, একটী রতি, আজ এইখানে রতি-কন্দর্পের শুভ মিলন।

মাল্য বিনিময়ান্তে নরেশের বামদিকে বসিয়া প্রশান্ত বদনে মহালক্ষ্মী বলিলেন, "প্রকাশ্য সভায় অগ্নি ও নারায়ণ সাক্ষী করিয়া শাস্ত্রীয় মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক বিবাহ হইতে পারিত, কিন্তু তোমার জননী এ বিবাহে হয় ত সম্মতি দিতেন না, কেন না, আমি এত বড় হইয়াছি, এতদিন বিবাহ হয় নাই, ইহা হিন্দু সমাজের প্রথা বিরুদ্ধ, তোমার জননী মনে করিতে পারিতেন, আমাদের কুলে হয় ত কোনরূপ খোঁটা আছে, সেই সন্দেহে তাঁহাকে জানাইতে পারা গেল না, প্রকাশ্যরূপে মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ হইল না, কাজেই গান্ধর্ব্ব বিবাহ। বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইহার পর যদি তোমার জননীর সন্তোষ জন্মে, প্রথামতে তখন নূতন প্রকার ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে।" এইবার একটু আরক্ত বদনে উজ্জ্বল হাস্য আনয়ন করিয়া মহালক্ষ্মী বলিলেন, "বর! বিবাহের সময় বরকনে দু'জনেই যৌতুক পায়। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে:—

"মাথায় টোপর দিয়া বসিলা দম্পতী।
কৌতুকে যৌতুক দিলা যতেক যুবতী॥"

আমাদের এখানে কে যৌতুক দিবে? বর তুমি বল, আমিই তোমারে যৌতুক দিব। তোমার জননী প্রভাতে বাড়ীতে প্রত্যাগত হইবার পূর্ব্বেই আমি একবার বাড়ী যাইব, বিংশতি সহস্র মুদ্রা আনিয়া যৌতুক দিয়া তোমার বাড়ীখানি খালাস করিব।

মহানন্দে নরেশ্বরের সমুজ্জ্বল নেত্র-যুগল আনন্দাশ্রু প্রবাহে পরিপ্লুত।

বঙ্কিম-বরণ।*

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ।

খাম্বাজ মিশ্র তেতালা।

(১)

নববঙ্গ কবিতার মধুর কানন,
গুপ্ত করে ব্যক্ত দেখে কাব্যমোদিগণ;
পারিজাত-পরিমলে, প্রস্ফুটিত পুষ্পদলে
মন্দাকিনী-ধারে তুমি করিলে সেচন।
বীণাপাণি জয়-মাল্যে করিলে বরণ;
তোমায় করিল দান রাজ-সিংহাসন।

(২)

এক হস্তে দিব্য তান বীণার বাদন,
অন্য করে শক্তিশেল অমোঘ শাসন।
সাহিত্যের সব্যসাচী, শিষ্যে তব পদ যাচি,
যশের মন্দিরে সুখে করিল গমন।
সাহিত্যের রাজসূয় তোমার সাধন,
জীবনের মহাব্রত পূর্ণ উদ্‌যাপন।

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে বঙ্কিমচন্দ্রের মর্ম্মর-মূর্ত্তি স্থাপন উপলক্ষে।

(৩)

জন্মভূমি পদ তুমি, করিয়া শরণ,
নবমন্ত্রে ঋষিরূপে কর উচ্চারণ।
দেশ দশভুজা চিত্র, বরণীয় সুপবিত্র,
ত্রিদিব আভায় তোষে সবার নয়ন।
গীতার নিষ্কামধর্ম্ম, নমি নারায়ণ,
সকলে প্রথম দেব করাও শ্রবণ।

কোষ্ঠী-শিক্ষা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত পশুপতি সরকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্থাধিপতি।

চতুর্থাধিপতি মাতৃস্থানে থাকিলে জাতক মন্ত্রণাকুশল, ধনবান, চতুর, সুশীল, মানী, রমণীপ্রিয় ও সুখী হয়।

চতুর্থাধিপতি পুত্র বা ভাগ্যস্থানে থাকিলে জাতক সুখী, লোকপ্রিয়, বিষ্ণুভক্ত, মানী ও উপার্জ্জনশীল হয়।

চতুর্থাধিপতি শত্রুগৃহে থাকিলে জাতক বহু মাতাযুক্ত, ক্রোধী, চৌর, যথেচ্ছাচারী ও দুষ্টচিত্ত হয়।

চতুর্থাধিপতি তনু ও পত্নীস্থানে থাকিলে জাতক বিদ্বান, পিতৃধন ত্যাগশীল, সভায় মূকবৎ হয়।

চতুর্থাধিপতি ব্যয় বা মৃত্যুস্থানে থাকিলে জাতক সুখহীন, জারজ বা ক্লীব হয়।

চতুর্থাধিপতি কর্ম্মস্থানে থাকিলে জাতক নিত্যরোগী, উদার স্বভাব বিশিষ্ট, গুণবান, দাতা ও নিজহস্তে উপার্জ্জনশীল হয়।

চতুর্থাধিপতি ধনস্থানে থাকিলে জাতক সর্ব্বসম্পদযুক্ত, শ্রীমান, সাহসী, কুহকী, বহু কুটুম্বযুক্ত ও ভোগী হয়।

পঞ্চমাধিপতি।

পঞ্চমাধিপতি পুত্রস্থানে থাকিলে জাতক পুত্রহীন চঞ্চলমতি বিশিষ্ট, ক্রুরভাষী, ধার্ম্মিক ও বুদ্ধিমান হয়।

পঞ্চমাধিপতি শত্রু বা ব্যয় স্থানে থাকিলে জাতকের পুত্র শত্রুতা করে।

পঞ্চমাধিপতি কর্ম্মস্থানে থাকিলে জাতক সর্ব্বধর্ম্মবিৎ, দীর্ঘকায়, প্রভু ও ভক্তিমান হয়।

পঞ্চমাধিপতি মৃত্যু বা ধনস্থানে থাকিলে জাতক পুত্রস্থান, শ্বাসকাসের পীড়াযুক্ত, সুখহীন, ক্রোধী ও ধনবান হয়।

পঞ্চমাধিপতি ভাগ্যস্থানে থাকিলে জাতক সুপুত্রযুক্ত, কবি, লোকবিখ্যাত ও কুলপাবক হয়।

পঞ্চমাধিপতি আয়স্থানে থাকিলে জাতক পণ্ডিত, লোকপ্রিয়, গ্রন্থকার, দক্ষ, বহুপুত্রের পিতা ও ধনবান হয়।

পঞ্চমাধিপতি তনু বা ভ্রাতৃস্থানে থাকিলে জাতক খল ও কৃপণ হয়।

পঞ্চমাধিপতি মাতৃস্থানে থাকিলে জাতক লক্ষ্মীমান, সুবুদ্ধিযুক্ত ও মন্ত্রণাপটু হয়। জাতকের মাতা চির সুখিনী হয়।

ষষ্ঠাধিপতি।

ষষ্ঠাধিপতি শত্রুস্থানে থাকিলে জাতক যানবাহনযুক্ত ও লোকপ্রিয় হয়। কিন্তু জাতকের জ্ঞাতিগণ শত্রুতা করে।

ষষ্ঠাধিপতি আয় বা পত্নীস্থানে থাকিলে জাতক যশস্বী ও ধনবান হয়।

ষষ্ঠাধিপতি তনুস্থানে থাকিলে জাতক গুণবান, মানী, সাহসী ও পুত্রহীন হয়।

ষষ্ঠাধিপতি মৃত্যু বা ব্যয়স্থানে থাকিলে জাতক রোগী, পণ্ডিতগণের শত্রু, পরদাররত ও জীবহিংসা তৎপর হয়।

ষষ্ঠাধিপতি ভাগ্যস্থানে থাকিলে জাতক কাষ্ঠ প্রস্তর বিক্রয়কারী এবং ব্যবসাতে কখনও বা লাভ ও কখনও বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ষষ্ঠাধিপতি কর্ম্ম বা ধনস্থানে থাকিলে জাতক কুলপ্রধান, প্রবাসী, সুখী, বক্তা ও নিষ্ঠাবান হয়।

ষষ্ঠাধিপতি ভ্রাতা বা মাতৃস্থানে থাকিলে জাতক ক্রোধী, মনস্বী; খল, হিংস্রক চঞ্চলচিত্ত ও ধনবান হয়।

ষষ্ঠাধিপতি পুত্রস্থানে থাকিলে জাতক দয়ালু, সুখী, সৌম্য, মহৎ ও চতুর হয়। এই জাতকের ধন বন্ধু ক্ষণস্থায়ী।

সপ্তমাধিপতি।

সপ্তমাধিপতি তনু স্থানে থাকিলে জাতক পরস্ত্রীগামী, লম্পট, ভোগী, বিচক্ষণ, ধীর, শোকসন্তপ্ত ও রতি পীড়িত হয়।

সপ্তমাধিপতি মৃত্যু বা শত্রু স্থানে থাকিলে জাতক রোগিনী, ক্রোধযুক্তা, কুচরিত্রা স্ত্রীলাভ করে। এবং স্ত্রীসুখহীন হয়।

সপ্তমাধিপতি ভাগ্য বা ধন স্থানে থাকিলে জাতক বহুস্ত্রীর পতি, দীর্ঘসূত্রী ও স্ত্রীলোলুপ হয়।

সপ্তমাধিপতি কর্ম্ম বা মাতৃ স্থানে থাকিলে জাতক ধার্ম্মিক, সত্যবাদী ও দন্তরোগা হয় কিন্তু ইহার স্ত্রী পতিব্রতা হয় না।

সপ্তমাধিপতি ভ্রাতা বা আয় স্থানে থাকিলে জাতক পুত্রহীন হয়। শাস্ত্র বিহীত কর্ম্ম করিলে পুত্র জীবিত থাকে।

সপ্তমাধিপতি পত্নী স্থানে থাকিলে জাতক দরিদ্র, কৃপণ, উচ্চমনা, সুশ্রী কন্যা যুক্ত, বস্ত্রজীবী ও ধনহীন হয়।

সপ্তমাধিপতি মাতৃ স্থানে থাকিলে জাতক গুণী, মানী, ধনী ও সদানন্দ হয়।

অষ্টমাধিপতি।

অষ্টমাধিপতি তনু বা পত্নী স্থানে থাকিলে জাতক দেবদ্বেষী, নিত্যব্রণরোগী ও দুই স্ত্রীযুক্ত হয়।

অষ্টমাধিপতি ধন স্থানে থাকিলে জাতক অল্প ধনী, বিত্ত ও বাহুবল হীন হয়।

অষ্টমাধিপতি মাতৃ বা কর্ম্ম স্থানে জাতক ক্রূর, বন্ধুহীন, ভীত ও মাতা পিতাহীন হয়।

অষ্টমাধিপতি পুত্র বা আয় স্থানে থাকিলে জাতক বুদ্ধি ও ধন হীন এবং স্থির বুদ্ধি বিশিষ্ট হয়।

অষ্টমাধিপতি শত্রু বা ব্যয় স্থানে থাকিলে জাতক নিত্যরোগী, জল বা সর্প হইতে ভীত হয়।

অষ্টমাধিপতি মৃত্যু স্থানে থাকিলে জাতক দ্যূতক্রীড়াসক্ত, চৌর, মিথ্যাবাদী ও গুরুনিন্দায় তৎপর হয়।

অষ্টমাধিপতি ভাগ্য স্থানে থাকিলে জাতক পাপী, নাস্তিক, পুত্রহীন এবং পরস্ত্রী ও পরধনে লোভী হয়।

নবমাধিপতি।

নবমাধিপতি ভাগ্য স্থানে থাকিলে জাতক ধনী, গুণী, সুন্দর ও ভ্রাতৃসুখ প্রাপ্ত হয়।

নবমাধিপতি মাতৃ বা কর্ম্ম স্থানে থাকিলে জাতক মন্ত্রী বা সেনাপতি, পুণ্যবান, বাগ্মী, সাহসী ও ক্রোধহীন হয়।

নবমাধিপতি পুত্র বা আয় স্থানে থাকিলে জাতক ভাগ্যবান, লোকপ্রিয়, বিদ্বান, মানী, ধীর ও সৌন্দর্য্যগুণ সম্পন্ন হয়।

নবমাধিপতি মৃত্যু বা ব্যয় স্থানে থাকিলে জাতক ভাগ্যহীন হয়। তাহার মাতুল বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃসুখ থাকে না।

নবমাধিপতি তনু বা পত্নী স্থানে থাকিলে জাতক গুণবান, লোকপূজ্য ও বিফল মনোরথ হয়।

নবমাধিপতি ধন বা ভ্রাতৃ স্থানে থাকিলে জাতক ধনবান, গুণবান, জ্ঞানী, পণ্ডিত, লোকপ্রিয় ও ভাগ্যচিন্তাকারী হয়।

নবমাধিপতি শত্রু স্থানে থাকিলে জাতক নিদ্রালু, অলস, ধর্ম্মকর্ম্মহীন ও রোগ দ্বারা প্রপীড়িত হয়।

দশমাধিপতি।

দশমাধিপতি তনু স্থানে থাকিলে জাতক কবি, শৈশবে রোগ পীড়িত, ধনবান ও সুখী হয়।

দশমাধিপতি ধন পুত্র বা ভ্রাতৃ স্থানে থাকিলে জাতক মনস্বী, গুণবান, বক্তা ও সত্যধর্ম্ম সমন্বিত হয়।

দশমাধিপতি মাতৃ বা কর্ম্ম স্থানে থাকিলে জাতক জ্ঞানবান, সুখী, ধনবান, দেব ও গুরুভক্ত, ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী হয়।

দশমাধিপতি পত্নী বা আয় স্থানে থাকিলে জাতক ধনপুত্রবান, সুন্দরী স্ত্রীযুক্ত; আনন্দিত, সুখী ও সত্যবাদি হয়।

দশমাধিপতি শত্রু বা ব্যয় স্থানে থাকিলে জাতক শত্রু পীড়িত, চতুর ও সুখহীন হয়।

দশমাধিপতি ভাগ্য স্থানে থাকিলে জাতক নৃপতি সদৃশ ভাগ্যবান ও সুখী হয়।

ক্রমশঃ

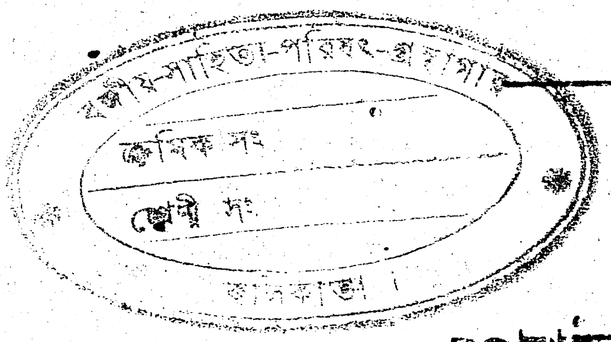

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

শ্যামা-মা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—প্রান্তর; সময়—অমাবস্যার মহানিশা।

(একদিক হইতে কর্ম্ম ও অপর দিক হইতে জ্ঞানের প্রবেশ।)

জ্ঞান। (কর্ম্মের প্রতি) "নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো—
বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি।"

কর্ম্ম। নমো নমো মহাত্মন্!
ক্রীতদাস আমি তব,—
ত্রিলোকের কিঙ্কর অধম।
শ্রেষ্ঠ তুমি হে চিন্ময়!
গায় গুণ গোলোকের পতি,—
জ্ঞান গতি, জ্ঞান মুক্তি,
ত্রিলোক পাবন।

জ্ঞান। নিজ গুণে কহ সনাতন!

(নেপথ্যে গীত।)

হাম্বীর—ঢিমে তেতালা।

ওরে মূঢ় মন! ভাব অকারণ,
সময় পেয়েছ ভাল,—
ভজ ভক্তিভ'রে শ্যামা শ্রীচরণ॥

কর্ম্ম। সত্য মিথ্যা কর' দরশন,—
সাধক সম্প্রদ অহ,—
লভি তব অপার করুণা
নশ্বর সংসার সুখে
হাসি মুখে দিয়ে জলাঞ্জলি,
কুতূহলী হ'য়ে কত'
অবিরত ইষ্ট নাম করিছে কীর্ত্তন।

(নেপথ্যে গীত।)

ত্যাজি বৃথা ভাবনা,
কালীপদ ভাবনা,
ঘুচিবে ভব যাতনা,
সফল হবে জীবন॥

জ্ঞান। কালী তত্ত্বে মত্ত ভক্তরাজ,
মূল নাম জ্ঞান,
পূর্ণানন্দে পূর্ণ নিরন্তর।

(নেপথ্যে গীত।)

যদি চাহ তরিতে
কালী বল ত্বরিতে,
শ্রীকালী পদ তরিতে
স'পরে আপন॥

কর্ম্ম। আনন্দ বারিধি হৃদে
উথলিল হেরি সুধীবরে।

জ্ঞান। এ আনন্দ মূলাধার তুমি কর্ম্মদেব!
উত্তাল তরঙ্গ পূর্ণ—
এ অপার ভব পারাবার

'তরিবার আশা যার প্রাণে
সে যদি অনন্য মনে
লয় তব বারেক আশ্রয়,
পূর্ণানন্দে পূর্ণ সে আপনি,
তানে তানে আনন্দ বিলায়
হেলায় চরমে যায় নিত্যানন্দ পুরে।
তোমারি কৃপায়,
নরনারী ভাসিতেছে নিত্যানন্দ নীরে,
নিত্যধাম আঁচরে লভিবে।
আসে এই ভিতে ;—
চল যাই,—
অন্তরালে থাকি দোঁহে
ভক্ত মুখে শুনি কালীনাম।

কর্ম্ম। চল মহাশয়!
কিন্তু মোর বাসনা অন্তরে
পরীক্ষায় বুঝিবারে সাধকের মন।
ছদ্মবেশে—
শত্রুভাবে বাদে হ'ব রত,
দেখি কিবা প্রকাশে ভাষায়।

জ্ঞান। ইচ্ছাময়, ইচ্ছা তব হউক পূরণ।

উভয়ের প্রস্থান

(পূর্ব্ব গীতটী গাহিতে গাহিতে একদিক দিয়া সাধকের প্রবেশ
অপর দিক হইতে দস্যুবেশে কর্ম্মের প্রবেশ।)

কর্ম্ম। কে রে তুই বিজন প্রান্তরে একা ?
ঘোর অমানিশা,—
নিশাচর আঁধারে আহত
কোথা যাস্ মোর করে এড়া'য়ে এখন ?
ছাড়্ মূঢ়, প্রাণের মমতা তোর।

সাধক। কে তুমি গো—কে তুমি গো,—
তুমি কি গো প্রাণময়ী শ্যামা মা আমার ?

তাই মোর প্রাণে এত মমতা তোমার ?
কি সুন্দর! কি সুন্দর!
মরি কিবা নীলদ বরণ,
কমল নয়ন,
সর্ব্ব অঙ্গ করুণা জড়িত!
বল,—বল,—
কে তুমি গো দাঁড়ায়ে হেথায় ?

কর্ম্ম। যেবা হই আমি,
পরিচয়ে কিবা প্রয়োজন!
জীবন বাঁচাতে যদি সাধ,
ধন-রত্ন যা' আছে রে কাছে,
দিয়ে মোরে
যাও ত্বরা নিজগৃহে ফিরি।
কেন মিছে
দস্যু করে বিঘোরে হারাবি প্রাণ ?

সাধক। প্রাণ ?—প্রাণ ?—কোথা প্রাণ ?
আছে কিরে জীবন আমার ?
নিদারুণ রিপু অত্যাচারে
বহুদিন প্রাণ শূন্য আমি।
বিকলাঙ্গ এ দেহ আমার!
গৃহে ফিরে যেতে বল মোরে ?
আহা আহা,—
গৃহ মোর শ্যামার চরণ,
জন্ম জন্মভূমি,—
স্বর্গাদপি গরীয়সী শ্যামা মা আমার
ওহো, ওহো—
বহুদিন,—বহুদিন হ'ল,
চলে গেল যুগ যুগান্তর—
এসেছিরে ছেড়ে সেই পুণ্য জন্মভূমি!
অতুল—অমূল্য ধনে

পরিপূর্ণ গৃহ সে আমার!
জানি না—কি সুখ আশে,
হায় কোন্ কর্ম্মের উদ্দেশে,
অবতেলি সে পবিত্র ধাম,
যাত্রা ক'রে বাহিরিনু যবে,
সেই হ'তে
কাম, ক্রোধ সাথে সাথে ফেরে।
দারুণ প্রহারে,
জর্জ্জরিত করে নিরন্তর।
ওগো—ওগো,—
ত্বড়'সাধ ঘরে ফিরে যেতে,
কিন্তু হায় প্রাণশূন্য আমি'
কোন্ পথে
কেমনে ফিরিব ঘরে আর,
কি করি—কি করি,
মোহ করে এড়া'তে যে নারি!
দিশে হারা হ'য়ে
ঘুরে মরি প্রান্তরে প্রান্তরে।
চলেনা চরণ,—
অন্ধকার হেরি চারিধারে!
মা! মা! কোথা মা আমার!
ওগো, ওগো,—জান যদি,
কৃপাকরি ব'লে দাও মোরে
কোন্ পথে গেলে,—
পাব দেখা জননী শ্যামার।

কর্ম্ম। যাও এ—ই পথে,—
পা'বে তুমি শ্যামার শরণ!

সাধক। ভক্তিভরে নমি তব পায়।

গীত।

ওরে রে ভ্রমর মন!
তারাপদ শতদলে ভ্রম'রে ভ্রম রে॥
বিষয়-কেতকী ফুল,
পাপ-রেণু সমাকুল,
তাহে কেন প্রাণাকুল কর রে কর রে॥
তারা সুধা করি পান,
তারায় ধরি তারা তান,
সুতারে গাও তারা গান মনরে মনরে॥

প্রস্থান।

(জ্ঞানের প্রবেশ)

জ্ঞান। সাধকের মনোভাব বুঝিলে কেমন?

কর্ম্ম। সদাত্ম প্রখর!
পবিত্র আলোকে তব
আলোকিত অন্তর যাহার,
কি সাধ্য আমার—
পরীক্ষায় পরাস্ত করিব তারে,
পরাজিত আমি দেব!
গুণাকর, জ্ঞানের সাগর,
শ্যামাপদে স'পেছে জীবন।
নাহি মানে সম্পদ বিপদ,
ক্রোধ হিংসা করেছে বর্জ্জন,
নির্ভয় হৃদয়
চিদানন্দে মগ্ন অনুক্ষণ

জ্ঞান। চল ত্বরা—
চল যাই ভক্তের পশ্চাতে,
আমি পুনঃ শত্রুভাবে
ল'ব আজি পরীক্ষা তাহার।
নিন্দাচ্ছলে শ্যামারূপ বর্ণিব সাক্ষাতে।
শুনি তার মর্ম্ম কথা প্রকাশে কি ভাবে।

উভয়ের প্রস্থান

(গাহিতে গাহিতে আনন্দ ভৈরবের প্রবেশ।)

প্রেমের প্রাণটী রহে কি প্রাণে গো—
মনটী রহে কি মনে ॥
হইলে পাগল বিকল বিতল
ছোটে প্রাণ বঁধু পানে গো,—
ছোটে প্রাণ বঁধু পানে ॥
ল'য়ে কত আশা কত সাধ,
কত সোহাগ অনুরাগ প্রাণে।
কত ভালবাসা বাসি
নীরবের হাসি,
চলে যায় আন মনে গো,—
চ'লে যায় আন মনে ॥
নাহি মানে মানা
কাহারো সে
কোনো কথা নাহি শুনে,
যেন জোয়ারেরি জল,
উছল উছল,
ভেসে যায় টানে টানে গো,
ভেসে যায় টানে টানে ॥ প্রস্থান।

ইতি প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সমালোচনা।

স্ত্রীলোকদিগের আহ্নিক-কৃত্য।—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ স্মৃতি-রত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য চারি আনা মাত্র।

হিন্দু রমণীগণের ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে অথবা অব্যবহিত পরেই নিত্য সন্ধ্যাবন্দনা আহ্নিকাদি শিক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য, কিন্তু গৃহস্থ সংসারে সচরাচর তাহা ঘটিয়া উঠে না; কারণ বালক বালিকাগণের লালন পালন, গুরুজনদিগের সেবা শুশ্রূষা ও সংসারের নানা গৃহকর্ম্মে স্ত্রীলোকদিগের এতই নিযুক্ত থাকিতে হয় যে, ইষ্টদেবতার নিকটে আহ্নিকাদি শিক্ষা করা অবসর সাপেক্ষ বলিয়া হিন্দু রমণীর ঐকান্তিক ইচ্ছা সত্ত্বেও ঘটিয়া উঠে না। ধর্ম্মানুষ্ঠানের অভাব অনেকেই অনুভব করিয়া থাকেন, বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুর আহ্নিক পূজা পদ্ধতি শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কেবল মাত্র স্ত্রীলোকদিগের সম্পূর্ণ উপযোগী নহে; অতএব এই "স্ত্রীলোকদিগের আহ্নিক-কৃত্য" নামক পুস্তকখানি কেবল মাত্র হিন্দু রমণীগণের বিশেষ অভাব দূর করিবে, এরূপ ভরসা করা যায়। আমরা এই পুস্তকখানি আনুষ্ঠানিক হিন্দুর অন্তঃপুর মধ্যে বহুল প্রচার কামনা করি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

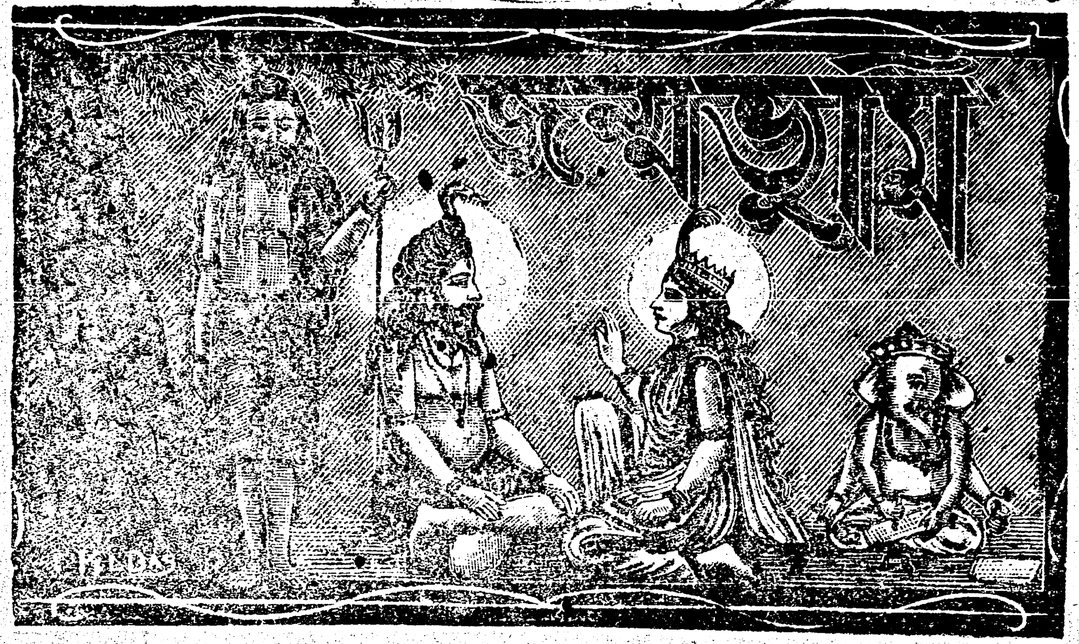

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

২৮-শ, বর্ষ। ১৩২৯ সাল, আষাঢ়। ৩য়, সংখ্যা।

চণ্ডীকথা।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ, বিরচিত।

(১)

স্বারোচিষ মন্বন্তর, পুণ্য চৈত্রবংশধর,
সুরথেরে সকলে পূজিত।
স্বপুরে স্বজন দল, হরিল সম্পদ বল,
মেধসের হইল আশ্রিত ॥
সমাধি বৈশ্যের নাম, বিচ্যুত আপন ধাম,
বেদনায় সুরথ সমান। ॥

সেই পুণ্য তপোবনে, আসিল দুঃখিত মনে,
মুনি কাছে পাইলেন জ্ঞান ॥
"সদাই মমতাবর্ত্তে, নিপাতিত মোহ গর্ত্তে,
সংসারের স্থিতি হেতু নর।
যোগনিদ্রা মহামায়া, মোহিছে জগত কায়া,
তাহে মুগ্ধ বিশ্ব চরাচর ॥"
জিজ্ঞাসেন বৈশ্য ভূপ, কেমন তাঁহার রূপ,
কেন হয় আবির্ভাব যাঁর।
ঋষি কহে, নিত্যা তিনি, তথাপি অসুর জিনি,
কার্য্য সিদ্ধি করে দেবতার ॥

(২)

ব্রহ্মার কল্পান্ত দিন, যোগনিদ্রা সমাসীন,
মহার্ণবে সুপ্ত লক্ষ্মীপতি।
অসুর মধু-কৈটভ, বিষ্ণু কর্ণমূলোদ্ভব,
নাভিপদ্মে, স্থিত প্রজাপতি ॥
ব্যাদান করিয়া মুখ, বিনাশিতে চতুর্মুখ,
ধাবমান অসুর ভীষণ।
বিপদে জাগাতে হরি, হরিনেত্র অধিশ্বরী,
ব্রহ্মা, স্তুতি করিল তখন ॥
"স্বাহা তুমি, স্বধা তুমি, প্রণবের মাত্রা তুমি,
সৃষ্টি স্থিতি সংহার কারণ।
মহাবিদ্যা মহামায়া, সকলি তোমার ছায়া,
গুণময়ী প্রকৃতি পালন ॥"
বিষ্ণুদেহ হতে মায়া, লইলেন নিজকায়া,
অবস্থিত ব্রহ্মার নয়নে।

তখন জাগিয়া হরি, বিনাশ করিল অরি,
জলশূন্য আপন জঘনে ॥

(৩)

মহিষা সুরের সনে, যুদ্ধ করি দেবগণে,
হইলেন যবে পরাজিত।
পদ্মযোনি সঙ্গে করি, ইন্দ্রাদি অসুর অরি,
শিব বিষ্ণু স্থানে উপনীত ॥
শুনি সব বিবরণ, ভ্রূকুটি কুটিলানন,
ব্রহ্মা শম্ভু বিষ্ণু সেইক্ষণ।
তাঁহাদের তেজরাশি, দেবাদির তেজে আসি,
নারীরূপ করিল ধারণ ॥
মুখ, শম্ভু তেজে হয়, বিষ্ণুতেজে বাহুচয়,
ব্রহ্মা তেজে পদ বিরচিত।
অন্য যত অবয়ব, অন্য দেব সমুদ্ভব,
পুণ্য তেজে, হইল গঠিত ॥
নিজ শূল, মহেশ্বর, সুদর্শন, চক্রধর,
কমণ্ডলু, ব্রহ্মা করে দান।
ইন্দ্র আদি দেব যত, আয়ুধ ভূষণ কত,
সমর্পিল করিতে সম্মান ॥

(৪)

অমরে করিতে দয়া, সে সিংহ-বাহিনী জয়া,
মহাসুরে করে আক্রমণ।
অম্বিকার ক্রুদ্ধ শ্বাসে, সহস্র প্রমথ আসে,
সবে মিলে করে মহারণ ॥

চণ্ডিকার মহাক্রোধ, না পারি করিতে রোধ,
হত প্রাণ মহিষ অসুর।
নিহত অসুর সব, শুক্রাদি মধুর স্তব,
দেবী পদে করিল প্রচুর ॥
"নিশেষ দেবের শক্তি, করে দেহে নিবসতি,
ভক্তি নত আমরা সকলে।
প্রসন্না হইলে তুমি, প্রসন্না জগত ভূমি,
কোপে নষ্ট শত্রুকুল দলে ॥"
স্তবে তুষ্ট হন অতি, ভদ্রকালী ভগবতী,
চাহিলেন বর দেবগণ।
"স্মরিব তোমারে যবে, নাশিও বিপদ সবে",
দেবী কহে 'তথাস্তু' বচন ॥

ক্রমশঃ

সাধক-কমলাকান্ত।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্মশান খড়ী নদীর তীরে, দেবী বিশালাক্ষীর অনতিদূরে। সাধক শ্মশান-কোলে বসিয়া দেবী বিশালাক্ষীর মন্দিরের দিকে দৃষ্টি করিয়া শূন্যমনে কি ভাবিতেছেন, ভাবিতে ভাবিতে বালকের ন্যায় কাঁদিলেন। কাঁদিলেন কেন? বোধ হয় মন্দিরস্থিত তপস্যা দ্বারা মায়ের জাগরিত মূর্ত্তি সাধকের মনে পড়িল। মানব মহাদুঃখে পরম আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাতে মনোবেগ সম্বরণ করিতে পারে না, আত্মীয়ের দুঃখ মোচনের ক্ষমতা না থাকিলেও দুঃখের ভার লইয়া আত্মীয় স্বজন শোকের লাঘব করে। সাধকের জগতের মধ্যে পরমাত্মীয় জগদম্বা,

একমাত্র ভালবাসার পাত্র, দেবী বিশালাক্ষীর পদপ্রান্তে বসিয়া অনেক মনের কথা বলিতেন, তাই আজ তাঁহার স্মরণেও দর্শনে শোকের উচ্ছ্বাস উঠিল। শোকে, দুঃখে, আপদে, বিপদে, সুখে, সম্পদে যাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া মনের কথা বলা যায়, তিনি ভিন্ন এ জগতে আপনার কে হইতে পারে। সাধক-পত্নীর মৃতদেহ চিতায় স্থাপিত হইল। সাধক চারিদিকে শ্মশানরঙ্গিণীর নৃত্য দর্শন করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, শ্মশানই আমার পরম রমণীয় শান্তির স্থান। আমার মা শ্মশানবাসিনী, বাবা মৃত্যুঞ্জয় শ্মশানবাসী। আমার গর্ভধারিণী এই শ্মশানে চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন। পত্নীও এই শ্মশানের কোলে শয়ন করিল। একে সাধকের স্বতই বৈরাগ্য, মানব মাত্রেরই শ্মশানে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তাই এই মহাদুঃখে সাধকের সহাস্য বদন, যেন কোন রমণীয় স্থানে উপস্থিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় সুখশান্তি ভোগ করিতেছেন। সংকারের উপযোগী দ্রব্যাদি আনীত হইতে লাগিল। সাধক শ্মশান কোলে বসিয়া প্রসন্ন মনে ভাবিতেছেন, "মানুষ মাত্রেই চরমে এই শ্মশানকে আশ্রয় করে। এখানে অভিমান নাই, অহঙ্কার নাই, ধনমদ নাই, জাতি বিচার নাই, তবে কি ইহা স্বর্গ, পূর্ণানন্দময়ী যথা নৃত্য করেন, তাহা স্বর্গ অপেক্ষাও বাঞ্ছনীয়। শ্মশানই সাধনার প্রশস্থ স্থান। এখানে সংসারের ঘৃণা, দ্বেষ, আশা, ভরসা, মায়া মোহ, আচার, বিচার সব ধ্বংশ হইয়া অঙ্গাররূপে পরিণত হয়। এখানে আসিয়া বসিলেও স্বরূপ মনকে ব্যথিত করিতে পারে না, কাজেই চিত্ত শুদ্ধ হয়, প্রেম আইসে, আনন্দ আইসে, হৃদয়ে আনন্দময়ীর আবির্ভাব হয়, [illegible] হয়। চিন্ময়ী চিন্তাপুরে উদয় হন, জীবাত্মার সহিত মিলিত হন, পরমাত্মা ও পূর্ণানন্দময়ী এক হন।" মুখাগ্নির জন্য সাধককে আহ্বান করা হইল। তিনি মুখাগ্নি প্রদান করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে গাহিতে লাগিলেন :—

কালি! সব ঘুচালি লেঠা।
শ্রীনাথের বচন, আছে যেমন, রাখ্‌বি কিনা রাখ্‌বি সেটা ॥
তোমার যারে কৃপা হয় তার সৃষ্টিছাড়া রূপের ছটা।
তার কটিতে কৌপিন যোটেনা, গায়ে ছাই আর মাথায় জটা ॥
শ্মশান পেলে সুখে ভাসে, তুচ্ছ ভাবে মণি কোঠা।
আপনি যেমন ঠাকুর তেমন, ঘুচ্‌লো না তার সিদ্ধি ঘোটা ॥

দুখে রাখ, সুখে রাখ, করবো কি আর দিয়ে খোঁটা।
আমি দাগ দিয়ে পরেছি আর পুঁছতে কি পারি সাধের ফোঁটা॥
জগত জুড়ে নাম দিয়েছ, কমলাকান্ত কালীর বেটা।
এখন মায়ে পোয়ে কেমন ব্যাভার, ইহার মর্ম্ম জান্‌বে কেটা॥

চিতাগ্নি মধ্যে জগদম্বার আবির্ভাব দেখিয়া সাধক চিতার চারিপার্শ্বে নৃত্য করিতে করিতে করযোড়ে সঙ্গীতস্বরে কহিতেছেন, "মা আমার সংসারের সম্বন্ধ ছিন্ন করিলে, এখন শিববাক্য সত্য হ'ক। মা আমাকে কৌপীন দাও, ভস্ম দাও, মাথায় জটা দাও, সৃষ্টিছাড়ারূপে সাজাও। মা! লক্ষপতির প্রাসাদ অপেক্ষাও এই শ্মশান যেন আমার প্রিয়তম বোধ হয়। আমাকে সচ্চিদানন্দ ভাব দাও, আমার জীবন যেন জগতের মঙ্গলকার্য্যে ব্রতী হয়। মা আমি যে সুখ দুঃখ সমান বোধ করি। আমার কপাল মাঝে কালী নামের দাগ উঠেছে, দেখো যেন মা এ দাগ পুঁছে দিও না। যা দেশময় রব তুলেছ কমলাকান্ত মায়ের বেটা। তুমি মায়ের মত মা হও, স্নেহ মমতা ছেড়োনা, আমাকে ভক্তি দাও, যেন উপযুক্ত সন্তান হ'তে পারি।"

শবদাহকারীরা বিস্মৃত হইয়া আনন্দনৃত্য দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "এরূপ লোকের সংসারী হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। ইনি সর্ব্বদুঃখহরা সিদ্ধেশ্বরীর নিতান্ত আশ্রয় লইয়াছেন, তাই কৃপাময়ী ইহাকে মায়াজাল হইতে মুক্ত করিয়া পরিণামের পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। পুনর্ব্বার ইহাঁর বিবাহ দিয়া ইহাকে সংসারী করিবার চেষ্টা করা বিফল। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। হরিধ্বনি পূর্ব্বক সকলে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। হরিনাম উচ্চারণে মনের ময়লা থাকেনা। শববাহীরা পুনঃ পুনঃ হরিবল হরিবল শব্দে গ্রাম প্রবেশ পূর্ব্বক গ্রামবাসীদিগের মনে সকল বস্তুর অনিত্যতা উৎপাদন ও সাধকের সাংসারিক অবস্থা স্মরণ করাইয়া তাহাদিগকে ব্যথিত করিল। সাধক যথাবিধি শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া পত্নীগ্রহণ সময়ের অঙ্গীকার হইতে মুক্তিলাভ করিলেন; ভ্রাতৃ হস্তে সংসারের ভার সমর্পণ করিয়া সর্ব্বদাই পরমার্থ চিন্তায় রত হইলেন। মাতৃ আজ্ঞা স্মরণ করিয়া দেশ ত্যাগ করিলেন না।

পঞ্চম অংশ।

মনের মত মন হওয়া বড় সৌভাগ্যের বিষয়। সৎসঙ্গ ও সদালাপ মনে করিলেই ঘটে না, পঞ্চভূত আছে, দেহ আছে, মন আছে, মায়া আছে, তারপ

আত্মা। আত্মা পরমেশ্বরের অংশ। মায়া তাঁহার ইচ্ছা বা সংসার স্থাপনের যন্ত্র। প্রকৃতি ও মায়ার সম্মিলনে এ বিশ্ব কার্য্যকর হইয়া চলিতেছে। স্নেহ, মমতা, অহঙ্কার, ঐশ্বর্য্য বাসনা, উৎপাদিকাশক্তি এই সকল ধর্ম্ম মায়ার। যে প্রকৃতিতে মায়ার জমাট বেশী থাকে, তাহাকে মায়া সংসারে চির সংশ্লিষ্ট করিয়া রাখেন। পঞ্চভূতের বশীভূত করিয়া রাখে। মানব-মন মায়ার বশবর্ত্তী হইলে আত্মার সহিত তাহার নির্ম্মলদৃষ্টি ঘটে না। মায়ার খেয়া মনকে কলুষিত করে, মনের ময়লা আত্মায় লিপ্ত হয়। ধূম পরিপূর্ণ গৃহস্থিত স্বর্ণখণ্ডের ন্যায় আত্মা মায়ার দেহকে অবলম্বন করিয়া কলুষালিপ্ত হইয়া অবস্থান করেন। সেই কলুষ মোচনের ও আত্মার স্বকীয়ভাব সম্পাদনের অর্থাৎ আত্মার মুক্তির একমাত্র ঔষধ সদালাপ, সৎসঙ্গ সৎকর্ম্ম, ঈশ্বরে ভক্তি ও জ্ঞান। কর্ম্ম অসংখ্য, জ্ঞান অনন্ত, ভক্তি এক. ভক্তি হইতেই বিশুদ্ধজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। সাধক কমলাকান্ত পরমাভক্তিকে আশ্রয় করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। এমন তারার নাম, ব্রহ্ম, তাহার ধ্যান ব্রহ্ম সার ভাবিতেছেন। তাঁহার মন, বুদ্ধি ও আত্মা নির্ম্মলভাবে পরস্পরকে দৃষ্টি করিতেছে। তিনি এখন সংসারকে অন্যভাবে দেখিতেছেন, মায়ার বৈচিত্র নাই, মায়ার বিভীষিকা নাই, মায়ার ক্রন্দন নাই, মায়ার অন্ধকার ছুটিয়া গিয়াছে, তিনি প্রেমালোকে জগৎ হাস্যময় দেখিতেছেন। সংসার পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে স্তরে স্তরে চূড়া পর্য্যন্ত দুঃখ, অভাব ও ব্যাধি কণ্টক এবং পর্ব্বতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ভীষণ মৃত্যু-শিলাকে অবলোকন না করিয়া তিনি প্রেমালোকে সংসার পর্ব্বত জ্যোতির্ম্ময় দেখিতেছেন, ভক্তি ও জ্ঞান সোপানে আরোহণ করিয়া সংসার পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশে জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

জননী ও পত্নীর পরলোক গমনে প্রীতির প্রিয় হাস্য সাধককে পরিত্যাগ করিল না। স্মরণ-রাক্ষস মধ্যে মধ্যে মনকে আক্রমণ করিলে, জ্ঞানবাণ দ্বারা তাহাকে প্রতারিত করিতেন। সর্ব্বদুঃখহরা হৃদয়-বাসিনীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহাতে পিতা মাতা ও পত্নীর অবস্থান দৃষ্টি করিয়া সুখী হইতেন। দূরবর্ত্তী ও নিকটবর্ত্তী আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাঁহার উপর্য্যুপরি সাংসারিক বিপদের কথা উল্লেখ করিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই তিনি তাঁহাদের সহিত তত্ত্ববোধিনী কথা প্রসঙ্গ আরম্ভ করিতেন, তাঁহাদিগকে তাঁহার বিপদের কথা উল্লেখ করিবার অবসর দিতেন না, সংসারের অনিত্যতা প্রতিপন্ন করিতেন, নিত্যবস্তু ভক্তি ও প্রেম একথা বিশদরূপে বুঝা-

ইয়া তাঁহাদের অন্তর সরস করিতেন ও বৈরাগ্য জন্মাইতেন। তাঁহারা ভাবান্তরে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া নিজ নিজ বন্ধুবান্ধবের নিকট তাঁহারা মহৎভাবের গল্প করিয়া সুখী হইতেন। সাধকের বন্ধু কেণারাম চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বিপদের কথা শুনিয়া দেবী বিশালাক্ষীয় মন্দিরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। গুপ্তড়ের মহোৎসবের সময় কেণারামের সহিত সাধকের সাক্ষাতের পর কেণারাম মধ্যে মধ্যে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া সুখী হইতেন, সাধকও শ্যামা পূজার পর কেণারামের গৃহে পদার্পন করিয়া, তাঁহার গৃহ পবিত্র করিতেন। কেণারামকে সাধক অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন। বিষম দুঃখ, কি শোকের সময় প্রিয়তম ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইলে মানব মনোবেগ সম্বরণ করিতে পারে না, কিন্তু কেণারাম শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার সহাস্য বদন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, দেখিলেন মন্দির মধ্যে বেদীর উপর দেবী বিশালাক্ষীমূর্ত্তি, বেদী চন্দন চর্চ্চিত, দেবীর পদে জবা ও বিল্বপত্র, সম্মুখে বিল্বপত্র আচ্ছাদিত পূর্ণঘট, পার্শ্বে কুশাসনে সাধক উপবিষ্ট, গলে রুদ্রাক্ষমালা, বাস লোহিতবস্ত্র। কেণারাম ভক্তিভরে দেবীর চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক সাধককে অভিনন্দন পূর্ব্বক সাধকের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। সাধক কেণারামকে আগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া নয়নে দর্শন আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কেণারাম সাধকের দুর্ঘটনার কথা উত্থাপন করিবামাত্র সাধক গাহিলেন :—

সুখের বাসনা কর ক'দিন।
ত্যজি অন্য ফল, কালী কালী বল, মানব জনম য'দিন ॥
পাবে ব্রহ্মপদ, অক্ষয় সম্পদ, স্মরণ করিবে এ দিন।
সৃষ্টি স্থিতি লয়, যাহা হইতে হয়, সে হবে তাহার অধীন ॥
যখন যেমন, বিধির লিখন, সেইরূপে যাবে সে দিন।
ভাবিলে বিষাদ, ঘটিবে প্রমাদ, কালী না বলিবে যে দিন ॥
কমলাকান্ত, হইয়ে ভ্রান্ত, ভুলেছ ন'মাস ন'দিন।
বারে বারে আসি, দুঃখ রাশি রাশি, যাতনা সবে কত দিন।

সঙ্গীত শেষ করিয়া সাধক কহিলেন, "ভাই এই ত মানব জন্ম, দুই তিন দিনের জন্য, যদি এই অল্প সময় সংসারের ভোগ সুখের জন্য লালায়িত হইয়া

কাটাইবে তোমার অনন্ত পরকালে কি হইবে একবার ভাবিবে না। ভাই তাই বলি, অনিত্য ভোগ বিলাসের আশা পরিত্যাগ করিয়া কালী কালী বল। তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ কর, তন্ময় হইতে চেষ্টা কর। লাভ প্রচুর, দেখিবে কি আনন্দ প্রাপ্ত হইবে, অক্ষয় সম্পদ, ব্রহ্মপদ লাভ করিবে। ত্রিগুণধারিণী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রসবিনী তোমার সাধনায় বশীভূত হইবেন। কর্ম্মী হও; তবে এ দানের কথা সাফল্য হইবে। জীবনের সাংসারিক সুখদুঃখ বিধান ব্যবস্থায় যাহা ঘটিবে, বিধির ইচ্ছায় তাহা ঘটিবেই, সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করিও না; সে সকল ঘটনাকে মনোমধ্যে স্থান দিও না, যদি দাও, তাহা হইলে জানিবে বিপন্ন হইলে, তোমার পরম পথে কণ্টক পড়িল। সর্ব্বদা কালী কালী বলিয়া পথ পরিষ্কার রাখ। ভাই এই বড় দুঃখের বিষয়, আমাদের কি ভ্রম ঘুচিবে না; পুনঃ পুনঃ গর্ভযন্ত্রণা, এই সব অসীম দুঃখ রাশি স্মরণ করিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হইবে না?" কেণারাম কহিলেন, "আপনিই ধন্য, আপনার মনের বিকার কখনও দেখিলাম না, আপনি কর্ম্মী ও আমরা অল্পনাশীল, কি করিয়া মন বশীভূত হইবে, এই তর্কেই আমরা এ জীবন কাটাইয়া দিব, কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইব না, নির্জ্জনে বসিব না, সংসার ভুলিব না, ধ্যান-ধারণা করিব না, নয়ন জলে ভিজিব না, সোজা পথে, সুখের পথে যাইব না, পথ কণ্টকময় জানিয়াও সেই পথে যাইব, শেষে কণ্টকে সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ হইয়া, আকুল হইয়া পড়িব, আবার কণ্টককে আলিঙ্গন করিয়া গড়াগড়ি দিব, চীৎকার করিব, রুধিরাক্ত কলেবর হইব, শিরে করাঘাত করিব, তথাপি কণ্টক ত্যাগ করিব না, পশ্চাৎপদ হইব না।" সাধক হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "সে দৃশ্যও বড় মন্দ নহে, জগদম্বার সংসার নাট্য-মন্দিরে এ প্রহসন ঘরে ঘরে," "শ্যামা মা উড়াচ্ছেন ঘুড়ী সংসার বাজারের মাঝে ... ... ঘুড়ী লক্ষে দুটো একটা কাটে হেসে দেন মা হাত চাপুড়ী।" তুমি যে বলিলে, পশ্চাৎপদ হইবে না, তাহা কি সহজ কথা, তাঁর কাছে কিছু প্রার্থনা করিও না, ভক্তি পাইবার উপযুক্ত হইয়া কেবল ভক্তি চাও, তাহা হইলেই কেবল কণ্টকময় পথ ত্যাগ করিতে পারিবে। আরও বলি, তুমি যে অনুতাপ করিলে সে অনুতাপও ভাল। অনুতাপে বোঝা যায়, মন কর্ম্মী হইতে চায়, মন নিষ্পাপ হইতে চায়। মন যদি সোজা পথে দাঁড়ায়, তাহাকে সুপথের পথিক করা বেশী কষ্টসাধ্য নহে, তখন জানিবে মনভ্রমর হইয়াছে, আর কলুষ প্রিয় মাছি নাই, যে মধুপান করিতে চায়, তাহাকে মায়ের পাদপদ্ম দেখাইয়া দাও, সে মধুপান করুক। পাদপদ্মের এমনি গুণ বঞ্চনা নাই, পিপাসু হইলে, মানব

মন তৃপ্তি লাভ করিবেই, প্রেম-মধুপানে বিভোর হইয়া সংসার ভুলিয়া যাইবে।

সাধক আবার গাহিলেন :—

শ্যামা ? ভাল ভেবেছ মনে।
যে ও পদে আশ্রয় লয়, তারে বিষয় বিষে রাখ্‌বে কেনে ॥
কিঞ্চিৎ করুণাময়ী কালী যদি চাও নয়নে।
তবে নিরানন্দ দূরে যায় মা ! সদানন্দ সুধাপানে ॥
বিষয় পথের পথিক যারা, সে চল্‌বে কেন তাদের সনে।
সে একাকী বিরলে বসে, হেসে হেসে চায় যাত্রিগণে,
কমলাকান্তের এই নিবেদন মা শ্রীচরণে,
আমার একুল গেল, ওকুল রাখ, সকুল হও নাথের বচনে ॥

ভাই রে ! যে ব্যক্তি মায়ের নিতান্ত আশ্রয় গ্রহণ করে তার কি বিষয় বাসনা থাকে। অরুণ উদয়ে—অন্ধকারের ন্যায় তার নিরানন্দ পূর্ণানন্দময়ীর দৃষ্টিতে কোন্ দিকে চলিয়া যায়। ভোগ সুখ বিষয় বাসনাতে সে ব্যক্তি ভ্রুক্ষেপও করে না। তুমি ভোগ-বিলাস পিপাসু লোকের কণ্টকাকীর্ণ পথে গমনহেতু যে দৃশ্যের কথা এখনি বলিলে, সেই দৃশ্য সে ব্যক্তি দর্শন করিয়া এ সব মায়ের লীলা বলিয়া হাস্য করে। ভাই রে, এখন ত মনে হইতেছে সোজা পথে দাঁড়াইয়াছি, পথের সম্বল কেবলমাত্র তন্ত্রোক্ত শিব বাক্য। এখন সচ্চিদানন্দ নিকেতনে পৌঁছান পূর্ণানন্দময়ীর ইচ্ছা।"

ক্রমশঃ

মহালক্ষ্মী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

ষষ্ঠ পল্লব।

উপসংহার।

বাঙ্গালীর মেয়ের স্বয়ম্বর কেমন, পাঠক মহাশয় তাহা শুনিলেন ; এক্ষণে শেষের কথাগুলি শ্রবণ করুন। ভোরে উঠিয়া, একখানি পাল্কি করিয়া, মহালক্ষ্মী নিজ বাড়ীতে গিয়াছিলেন, বেলা দশটার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিয়াছেন ; গৃহিণী তখনও ফিরিয়া আইসেন নাই। মহালক্ষ্মী রন্ধন করিলেন, বারোটা বাজিয়া গেল, তখনও গৃহিণী আসিলেন না ; কাজে কাজে আহারাদি চুকিল।

বেলা যখন পাঁচটা বাজে বাজে, সেই সময় একখানা গাড়ী আসিল। গাড়ী হইতে গৃহিণী নামিলেন। পাঁচুর পিসী তাঁহার সঙ্গে আসিয়া ছিলেন, পাঁচুও আসিয়াছিল। তিনজনে উপরে গিয়া উঠিলেন. সম্মুখের ঘরে তিনজনেই একাসনে উপবেশন করিলেন, মহালক্ষ্মী তাঁহাদের নিকটে বসিলেন, শ্যামীর মা একটু তফাতে একখানি পিড়ী পাতিয়া বসিল। জননীর সঙ্গিনী দু-টিকে নরেশ্বর চিনিতে পারিলেন না, মহালক্ষ্মী চিনিলেন। পাঁচুর পিসী একটি গল্প জুড়িয়া দিলেন, নরেশ্বর সরিয়া গেলেন।

গল্প চলুক, আমরা এই অবকাশে পাঁচুর পিসীর একটু পরিচয় দিয়া রাখি। পিসীমার নাম করুণা সুন্দরী ;—নামেও করুণা, ব্যবহারেও করুণা। সকলকেই তিনি ভালবাসেন, কেহই তাঁহার অপ্রিয় নহে। পাঁচুটি বেটাছেলে নয়, মেয়ে মানুষ ; পাঁচুর উপর করুণাসুন্দরীর কন্যাতুল্য স্নেহ। পিসীমার বয়ঃক্রম ৪০।৪২ বৎসর, সধবা ; তাঁহার গর্ভজাতা এক কন্যা আছে, কন্যার নাম শ্রদ্ধা ; সেই শ্রদ্ধার পুত্রের অন্নপ্রাশনে গণেশজননীর নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। এখন কথা হইতেছে, যখন গর্ভজাতা কন্যা আছে, তখন করুণাসুন্দরীকে লোকে শ্রদ্ধার মা না বলিয়া, ভাইজীর পরিচয়ে পাঁচুর পিসী কেন বলে ? কারণ এই যে, শ্রদ্ধার জন্মের পূর্ব্বে পাঁচুর জন্ম. সেই জন্য পাঁচুর পিসী আখ্যাতেই তিনি সুপরিচিতা। লোকে বলে পাঁচুর পিসী, পাঁচু কিন্তু তাঁহাকে মা বলে।

রাত্রি দশটার পর গল্প বন্ধ হইল, সকলে আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন। গৃহিণীর শয়ন ঘরটি ছোট বটে, কিন্তু নিতান্ত অপ্রশস্ত নয় ; সেই ঘরের মেজেতে ঢালা বিছানা হইল, গৃহিণী সে রাত্রে খট্টায় শয়ন করিলেন না, নীচের বিছানাতেই এক সঙ্গে শয়ন করিলেন।

গত রাত্রে মাল্য বদলের পর মহালক্ষ্মী বলিয়াছিলেন, "গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইল, সময় যদি আইসে, শাস্ত্রমতে প্রকাশ্য বিবাহ হইতে পারিবে।" তাঁহার সেই ভবিষ্যদ্বাণী শীঘ্রই ফলিল।

করুণাসুন্দরীর বাড়ীতে গতরাত্রে গণেশজননীর বাস হইয়াছিল, করুণাসুন্দরী নির্জ্জনে গণেশজননীর নিকটে মহালক্ষ্মীর পরিচয় দিয়াছিলেন। বংশ পরিচয়, চরিত্র চর্য্যা, ধনদৌলত, নরেশের সহিত দেখা শুনা এবং উভয়ের অনুরাগ বৃত্তান্ত আমূল বিবরণ গণেশজননীর শুনা হইয়াছিল। নরেশকে প্রাপ্ত

হইবার অভিলাষে ডাকাতির কথা রচনা করিয়া কাঙ্গালিনী সাজিয়া, মহালক্ষ্মী তাঁহার বাড়ীতে আসিয়াছিল, বিষয় আশয় নষ্ট হয় নাই, ডাকাতেও সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে নাই, সমস্তই বজায় আছে, বিষয়ের মুনফা লক্ষ টাকা, সে রহস্যটিও করুণা-সুন্দরী ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। পরিচয় শ্রবণে গণেশজননী প্রাণে যে কতখানি আনন্দ, পাঠক মহাশয়েরা তাহা অনুভব করুন। মহালক্ষ্মীর সহিত নরেশের বিবাহ হইলে সংসারের সর্ব্ববিধ মঙ্গল হইবে, সমস্ত বিঘ্ন বিপত্তি দূর হইবে, সকলেই সুখী হইবেন, ইহাও করুণাসুন্দরীর মুখের বাক্য।

নরেশের সহিত অবিলম্বে মহালক্ষ্মীর বিবাহ দিতে গণেশজননী আগ্রহবতী। রজনী প্রভাত হইবামাত্র পুরোহিত ডাকাইয়া বিবাহের দিন ধার্য্য করিতে তিনি অনুরোধ করিলেন; পঞ্জিকা দেখিয়া পুরোহিত বলিলেন, আগামী পঞ্চমী তিথিতে শুভবিবাহের শুভদিন। সে দিন ছিল, কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া তিনদিন পরে পঞ্চমী। শীঘ্র শীঘ্র বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল, করুণা ও পাঁচু সেই তিনদিন সেই বাড়ীতেই রহিলেন।

পঞ্চমী আগত; সব ঠিক, কিন্তু একটি গোল বাঁধিল। সম্প্রদান করিবে কে? পুরোহিতের নিকট ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি বলিলেন, "আমাদের শাস্ত্রের উদ্বাহতত্ত্বে অষ্ট প্রকার বিবাহের বিধি আছে; ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত পাঁচ প্রকার বিবাহ উৎকৃষ্ট, শেষের তিন বিবাহ নিকৃষ্ট। গান্ধর্ব্ব-বিবাহ শাস্ত্র প্রমাণে সুসিদ্ধ; বর কন্যার মনোমিলনে গান্ধর্ব্ব বিবাহ হয়; সম্প্রদান করিবার লোকাভাবে কন্যা স্বয়ং আপনাকে সম্প্রদান করিতে পারে।"

সেই ব্যবস্থাই গ্রাহ্য হইল। ব্রাহ্মণের বিবাহে যেমন কুশণ্ডিকার পদ্ধতি আছে, সেই পদ্ধতিমতে বর কন্যা উভয়ে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা মন্ত্র পাঠ করিয়া বিবাহ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণের কুশণ্ডিকার ন্যায় নারায়ণ সম্মুখে হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া, শতাধিক জনপূর্ণ সভায় নরেশ্বরের সহিত মহালক্ষ্মীর শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হইল। এ বিবাহে যথাসম্ভব সমারোহ হইয়াছিল, একথা বলাই বাহুল্য। করুণাসুন্দরী আদর পূর্ব্বক মহালক্ষ্মীকে একছড়া মুক্তাহার যৌতুক দিলেন, পাঁচুও নরেশ বাবুকে একটি হীরকাঙ্গুরী যৌতুক দিল। বিবাহ হইবে, স্থির জানিয়া হার ও অঙ্গুরী তাঁহারা সঙ্গে করিয়া আনিয়া ছিলেন। গণেশ-জননীর দুঃখের সংসার পূর্ণানন্দে পরিপূর্ণ।

বিবাহের দুইদিন পরে নরেশবাবু তাঁহাদের মহাজনের বাড়ীতে গিয়া; মায়সুদ্ধ

সমস্তটাকা পরিশোধ করিয়া, বাড়ীবন্ধকী দলিলখানি খালাস করিয়া আনিলেন; জননীর হস্তে দলিলখানি অর্পণ করিয়া, তাঁহার চরণবন্দনা পূর্ব্বক অর্থপ্রাপ্তির সূত্রটি প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

দুই চারিদিন অতীত হইয়া গেলে দশবারো জন রাজমিস্ত্রী ও ২০।২৫ জন মজুর লোক ডাকাইয়া বাড়ী মেরামত আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইল। একমাসের মধ্যে সেই বিস্তৃত অট্টালিকা রাজবাটীর ন্যায় শোভাধারণ করিল; সঙ্গে সঙ্গে অট্টালিকার উপযুক্ত গৃহসজ্জাও অনুষ্ঠিত হইল, দাস দাসী, দ্বারপাল ও সরকার লোকজন নিযুক্ত হইল। অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন দর্শনে প্রতিবাসীগণ চমৎকৃত। দুরবস্থার সময় যাহারা নরেশ্বরকে অবজ্ঞা করিত, তাহারা এখন নরেশ্বরকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতে লাগিল; যে সকল ক্রূরলোক ঐ বাবুর ছেলের দুঃসময়ে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল, তাহারা এখন মনে মনে দারুণ হিংসায় ফাটিয়া গেল।

বিবাহের দুইদিন পরে পাঁচুকে লইয়া করুণাসুন্দরী গৃহে গিয়াছিলেন, মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া যাইতেন। পাঁচুটি সধবা, স্বামীটি ঘরজামাই, করুণাসুন্দরীর পিতৃদত্ত ও স্বামীদত্ত ধনে সংসারের কোন অভাব ছিল না, কিন্তু পাঁচুর সন্তান হয় নাই, বয়স একুশ বাইশ বৎসর, করুণাসুন্দরীর মনে সেই একটি মহাদুঃখ।

পাঁচবৎসর অতীত। মহালক্ষ্মী ইতিমধ্যে একটি সুসন্তান প্রসব করিয়াছেন; গণেশজননীর সুখের সংসারে আনন্দের উপর মহানন্দ; দান, ধ্যান, পূজাপর্ব্ব, ক্রিয়া কলাপ সর্ব্বদাই চলে। মহালক্ষ্মী পুত্রটি লইয়া মধ্যে মধ্যে এক একদিন পিত্রালয়ে যান, সেই দিনই চলিয়া আইসেন, তাঁহার জমিদারির খাজানার টাকা নরেশ্বরের বাড়ীতেই ইরসাল হয়; পিতৃভবনের দপ্তরখানা সমান গুল্‌জার; মফঃস্বলের নায়েব গোমস্তার চালান দেখিয়া সেই দপ্তরখানার আমলারা সমস্ত ইরসালীর টাকার জমা খরচ রাখেন, মফঃস্বলের আমলাদের সালতামালী নিকাশ লন, কিছুতেই বিস্মৃতি-মনা হয় না।

বৎসর বৎসর দুই বাড়ীতেই দুর্গা পূজা হয়, দুই বাড়ীতেই সমান ঘটা। ষষ্ঠির স্বায়ংকাল, পূজার তিনদিন এবং বিজয়ার দিন মহালক্ষ্মী খানিকক্ষণ করিয়া পিতৃভবনে থাকেন, তাহার পর স্বামীভবনে চলিয়া আইসেন। পূজার সময় ও অপরাপর ক্রিয়া পরবের সময় করুণাসুন্দরী, পঞ্চাননী (পাঁচু) শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধার পিতা পাঁচুর স্বামী ও শ্রদ্ধার স্বামী প্রভৃতি নরেশবাবুর বাড়ীতে আসিয়া আমোদ

আহ্লাদ করেন, সকলের মুখেই সর্ব্বক্ষণ আনন্দ মাখা। গণেশজননী পুত্র পৌত্র ও লক্ষ্মীরূপিণী পুত্রবধুকে লইয়া শিব-সীমন্তিনী গণেশজননীর ন্যায় আনন্দ সাগরে ভাসমান ; নিত্য যেন এই সংসারে কাশীশ্বরি মা ! অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান।

গল্পটির তাৎপর্য্য আলোচনা করিয়া আমরা একটি নূতন দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হইতেছি।—সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রমে আর্য্যলক্ষ্মী মহালক্ষ্মীর বিবাহ, পূর্ব্বের কথা মনে করিলে বঙ্গের হিন্দু সংসারে ইহা এক প্রকার নূতন। অধুনা আমাদের কায়স্থ ব্রাহ্মণের বিবাহে যেরূপ মর্ম্মভেদী হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে. পুত্র বিক্রয়ের উচ্চ ডাকে নিলামের উপদ্রবে গরীব কন্যা কর্ত্তারা দিন দিন যেরূপ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন, দিন দিন নিলামের আগুণ অনুকূল বাতাসে যেরূপ বেগে জ্বলিয়া উঠিতেছে, ক্রমে সেই আগুণ আরও অধিক প্রমাণ হইলে ঘরে ঘরে সপ্তদশ অষ্টাদশ বিংশতি পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়া কুমারী কন্যা দর্শন করিতে হইবে, এমন কি উচ্চ বংশীয়া গরীব কুমারীরা হয়ত চিরজীবন কুমারী অবস্থায় থাকিবে, ঘরে ঘরে হয়ত ক্রন্দনের রোল উঠিবে ; এই মহাপাপের স্রোত বন্ধ করিবার কোন উপায় হইতেছে না ; কন্যা বিক্রয় করিলে পাপ হয়, পুত্র বিক্রয়ে পাপ নাই, ধনলোভী বর কর্ত্তাগণের হয়ত এইরূপ সিদ্ধান্ত দাঁড়াইয়াছে ; মহালক্ষ্মীর ন্যায় পাঁচসাতটি হিন্দু কুমারী ঐরূপে ইচ্ছা বরি হইয়া যদি স্ব স্ব পতি মনোনীত করিতে পারেন, তাহা হইলে বোধ হয়, পুত্র ব্যবসায়ী নিলামওয়ালা ধনুর্দ্ধরগণের পণের দাবির রোগটা কমিয়া আসিতে পারে, জোঁকের মুখে নুন পড়ে !

বিবাহের বাজারের অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া দেখিয়া, সমাজের কল্যাণার্থ আমরা যদি বাঙ্গালীর মেয়ের স্বয়ম্বরের পক্ষপাতি হই, তাহা হইলে বোধ করি, আমাদের সমাজ হিতৈষী বন্ধুগণ আমাদিগকে নিন্দা করিতে পারিবেন না।

রথযাত্রা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত।

১। সত্য সনাতন নিত্য নিরঞ্জন ব্রহ্মময় নারায়ণ।
তুমি পতিত-পাবন, অধম-তারণ, দুরিত বারণ, দীননাথ,—
দীনে হইয়ে সদয়, ওহে দয়াময়,
আজি বিরাজ' হৃদয়-রথে জনার্দ্দন ॥

২। ল'ইয়ে মুক্তি-রূপিণী, সতী সুভদ্রা ভগিনী,
ভ্রাতা বিবেক-রাম সাথে হে, ব'স হৃদয়-রথে,
(জগন্নাথ হে) (জগবন্ধু হে)।

৩। মানস-সারথি হ'বে বাজি রিপুগণ।
জ্ঞান পথে ধাবে রথ শ্রীমধু-সূদন ॥
মোক্ষ পুরী পানে—(পরমেশ হে !)—

৪। ইন্দ্রিয় কুচক্র দশ, অবশ,—সদা স্ববশ,
হবে বাধ্য লক্ষ্য পথে ধাইতে—(রথের টানে টানে হে !)

৫। কাতরে শ্রীহরি হে কুরু করুণা,—পূরাও বাসনা।
নাহি চাহি রাজ্য ধন, চাহি শুধু শ্রীচরণ, শ্যাম,—শ্যাম হে,—
তব রূপ অনুক্ষণ করি ভাবনা ॥

৬। বিরাগ অনিল ব'বে অনুরাগে হায়।
উড়িবে শান্তির ধ্বজা রথেরি চূড়ায় ॥ হে—

৭। প্রাণ নে'তে হরি ভাবে,— হরি ব'লে হে !
ঐ রথ হ'তে আনন্দেতে হরি নামের লুট্ ছড়াবে ॥

৮। আমি আনন্দে শ্রীধামে ক'রব' গমন ॥

কীর্ত্তন।

শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ কাব্যতীর্থ বিরচিত।

১। (আজি) একি ভাব হেরি ভাব-ময়।
আসিয়ে একান্তে, এ গোকুল প্রান্তে,
প্রাণ প্রিয় ধন যেতেছ কোথায় ?
কেমনে হে নিরজনে উঠি রথোপরে,
পাষাণে বাঁধিয়ে হিয়ে যাও মধুপুরে,
বধে কি এমন ক'রে শরণাগতেরে,
কেন হে ঢালিছ হেন গরল সুধায় ॥

২। ব্রজ জীবন ! ছার জীবন কি সুখে রাখিব।
তব বিরহে প্রাণ, এখনি ত্যজিব ॥

৩। (একবার) ভাব দেখি কমল-আঁখি কোন পরাণে হায়।
(ত্যজি) ধেনু, বৃন্দাবন, বাঁশরী বাদন চলিছ কোথায়

৪। পরিহরি ব্রজপুরী প্রাণ-হরি যায় রে,
এ অবধি কানু-প্রেমে অবধি বা হয় রে,
কাল' বিনে কালি-মাখা হেরি দিশাচয় রে,
কেমনে নিবারি মনে ঘটিল কি দায় ॥

৫। আঁখি মেলি দেখ হরি, বিষাদে কিশোরী
ত্যজে প্রাণ হরি ব'লে হায়, (প'ড়ে রথ তলে ।)
নিঠুর হ'য়ো না কাল' এ নহে করম ভাল,
কিবা সুখ বধি অবলায় ? একি কর ছলে ॥

৬। ধন্য তুমি গো মুনিকুলপতি ! রাখিলে কীরতি ভাল' (আজি)
(আজি) সাধের গোকুল অকূলে ভাসালে,
(ব্রজ) কৃষ্ণ বিরহ অনলে পুড়ালে,
(রাখিলে সুযশ ভাল) ॥
কে বলে অক্রূর ! তুমি হে অ-ক্রূর,
ক্রূর শিরোমণি, নীলমণি-চোর,
খর আঁখি-পাতে আজি হে তোমার
এ ব্রজ-লীলা ফুরাল ॥

৭। বিফল রোদন সখি ! বিফল সকলি,
পায়ে ঠেলি গেল চলি আজি বনমালী ;
আসার আশাতে হৃদে বাঁধি সবে আলি,
হরি স্মরি হর কাল, হবে হরিময় ॥

"পুনর্যাত্রা ।"

শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ কাব্যতীর্থ বিরচিত ।

ওহে নারায়ণ ! ব্রজের জীবন,
দেহি দরশন শ্রীমধুসূদন !
এসেছি প্রভাসে, তোমারি সকাশে,
নিরখিতে শুধু ও বিধু বদন ॥

চিনেছি তোমারে ওহে চিন্তামণি !
ত্রিভুবন মণি তুমি নীলমণি,
হারায়ে সে মণি ওহে যদুমণি !
নয়ন মণি হারা মোরা গোপিগণ ॥

বিমনা যমুনা না বহে উজান
পিক কুল নাহি করে কুহুতান,
শারি শুক মুখে "রাধা শ্যাম" গান,
কলহ ছঙ্কারে না ঝরে এখন ॥

না ভাসে গগনে সে মুরলী রব,
ধবলী শ্যামলী হ'য়েছে নীরব,
শুষ্ক তরু লতা হে প্রাণ কেশব,
শব রূপ আজি মধুর-বৃন্দাবন ॥

তোমার বিরহ— অনলে শ্রীহরি,
ধূ ধূ জ্বলে সদা সে শব-নগরী—
ঢালি নেত্র বারি নিভাইতে নারি'
নব জলধরে লইনু শরণ ॥

হৃদয় দেবতা, আজি হে তোমারে,
প্রাণের হরষে হৃদি রথোপরে
তুলি ল'য়ে ফিরে, যাব' নিজপুরে ;
পুনর্যাত্রা ভবে হবে সমাপন ॥

অনিত্য সংসারে, ক্ষণ এ মিলন ;
ঘুচায়ে শ্রীহরি ! কর' পদে লীন
প্রভাস মিলনে, সে শুভ মিলন
গাবে ত্রিভুবনে তব যশোগান ॥

ভক্তি।

লেখক;—শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী।

নারদসূত্রে ভক্তির অভিধান দিয়াছেন, "সা তস্মিন পরম প্রেম রূপা।" অর্থাৎ পরমেশ্বরে পরম প্রেমের নামই ভক্তি। আর শাণ্ডিল্যসূত্রে বলিয়াছেন, "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" ঈশ্বরে পরানুরক্তি অর্থাৎ আরাধ্য বিষয়ে অন্তঃকরণে একান্ত অনুরাগই ভক্তি।

শ্রুতিতে বলিয়াছেন, "ভক্তিরস্যভজনং তদিহা মুত্রোপাধি নৈরাস্যে না মুখিন মনঃ কল্পনমেত দেব নৈষ্কর্ম্মমিতি," অর্থাৎ সর্ব্ববিধ উপাধিশূন্য হইয়া অনুকূল ভাবে শ্রীভগবানের ভজনের নামই ভক্তি এবং উহাতেই নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি। অবিকল এই শ্রুতির অনুবাদ পূজ্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে যে ভক্তির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা এই—

অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ভগবান সম্বন্ধীয় অনুকূল অনুশীলনকেই সামান্যতঃ ভক্তি বলে। এই অনুশীলন যদি জ্ঞান ও কর্ম্মের আবরণ এবং ভক্তি ভিন্ন অন্য বস্তুর স্পৃহাশূন্য হয়, তবেই তাহাকে উত্তমাভক্তি বলা যায়।

জ্ঞান ও বৈরাগ্য সাধারণতঃ ভক্তিমার্গে উপেক্ষনীয় হইলেও বর্জ্জনীয় নহে। ভক্তির অবিরোধী জ্ঞান ও বৈরাগ্য যে ভক্তি মার্গে প্রবেশের সহায় তাহা মহাজনগণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যে জ্ঞান ও বৈরাগ্য হইতে চিত্তের কাঠিন্য জন্মে, তাহাই ভক্তিমার্গের সাধকের পক্ষে বর্জ্জনীয়, ইহাই শাস্ত্র উপদেশ, কারণ কোন কারণে চিত্তের কাঠিন্য জন্মিলে তাহাতে ভক্তিস্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত ঘটে, আর চিত্তে ভক্তিদেবীর স্ফূর্ত্তি না হইলে তাহাতে ভক্তিরসকল্পতরু শ্রীভগবানের উদয় হয় না। ভক্তিশাস্ত্রকারগণ বলেন, কর্ম্ম চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে, বৈরাগ্য হৃদয়ের রস শুষ্ক করে, জ্ঞান হৃদয়কে শ্রদ্ধাশূন্য করে। গুরুবাক্যে, শাস্ত্রবাক্যে ও মহাজনবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা, এই শ্রদ্ধাই ভক্তি সাধকের সর্ব্বাগ্রে সাধনীয়। শুষ্কজ্ঞান দ্বারা মানবের সহজ কোমল হৃদয় ক্রমশঃ কঠিন হয়, কঠিন হৃদয়ে শ্রীভগবানের আসন প্রতিষ্ঠা হয় না।

ভক্তি অনুশীলনের তিনটি অবস্থা। সাধন, ভাব ও প্রেম। ইষ্টের বর্ণের প্রেরণা দ্বারা সাধনীয়া সমস্ত ভক্তির নামই সাধনভক্তি। ইহা জীবের হৃদয় নিহিত প্রেমকে উদ্দীপনা করে বলিয়াই ইহাকে সাধনভক্তি বলে। শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষ স্বরূপ প্রেম সূর্য্যাংশু সদৃশ এবং রুচির দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা সম্পাদক ভক্তি বিশেষের নাম ভাব। এই ভাব প্রেমের প্রথমাবস্থা। এই নিমিত্ত ভাব ঘনীভূত হইলেই তাহাকে প্রেম বলে। বিষয় ভোগ সত্ত্বেও সৌভাগ্য বশতঃ যখন জীবের বহির্মুখেতর নিবৃত্তি হয়, তখন ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক, কর্ম্মফল এই সকল বিষয়ে বিশ্বাস জন্মে। ক্রমে হৃদয়ে তত্ত্বসম্বন্ধীয় কিছু কিছু আলোচনার ইচ্ছার উদয় হয়। এই প্রকার অপ্রাকৃত তত্ত্বের আলোচনা হইতে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি তত্ত্ববিষয়িনী ইন্দ্রিয় চেষ্টার সহিত উহা ক্রমশঃ চরম অবস্থায় উপনীত হয়। ঐ চেষ্টা প্রথমে সাধন রূপেই প্রকাশ পায়, পরে উহা দ্বারায় ভাবের উদ্দীপনা হয়। এই ভাব পরে প্রেমরূপে পরিণত হয়। অতএব এই প্রেমই জীবের নিত্যধর্ম্ম। সর্ব্বজীব হৃদয়েই এই নিত্য ধর্ম্ম প্রেম বিদ্যমান আছে, কিন্তু যত দিন জীবের হৃদয়ে ভগবতত্ত্বের অভ্যুদয় না হয় সেই পর্য্যন্ত উহা অপরিস্ফুট থাকে। উহাকে পরিস্ফুট করিতে হইলে সৎসঙ্গের প্রয়োজন, শ্রদ্ধা না থাকিলে সৎসঙ্গ লাভ হয় না, অতএব গুরু, সাধু, শাস্ত্র ও দেবতাদিতে যাহাতে জীবের মনে আন্তরিক শ্রদ্ধা অর্থাৎ ভক্তিভাবের উদ্রেক হয় তাহার জন্যই নরাঙ্গ ভক্তি, প্রথম অঙ্গের যাজন প্রয়োজন। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নরাঙ্গ ভক্তির প্রথম অঙ্গ শ্রবণ। সাধুমুখে, আচার্য্যমুখে, গুরুমুখে ভগবতকথা শ্রবণে হৃদয়ে শ্রদ্ধার বীজ রোপিত হয়। ভক্তিপথের পথিকের এই শ্রবণ শক্তি ও সাধ্যবস্তু। সাধন ভিন্ন সাধ্যবস্তু প্রাপ্ত হয় না। বহু বহির্ম্মুখ জীবের ভগবত-কথা শ্রবণ শক্তি একবারে নাই। ইহার কারণ ভক্তি বহির্ম্মুখতা ভিন্ন আর কিছু নহে। জীবেরা এই ভক্তি বহির্মুখতা দূর করিবার জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভুবন-মঙ্গল শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন প্রচার। উচ্চ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা ভক্তি বহির্মুখ জীবের হৃদয়ে হরিকথা শ্রবণ শক্তির উদ্দীপনা হয়। তাই কলি-পাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশ দিলেন,—

বহিরঙ্গ সঙ্গে কর নাম সঙ্কীর্ত্তন।
অন্তরঙ্গ সঙ্গে কর রসাস্বাদন॥

ক্রমশঃ

জামাই বাবু।

(বুড়ীর গল্প।)

(১)

মেদিনীপুর জেলার একখানি গ্রামে বিশ্বেশ্বরীদেবী নামে এক বিধবা ব্রাহ্মণী ছিলেন, তাঁহার একমাত্র কন্যা; সেই কন্যার নাম ব্রজেশ্বরী। বিশ্বেশ্বরীর স্বামী গদাধর গাঙ্গুলী মস্তকুলীন ছিলেন; বেগের গাঙ্গুলী; চরিত্র ভাল, বিষয় আশয়ও কিছু ছিল। বাঁকুড়া জেলা হইতে একটি বর আনিয়া ব্রজেশ্বরীর বিবাহ দেওয়া হয়। বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে, একটি কন্যা লইয়া ব্রজেশ্বরী বিধবা হন, কন্যাটির বয়স তখন তিন বৎসর। দিব্য সুন্দরী, দিব্য গঠন দিব্য চক্ষু, দিব্য চুল। নাম রত্নেশ্বরী।

রত্নেশ্বরী বড় হইল, হিন্দুগৃহে বিবাহের বয়স অতীত হইল, সমান ঘরের বর পাওয়া যায় না, অন্বেষণ করিবারও লোক নাই, রত্নেশ্বরী সুতরাং পঞ্চদশ বর্ষীয়া কুমারী।

বাড়ীখানি একতলা; ভিতর দিকে চকবন্দী চারিদিকে দুটি দুটি আটটি কামরা; বাহির মহলে ছোট একটি বৈঠকখানা, একটি চুণের ঘর, গোলপাতায় ছাওয়া, একখানি গোয়াল ঘর, চারিদিকে ইটের প্রাচীর। বাড়ীতে দুটি গাভী ছিল, গাভীর সেবার জন্য একজন চাকর ছিল, চাকরের নাম খড়্গরাম। সংসারের কাজ কর্ম্মের জন্য একজন অর্দ্ধবৃদ্ধা দাসী ছিল, দাসীর নাম গৌরী।

বাড়ীর সংলগ্ন প্রায় এক বিঘা জমিতে একখানি বাগান। বাগানে কলা গাছ, ফুলগাছ, বেলগাছ, একটি জালরুল গাছ, একটি লিমগাছ, পাঁচটি আম গাছ, একটি তালগাছ, দু'টি নারিকেল গাছ, আর পাচ সাতটি পেয়ারা গাছ। বৃক্ষগুলির মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট কচুগাছ, কাঁটানটে আসসেওড়া আর চারা চারা খেজুরগাছ, ধারে ধারে ঘাসবন; বর্ষাকালে সেই ক্ষুদ্র জঙ্গলে অগণ্য জোঁক হয়। বাগানের পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে ছোট একটি পুষ্করণী।

বাড়ী বর্ণনা হইল, সংসার বর্ণনা হইল, বাগান বর্ণনা হইল, বাকী রহিল কেবল রত্নেশ্বরীর বিবাহ বর্ণনা। বর পাওয়া যায় না। আরও একটি বর্ণনা বাকী আছে। সেটি সেই পরিবারের সম্পত্তি বর্ণনা। গদাধর যখন মরেন,

তখন গ্রামের মধ্যে তাঁহার প্রায় দেড়শত বিঘা ঠিকা ব্রহ্মোত্তর জমি ছিল, কতক কতক জমিতে নীলচাষ ও রবিফসল হইত, বাকি জমি গুলি প্রজাবিলি ছিল। সর্ব্বশুদ্ধ বৎসরে প্রায় সাত আট শত টাকা আয় হইত। ইহা ছাড়া গদাধর ঠাকুর পাঁচখানি কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া ছিলেন, ফি কেতা হাজার টাকা।

এই পর্য্যন্ত বর্ণনা সমাপ্ত। এইবার রত্নেশ্বরীর বিয়ের কথা। বলা হইয়াছে, রত্নেশ্বরীর বয়স পঞ্চদশবর্ষ; মা, দিদিমা, দুইজনেই বরের জন্য ভাবেন, মনে মনে রত্নেশ্বরীও বরের জন্য ভাবে, সে ভাবনাটা কিন্তু প্রকাশ পায় না।

(২)

একদিন দৈবাৎ একজন ঘটক একটা সম্বন্ধ আনিল। বরের কুল শীল ভাল, সমান ঘর, বয়স কম, চমৎকার রূপ, লেখা পড়াতেও পণ্ডিত। ঘটকের কথায় ব্রজেশ্বরীর মন হইল, সেই বরেই বিয়ে দিতে তিনি রাজি হইলেন। বিশ্বেশ্বরীরও সেই মত।

একদিন পরে বর আসিল। যথার্থই দিব্য চেহারা;—দিব্য গৌর বর্ণ, দিব্য অঙ্গ সৌষ্ঠব, দিব্য চক্ষু, দিব্য গোঁফ, দিব্য কেয়ারী করা চুল। বয়স তরুণ,—বড় জোর বিংশতি বৎসর।

গল্প করিতে করিতে বুড়ী একটা ভারি ভুল করিয়াছিল। বরের রূপ বলিল, গুণ বলিল, বয়স বলিল, কেবল নামটি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। তাহার ভুলের দরুণ আমরাও নামটি বলিতে পারিলাম না, আগাগোড়া কেবল "বর বর" বলিয়া গল্পটি সাজাইব।

সেই বরের সহিত রত্নেশ্বরীর বিবাহ হইল। রত্নেশ্বরীর পিতা ঘরজামাই ছিলেন, এই বরটিও ঘরজামাই হইল। ভাগ্যগুণে অথবা ভাগ্যদোষে যাহারা ঘরজামাই, তাহারা প্রায় স্ত্রীর সেবা পায় না, স্ত্রীর আদর পায় না, স্ত্রীর ভালবাসা পায় না।

ব্রজেশ্বরী কিন্তু তাহার ঘরজামাই স্বামীকে ভক্তিপূর্ব্বক সেবাযত্ন করিতেন, উপদেশ পাইয়া রত্নেশ্বরীও এই নূতন বরটিকে মনের সহিত সেবাযত্ন করিতে লাগিল।

মনের মতন সুন্দর বর হইয়াছে, রত্নেশ্বরীর অপূর্ব্ব আনন্দ; পণ্ডিত জামাই সংসারের অতি ভাবক হইয়াছে, ব্রজেশ্বরীরও সেই আনন্দ বৃদ্ধা বিশ্বেশ্বরীও সে আনন্দ ভোগে বঞ্চিতা রহিলেন না।

বর প্রতিদিন শ্বাশুড়ীর ও দিদি শ্বাশুড়ীর পদধূলি গ্রহণ করে, মিষ্ট মিষ্ট কথা কয়, জমি জমার কাগজ পত্র দেখে, সময় হইলে কোম্পানীর কাগজের সুদ বাহির করে, সকলকেই দেখায় আমি খুব কাজের লোক।

(৩)

এক বৎসর গত হইল। বরের সহিত রত্নেশ্বরীর প্রণয় বাড়িল, বরের উপর ব্রজেশ্বরীরও বিশ্বাস বাড়িল। ব্রজেশ্বরীর বয়স অধিক নহে ;—পঞ্চদশ বর্ষে কন্যাটি হইয়াছে, কন্যাটি এখন ষোড়শী, এ হিসাবে ব্রজেশ্বরীর বয়ঃক্রম একত্রিশ বৎসর মাত্র। বিষয় কর্ম্মের কথায়, ঘর সংসারের কথায়, জামাইবাবুর সহিত ব্রজেশ্বরী দেবীর মতের ঠিক মিল হয়, সময় বিশেষে দু'জনে বেশ মিষ্ট মিষ্ট আলাপও হয়। ব্রজেশ্বরীও অসুন্দরী ছিলেন না, প্রথম যৌবনে রত্নেশ্বরীর তুল্য সুন্দরী ছিলেন, সে গৌরব তাঁহার আছে। অল্প কথায় যে কাজ হয়, বেশীক্ষণ কথা কহিবার অভিলাষে জামাইবাবু শ্বাশুড়ীর গা ঘেসিয়া বসিয়া, সেই কাজে অনেক বেশী কথা বাড়াইয়া তোলেন। জামাইবাবুর কথাগুলিও বেশ মিষ্ট মিষ্ট ; খুঁতের মধ্যে একটু অনুনাসিক উচ্চারণ।

আরও এক বৎসর অতীত হইল। রত্নেশ্বরীর সঙ্গে নূতন বয়সের দিব্য প্রণয়, কিন্তু জমাট নয় ; যেন একটু একটু উদাস উদাস ভাব। সেই দুঃখে অথবা অন্য কোন অদ্ভুত নিগূঢ় কারণে রত্নেশ্বরী দিন দিন রোগা হইতে লাগিল ; অপরূপ শ্রী ছিল, শ্রী ভ্রষ্ট হইয়া আসিল।

(৪)

সবদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কন্যার গৃহে জাগিয়া বসিয়া ব্রজেশ্বরী দেবী বরের সহিত সংসার ধর্ম্মের অনেক রকম গল্প করেন। এক রাত্রে ভারি ঝড় বৃষ্টি অন্ধকার ; একটা দমকা বাতাসে ঘরের প্রদীপটা নিবিয়া গেল। সেই অন্ধকারে অন্য এক নিভৃতকক্ষে শ্বাশুড়ীকে জামাই ডাকিয়া লইয়া উভয়ে গমন করিলেন, উদ্দেশ্য গুপ্তকাহিনী প্রকাশ করা।

ঝুপ্ ঝাপ্ বৃষ্টি ; একটু দূরে থাকিলে কেহ কাহার কথা শুনিতে পায় না। শ্বাশুড়ীর চরণ ধরিয়া পদধূলি মস্তকে লইয়া কিঞ্চিৎ মৃদুস্বরে জামাইবাবু বলিল, "মা! আমি তোমাকে চিনিয়াছি। এ জন্মে তুমি আমার শ্বাশুড়ী হইয়াছ, এ জন্মে আমি তোমাকে মা বলি, কিন্তু পূর্ব্বজন্মে তুমি আমার গর্ভধারিণী জননী ছিলে।

এ জন্মেও তোমার ঠিক সেই মায়ের মত স্নেহ-মমতা হইয়াছে, আমি তোমাকে কি ভাবে শ্রদ্ধা ভক্তি করিব, সর্ব্বক্ষণ কেবল তাহাই ভাবি, সর্ব্বক্ষণ তোমার কাছে কাছে থাকিতে চাই, সর্ব্বক্ষণ তোমার সহিত কথা কহিতে ভালবাসি। তোমারে আন্তরিক ভক্তি করি।

(৫)

অন্ধকারে জামাই চরণ ধরিয়া রহিয়াছে, ঐ সব কথা বলিতেছে, শ্রদ্ধাভক্তি জানাইতেছে, ব্রজেশ্বরীর লজ্জা হইল ; একটু একটু ভয়ও হইল, মাতৃস্নেহ জানাইবার অবসর হইল না ; ব্যগ্রস্বরে তিনি বলিলেন, "এখন চলো বাবা, চল, রতনের কাছে যাই, বাছা অন্ধকারে একলা রয়েছে, তোমাতে আমাতে এখানে রয়েছি, তাও হয়ত জানতে পেয়েছে, হয়ত কত ভয় পাচ্ছে, হয়ত আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছে, এই দুর্য্যোগে কোথায় বাছা ভিজে ভিজে বেড়াচ্চে, চল আমরা তার কাছে যাই, কাল দিনের বেলা তোমার সব কথা শুনবো।"

বর সে কথা মানিল না, চরণ ছাড়িল না, ফুস্ ফুস্ করিয়া বলিল, "আর একটা কথা শোন। ভয় পেয় না, চোমকে উঠনা, আশ্চর্য্য ভেবোনা, সত্য কথা আমি কব। মা! তোমার পুনঃজন্ম হয়েছে, আমার পুনঃজন্ম হয় নাই। আমি প্রেতাত্মা। যে চেহারা আমার দেখছ, এ চেহারা আমার নয়, আমি প্রেতাত্মা। যে সকল প্রেতাত্মা সৎপথ গামি হয়, জীবনকালে যাদের পাপের ভাগ বেশী থাকে না, প্রেতলোকে প্রায়শ্চিত্তে পাপ ক্ষয় হবার পর তাহারা ইচ্ছামত রূপধারণ করিতে পারে ; আমিও তাহাই পারি, পারিয়াছিও তাই ; সুন্দর রূপ ধারণ করিয়া আমি তোমার জামাই হইয়াছি। ঘটক আমাকে জানে না। দিনকতক তোমারে দেখিয়া দেখিয়া সেই ঘটককে আমি ধরিয়াছিলাম, তোমার মেয়েকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা, জানাইয়া তোমার কাছে তাহাকে আমি পাঠাইয়া ছিলাম ; সে আমাকে সত্য সত্য সজীব মনুষ্য মনে করিয়াই তোমার কাছে আনিয়া দিয়াছে। তাহাকে একদিন কিছু টাকা দিও। আমি প্রেতাত্মা, আমারা টাকা স্পর্শ করি না, বিশুদ্ধ প্রেতাত্মাদের টাকা স্পর্শ করিতে নাই। বেচারা আমার বিস্তর উপকার করিয়াছে, মা! তুমি তাহাকে কিছু টাকা দিও।"

কিঞ্চিৎ কম্পিত কণ্ঠে ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "টাকা আমি তাহাকে অক্লেশে

দিতে পারি, দিবও তাই, কিন্তু তোমার কথা শুনে আমার ভয় হচ্ছে; তুমি আমার চরণ ধারণ কোরে রয়েছ, আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপ্‌চে। যদি মুর্চ্ছা যাই তুমি আমাকে ধোরো।"

বররূপী প্রেত বলিল, "মূর্চ্ছা তোমার হবে না হবে না, আমি মন্ত্র জানি; সে মন্ত্রের কাছে মূর্চ্ছা ঘেঁসিতে পারে না। ভয় ত্যাগ কর; মা! আমার গতি কি হবে, বল। তুমি এত বড় হয়েছে, এখন যদি আমি আবার নূতন জননী জঠরে প্রবেশ করি, দশমাস পরে ক্ষুদ্র একটি শিশু হব; সে জন্মে তোমাকে আমি মা বলে শান্তি লাভ কর্‌তে পার না। আমার ইচ্ছা কি জান মা, শীঘ্র শীঘ্র তোমার এ জন্মের খেলাধুলা সাঙ্গ হউক, এ দেহ ত্যাগ কোরে তুমি অন্য এক ব্রাহ্মণীর গর্ভে নূতন দেহ পরিগ্রহ কর আমিও জননী জঠর হইতে নূতন কলেবরে প্রসূত হব। তখন আর আমাদের উভয়ের মাতাপুত্র সম্বন্ধের কোন বাধা হবে না। পূর্ব্ব জন্মে তোমাকে আমি ঐকান্তিক শ্রদ্ধাভক্তি করে ছিলেম, এখনও সেই ভাব, সেই শ্রদ্ধাভক্তি আমার হৃদয়ে রয়েছে, তোমার চরণ আমি কিছুতেই ছাড়তে পার্‌ব না।"

ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "ইচ্ছায় কি মরণ হয়? তোমার নূতন জন্ম হবে, তারপর কতদিনে আমার মরণ হবে, আমি আবার নূতন সংসারে জন্মাব, তোমাতে আমাতে কেমন কোরে মাতা পুত্র সম্বন্ধ স্থাপন হবে।"

বর বলিল, "সে ভার আমার থাকল। তুমি বলিতে ছিলে, মূর্চ্ছা; আমি তোমার চরণ ছাড়িয়া দিলে এখনি তোমার মূর্চ্ছা আসিবে, সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিবে না; তাহা হইলেই ভগবান প্রসন্ন হইবেন।

ব্রজেশ্বরী ভাবিলেন, "বলে কি? সত্যই কি প্রেতাত্মা? উঃ! ঐ জন্যে আমার রত্নেশ্বরী শ্রীভ্রষ্ট হয়ে রোগা হয়ে যাচ্চে! ঠিক কথা! আমার রত্নেশ্বরী হয় ত বাঁচ্‌বে না! তার মরণ আমাকে দেখ্‌তে না হয়, তার জন্যে কেঁদে কেঁদে আমাকে শোক কত্তে না হয়, তা হলেই আমি বাঁচি।" ঐরূপ চিন্তা করিয়া ব্রজেশ্বরী জামাইকে বলিলেন, "তবে তুমি আমার চরণ ছাড়ো, আমি মূর্চ্ছা যাই।"

যে বুড়ীর এই গল্প, সে বলিয়াছে সেই রাত্রে ব্রজেশ্বরীর মূর্চ্ছা আসিয়াছিল, আর চৈতন্য ফেরে নাই, পরদিন প্রভাতে বরটিও অদৃশ্য হইয়াছিল। দ্বিতীয় জন্মে মাতাপুত্রে মিলন হইয়াছিল কিনা, বুড়ী তাহা জানে না।

কোষ্ঠী-শিক্ষা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত পশুপতি সরকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

একাদশাধিপতি।

একাদশাধিপতি তনুস্থানে থাকিলে জাতক ধনবান, সাত্ত্বিক, মহৎ, বাগ্মী ও কৌতুকী হয়।

একাদশাধিপতি ধন বা ভ্রাতৃস্থানে থাকিলে জাতক মহৎ, তীর্থযাত্রাপ্রিয়, শূলরোগী ও সর্ব্বকার্য্যে সফলকামী হয়।

একাদশাধিপতি পুত্র বা মাতৃস্থানে থাকিলে জাতক সুখী, পুত্রবান, ধার্ম্মিক ও সর্ব্বসিদ্ধিদাতা হয়।

একাদশাধিপতি শত্রুস্থানে থাকিলে জাতক রোগী, প্রবাসী, পরসেবক ও বহু সুখযুক্ত হয়।

একাদশাধিপতি পত্নী বা মৃত্যুস্থানে থাকিলে জাতক স্ত্রীহীন, উদার, গুণী, কৃশী ও মূর্খ হয়।

একাদশাধিপতি ভাগ্য বা কর্ম্মস্থানে থাকিলে জাতক রাজপ্রিয়, ধনবান, চতুর, সত্যবাদী ও ধার্ম্মিক হয়।

একাদশাধিপতি আয়স্থানে থাকিলে জাতক বাগ্মী, পণ্ডিত ও কবি হয়।

একাদশাধিপতি ব্যয়স্থানে থাকিলে জাতক ম্লেচ্ছসংসর্গী, কামুক, বহু স্ত্রীযুক্ত, চঞ্চলমতি ও লম্পট হয়।

দ্বাদশাধিপতি।

দ্বাদশাধিপতি তনু বা পত্নীস্থানে থাকিলে জাতক স্ত্রীসুখহীন, দুর্ব্বলকায়, রোগী, ধন বা বিদ্যাহীন হয়।

দ্বাদশাধিপতি ধন বা মৃত্যুস্থানে থাকিলে জাতক বিষ্ণুভক্ত, ধার্ম্মিক, সত্যবাদী ও সর্ব্বগুণযুক্ত হয়।

দ্বাদশাধিপতি ভ্রাতা বা ভাগ্যস্থানে থাকিলে জাতক স্ত্রী গুরু ও প্রিয়জনদ্বেষী এবং স্বার্থপর হয়।

দ্বাদশাধিপতি শত্রু বা ব্যয়স্থানে থাকিলে জাতক মাতৃ পিতৃ চিন্তাযুক্ত, ক্রোধী, পুত্রজন্য দুঃখী ও পরস্ত্রী লোভী হয়।

দ্বাদশাধিপতি কর্ম্ম বা আয়স্থানে থাকিলে জাতক পুত্রসুখহীন ও অল্প ধন-রত্নাদি সম্পন্ন হয়।

নবম অধ্যায়।

দশাফল নির্ণয়।

কলিযুগে নাক্ষত্রীকী দশাফলপ্রদ এই দশা প্রধানতঃ দুই প্রকার অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী। বিংশোত্তরী দশা মধ্য ভারতবর্ষে এবং অষ্টোত্তরী দশা বঙ্গদেশে প্রচলিত। তজ্জন্য অষ্টোত্তরী মতে ফল লিখিত হইতেছে।

দশা নির্ণয়।

কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা নক্ষত্রে জন্ম হইলে রবিরদশা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা ও অশ্লেষা নক্ষত্রে জন্ম হইলে চন্দ্রের দশা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে জন্ম হইলে মঙ্গলেরদশা; হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা নক্ষত্রে জন্ম হইলে বুধেরদশা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা বা মুলা নক্ষত্রে জন্ম হইলে শনিরদশা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, অভিজিৎ ও শ্রবণা নক্ষত্রে জন্ম হইলে রাহুরদশা এবং উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী, অশ্বিনী বা ভরণী নক্ষত্রে জন্ম হইলে শুক্রেরদশা হয়।

দশা পরিমাণ।

রবির ৬ বৎসর। চন্দ্রের ১৫ বৎসর। মঙ্গলের ৮ বৎসর। বুধের ১৭ বৎসর। শনির ১০ বৎসর। বৃহস্পতির ১৯ বৎসর। রাহুর ১২ বৎসর এবং শুক্রের ২১ বৎসর ভোগ পরিমাণ।

প্রতিনক্ষত্রের যোগফল।

যে গ্রহের দশা যতটী নক্ষত্রে ভোগ করে ৩৩ দিয়া ঐ দশা পরিমাণকে ভাগ করিলে প্রতিনক্ষত্রের ভোগকাল জানা যায়। তিনটী নক্ষত্রে রবির দশা অতএব রবিরদশা পরিমাণ ৬ বৎসরকে ৩ দিয়া ভাগ করিলে প্রতি নক্ষত্রের ভোগ কাল ২ বৎসর হয়। চারিটী নক্ষত্রে চন্দ্রের দশা, অতএব চন্দ্রেরদশা পরিমাণ ১৫ বৎসরকে ৪ দিয়া ভাগ করিলে প্রতি নক্ষত্রের ভোগ কাল ৩ বৎসর ৯ মাস হয়। তিনটী নক্ষত্রে মঙ্গলের দশা, অতএব মঙ্গলের দশা পরিমাণ ৮ বৎসরকে ৩ দিয়া ভাগ করিলে প্রতি নক্ষত্রের ভোগ কাল ২ বৎসর ৮ মাস হয়। এইরূপ চারিটী নক্ষত্রে বুধেরদশা, বুধেরদশা পরিমাণ ১৭ বৎসরকে ৪

দিয়া ভাগ করিলে প্রতি নক্ষত্রের ভোগ কাল ৪ বৎসর ৩ মাস হয়। তিনটী নক্ষত্রে শনিরদশা অতএব শনিরদশা পরিমাণ ১০ বৎসরকে ৩ দিয়া ভাগ করিলে প্রতি নক্ষত্রের ভোগ কাল ৩ বৎসর ৪ মাস হয়। চারি নক্ষত্রে বৃহস্পতিরদশা কিন্তু অভিজিৎ নক্ষত্রকে গণনার মধ্যে ধরা হয় না বলিয়া উহার ভোগ কাল উত্তরাষাঢ়া ও শ্রবণার মধ্যে অর্দ্ধেক করিয়া দেওয়া হয়, বৃহস্পতিরদশা ১৯ বৎসরকে ৪ দিয়া ভাগ করিলে প্রতি নক্ষত্রের ভোগ কাল ৪ বৎসর ৯ মাস, ইহার মধ্যে পূর্ব্বাষাঢ়ার ৪ বৎসর ৯ মাস, উত্তরাষাঢ়ার ৭ বৎসর ১ মাস ১৫ দিন, শ্রবণা নক্ষত্রেরও ৭ বৎসর ১ মাস ১৫ দিন ভোগ কাল হয়। তিনটী নক্ষত্রে রাহুরদশা অতএব প্রতি নক্ষত্রে ভোগ কাল ৪ বৎসর। চারিটি নক্ষত্রে শুক্রের দশা অতএব প্রতি নক্ষত্রের ভোগ কাল ৫ বৎসর ৩ তিন মাস।

পূর্ব্বোক্ত জাতকের শ্রবণা নক্ষত্রে জন্ম হইয়াছে। শ্রবণা নক্ষত্রে জন্ম হইলে বৃহস্পতিরদশায় জন্ম হয়। অতএব উক্ত জাতক বৃহস্পতিরদশায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। বৃহস্পতিরদশা পরিমাণ ১৯ বৎসর। ইহার মধ্যে পূর্ব্বাষাঢ়ার ভোগ ৪ বৎসর ৯ মাস ও উত্তরাষাঢ়ার ৭ বৎসর ১ মাস ১৫ দিন গত হইয়াছে। অতএব দেখিতে হইবে যে, ঐ জাতকের জন্ম সময়ে শ্রবণানক্ষত্রের কতটুকু ভুক্ত হইয়াছিল আর কি পরিমাণ ভোগ্য ছিল।

ক্রমশঃ

রথ-দর্শন।

লেখক,—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার পাত্র।

"রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।"

ভগবানের লীলাতত্ত্ব অনুশীলন করিলে, তাঁহার সকল লীলাই যেন করুণা-মাখা, চিত্তাকর্ষক, শিক্ষাপ্রদ এবং অধ্যাত্ম ভাবে পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে রথযাত্রা-লীলা একটী বিশেষ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

দ্বাপরযুগের অন্তভাগে লীলাময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে রথারোহণে গমনাগমন অবলম্বন করিয়া রথযাত্রা উৎসব ভারতে প্রচলিত। এই

সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে, তাহা স্থানান্তরে [illegible] হউক, এই লীলাকাহিনী বহু শতাব্দী অতীত হইলেও, অদ্যাপি তাঁ[illegible] তাহা স্মরণ মনন পূর্ব্বক বর্ষে বর্ষে যথা সময়ে রথযাত্রার অনুষ্ঠান করেন, এবং নিজ নিজ ভাবে অন্তরে বাহিরে লীলা বা ইষ্টরূপ দর্শনে আনন্দে বিভোর হ'ন। তত্ত্ব-পিপাসু দর্শকমণ্ডলীও সেই পবিত্র ভাবোচ্ছ্বাসের হিল্লোলে মাতিয়া আপনা-দিগকে ধন্য মনে করেন। তমমুখি কলিযুগ হইলেও যেন সত্যযুগের ক্ষণিক বা সাময়িক আবির্ভাব বলিয়া বোধ হয়।

একটী শাস্ত্রীয় বচন আছে,—"রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।" যিনি রথের মাঝে লীলাময় শ্রীহরির বামন রূপ প্রত্যক্ষ দর্শন করেন, তিনিই দুঃখসঙ্কুল জনন মরণ রূপ গতায়াত হইতে মুক্তি লাভ করেন। এ শুভাদৃষ্ট যার যখন হয়, তখন তিনি ত ধন্যই এমন কি যাহারা সেই ভগবান ভক্তের সঙ্গলাভ করেন,—তাঁহারাও ধন্য।

লীলাক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অধিকাংশ রথই দারুময়, কচিৎ কোথাও ধাতু নির্ম্মিত রথ দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন,—শ্লোকোক্ত রথের আধ্যাত্মিক অর্থ—এই দেহরথ। অর্থাৎ এই দেহরথে বামনরূপ দর্শন করিলে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না—মুক্তি লাভ করে। যুগে যুগে লীলাচ্ছলে যে যে রূপ ধারণ করিয়া ভগবান ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই সকল রূপই তাঁহার উপাসকগণ হৃদয়ে ধ্যান করেন, সেই সকল রূপের বিগ্রহ মূর্ত্তির নানা উপচারে ভক্তিভাবে পূজা ও সেবাদি করেন। এইরূপ পূজা, সেবা, ইষ্টনাম জপ, ইষ্টরূপ ধ্যান করিতে করিতে যখন সাধক তন্ময় হইয়া যান, তখন সাধকের হৃদয়মাঝে ইষ্ট দেবতার জ্যোর রূপ আর কল্পনায় থাকেনা,—চিন্ময় হইয়া যায়—যেন প্রত্যক্ষ দর্শন হইতেছে, এমন কি কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এইরূপ উপলব্ধি হয়। এই ভাবে সাধকের চিত্ত যখন নির্ম্মল হয়, তখন তাঁহার চিন্ময় ইষ্টমূর্ত্তি বামন ভাবেই কখন বা নিজ হৃদয়ে—অর্থাৎ দেহরথে কখন বা বাহিরে, অর্থাৎ বহিরথে কখন বা ঘটে ঘটে দৃষ্টিগোচর হয়। দারুময় রথও ক্ষুদ্র, মানবের দেহরথও ক্ষুদ্র, সুতরাং তিনি বিরাট রূপী হইলেও তাঁহাকে ক্ষুদ্র বা বামন হইয়াই দর্শন দিতে হয়। কিন্তু যে সাধকের এইরূপ অবস্থা ঘটে নাই—অথচ রথের মাঝে তাঁহার উপাস্য দেবতাকে বা ইষ্টকে দর্শন করিবার জন্য প্রাণ আকুলি বিকুলি করে, তখন করুণাময় শ্রীভগবান আর স্থির থাকিতে পারেন না, অচিরাৎ সেই ভক্তের মনোরথ পূর্ণ করেন।

মানব সাধারণতঃ বহির্ম্মুখি ; সুতরাং জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভগবানের এই সৃষ্ট লীলা জগৎ আর তাঁহার লীলারূপ অবলম্বন করিতে মানব বাধ্য হয়। যখন এই সকল অনুশীলন করিতে করিতে তাঁহার তত্ত্ব জানিবার জন্য, তাঁহার দর্শন পাইবার জন্য, কাহারও প্রাণে আকাঙ্ক্ষা হয়, তখন তাহার প্রাণে আকাঙ্ক্ষা বলবতী করিবার জন্য, তাঁহার দিকে চিত্ত আকৃষ্ট করিবার জন্য লীলাময় শ্রীহরি নানা ব্যবস্থা করিয়াছেন। রথলীলা তন্মধ্যে একটী দৃষ্টান্ত।

অদ্য সেই রথযাত্রা। মহা আনন্দের দিন। কি সহরে, কি নগরে, আবাল বৃদ্ধ আজি মনোমত সুন্দর সাজে সুসজ্জিত হইয়া নানা ভাবে কাতারে কাতারে রাজপথে বাহির হইয়াছে ; অনেকেরই উদ্দেশ্য রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন। এই পর্ব্ব ভারতবর্ষের নানা স্থানে, পল্লিতে পল্লিতে অনুষ্ঠিত হইলেও নীলাচল পুরুষোত্তমে রথোপরি শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনের জন্য দূরবর্ত্তী নানা স্থান হইতে আজ লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছে। কি সন্ন্যাসী, কি গৃহী, কি পুরুষ, কি নারী, জাতিবর্ণ, লজ্জা, ঘৃণা, মান, অপমান বিদায় দিয়া অসংখ্য জনতা ভেদ করিয়া অগ্রসর। এক অপরূপ দৃশ্য।

আসুন ভাই সকল! আজ এই শুভদিনে শুভক্ষণে আমরাও অগ্রসর হই। আজ জগন্নাথের আকর্ষণ! আজ পতিত-পাবন অধম-তারণ জগন্নাথ আমাদের মত সাধন ভজন বিহীন কামিনী কাঞ্চনাসক্ত মানবকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার অযাচিত কৃপা বিতরণ করিতে শ্রীমন্দির হইতে রাজপথে বাহির হইয়াছেন। সকলে দূর হইতেও দর্শন করিতে পারিবে বলিয়া উচ্চ রথোপরি তাঁহার আবির্ভাব। আসুন ভাই! আজ ভগবানের কৃপাসিন্ধু উথলিয়াছে, আজ ভাবের বন্যা আসিয়াছে, আজ কাহাকেও ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন না। যদি কাহাকেও নিম্নশ্রেণী বা সঙ্কুচিত দেখেন, সামর্থ থাকে তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলুন। তাহারা হয় ত নিজেদের ঘৃণিত ভাবিয়া আজ পতিত পাবনকে দর্শনের জন্য অধিকতর ব্যাকুল, আপনাদের ভয়ে সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, কিন্তু যাহাদের প্রাণ তাঁহার জন্য যত ব্যাকুল, জগৎ চিন্তামণি পরম দয়াল তাহাদের জন্য তত চিন্তিত। আমরা হই না কেন যেমন তেমন, আজ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে তাঁহার কৃপা বিতরণ।

ঐ দেখুন! রথের অগ্রভেদী ধ্বজা। ঐ দেখুন! মনোহর উজ্জ্বল রথে প্রাণারাধ্য দেবতা জগন্নাথরূপে বিরাজমান। ঐ দেখুন! ভাগ্যবান ভক্ত সেবকেরা আজ মনের সাধে তাঁহাকে সচন্দন গন্ধপুষ্পমাল্যে সাজাইয়াছেন!

ঐ দেখুন! তাঁহার সেবকগণ আশে পাশে প্রভুর সেবায় নিযুক্ত। ঐ শুনুন সকলের জয়ধ্বনি! ঐ শুনুন! "জয় জগন্নাথ" "জয় জগবন্ধু" রব আজ লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে। মন! তোমার কি কিছু সাধ নাই? এত দেখিয়া শুনিয়াও কি তোমার কি কিছু সাধ হয় না? সাধন ভজন বিহীন বলিয়া কি তোমার আজ ক্ষোভ হইতেছে? ক্ষোভ কিসের? একবার তুমিও "জয় জগবন্ধু," "জয় পতিত পাবন জগন্নাথ" বলিয়া ডাক, একবার সাধের ঠাকুরের নিকট প্রাণ খুলিয়া সকাতরে প্রার্থনা কর—ক্ষোভ দূর হইবে—প্রাণ জুড়াইবে।

গীত।

"তুমি হে সাধের ঠাকুর, আমি সাধ বিহীন।
(তুমি) সাধের তরে, বলির দ্বারে, বাঁধা চিরদিন॥
সাধের পণে কিন্‌তে তোমায়, সাধ হ'লোনা হায়!
আমার সাধ বিনা বিষাদে প্রভু, সাধের জীবন যায়;
(আমি) সাধ মাগি রাঙ্গা পায়;
(ওহে) সাধ দিয়ে সাধ পুরাও প্রভু আমি কৃপাধীন॥
রথের মাঝে কেমন সাজে, দেখ্‌তে বড় সাধ।
(তুমি) দীনের সখা, দিয়ে দেখা, ঘুচাও অবসাদ;
মিনতি করি হৃদয় চাঁদ;
দীনবন্ধু নামটী তোমার, আমি অতি দীন॥
প্রেমের পথে হৃদয়রথে, কর বিচরণ।
রথযাত্রা হেরে ভবের যাত্রা দিবে বিসর্জ্জন;
হবে না গমনাগমন;
জগবন্ধু বলে প্রেম সলিলে ভাসুন নিশিদিন॥"

হে জগন্নাথ! হে জগবন্ধু! হে অধম তারণ! একবার এ অধমের প্রতি কৃপা কর। দয়াল ঠাকুর! দয়া করে প্রাণে বল দাও। একি! একি হ'ল! —কে যেন আমাকে টান্‌ছে। আর যে দাঁড়াতে পারি না। একি জগবন্ধুর আকর্ষণ! ঐ রথ চলেছে,—এই দিকেই আস্‌ছে। ওঃ কি জনতা; কি ভিড়! হোক্ ভিড়, চলুন—জনতা ভেদ ক'রে, চলুন—প্রভুর রথ টান্‌তে হবে। জগবন্ধুর আকর্ষণ! "জয় জগন্নাথ," "জয় জগবন্ধু" বলিয়া রথের দড়া ধরি।

কিয়ৎক্ষণ আসিয়া রথ থামিল। বহুলোকে প্রাণপণে টানিতেছে, কিছুতেই রথ আর চলে না। যাহারা টানিতেছিল এখন তাহারাই ত টানিতেছে—বরং টানিবার জন্য লোকসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে। তথাপি রথ আর চলেনা কেন? কারণ কি?—ওঃ বুঝিয়াছি। ঠাকুর! সাধে কি তোমায় জগবন্ধু বলে,—সাধে কি লোক সাংসারিক মায়া মমতা পরিশূন্য হইয়া—সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া—এমন কি নিজ প্রাণের মমতা তুচ্ছ বোধ করিয়া তোমাকে দর্শন করিতে এতদূর আগমন করে! সাধে কি তোমার ভক্তেরা তোমায় ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু বলিয়া সম্বোধন করে! এই যে অসংখ্য লোক সমুদ্র আজ তোমায় দিব্যরথে দর্শনার্থ চতুর্দ্দিকে সমবেত হইয়াছে, ঠাকুর! তোমার রথ যদি দ্রুতগতিতে গমন করে, দুরস্থিত লোকেরা কেমনে তোমায় দর্শন লাভে সমর্থ হইবে? তোমার ইচ্ছা না হইলে লোক শত চেষ্টাতেও রথ টানিতে সক্ষম হয় না।

ঠাকুর! তোমার মহিমা অপার। তুমি কৃপা করিয়া না বুঝাইলে লোক কি করিয়া বুঝিবে, তুমি দয়া করিয়া তোমার মহিমা বুঝাইয়া দাও। তুমি নিজগুণে আকর্ষণ করিয়াছ, তাই এখানে আসিতে পারিয়াছি, তাই এই জনতা ভেদ করিয়া রথরজ্জু স্পর্শ করিতে সক্ষম হইয়াছি। যদি অধম দাসের প্রতি এতই দয়া, হে তুমি কৃপাসিন্ধু পতিত পাবন! একবার এই ক্ষুদ্র হৃদয়রথে উদয় হও, একবার রথের মাঝে বামনরূপে দর্শন দিয়া কৃতার্থ কর। হে বাঞ্ছা-কল্পতরু! বড় আশা করে তোমার আশা পথে এই রথ রেখেছি, দাসের মনোসাধ পূর্ণ কর। বিবেক বৈরাগ্য অশ্বদুটী রথে যুতে দাও; আমার মনকে ধৈর্য্য বগ্‌লা হাতে দিয়ে রথের সারথী কার্য্যে নিযুক্ত কর, যেন তোমায় অন্তরে বাহিরে দেখিতে দেখিতে এই ভবসমুদ্র নির্ব্বিঘ্নে পার হইয়া তোমার অভয় চরণে আশ্রয় পাই।

নৈরাশ্যে।

লেখক,—শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি।

নাই, নাই সুখ পৃথিবী ভিতরে,
নাই, নাই সুখ মানবের তরে।
নিঠুর বিধাতা সৃজেছেন পরে,
শুধু মরতের দুঃখ সহিবারে॥

যেথা মিলে শুধু পিশাচের মেলা।
ভগন পরাণ পদাঘাতে দলা॥
ঘন ঘন যেথা উঠে হা হুতাশ।
তারি সনে শুধু মেশে দীর্ঘশ্বাস॥
যেথা শুধু(ই) নৈরাশ চীৎকার।
মাঝে মাঝে প্রাণস্পর্শী হাহাকার॥
যেথা পিতাপুত্রে সতত বিরোধ।
মিত্রে নাহি যেথা রাখে অনুরোধ॥
সেথা—সেথা—সুখ? বলিওনা আর।
শুনে কাণ 'ঝালাপালা' হয়েছে আমার॥

সমালোচনা।

ললিত-গাথা।—শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ, বিরচিত, মূল্য এক টাকা মাত্র।

গ্রন্থকার পুস্তকের প্রথমেই নিবেদন পত্রে লিখিয়াছেন,—"গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজার মতন, দ্বিজেন্দ্রলালের "বঙ্গ আমার" গানের ভাষার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার বন্দনা করি। এই গীতটি স্যার গুরুদাস প্রভৃতি সুধীগণ বড়ই পছন্দ করেন, সেই উৎসাহে দ্বিজেন্দ্রলালের অপর গানের ভাষাগত অল্প বিস্তর পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাতে নূতন ভাবের আরোপ করিয়াছি।"

ললিতচন্দ্র সুকবি। ললিতগাথার অনেকগুলি কবিতাই প্রাণস্পর্শী; তাহা পাঠ করিলেই বুঝা যায়। তিনি হৃদয়ে যে ভাব অনুভব করিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, স্বর্গীয় মহাকবি দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দ বন্দের অনুসরণ করিয়াছেন বটে, ভাষায় প্রকাশ করেন নাই। প্রত্যেক কবিতায় তাঁহার ভাব ও ভাষা তাঁহার নিজস্ব,—তাঁহার ভাব ও ভাষা মধুর,—পবিত্র প্রসাদগুণে বিশিষ্ট। এ অনুকরণ যুগে এরূপ প্রতিভার পরিচয় তাঁহার পক্ষে বড় সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। তাঁহার পক্ষে আরও একটা বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে, মহাকবি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁহার কবিতায় স্পর্শ করিতে পারে নাই। বর্ত্তমান কালে অধিকাংশ কবির কবিতাই রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতিধ্বনি।

ললিত গাথার কবি স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের ভাব, ভাষা ও ছন্দোবন্দের ভঙ্গী সকল হৃদয়ঙ্গম করিয়া ললিত গাথার কবিতাগুলি রচনা করিয়াছেন, কবিতাগুলি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিলাম।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

২৮শ, বর্ষ। | ১৩২৯ সাল, শ্রাবণ। | ৪র্থ, সংখ্যা।

চণ্ডীকথা।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ, বিরচিত।

(৫)

শুম্ভ নিশুম্ভরে বলে, বিজিত অমর দলে,
দেবী বাক্য, করিয়া স্মরণ।
হিমালয়ে চলে যায়, স্তব করে পুনরায়,
অসুরের করিতে নিধন॥
সৌম্যা অতি, রৌদ্রা অতি, বিষ্ণুমায়া ভগবতী,
এ জগত তোমার ক্রিয়ায়।

সর্ব্বভূতে যায় নিতি, বিভূতির রূপে স্থিতি,
নমস্কার নমস্কার তায় ॥"
শরীর হইতে তার, আবির্ভাব অম্বিকার,
কৌশিকীয় নামে খ্যাত হয়।
বিনির্গতা হলে সতী, কৃষ্ণবর্ণা সে পার্ব্বতী,
কালিকায়, নগেন্দ্র আশ্রয় ॥
শুনিয়া তাহার রূপ, দৈত্য শ্রেষ্ঠ শুম্ভ ভূপ,
দূত তথা করিল প্রেরণ।
"আনানে জিনিবে যেই, ভর্ত্তা মোর হবে সেই,"
দূতে দেবী কহে পূর্ব্ব পণ ॥

(৬)

দূতবাক্যে রুষ্ট অতি, পাঠাইল মূঢ়মতি,
দেবী বধে সে ধূম্রলোচন।
অম্বিকা, রোষের ভরে, যেমন হুঙ্কার করে,
ভস্ম হয় দৈত্যের জীবন ॥
চণ্ড মুণ্ড দৈত্যদ্বয়, দেবীরে করিতে জয়,
আগমন করিল তখন।
কোপে দেবী কৃষ্ণবর্ণা, নরমালা বিভূষণা,
ললাটেতে দিল দরশন ॥
বিচিত্র খট্টাঙ্গধরা, শুষ্কমাংসে দেহভরা,
দ্বীপি চর্ম্ম আছে পরিধান।
বদন বিস্তার করে, আরক্ত নয়ন ভরে,
রণরঙ্গে উত্তেজিত প্রাণ ॥
বধ করি চণ্ড মুণ্ডে, লইল উভয় মুণ্ডে,
চণ্ডিকায় প্রদানিল যবে।

মুণ্ড লয়ে সমাগতা, কালীরে কহেন মাতা,
'চামুণ্ডা'র নামে ধন্য হবে ॥

(৭)

সর্ব্ব দৈত্য সৈন্য আসে, দেবীর বিনাশ আশে,
গুহ ইন্দ্র ব্রহ্মাদি তখন।
করিতে অসুর জয়, আপনার শক্তিচয়,
দেহ হ'তে করিল প্রেরণ ॥
হংসযুক্ত রথোপরে, অক্ষ কমণ্ডলু করে,
ব্রহ্মাণীর হয় আগমন।
বৃষারূঢ়া মাহেশ্বরী, আগত ত্রিশূল ধরি,
কৌমারীর ময়ূর বাহন ॥
শঙ্খ চক্রে বৈষ্ণবীর, নারসিংহী, বারাহীর,
ঐন্দ্রী শক্তি, করে অধিষ্ঠান।
"শীঘ্র দৈত্যে কর হত, দেবশক্তি সমাগত,"
চণ্ডিকায় কহিল ঈশান ॥
শিবা শত নিনাদিনী, চণ্ডিকায় শক্তি তিনি,
শিবে দূত করিল নিয়োগ।
রোষ বশে শিবরাণী, শুম্ভ আদি নাহি মানি,
শস্ত্র আদি করিল প্রয়োগ ॥

(৮)

রক্তবীজ মহাক্রুদ্ধ, আসিল করিতে যুদ্ধ,
দেখি তারে সকলে স্তম্ভিত।
রক্ত বিন্দু যদি তার, পড়ে অঙ্গে বসুধার,
শত দৈত্য হইছে সৃজিত ॥

যেমন বাসনা জয়, সমূলে করিতে ক্ষয়,
একবিন্দু থাকে যদি তার।
আবার বাসনা রাশি, তড়িতের বেগে আসি,
চিত্ত পুন করে অধিকার ॥
দেখিল মাতৃকা যত, রক্তবিন্দু ভূমিগত,
পুন দৈত্য করিছে নির্ম্মাণ।
চণ্ডী কহে চামুণ্ডারে, "বিনির্গত রক্তধারে,
কর শূন্যে অবিরত পান ॥"
রক্তবীজ রক্তমুখে, চামুণ্ডা লইল মুখে,
দেবী দৈত্যে করিল নিধন।
পূর্ণানন্দ দেবগণ, দেহজাত মাতৃগণ,
নৃত্য সবে করিল তখন ॥

(৯)

দেবী, মাতৃশক্তিযুক্ত, নিশুম্ভ হইল হত,
শুম্ভ তারে করিল বিদ্রূপ।
নিজে বাহি শক্তিধর, অন্য বলে রণ কর,
দেবী তারে কহেন স্বরূপ ॥
আমার বিভূতি সবে, আমি ভিন্ন নাহি ভবে;
দেখ দেহে হইতেছে লীন।
হইলেন একাকিনী, নিজ-তেজে গরবিনী,
শুম্ভ হ'ল জীবন বিহীন ॥
দেবগণ ভক্তি ভরে, দেবী পদে স্তব করে,
"প্রশমন সকল বাধায়।
তুমি দেবী দাও স্বর্গ, তোমা হ'তে অপবর্গ,
নারায়ণি, প্রণাম তোমায় ॥

সকল মঙ্গল দিবে, সর্ব্বার্থ সাধিকে শিবে,
ত্রিনয়নি, সবায় শরণ।"
গৌরী আনন্দিত মনে, বর দিয়া দেবগণে,
ভবিষ্যত কহিল তখন ॥

(১০)

যশোদা হইবে মাতা, নন্দ গোপগৃহে জাতা,
অম্ব শুম্ভ নিশুম্ভ যখন।
অবতরি বিন্ধ্যাচলে, দুই জন মোর ছলে,
পরস্পরে করিবে নিধন ॥
অতি রৌদ্ররূপ ধরে, বিপ্রচিত্ত নাশ ক'রে,
পাব স্তব রক্ত-শুম্ভকায়।
অনাবৃষ্টি অবিরাম, 'রোধি, শতাক্ষী'র নাম,
"শাকম্ভরী" ভুবনে সবায় ॥
'দুর্গম' অসুর নাশে, 'দুর্গাদেবী' সবে ভাষে,
রক্ষা করি শৈলে মুনি যত।
লভি' শান্তি অভিরাম, 'ভীমাদেবী' দেয় নাম,
ভক্তি ভরে হইয়া প্রণত ॥
ত্রিলোক হিতের তরে, 'অরুণে'রে বধ করে,
'ভ্রামরী'র আখ্যা পাই আর।
দানবের বাধা যদা, অবতীর্ণ হব তদা,
সাধিবারে অরাতি সংহার ॥

(১১)

হয়ে সদা সমাহিত, যবে তোমে মম চিত;
সর্ব্ব বাধা করি তার ক্ষয়।

কহিয়া মাহাত্ম্য কথা দূর করি সব ব্যথা,
দেব দেহে হইলেন লয়॥
জগত পালন তরে, অবতার রূপ ধরে,
আপনারে করেন সৃজন।
শুনিয়া মাহাত্ম্য সবে, সমাধি সুরথ তবে,
তপস্যায় করিল গমন॥
মহীময়ী প্রতিমায়, বিরচিল চণ্ডিকায়,
পূজা তাঁর করিল পুলিনে।
তপনে সন্তুষ্টা অতি, নৃপে কহে ভগবতী,
রাজ্য তুমি পাবে স্বল্পদিনে॥
প্রণমি জননী পায়, সমাধি, সমাধি চায়,
লাভ করে পূর্ণ মোক্ষ জ্ঞান।
তব পদে সদা মতি, রহে যেন ভগবতী,
কর মাতা এই ভিক্ষা দান॥

(১২)

মানবের হৃদয়েতে, মানবের সৃষ্টি হ'তে,
সেই যুদ্ধ চলে অবিরাম।
সেই সখ্যে জিনিবারে দেয় শিক্ষা বারে বারে,
সুরাসুরে কঠোর সংগ্রাম॥
বিবিধ দৈত্যের রূপে, দুর্ব্বিনীত বৃত্তি জাগে,
ক্ষিপ্ত সদা করিতে বিরোধ।
আত্ম সংযমের বল, তাহাদের অবিরল,
মহাতেজে করিছে বিরোধ॥
পাপের প্রবৃত্তি চয়, সতত হইবে ক্ষয়,
চণ্ডীকথা করিলে শ্রবণ।

জয়ন্তী মঙ্গলা কালী, কপালিনী ভদ্রকালী,
তার পদে প্রণত সকল।
ছন্দের ললিত স্বরে, গীত হ'ক ঘরে ঘরে,
সুপবিত্র চণ্ডিকা মঙ্গল॥
অন্তরে পুণ্যের ভাতি, সুশোভিত দিবারাতি,
শান্তি সুধা করিবে বর্ষণ॥

সাধক-কমলাকান্ত।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কেশারাম চট্টোপাধ্যায়ের সহিত এইরূপ সদালাপে দিবস অতীত হইল। কার্ত্তিকের শেষ, সায়ংকাল উপস্থিত, শিশির মণ্ডিত সূর্য্যদেব অতি সুখস্পর্শ হইয়া পশ্চিম গগনে শয়ন করিতেছেন। আকাশ অতি নির্ম্মল, প্রকাণ্ড নীল পটের ন্যায় বৃহৎ তরুরাজির অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হইতেছে। আজ শুক্ল ত্রয়োদশী, সুষমা সজ্জিত প্রায় পূর্ণ কলেবর প্রিয়দর্শন নিশানাথ সুনীল পূর্ব্বগগনে ইতি মধ্যেই অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন। বর্ষার অবসান হইলেই খড়্গেশ্বরী পূর্ণ কলেবরা, তীব্র বাহিনী। নদীপারে গমনাগমনে নৌকার প্রয়োজন। সাধক কেশারামকে বিদায় দিয়া নদীপারে শৌচার্থে চলিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রদোষ সময়ে নদীপারে যাইতেন। নৌকাবাহিয়া তাঁহাকে পার করিবার জন্য দেবী বিশালাক্ষীর ঘাটের নিকট উপস্থিত থাকিত। চান্না গ্রামের পার ঘাট দেবী বিশালাক্ষীর মন্দির হইতে কিছু দূরবর্ত্তী ছিল। নৌকা বাহিয়া চান্নার পার ঘাটে সর্ব্বদা থাকিত, কেবল সাধককে পার করিবার জন্য সকাল সন্ধ্যায় দেবী বিশালাক্ষীর ঘাটে আসিত। সাধক ঘাটে আসিয়া দেখিলেন, নৌকা বাহিয়া উপস্থিত নাই। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া নৌকাবাহিয়া দেবী বিশালাক্ষীর ঘাটে আসিবে এমন সময় কয়েকজন ভদ্রলোক তাহাদিগকে পার করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। নৌকাবাহিয়া কহিল, "আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, সন্ধ্যা হইয়াছে, এতক্ষণ নিশ্চয়ই দেবীর পার ঘাটে

আমাদের ঠাকুর আসিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে পার করিয়া শীঘ্র আসিয়া আপনাদিগকে পার করিতেছি।” আগন্তুকগণ কহিলেন, “আমাদিগকে অনেক দূর যাইতে হইবে, রাত্রি হইবে, অগ্রে আমাদিগকে পার করিয়া দাও, তাহার পর ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পার করিও।” এমন সময় সাধক নদীকূলে দাঁড়াইয়া খড়্গেশ্বরীর গৌরবগমন এবং প্রতিতরঙ্গ বিক্ষেপে আনন্দময়ীর নৃত্য অবলোকন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে পূরবীরাগে গাহিলেন :—

লয়ে চল ভব নদী পার (গো মা মোরে)।
আমি অতি অকৃতি অধম দুরাচার ॥

নৌকাবাহিরা ভদ্রলোকদিগকে কহিল, “মহাশয়রা ওই শুনুন, আমাদের ঠাকুর বিশালাক্ষীর ঘাটে আসিয়াছেন, তাঁহার মধুর গান শুনিয়া আমাদের হাতের হাল আল্‌গা হইতেছে।” ভদ্রলোকগণ কহিলেন, “তোমাদের বিলম্বের কারণ ঠাকুরকে বলিলে, তিনি নিশ্চয়ই সুখী হইবেন, তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন, আমাদের রাত্রি হইবে, আমাদিগকে অগ্রে পার করিয়া দাও, তোমাদিগকে পারের পয়সা দ্বিগুণ দিব।” দূরবর্ত্তী বংশীধ্বনির ন্যায় সাধকের কণ্ঠস্বর খড়্গেশ্বরীর উভয়কূল উল্লাসিত করিয়া শ্রুত হইল :—

সম্বল আছিল যার, অনায়াসে হ'ল পার,
কিছু ধন নাহিক আমার (যে নাবিকে দিব মা)
প্রদোষ সময়ে, ধরম তরিবার নেয়ে,
চেয়ে আছি চরণ তোমার (গো কৃপাময়ী)

নৌকাবাহিরা বলিল, “ওই শুনুন, ঠাকুর তাঁহার পয়সা নাই এই কথা মায়ের কাছে বলিতেছেন। আমরা সকাল সন্ধ্যায় প্রথম খেওয়া অমনি পার করি, পয়সা লই না। ঠাকুরকে না পার করিয়া আপনাদিগকে পার করিতে পারিব না, আপনারা একটু দাঁড়ান।” এই বলিয়া নৌকাবাহিরা সাধককে পার করিবার জন্য চলিল। সাধক আবার গাহিলেন :—

অজ্ঞানে হয়েছি অন্ধ, পথে নানা প্রতিবন্ধ,
ভবসিন্ধু অতি অনিবার (কিসে পার হব মা)।
কমলাকান্তের এই, নিবেদন ব্রহ্মময়ী,
তুমি মোরে করিবে নিস্তার। "

সাধকের সমুদয় গীত এক এক ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া বিরচিত হইয়াছিল। গান বাঁধিবার ইচ্ছায় চিন্তা করিয়া কোন গীত রচিত হয় নাই। অনু-

গত লোকদিগের সহিত কথপোকথন সময় কিম্বা প্রকৃতির রূপ বৈচিত্র্য দর্শনে যখন যেমন চিন্তার উদয় হইয়াছে, তখন সেইরূপ সঙ্গীতের সৃষ্টি হইয়াছে। বিশেম ডাকাইতের সহিত ওড়গ্রামের ডাঙ্গায় সাধকের সাক্ষাৎ তাঁহার জীবনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিশে ডাকাত সাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এবং যতদিন জীবিত ছিল, সাধকের সহবাস দিনেকের জন্যও পরিত্যাগ করে নাই। সাধকের সহিত সাক্ষাতের পরও বিশের জগাই মাধায়ের ন্যায় বিশুদ্ধ বৈরগ্যের উদয় হইয়াছিল। সাধক তাহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, তাহার আত্মগ্লানি, ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ দেখিয়া সাধক তাহাকে পরমভক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

ওড়গ্রামের ডাঙ্গায় বিশে ডাকাইতের সহিত সাধকের সাক্ষাৎ ও বিশে ডাকাইতের সাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ।

সাধক অমরারগড়ে তাঁহার বন্ধু কেণারাম চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে পদার্পণ করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। আজ তাঁহার কেণারামকে দর্শন করিবার ইচ্ছা হইল। চান্না হইতে অমরারগড় গ্রাম প্রায় সাত আট ক্রোশ। চান্নার পশ্চিম অমরারগড়। অনেক গ্রাম, প্রকাণ্ড মাঠ ও ডাঙ্গা পার হইয়া অমরারগড় যাইতে হয়। জগদম্বা বিশালাক্ষীর চরণে বিল্বদল ও জবা নয়নজলে প্রদান করিয়া সাধক আহারান্তে বন্ধুদর্শনে চান্না হইতে বহির্গত হইলেন। সাধকের সহাস্য বদন, তাঁহার শ্মশ্রুজাল মণ্ডিত মুখমণ্ডল জলদজাল বেষ্টিত শশধরের ন্যায় বোধ হইতেছে। তাঁহার গলে রুদ্রাক্ষমালা, পরিধানে গেরুয়া বস্ত্র, বগলে গাত্রমার্জ্জনী বদ্ধ দ্বিতীয় বস্ত্রখণ্ড। সাধক খড়্গেশ্বরী পার হইয়া প্রশস্ত শস্যক্ষেত্র মধ্যে সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছেন। কার্ত্তিক মাসের শেষ ভাগ, ধান্য সকলের মধ্যে কোন জাতীয় ধান্য পরিপক্ক অবস্থায় মস্তক অবনত করিয়া স্বর্ণপুংক্তির ন্যায় সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে। কোন জাতীয় ধান্য গর্ভাবস্থায়, কেহ বা সদ্য প্রসূতা। সাধক মানবের প্রাণস্বরূপ ধান্য সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অতি প্রফুল্ল মনে বিশ্ব প্রতিপালিনী পরমেশ্বরীর পদে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, “মা তোমার এ মূর্ত্তি বড় মনোরম, তাই ভারতবাসী হিন্দুগণ

তোমার এ মূর্ত্তিকে শারদীয় পূজায় নব পত্রিকার অঙ্গ গ্রহণ করিয়া পূজা করিয়া থাকেন। মা এই বিশ্বমাঝে সকল বস্তুই তোমার অসীম করুণার চিহ্ন স্বরূপ।"

সাধক ক্রমে ক্রমে অনেক গ্রাম বিবিধ শষ্যক্ষেত্র পার হইয়া ওড়গ্রামের ডাঙ্গার পূর্ব্বপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। ওড়গ্রামের ডাঙ্গা একটী বিস্তৃত প্রান্তর, প্রায় একক্রোশ ব্যাপী। সাধককে ঐ প্রান্তর পার হইয়া যাইতে হইবে। দিনমণির করজাল অতি ক্ষীণ ও সুখস্পর্শ। দিক মণ্ডল ও আকাশ মণ্ডলে ব্যাপ্ত গৌর-কররাশি দূরস্থিত প্রকৃতি মণ্ডলের শিরোদেশে ও ওড়গ্রামের প্রান্তরে পাতিত হইয়া অবনীকে রজতময়ী করিয়া অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিয়াছে।

সাধক ক্রমে ক্রমে ওড়গ্রামের ডাঙ্গার মধ্যদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যদেব অস্তাচলে শয়ন করিয়াছেন। কখনও অন্ধকার হয় নাই। লোহিতবর্ণ মেঘশ্রেণী পূর্ব্ব ও দক্ষিণ আকাশে দৃষ্ট হইতেছে। সাধক অপেক্ষাকৃত দ্রুতপদে চলিতেছেন। এমন সময় মানুষের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। তিনি পশ্চাৎভাগে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, ভীষণাকার কয়েকজন শড়কী হস্তে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে।

তাহারা কৃষ্ণকায় ও বলিষ্ঠ। তাহাদের মস্তকে দীর্ঘকেশ, পরিধান বস্ত্র আজানুলম্বিত ও মল্লবেশে কটিবদ্ধ, হস্তে শড়কী বা দৃঢ় কাষ্ঠনির্ম্মিত অনতিদীর্ঘ লাঠী। সাধক দেখিলেন, তিনি ডাকাইতের হস্তে পড়িয়াছেন, আর নিস্তার নাই। যমদূতের হস্তে নিস্তার আছে কিন্তু ডাকাইতের হস্তে পরিত্রাণের উপায় নাই। সাধকের কিছুমাত্র ভয়ের সঞ্চার হইল না। তিনি ভুবন মোহিনীর ধ্যান করিয়া তাহাদের গতি নিরীক্ষণ পূর্ব্বক হাস্যমুখে দণ্ডায়মান রহিলেন, দেখিলেন, শ্মশানবাসিনী ডাকিনী পরিবৃতা হইয়া অট্ট অট্ট হাসে তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার বেশ ভয়ঙ্করী হইলেও অভয় বরদামূর্ত্তি, বদনে কাদম্বিনী শোভা, নয়নে করুণাদৃষ্টি। সাধক হাস্য করিয়া কহিলেন, "ইচ্ছাময়ী তোমার ইচ্ছা পরিপূর্ণ হউক।" ডাকাইতেরা শড়কী নিক্ষেপ করিতে করিতে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতে লাগিল। সাধক ভাবিলেন, "নিকট মরণ এবং প্রাণ খুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে গাহিলেন :—

আর কিছু নাই শ্যামা তোমার, কেবল দুটি চরণ রাঙ্গা।
শুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারী অতেব হলেম সাহস ভাঙ্গা॥
জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা, সুখের সময় সবাই তারা,
বিপদ কালে কেউ কারো নয়, ঘরবাড়ী ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা॥

নিজগুণে যদি রাখ, করুণা নয়নে দেখ,
নইলে জপ করে যে তোমায় পাওয়া সে সব কথা ভূতের সাঙ্গা॥
কমলাকান্তের কথা, মারে বলি মনের ব্যথা,
জপের মালা ঝুলি কাঁথা, জপের ঘরে রইল টাঙ্গা॥

সাধক এই ভীষণ বিপদকালে পৃথিবীর মধ্যে জগদম্বা ব্যতীত আর অবলম্বনের পাত্র কিছু নাই ভাবিয়া বলিতেছেন, "মা আমি চিরকাল তোমার চরণ সম্বল করিয়াছি, চরণে শরীর মনপ্রাণ সব সমর্পণ করিয়াছি, আমার এইরূপ পরিণাম কি উচিত? শুন তোমার চরণে ত্রিপুরারী ভিন্ন কাহারও অধিকার নাই, যদি তাই হয়, তাহা হইলে আমার এইরূপ পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। মা! আমি তোমাকে ভালবাসিয়া জ্ঞাতিবন্ধু দারা সুত ঘরবাড়ী সব ত্যাগ করিয়া কত জপ তপ করিয়াছি, তথাপি আমার পরিণাম এইরূপ হইবে? হায় হায়! আমি ভাবিতেছি, আমি ভেক লইয়াছি ও আমি সাধক হইয়াছি, আমার অহঙ্কার আসিয়াছে, আমি ফলাকাঙ্ক্ষা করিতেছি, বুঝিয়াছি, জননী তোমার দয়া না হইলে জপ তপে কিছু হয় না। এখন আত্মীয় স্বজনই বা কি করিত, তারা কি আমাকে এই ঘৃণিত পরিণাম হইতে রক্ষা করিতে পারিত। মা বিদায় দাও, একবার করুণানয়নে চাও, সেই হাসিভরা মুখ দেখিয়া নয়ন মুদ্রিত করি। মা আর একটী কথা বলি, আমার বড় সাধের জপেরমালা ঝুলিকাঁথা, জপের ঘরে টাঙ্গান আছে, সব তোমারই জিনিষ তোমাকেই দিয়া চলিলাম।"

ডমরুর বাদ্য শ্রবণে বিষধরের ন্যায় ডাকাইতেরা সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া দাঁড়াইল, সাধকের প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া রহিল। তাহাদের হস্ত পদ উদাসীন, যেন কি এক মোহিনী শক্তি তাহাদিগকে স্থাবরের ন্যায় করিয়া তুলিল। তাহাদের মধ্যে প্রধান ডাকাইতের নাম বিশে ডোম, তাহার জন্মান্তরের সুকৃতি বিস্তর ছিল। বিশে সাধকের চারিদিকে কি এক জ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, ভাবিল, এই সাধু স্বর্গের দূত, মহাপুরুষ, ভৈরব। তাহার হৃদয় দ্বার খুলিয়া গেল, হৃদয় কলুষ ভক্তিরস্রোতে ভাসিয়া গেল। পাপ কল্পনা ধূলিজাল ভক্তিবারিতে বিদূরিত হইয়া হৃদয় নির্ম্মল হইল। বিশে গদ্‌গদ্ স্বরে কহিল, "কে তুমি?" সাধক হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "কালী কিঙ্কর কমলাকান্ত, বাড়ী চান্না।" বিশে বলিল, "চান্নার কমল ঠাকুর!" সাধক বলিলেন, "হঁ।" বিশে উন্মাদের ন্যায় দৌড়িয়া আসিয়া সাধকের পদযুগল ধরিয়া পতিত হইল। বিশে ডাকাইতি করিবার জন্য বাহির হইবার পূর্ব্বে

কালীর চরণে জবা, বিল্বজল ও পদ্ম দিয়া জয় প্রার্থনা করিত। বিশে সাধকের চরণে সেই পদ্মগন্ধ পাইল, মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিল, সাধক কমলাকান্ত নহেন, তাহার মা কালী। বিশে আবার সাধকের চরণে মস্তক স্থাপন করিলেন। সাধক তাহাকে হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন। বিশে করযোড়ে ছবির ন্যায় দাঁড়াইল। তাহার হৃদয় ব্যাকুল, সাধকের দিকে একদৃষ্টি, নয়নে জল। সাধক তাহার ভক্তিপূর্ণ ভাবান্তর দেখিয়া জগদম্বার ধ্যানে তাহার সহিত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "মা লীলাময়ী, তোমার বুঝি এই অভিনয়টুকু দেখিবার ইচ্ছা ছিল, তাই আমাকে এই প্রান্তরে আনিয়া তোমার অপার করুণার পরিচয় দিলে, এ ঘোর পাষণ্ডেরও বিকার জন্মাইলে। এখন বোধ হইতেছে এবার আমাকে রক্ষা করিলে। বিশ্ব জননী! তুমিই জান আমি এ সংসারের কোন্ উপকারে আসিব।" বিশের সঙ্গীগণ বিশের এই প্রকার ভাবান্তর দেখিয়া ভাবিল, "বিশের একি হ'ল, ব্রাহ্মণ বোধ হয় কিছু মন্ত্র জানে। বিশে আমাদিগকে বলিত, সন্ন্যাসী, ফকিরের ঝুলির ভেতর বেশ দশটাকা থাকে, আজ কাল অনেক লোক আমাদের ভয়ে সাধু সন্ন্যাসীর বেশ ধরে যাওয়া আসা করে, যে রকম বিশের গতিক দেখ্‌ছি বুঝি শুধুহাতেই বা ঘরে ফিরে যেতে হয়, যা হ'ক ঠাকুরের গানটা শুনে আমাদেরও যেন প্রাণ কেমন করে উঠ্‌লো, আজ বোধ হচ্ছে দুই একটা গান শুনেই ঘরে ফিরে যেতে হবে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া বিশের সঙ্গীগণ তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, "ওরে তোর কি হ'ল, গান শুনে অবাক হয়ে গেলি যে, কাঁদ্‌ছিস্ কেন?" সাধককে সম্বোধন করিয়া কহিল, "হাঁ ঠাকুর! বিশের একি হ'ল, বিশে আজ পর্য্যন্ত এক পয়সার লোভ ছাড়্‌তে পারে নাই, তুমি বুঝি কিছু মন্ত্র জান, মন্ত্রটা ফিরে নাও, বিশেকে পাগল করো না, যাও বাবা আস্তে আস্তে চলে যাও।" উহাদের মধ্যে একজন বলিল, "তুমি মায়ের গান গেয়ে বেড়াও, তাই মা তোমাকে আজ বাঁচিয়ে দিলে, তোমার গলাটি বড় মিঠে; আর একখানা গান গাওনা ঠাকুর!" ডাকাইতদিগের মধ্যে অন্য একজন কহিল, "আষাঢ়ে নবমীতে বিশালাক্ষী মার খুব ধুমধামে পূজো হয়, আমি দু'একবার পূজো দেখ্‌তে গিয়েছি, কমল ঠাকুরের গানও শুনেছি, তোমার চেহারাটা কোমল ঠাকুরের মত বটে, কমল ঠাকুর হাতে তাল দিয়ে যে রকম গান করে সে রকম হাতে তাল দেবার ক্ষমতা কারো নাই, তার হাতের তাল বাজনার চেয়ে মিঠে, যদি তুমি কোমল ঠাকুর হও, তেমনি করে হাতে তাল দিয়ে গাও দেখি, গাও ঠাকুর! এবার তাল দেয়া দেখে বুঝ্‌বো কোমল

ঠাকুর কিনা।" বিশের সেই ভাব, স্থিরদৃষ্টি, সাধকের চরণের দিকে, করযোড়ে দণ্ডায়মান, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস। ডাকাইতদিগের মধ্যে জনৈক বিশেকে আবার সম্বোধন করিয়া কহিল, "ওরে একি ভণ্ডামী যুড়্‌লী, কথা ক'স না কেন? গান শোন।" সাধক বিশ্বজননীর ধ্যান করিয়া দেখিলেন, বরাভয় ধারিণী নির্জ্জন প্রান্তরে মৃদুহাস্যে নৃত্য করিতেছেন; ডাকাইতদিগের ভীষণমূর্ত্তি দর্শন করিয়া দেখিলেন, তাহাদের মধ্যেও স্নেহময়ীর আবির্ভাব। তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তিনি কহিলেন, "জননী আজ আবার একি ভাব! করে যষ্টি, মল্লবেশ, প্রান্তর প্রদেশে শরণাগত সন্তানকে লইয়া একি অভিনয়! বড়ই রঙ্গ জান মা! তোমার উপর এখন আমার অভিমান হইতেছে। সন্তানের উপর একি বিড়ম্বনা! তুমি আমাকে বলিবে বিধির লিখন যে দিন যেমন সেই রূপে যাবে সেদিন। বিধির লিখন ত কর্ম্মফলের বশবর্ত্তী। হে মা! জিজ্ঞাসা করি যদি আমার কর্ম্মফল আমাকে ভোগ করিতে হইবে, তবে তুমি কি জন্য? আমি ত তোমার নিতান্ত শরণাপন্ন, তুমি আমাকে যে পথে ভ্রমাইতেছ আমি সেই পথে ভ্রমিতেছি, যাহা করাইতেছ তাহাই করিতেছি, তবে আমার সুখ দুঃখ কি? আমার আবার কর্ম্ম কি? কর্ম্মফল কি? তুমিই আমার কর্ম্ম। বুঝেছি, জননী তুমি আমাকে বুঝাইলে শমন শঙ্কট অতি কঠিন সময়। সেই শমন শঙ্কটে মানবের তোমা ভিন্ন অবলম্বনের, শান্তির পদার্থ আর নাই। মানব জীবনে কত আসে, কত যায়, কত হয়, কিন্তু মৃত্যুর সময় তুমিই একমাত্র আধার, একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র শান্তি। মা বুঝেছি, সেই ভীষণ সময়ের জন্য তোমার নিতান্ত প্রয়োজন।" ডাকাইতেরা বলিল, "হাঁ ঠাকুর তুমিও যে বিশের মত হা করে দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌তে লাগ্‌লে, আজকার রাতটা এইখানেই কাটাবে নাকি? আর একটা গান গাওনা, হাতে তাল দিয়ে গাইবে, দেখ্‌বো তুমি কমল ঠাকুর কিনা?" সাধক হাতে তাল দিয়া গাহিলেন :—

তারা! তবে তোমার ভরসা বল কে করে।
যদি আপনারি কর্ম্মফল ফলিবে আমারে ॥
যে পথে ভ্রমাও তুমি, সেই পথে ভ্রমি আমি
মিছে সুখ দুঃখ ভাগী কর গো আমারে ॥
কমলাকান্তের এই নিবেদন ব্রহ্মময়ী
শমন শঙ্কট যদি না থাকিত নরে ॥

ক্রমশঃ

কোষ্ঠীর ফল।

লেখক,—ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাহিত্য-বিশারদ।

কোষ্ঠীর লিখিত ফল মিলে না বলিয়া অনেকে "ফলিত জ্যোতিষের" প্রতি অবিশ্বাস করেন। কিন্তু মনে রাখা উচিত শাস্ত্র অবিশ্বাস্য নহে। দোষ আমাদের; আমরা শাস্ত্রের নিগূঢ়ার্থ অবগত না হইয়াই শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া বসি।

এ দেশের অনেক জ্যোতির্ব্বিদ নবগ্রহের বলাবল ও শুভাশুভত্ব বিচার না করিয়াই কোষ্ঠীতে সাধারণ একটি ফল লিখিয়া থাকেন। জাতকের বৃহস্পতির দশা পড়িয়াছে, দেখিলে অমনই লিখিয়া বসিলেন :—

"রাজ্যাস্পদং তনয় বিত্ত বিশাল ভোগান্
পর্য্যাপ্ত সৌখ্যং ধনধান্য সমাশ্রয়ঞ্চ।
ধর্ম্মার্থকাম সুখভোগ বহু প্রয়োগং
যাবদ্ বৃহস্পতি দশা পুরুষোহি তাবৎ॥"

ঐ বৃহস্পতি তাহার পক্ষে কিরূপ ফলদাতা তদ্বিষয়ে কিছুই বিচার করা হইল না, সুতরাং ফলেরও বিলক্ষণ অনৈক্য ঘটিল।

জ্যোতিষশাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে, নৈসর্গিক শুভগ্রহগণ (বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও পূর্ণচন্দ্র) অবস্থানুসারে অশুভ এবং নৈসর্গিক অশুভ গ্রহগণ (রবি, মঙ্গল, শনি, রাহু, কেতু ও ক্ষীণচন্দ্র) অবস্থানুসারে শুভফলদাতা হইয়া থাকে। কাযে কায়েই শনির দশায় "মিথ্যাপ্রবাদবধবন্ধ নিরাশ্রয়ত্বং চৌরাদি ভূপতিভুজঙ্গম ভীতিমগ্নং"—ইত্যাদি কুফল লাভের পরিবর্ত্তে অনেকে হয়ত রাজৈশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে।

যে গুরু শুক্রকে বিশেষ শুভগ্রহ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাদেরই কথা আবার শাস্ত্রকর্ত্তা কি বলিতেছেন দেখুন,—

"কেন্দ্রাধিপত্য দোষস্তু বলবান্ গুরুশুক্রয়োঃ।
মারকত্বেপি চ তয়োর্ম্মারক স্থান সংস্থিতি॥"

জন্ম পত্রিকায় যে রাশিতে "লং" অক্ষর লিখিত থাকে সেই রাশিকে লগ্নস্থান বা তনুস্থান কহে। লগ্নস্থানে বয়স, বর্ণ, আয়ুঃ প্রভৃতি বিচার্য্য। বামাবর্ত্তক্রমে লগ্নের দ্বিতীয় রাশিতে ধন; তৃতীয়ে সহজ; চতুর্থে বন্ধু ও সুখ; পঞ্চমে বিদ্যা, বুদ্ধি ও সন্তান; ষষ্ঠে শত্রু ও পীড়াদি; সপ্তমে স্ত্রী; অষ্টমে মৃত্যু; নবমে ধর্ম্ম,

দশমে কর্ম্ম, মান ও কীর্ত্তি; একাদশে আয় এবং দ্বাদশে ব্যয়াদি সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়।

এই দ্বাদশ স্থানের অপর নাম দ্বাদশভাব, যথা—তনুভাব, ধনভাব, সহজভাব ইত্যাদি। লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম ভাব স্থান গুলি "কেন্দ্র" এবং পঞ্চম ও নবম ভাবস্থান "ত্রিকোণ" নামে বিখ্যাত।

মেষ, বৃষ, মিথুন প্রভৃতি দ্বাদশ রাশিরই এক একটি অধিপতিগ্রহ আছে।

মেষ ও বৃশ্চিকের অধিপতি মঙ্গল; বৃষ ও তুলার অধিপতি শুক্র; মিথুন ও কন্যার অধিপতি বুধ; ধনু ও মীনের অধিপতি বৃহস্পতি; মকর ও কুম্ভের অধিপতি শনি; সিংহের অধিপতি রবি এবং কর্কটের অধিপতি চন্দ্র।

এখন উপরি লিখিত শ্লোকটির অর্থ বুঝুন। বৃহস্পতি ও শুক্র যদি কেন্দ্রাধিপতি হইয়া অর্থাৎ লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম বা দশমস্থানের অধিপতি হইয়া মারকস্থানে (লগ্নের দ্বিতীয় ও সপ্তমস্থান) স্থিত হয় তবে ঐ দুইগ্রহ অপরাপর মৃত্যুকারক গ্রহ অপেক্ষা প্রবল মারক বলিয়া গণ্য হইবে।

শনিগ্রহের নাম শুনিলে ত আমরা ভয়ে অস্থির হই। ঐ দুষ্টগ্রহ তুষ্ট হইলে আবার কিনা করিতে পারে।

"কেন্দ্রে শনৌ ত্রিকোণে বা সোচ্চমূলত্রিকোণগে।
রাজ্যাধিপেন সংদৃষ্টে নৃপমাল সমন্বিত॥"

প্রত্যেক গ্রহের এক একটি উচ্চস্থান আছে। রবির মেষ, চন্দ্রের বৃষ, মঙ্গলের মকর, বুধের কন্যা, বৃহস্পতির কর্কট, শুক্রের মীন, শনির তুলা, রাহুর মিথুন এবং কেতুর ধনুরাশি উচ্চস্থান। উচ্চগ্রহকে "তুঙ্গী" বলে। তুঙ্গীগ্রহ মাত্রই মহাবলশালী ও সুফলপ্রদ। ভগবান্ রামচন্দ্রের জন্ম সময়ে পাঁচটি গ্রহ তুঙ্গী ছিল; পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণেরও চারিটিগ্রহ উচ্চস্থ।

* শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের জন্ম-পত্রিকা।

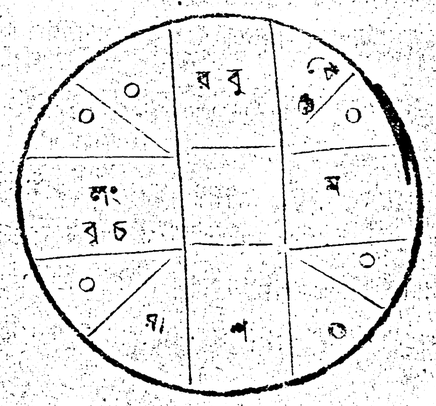

উচ্চস্থান ব্যতীত গ্রহদিগের আর একটি সুখের স্থান আছে। উহার নাম "মূলত্রিকোণস্থান।" রবি ও কেতুর সিংহ, চন্দ্রের বৃষ, মঙ্গলের মেষ, বুধের কন্যা, বৃহস্পতির ধনু; শুক্রের তুলা এবং শনি ও রাহুর কুম্ভরাশি মূলত্রিকোণস্থান।

"কেন্দ্রেশনৌ" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইতেছে যে, শনি যদি নিজ উচ্চ (তুলারাশি) বা মূলত্রিকোণ (কুম্ভরাশি) গৃহগত হইয়া কেন্দ্রে বা ত্রিকোণে অবস্থিতি করে এবং দশমাধিপতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয় § তবে সে মানব রাজতুল্য গৌরবান্বিত হইয়া থাকে।

"মধুমাসি সিতেপক্ষে নবম্যাং কর্কটে শুভে
পুনর্ব্বসুবৃক্ষসহিত উচ্চস্থে গ্রহ পঞ্চকে।
মেষং পুষণিসংপ্রাপ্তে পুষ্পবৃষ্টি সমাকুলে
আবিরাশিজ্জগন্নাথঃ পরমাত্মা সনাতন॥"

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মপত্রিকা।

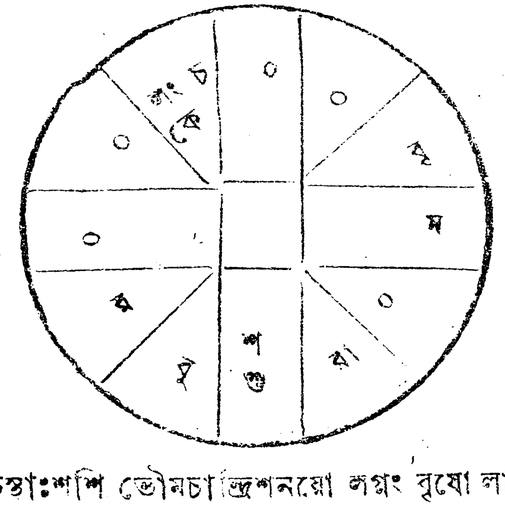

"উচ্চস্থাঃশশি ভৌমচাদ্রিশনয়ো লগ্নং বৃষো লাভগো।
জীবঃ সিংহতুলাদিযুক্রমবশাৎ পুন-শনি রাহবঃ॥
নৈশীথঃ সময়োঽষ্টমী বুধদিনং ব্রহ্মর্ক্ষযত্রক্ষণে।
শ্রীকৃষ্ণাভিধমম্বুজেক্ষণ মভূদাবিঃপরং ব্রহ্মতৎ॥"

§ "পশ্যন্তি সপ্তমং সর্ব্বে শনিজীবকুজাঃ পুনঃ।
বিশেষতশ্চ ত্রিদশত্রিকোণ চতুরষ্টমান্॥"

যে গ্রহ যে রাশিতে থাকে, সেই রাশি হইতে বামাবর্ত্তক্রমে সপ্তম রাশিতে তাহার পূর্ণ দৃষ্টি। পরন্তু ইহাতে বিশেষ এই যে, শনি তৃতীয় ও দশমে, বৃহস্পতি নবম ও পঞ্চমে এবং মঙ্গল চতুর্থ ও অষ্টমে পূর্ণ দৃষ্টি করিয়া থাকে।

রাহু দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে পঞ্চম, নবম ও দ্বাদশে পূর্ণ দৃষ্টি করে। কেতু অন্ধ; উহার দৃষ্টিশক্তি নাই।

ধর্ম্ম বিষয়েও শনির বিলক্ষণ কারকতা আছে। শনির যোগ ভিন্ন সাধক কখনই কঠোর তপস্বী হইতে পারেন না। ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কোষ্ঠীতে দেখুন,—এতদ্ সম্বন্ধে শনির কারকতা কত প্রবল।

(রাশিচক্রে গ্রহগণের আদ্যক্ষরই লিখিত হয়, যথা র,চ,ম অর্থাৎ রবি, চন্দ্র, মঙ্গল)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জন্মপত্রিকা।

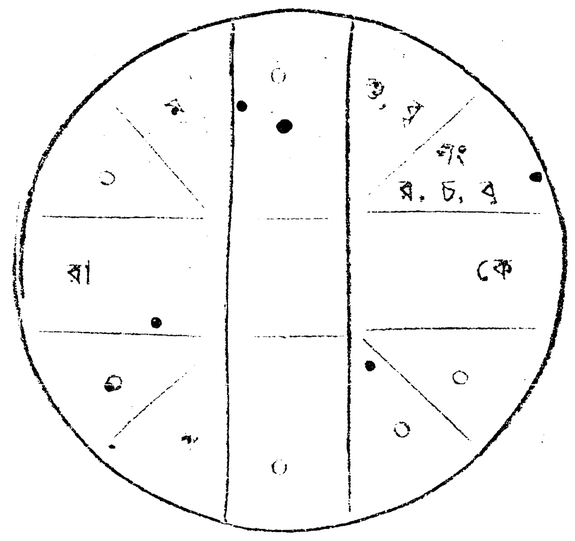

ইহার ধর্ম্মস্থানের অধিপতি শুক্র মান রাশিতে তুঙ্গী এবং স্বক্ষেত্রগত বলবান্ বৃহস্পতি যুক্ত হইয়া শনিকে পূর্ণদৃষ্টি করিতেছে। ঐ শনি আবার পঞ্চমভাবে (দেবভক্তি ও পুণ্যকর্ম্ম সম্বন্ধে এই স্থানে চিন্তনীয়) এবং দশমভাবে (এখানে সন্ন্যাস সম্বন্ধে বিচার্য্য) পূর্ণদৃষ্টি করায়, ইনি সন্ন্যাসী এবং একজন উচ্চশ্রেণীর কঠোর তপস্বী হইয়াছিলেন।

শনির ন্যায় মঙ্গলও একটি পাপগ্রহ। এই মঙ্গল বৃহস্পতি কর্ত্তৃক অবলোকিত হইয়া স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে "দয়ার সাগর" করিয়াছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মপত্রিকা।

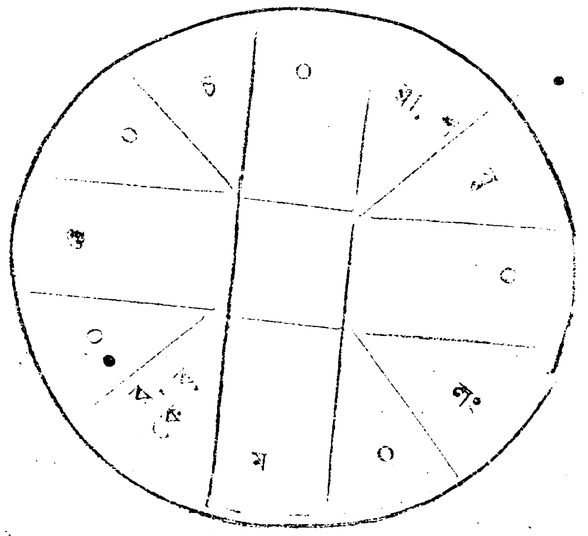

"ব্যয়েশে গুরু সংদৃষ্টে মহাদানকরো ভবেৎ"—এই কোষ্ঠীতে ব্যয়াধিপতি মঙ্গলকে বৃহস্পতি দেখিতেছে। এই কর্ম্মবীরের দশম বা কর্ম্মস্থানে কন্যারাশিতে বুধ তুঙ্গী; উহার ফল—

"গুরুজনস্যাহিতে নিরতোজনোবহুধনো দশমে শশিনন্দনে। নিজভুজার্জ্জিত বিত্তহয়োত্তম বহুসুখং ভজতে মিতভাষকঃ॥"

আবার শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের কোষ্ঠীতে দেখুন, মঙ্গল বৃহস্পতির যোগ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম-পত্রিকা।

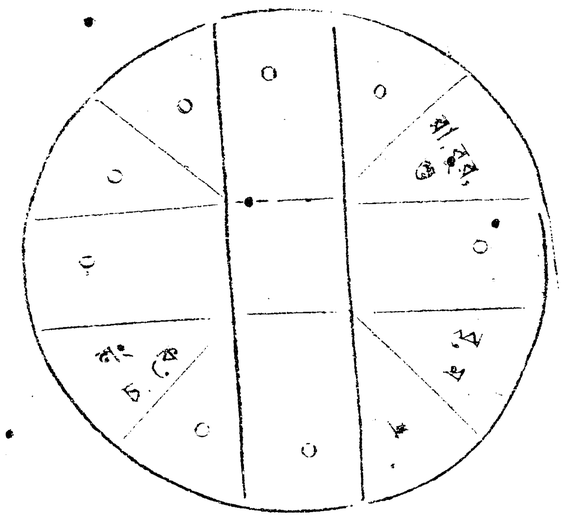

"শিল্পশ্রুতিশাস্ত্রজ্ঞো মেধাবী বাগ্মিশারদ মতিমান্।
অশ্বপ্রিয়ঃ প্রধানঃ সুরগুরু কুজয়ো সমাগতয়ো॥"

ইহাই কুজ বৃহস্পতি যোগের ফল।

এস্থলে বৃহস্পতি স্বক্ষেত্রগত হওয়ায় ঐ ফলের আরও আধিক্য হইয়াছে। ধনুরাশিস্থ বৃহস্পতির ফল শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে;—

"আচার্য্যোব্রত দীক্ষাযজ্ঞাদি নাম সংস্থিতার্থশ্চ।
দাতা স্বসুহৃৎপক্ষঃপ্রিয়োপচারঃ শ্রুতাভিরতঃ॥
মন্ত্রী বা মাঙ্গলিকোধনুর্দ্ধর সংস্থেভবেৎ পুমান্জীবে।
নানাদেশ নিবাসী বিবিক্ত তীর্থায়ন বুদ্ধিঃ॥"

এই কোষ্ঠীতে চারিটি গ্রহ কেন্দ্রগত অর্থাৎ লগ্নের সপ্তমস্থানে রহিয়াছে; সুতরাং "সন্ন্যাস যোগ"ও বেশ সুস্পষ্ট। যথা—"চতুর্গ্রহৈঃ কেন্দ্রগতৈঃ প্রব্রজ্যামাপ্নোতি জাতঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ॥"

শুভগ্রহ কত রকমে অশুভ এবং অশুভগ্রহ কত রকমে শুভ ফল দাতা হয়, তাহা আরও কিছু কিছু দেখাইতেছি।

"নদিশন্তি শুভং নৃণাংসৌম্যাঃ কেন্দ্রাধিপা যদি।
ক্রুরশ্চেদশুভং হ্যেতে প্রবলাশ্চোত্তরোত্তরাঃ॥"

শুভগ্রহ (বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও পূর্ণচন্দ্র) কেন্দ্রাধিপতি হইলে অশুভ ফল প্রদান করে এবং অশুভগ্রহগণ (রবি, মঙ্গল, শনি ও ক্ষীণচন্দ্র) কেন্দ্রাধিপতি হইলে শুভফল প্রদান করিয়া থাকে।

শুভাশুভ এই সকলগ্রহ উত্তরোত্তর বলবান্ হয়। যথা—লগ্নাধিপতি হইতে চতুর্থাধিপতি, চতুর্থাধিপতি হইতে সপ্তমাধিপতি এবং সপ্তমাধিপতি হইতে দশমাধিপতি অধিক বলবান্ বুঝিতে হইবে।

"সর্ব্বত্রিকোণ নেতারোগ্রহাঃ শুভফলপ্রদাঃ।
পতয়স্ত্রীষড়ায়ানাং যদি পাপফল প্রদাঃ॥"

লগ্নের ত্রিকোণ পতিগ্রহ নৈসর্গিক শুভই হউক অথবা অশুভই হউক, শুভ ফল প্রদান করে। তৃতীয়, ষষ্ঠ একাদশপতি গ্রহ শুভ হইলেও অশুভ ফল দাতা হয়।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে ত্রিকোণপতিগ্রহ নৈসর্গিক শুভ হইলে বিশেষ শুভফল এবং অশুভ হইলেও শুভফল দিবে। অপর পক্ষে তৃতীয়, ষষ্ঠ ও একাদশাধিপতি গ্রহ অশুভ হইলে বিশেষ অশুভ এবং শুভ হইলেও অশুভ ফল প্রদান করে।

দোষযুক্তগ্রহ (তৃতীয়, ষষ্ঠ ও আরপতি) আবার কখন কখন অপর গ্রহের সহিত কোন এক সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইয়া বিশেষ শুভ কারক হয়।

"কেন্দ্রত্রিকোণনেতারৌ দোষযুক্তাবপি স্বয়ং।
সম্বন্ধমাত্রাদ্বলিনৌ ভবেতাং যোগকারকৌ॥"

গ্রহগণের চতুর্ব্বিধ সম্বন্ধ আছে। পরস্পরের ক্ষেত্রে পরস্পরের বাসের নাম প্রথম সম্বন্ধ; পরস্পরের প্রতি পরস্পরের দৃষ্টির নাম দ্বিতীয় সম্বন্ধ; একগ্রহ কেবলমাত্র অপরকে দৃষ্টি করার নাম তৃতীয় সম্বন্ধ এবং দুইগ্রহের একত্র বাসের নাম চতুর্থ সম্বন্ধ।

এই চতুর্ব্বিধ সম্বন্ধের মধ্যে চতুর্থ অপেক্ষা তৃতীয় সম্বন্ধ বলবান্; তৃতীয়াপেক্ষা দ্বিতীয় এবং দ্বিতীয়াপেক্ষা প্রথম সম্বন্ধ বলবান্।

কেন্দ্র ও ত্রিকোণ পতি গ্রহ দোষযুক্ত হইলেও পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ সম্বন্ধের কোন এক সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকিলে "রাজযোগ" কারক হয়।

এই দেখুন,—মিরার সম্পাদক পরলোকগত নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের জন্ম পত্রিকায় চতুর্থ কেন্দ্রপতি পঞ্চমে ও পঞ্চম কোণপতি চতুর্থে থাকিয়া প্রথম সম্বন্ধে আবদ্ধ।

নরেন্দ্রনাথ সেনের জন্ম-পত্রিকা।

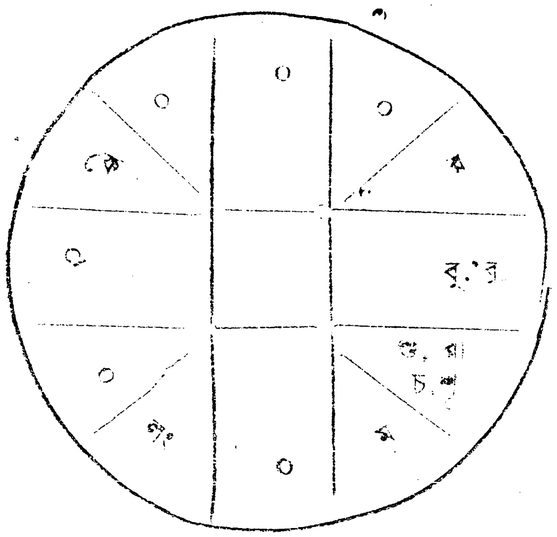

বঙ্কিম বাবুর কোষ্ঠীতেও চতুর্থপতি মঙ্গল পঞ্চমপতি শুক্রের সহিত পঞ্চমে একত্র বাস করিয়া "রাজযোগ" করিতেছে। কেন্দ্রপতি শনি ও কোণপতি শুক্রের দৃষ্টি বিনিময়ও আছে।

বঙ্কিম বাবুর জন্ম-পত্রিকা।

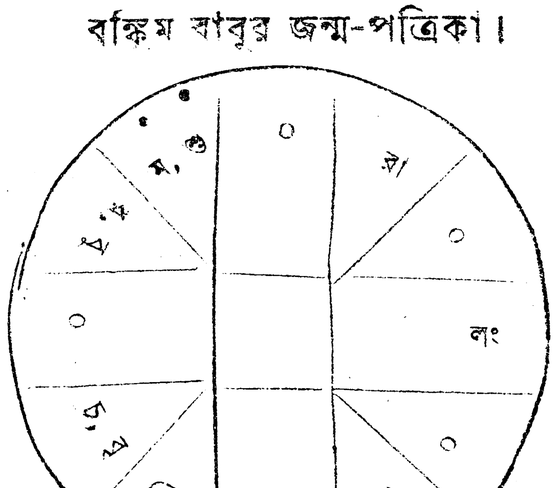

ঐ বলবান্ শুক্রই এই সাহিত্য-সম্রাটের প্রতিভা ফুটাইয়াছিল। মিথুনস্থ বুধ উহার সহায়। পঞ্চমস্থ শুক্রের ফল,—

"সকল কাব্যকলাপকলাকরঃ তনয় বাহন ধান্য সমন্বিত।
সুরপতেগুরু গৌরবভাজনো ভৃগুসুতে সুত সদ্মনি সংস্থিতে॥"

মিথুনস্থ বুধের ফল ;—

"শ্রুতিকাব্যকলাভিজ্ঞঃ কবিঃ স্বতন্ত্রঃ প্রিয়ঃ প্রধানরতঃ।"

তনয়ভবনস্থ (পঞ্চম স্থান) ঐ মঙ্গলগ্রহটি বঙ্কিম বাবুর পুত্রস্থানের হানি করিয়াছে। যথা—

"তনয়ভবন সংস্থে ভূমিপুত্রো মনুষ্যো ভবতি তনয়হীনঃ।"

কিন্তু শুক্র পঞ্চমাধিপ হইয়া পঞ্চমে স্বক্ষেত্রে থাকায় মঙ্গল একেবারে নিঃসন্তান করিতে পারে নাই। শুক্র নিজে স্ত্রীগ্রহ ; এ কারণ কন্যা সন্তান জন্মিয়াছিল।

সে কথা যাক্। এখন অনেকে হয় ত জিজ্ঞাসা করিবেন যে নরেন্দ্র বাবুর অথবা বঙ্কিম বাবুর কোষ্ঠীতে যখন "রাজযোগ" রহিয়াছে তখন তাঁহারা রাজা হইলেন না কেন?

শাস্ত্রে রাজযোগাধ্যায়ে অনেক স্থানে লিখিত আছে—

"রাজবংশোদ্ভবো বালো রাজা ভবতি নিশ্চয়ঃ।"

ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, অন্য বংশোদ্ভব ব্যক্তির ঐরূপ "রাজযোগ" থাকিলে সে ব্যক্তি রাজা হয় না, সে দেশের মণ্ডল, রাজপূজ্য ধনী, মানী ইত্যাদি হইয়া থাকে। নিকৃষ্ট বা মধ্যম রকম রাজযোগের ফলে একটি রাজার সন্তান রাজা হইতে পারে কিন্তু অন্য লোকে তাহার অবস্থার উপরি কিছু বড় হইয়া উঠে মাত্র। তবে উৎকৃষ্ট রাজযোগ বিদ্যমানে মানুষ নিশ্চয়ই রাজা হয়। ইহার প্রমাণ দেখাইছি।

বর্দ্ধমানাধিপতি হিজ্ হাইনেস্ স্বর্গীয় মহারাজাধিরাজ মহতাব্ চন্দ্ বাহাদুরের জন্ম-পত্রিকা।

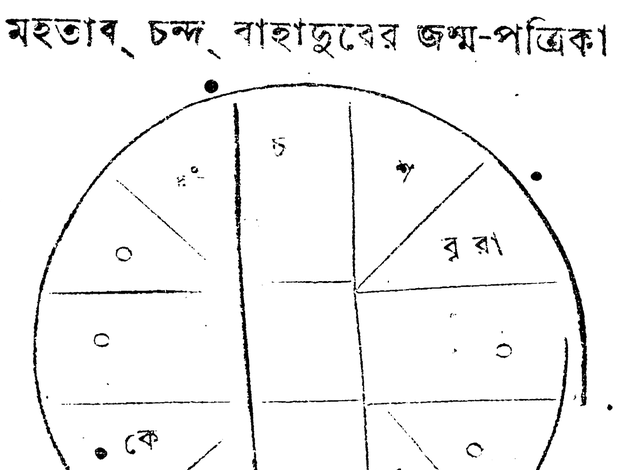

এই কোষ্ঠীতে অনেকগুলি রাজযোগ রহিয়াছে।

(১) চতুর্থ কেন্দ্রপতি রবি ও পঞ্চম কোণপতি বুধের একত্র বাস। (চতুর্থ সম্বন্ধ)।

(২) পঞ্চম কোণপতি বুধের সহিত সপ্তম, কেন্দ্রপতি মঙ্গলের একত্র বাস। (চতুর্থ সম্বন্ধ)।

(৩) লগ্নপতি শুক্র ও নবম পতি শনির মধ্যে দৃষ্টি বিনিময়। (দ্বিতীয় সম্বন্ধ)।

(৪) শুক্র কন্যারাশিতে নীচস্থ ;* ঐ কন্যার অধিপতি বুধ এবং শুক্রের উচ্চস্থানাধিপতি বৃহস্পতি এই দুই গ্রহই কেন্দ্রে অবস্থিতি করিতেছে।

"চেৎ খেচরৌ নীচগৃহং প্রয়াত
তদীশ্বরশ্চাপি তদুচ্চনাথঃ।
কেন্দ্রে স্থিতৌ তৌ ভবতঃ প্রসূতৌ
প্রশস্তকীর্ত্তী ভূপতি সম্ভবায়॥"

বিবিধ রাজযোগ ব্যতীত ইহাতে বিশিষ্ট ধনবান্ যোগও রহিয়াছে, যথা—

"সিংহে ধনুষি মীনে চ মেষ কর্কট বৃশ্চিকে।
রবিণা সহিতো ভৌমোনরং কুর্য্যাৎধনেশ্বরং॥"

এই স্বনামধন্য মহারাজাধিরাজ বাহাদুর হিন্দুর আদরের ধন মহাভারত, হরিবংশ ও রামায়ণ বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদ করাইয়া যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা দশমস্থ বৃহস্পতিরই ফল।

"দশমধামগতে চ বৃহস্পতৌ তুরগরত্ন বিভূষিতমন্দিরঃ।
জয়তি নীতিগুণৈর্নিশাত্রবান্ সকলধর্ম্মকরঃ সুখভাজনঃ॥"

রাহু ঐ দশম ভাবেরই বৃদ্ধি করিতেছে ; কারণ—

"যদ্ গ্রহাবগতৌ বাপি যদ্‌যদ্ভাবেশ সংযুতৌ।
তত্তৎ ফলানি প্রবলৌ প্রদিশেতাং তমোগ্রহৌ॥"

ইহার পুত্রস্থানে (লগ্নের পঞ্চম স্থান) বুধের ক্ষেত্রে শনির পূর্ণ দৃষ্টি থাকায় ইনি দত্তক পুত্র লাভ করিয়াছেন, যথা—

"পুত্রস্থানে বুধক্ষেত্রে মন্দক্ষেত্রেহথবা ভবেৎ।
মন্দ—মান্দিযুতে দৃষ্টে তদা দত্তাঃ সুতাদয়ঃ॥"

পঞ্চমস্থ শুক্র মহারাজের কবিত্বশক্তির বিকাশ করিয়াছিল।

* যে রাশিতে যে গ্রহ তুঙ্গী তাহা হইতে সপ্তম রাশিতে সেই গ্রহ নীচস্থ।

রবি, মঙ্গল, বুধের একত্র অবস্থান হেতু এই কোষ্ঠীতে "তীর্থমৃত্যু যোগ" ও হইয়াছে।

"ত্রয়োগ্রহাযদৈকত্র লগ্নরাশি বিবর্জ্জিতাঃ।
ভুক্তা চ বিবিধান্ ভোগান্ ম্রিয়তে জাহ্নবীজলে॥"

এইবার ফরাসীদেশের সম্রাট জগদ্বিখ্যাত বীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টির কোষ্ঠীও দেখাইতেছি। ইহাতে সর্ব্বোত্তম "রাজযোগ" বিদ্যমান্।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টির জন্ম-পত্রিকা।

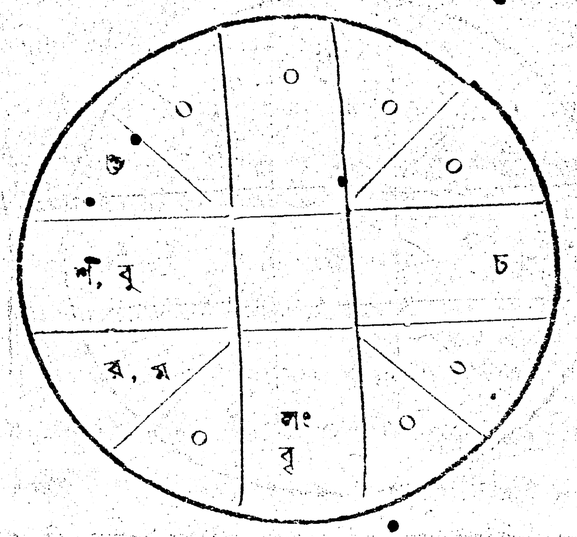

(১) চতুর্থ কেন্দ্রপতি শনি ও নবমপতি বুধের একত্র বাস। (চতুর্থ সম্বন্ধ)।

(২) পঞ্চমপতি শনি ও দশমপতি চন্দ্রের দৃষ্টি বিনিময়। (দ্বিতীয় সম্বন্ধ)।

(৩) নবমপতি বুধ ও দশমপতি চন্দ্রের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময়। (দ্বিতীয় সম্বন্ধ)।

(৪) শনির ক্ষেত্রে চন্দ্র ও চন্দ্রের ক্ষেত্রে শনির অবস্থিতি। (প্রথম সম্বন্ধ)।

একটি কেন্দ্রপতির সহিত একটি ত্রিকোণপতির পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন একটি সম্বন্ধ থাকিলে "রাজযোগ" হয়। আর যদি দুই বা ততোধিক কেন্দ্র—কোণপতির ঐরূপ সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকে, তবে তাহা অপেক্ষা অন্য শ্রেষ্ঠ যোগ কি আছে? শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"কেন্দ্র ত্রিকোণাধিপয়োরেকত্বে যোগকারকৌ।
অন্য ত্রিকোণপতিনা সম্বন্ধো যদি কিং পরম্॥"

অনেক সময় গ্রহগণ ভাল অবস্থায় থাকিলেও যোগফলে কোষ্ঠীর ফল মন্দ হইয়া পড়ে। এই যোগফল অতি নিশ্চিত ; ইহা প্রায় মিথ্যা হয় না।

"যথা যোগাদমৃতায়তে বিষং
বিষায়তে মধ্বপি সর্পিষা সমং।
তথা বিহায় স্বফলানি খেচরাঃ
ফলং প্রয়চ্ছন্তি হি যোগজোদ্ভবং ॥"

নিম্নে এ সম্বন্ধে একখানি কোষ্ঠী দেখাইতেছি।

এই ব্যক্তি আমার বিশেষ পরিচিত। ইনি বেশ বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান। ইহার কোষ্ঠীতে দুইটি গ্রহ (মঙ্গল ও বৃহস্পতি) তুঙ্গী। বৃহস্পতি ধনাধিপতি হইয়া ধনস্থানে পূর্ণ দৃষ্টি করিতেছে। ভাগ্যাধিপতি শুক্র পঞ্চমস্থ ; কিন্তু এক "ত্রিশূন্য যোগে" ইনি সারা জীবন দারিদ্র্য দুঃখ ভোগ করিতেছেন।

"লগ্নস্য দশমে শূন্যে রবেরেকাদশে তথা।
চন্দ্রস্য চাষ্টমে শূন্যে ত্রিশূন্যে চ দরিদ্রতা ॥"

ঐ দেখুন, লগ্ন হইতে দশম রাশিতে, রবি হইতে একাদশে এবং চন্দ্র হইতে অষ্টমে কোন গ্রহের অবস্থিতি নাই।

ভাব ফল ও যোগফলের দৃষ্টান্ত দেখান হইল ; কিন্তু এ সকলও স্থূল গণনা। ভাবস্থ শুভাশুভ গ্রহ কি পরিমাণ ফলদাতা হইবে, তাহা গ্রহস্ফুট ও ভাবস্ফুট ব্যতীত নিশ্চয় করা যায় না। আবার অনেক সময় গ্রহস্ফুটও সসন্ধি দ্বাদশ ভাবস্ফুট সাধন দ্বারা দেখা যায় যে, ভাবরাশিতে অবস্থিত গ্রহ তাহার পূর্ব্ব অথবা পর রাশির ফলদাতা হইতেছে।

দশাফলের সম্বন্ধেও অনেক বিচার আছে। প্রথমতঃ এ দেশের অনেক জ্যোতির্ব্বিদ্ কোষ্ঠীতে অষ্টোত্তরী দশাই লিখিয়া থাকেন। কিন্তু "কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ"—এই কলিকালে মহর্ষি পরাশরের মতই প্রবল। পরাশর বলিয়াছেন,—

"দশা বিংশোত্তরী চাত্র গ্রাহ্যানষ্টোত্তরী মতা।"

অতএব এখন বিংশোত্তরী দশাই গ্রাহ্য।

তারপর শুভ বা অশুভ গ্রহ তাহার নিজ দশা বা অন্তর্দ্দশা কালেই যে ঐ শুভাশুভ ফল প্রদান করে, তাহাও নহে।

"আত্ম সম্বন্ধিনো যে চ যে বা নিজ সধর্ম্মিণঃ।
তেষামন্তর্দ্দশাস্বেব দিশন্তি স্বদশা ফলং ॥"

গ্রহ স্বীয় দশা কালে আত্মভাবানুরূপ শুভাশুভ ফল না দিয়া আপনার সহিত পূর্ব্বোক্ত সহাবস্থানাদি সম্বন্ধ চতুষ্টয়ে আবদ্ধ অথবা আপনার সহিত সমান ধর্ম্ম বিশিষ্ট গ্রহের অন্তর্দ্দশাতেই স্বদশার ফল প্রদান করে।

এখন বলুন দেখি, কয়জন লোক এই সকল বিচার করিয়া কোষ্ঠীর ফল লিখিয়া থাকেন। নবগ্রহের শুভাশুভত্ব, বলাবল, দৃষ্টি, যোগাদি সম্বন্ধে বিচার করিয়া কোষ্ঠীর ফল গণনা করিলে সে ফল নিশ্চয়ই ফলিবে। তবে এই অগাধ সমুদ্রতুল্য জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি না থাকিলে এবং বহু কোষ্ঠী বিচার করিয়া যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিতে না পারিলে কেহই হঠাৎ ফলমীমাংসার সূক্ষ্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না। কিন্তু তাহা বলিয়া শাস্ত্র মিথ্যা নহে ; এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমরা সেই টুকুই দেখাইলাম।

মহাকবি মধুসূদন।

(১)

আজ মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যাহ। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন রবিবার বেলা দুইটার সময় আলিপুরের দাতব্য-চিকিৎসালয়ে মধুসূদন ইহলীলা সংবরণ করেন। তাহার পর পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইয়াছে।

তাঁহার মৃত্যুকালে "সমাজ-দর্পণ নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক লিখিয়াছিলেন,—"দুঃখের বিষয় এই, আমরা মাইকেলের অশৌচ গ্রহণ করিতে পারিলাম না ; কারণ, ওরূপ করিলে তৎক্ষণাৎ আত্যন্তর ও সমাজচ্যুত হইতে হইবে। ... ... হা মাইকেল, তোমার অন্তোষ্টির সময় তোমার নিকটে গিয়া তোমার আত্মীয়গণ

রোদন করিতে পারিল না! তুমি পরের মত বিদেশী ম্লেচ্ছগণের হস্তে মস্তক প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছ। তুমি কবরে যাইবার সময় বিজাতীয়েরা তোমার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়াছিল, আমরা সজলনয়নে দূর হইতেই কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম, নিকটে যাইবার ইচ্ছা করিলেও যাইতে পারিলাম না। হিন্দু ধর্ম্মের পারে গমন করিয়া তুমি কেন সমুদ্রপারবর্ত্তী জনের ন্যায় বহুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়িলে?'

"সমাজ দর্পণে"র এই খেদে তখনকার বাঙ্গালীর ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে। মাইকেলের প্রতি মনের ভাবও প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। আপাদমস্তক আত্মস্থ, অতিসাবধান, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, পরধর্ম্মভীরু, সেকালের বাঙ্গালী মধুসূদনকে জাতির মহাকবি বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন; মধুসূদনের প্রতিভার পূজা করিয়াছিল। কিন্তু তখনও "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়" ও "পরধর্ম্ম ভয়াবহ" হিন্দুর সমাজস্থিতির এই দুই পরস্পর সাপেক্ষ মূলমন্ত্র, কাল-প্রবাহে প্রতিহত হইয়াও, সমাজে সমুজ্জ্বল ছিল। তাই মাইকেলের প্রতিভায় মুগ্ধ হিন্দু, জাতীয় কবিকে "আপনার হ'তে আপনার" বলিয়া ভাবিয়াও, "সমুদ্র-পারবর্ত্তী জনের ন্যায় বহুদূরবর্ত্তী" বিবেচনা করিয়া, দূরে রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল। সমাজ-শাসন-নিয়ন্ত্রিত হিন্দুর শ্রদ্ধা বাহিরে বিকশিত হয় নাই:—কিন্তু হিন্দু খৃষ্টান মধুসূদনের জন্য কাঁদিয়াছিল, তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিবার অধিকারে বঞ্চিত হইয়া কাঁদিয়াছিল।

(২)

তাহার পর বহু বর্ষ অতীত-সাগরে মিশিয়াছে। সমাজের সে দুর্গ ভূমিসাৎ হইয়াছে। এখন বাঙ্গালী অকুণ্ঠিতচিত্তে সমাধিক্ষেত্রে অন্যধর্ম্মাবলম্বী শবের অনুসরণ করে; গির্জ্জায় বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে। সে-কাল বিধানে শৃঙ্খলিত ছিল। এ কাল মুক্ত! এ কালে দাঁড়াইয়া সেকালের বিচার করিলে অনেক কথা বুঝা যায়।

পরধর্ম্মাশ্রিত স্ব-সমাজচ্যুত; পরসমাজভুক্ত মাইকেল সর্ব্বপ্রকারে বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবন-বারিধির বহির্ভূত হইয়াও, কোন্ গুণে, কোন অধিকারে, কিসের প্রভাবে বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন, আজ তাহা ভাবিয়া দেখিলে লাভ আছে। ব্যথিত পিতার মত যে হিন্দু সমাজ ভ্রুকুটী কুটিলমুখে উরগক্ষত অঙ্গুলীর ন্যায় স্বধর্ম্মত্যাগী মধুসূদনকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, মাইকেল মধুসূদন কোন শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই ক্রুদ্ধ সমাজের রুদ্ধদ্বার ভাঙ্গিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া গরুড়ের মত সমগ্র জাতির প্রেমামৃত হরণ করিয়াছিলেন?

ইহা ভাবিয়া দেখিবার কথা। বুঝিয়া দেখিবার কথা।

(৩)

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন,—"স্মরণীয় বাঙ্গালীর অভাব নাই। কুলুকভট্ট, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদাধর, জগদীশ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারত-চন্দ্র, রামমোহন রায় প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারি। অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্ন প্রসবিনী। এই সকল নামের সঙ্গে মধুসূদননামও বঙ্গদেশে ধন্য হইল।"

কবি মধুসূদন বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন রত্ন দান করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহার নামে বঙ্গদেশ ধন্য হইয়াছে, ধন্য হইতেছে। কিন্তু কাব্য, কবিতা ও কবিত্ব তাহার কারণ নয়। যে গুণে কাব্য, কবিতা ও কবিত্ব অমর হয়; যে ধর্ম্মে কাব্য, কবিতা ও কবিত্ব পবিত্র, সার্থক ও ধন্য হয়, মাইকেল সেই ধর্ম্মের অধিকারী ছিলেন। যাহার অভাবে কবিত্ব পুরীষ-লিপ্ত পুষ্পের মত শোচনীয় ঘৃণার আস্পদ হয়, মাইকেলের কাব্য, কবিতা ও কবিত্বে তাহার সদ্ভাব আছে। সমবেদনা ও সহানুভূতিই কবির জীবন সার্থক করে। মাইকেল সেই সমবেদনা ও সহানুভূতির উৎস ছিলেন।

(৪)

আজন্ম বিদেশী তন্ত্রে শিক্ষিত, বিজাতীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত, বিদেশের ভাষায়, চিন্তায়, ভাবে, সাহিত্যে অনুপ্রাণিত হইয়াও মধুসূদন স্বদেশী তন্ত্র বিস্মৃত হন নাই। স্বদেশের ভাষায় ভাবে তাঁহার—শুধু অনুরাগ নয়, সহানুভূতি ও সমবেদনা ছিল। সেই সহানুভূতি ও সমবেদনার সঙ্গমে দেশবাৎসল্যের স্বর্গীয় কহ্লার সহস্র-দলে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই কহ্লারের সৌন্দর্য্যে, সৌরভে বাঙ্গালার সাহিত্য ও সমাজ মাতিয়া উঠিয়াছিল! মমতা বুদ্ধির—"চোখের জলের বাঁধন দিয়ে" মাইকেল বাঙ্গালীকে "মায়াডোরে বাঁধিয়াছিলেন!*

যৌবনে উন্মার্গগামী, দেশদ্রোহী নব-ভাবের আকস্মিক দীপ্তিচ্ছটায় অন্ধ, পর-ধর্ম্মের আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছিলেন।—তাঁহার উত্তরজীবন দেখিয়া বোধ হয় গত জীবনের মোহ শেষ-জীবনে ছিল না। পরধর্ম্মাশ্রিত মাইকেল স্বধর্ম্ম-নন্দনের, কল্পতরু পুরাণ হইতে মেঘনাদ, তিলোত্তমা, ব্রজাঙ্গনা চয়ন করিয়াছিলেন; চতুর্দ্দশপদী কবিতায় বাঙ্গালার ভাব, ভাষা ও মহাপুরুষগণের পূজা করিয়াছিলেন; কৃষ্ণকুমারীর ও শর্ম্মিষ্ঠায় ইতিহাসের ও পুরাণের ছবি আঁকিয়াছিলেন; বুড়ো শালিক ধরিয়া রঙ্গ করিয়াছিলেন; "একেই কি বলে সভ্যতা"য় কলঙ্কের কালী দিয়া বানরের বিদ্রূপচিত্র টানিয়া "চিন্তা করিয়া" বলিয়াছেন,—"বেহায়ারা আবার বলে কি আমরা সাহেবদের মত সভ্য হয়েছি। হা আমার

পোড়া কপাল! মদ-মাংস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়? একেই কি বলে সভ্যতা?"

হহা আত্ম-বিশ্লেষণের ফল কি না, সাহস করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু মাইকেলের সরলতা ও অকপটতার পরিচায়ক, সে পক্ষে সন্দেহ নাই।

মাইকেলের "আত্মবিলাপে" তীব্র অনুশোচনার ও গভীর হুতাশের আর্ত্তি ও অভিব্যক্তি দেখিয়া চোখে জল আসে,—

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়,
তাই ভাবি মনে!"

পর-ধর্ম্ম গ্রহণেও কি সে 'আশার ছলনা' ছিল না?

(৫)

মাইকেল বিদেশী সাহিত্যের সৌখীন উদ্যান হইতে স্বদেশী সাহিত্যের মনোজ্ঞ মালঞ্চে ফিরিয়াছিলেন। পরতন্ত্রে সুপ্ত সিংহ সহসা জাগিয়া স্ব-তন্ত্রের জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন। তাই তিনি মাতৃভাষাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পরধনলোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ,
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি—,
অনিদ্রায় অনাহারে, সঁপি কায়, মন
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি;—
খেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন।
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে, —
"ওরে বাছা! মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
'এ ভিখারী দশা তব কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে!
পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা—রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।"

এমন স্বপ্ন ক'জনের ভাগ্যে ঘটে? এমন ভাবে পরদেশমুগ্ধ ভিক্ষুক-জীবন পদদলিত করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া মাতৃভাষারূপ মণিজালে পূর্ণ খনির অক্ষয় ভাণ্ডারে নূতন হীরা, মাণিক, মতি ঢালিয়া দিবার সৌভাগ্য কয়জন লাভ করে?

আবার ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের ভারসেলস নগরে প্রবাসী মাইকেল "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী"র "সমাপ্তে" আত্ম নিবেদন করিয়াছিলেন,—

"—নারিনু মা চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি, ডাকিলা যৌবনে;
(যদিও অধম পুত্র, মা কি ভুলে তারে?)
এবে ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে।"

ইহাও কি মহাকবির আত্মবিস্মৃতির পর উদ্বোধনের পরিচায়ক নহে? মোহের ফল বিস্মৃতি;—তাহার পর স্বপ্ন ও জাগরণ। মাইকেলের চিত্ত-নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কি সুন্দর!

(৬)

প্রতিভার বরপুত্র মধুসূদন স্বদেশের বৈভবে অবহেলা করিয়া, পরধনলোভে মত্ত হইয়া পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া "অবরণ্যে বরিয়া" বহুদিন "বিফল তপে" মজিয়াছিলেন। নিরাশ হইয়াছিলেন। কিন্তু অনিদ্রায়-অনাহারে "সুখ পরিহরি" রত্নের অন্বেষণ করিলে, বরেণ্যের ধ্যান করিলে সাধকের 'তপ' নিষ্ফল হয় না। বাঙ্গালার কুললক্ষ্মী মাইকেলের সাধনায় প্রসন্ন হইয়া স্বপ্নে তাঁহাকে পরতন্ত্র ছাড়িয়া স্ব-তন্ত্রের ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। মাইকেল সংক্ষিপ্ত জীবনে কুল লক্ষ্মীর ইঙ্গিত যথাসম্ভব পালন করিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহার মৃতাহে—পরতন্ত্র, পরভাবমত্ত, আত্মবিস্মৃত, মাতৃভূমির বৈভবে বঞ্চিত, স্ব তন্ত্রের ঐশ্বর্য্যে অন্ধ বাঙ্গালী! আত্ম অন্বেষণ জীবনের সার কর। "অবরেণ্যে বরি" মানবজীবন সার্থক-সফল—চরিতার্থ হয় না। তুমি কোন ছার—প্রতিভাশালী পুরুষসিংহ মাইকেল পর পথের পথিক হইয়া অনুশোচনায় মথিত হইয়াছিলেন। সেই মহাকবির অভিজ্ঞতার মহাফল আজ তোমার। স্মরণ কর আত্মগৌরব, বর্জ্জন কর 'পরদেশে' ভিক্ষাবৃত্তি, বরণ কর আত্মশক্তি। "নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

(৭)

স্বদেশী তন্ত্রে শ্রদ্ধাই দেশভক্তি। দেশভক্তি সোণার পাথর বাটী নয়; কাঁঠালের আমসত্ত নয়। মাইকেলের বঙ্গভূমির প্রতি সম্ভাষণ দেশ-তন্ত্রের প্রথম গান। দেশভক্তির প্রথম উচ্ছ্বাস। স্বদেশী কবির প্রথম ঝঙ্কার। মাইকেলের বঙ্গস্তোত্র সৌন্দর্য্যপুষ্পের গুচ্ছ নয়। সে গান—মিনতি—প্রার্থনা—মার কাছে আদরে ছেলের আব্দার। তাহাতে বাঁচিবার সাধ আছে, কামনা আছে। আজ মধুসূদনের মৃতাহে বাঙ্গালী কবির 'কামনা' পাঠ কর,—

"সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।
প্রবাসে দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে,
এ দেহ আকাশ হতে,—নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে?
চির স্থির কবে নীর হায় রে জীবন-নদে!
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি মা ডরি শমনে—
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত হ্রদে।
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্ব জন।
কিন্তু কোন গুণ আছে,
বাচিব যে তব কাছে,—
হেন অমরতা, আমি কহ গো শ্যামা জন্মদে!
তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে।
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে,
মানসে, মা, যাহা ফলে,
মধুময় তামরস, কি বসন্তে, কি শরদে।"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার কলিকাতা

মাইকেল "নূতন মালা গাঁথিয়া" গৌড়জন সুখাবহ "মধুচক্র রচিয়া" বহুদিন নশ্বর সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। আজ বিরোধ, বিদ্বেষ ও ঐহিক সুখ দুঃখের অতীত মহাকবি মধুসূদনের স্মৃতি সপ্রমাণ করিতেছে, "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।" মধুসূদন বাঙ্গালীর মানসে, স্মৃতিজলে, কি বসন্তে কি শরদে, মধুময় তামরসের মত দিব্যশ্রীমণ্ডিত হইয়া ফুটিয়া আছেন। নিন্দুকের, পরকীর্ত্তিদ্বেষী প্রগল্‌ভের সাম্প্রদায়িক নিন্দার ঝড়ে সে তামরস ঝরিবে না।

(৮)

যে মধুসূদন "স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল—ত্রিভুবনের রমণীয় এবং ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থসমূহ সম্মিলিত করিয়া পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয়লক্ষ্য চিত্রফলকের ন্যায় চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার কাব্য ও কবিত্বের বিশ্লেষণ ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। তাই আজ মধুসূদনের শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার কাব্য কবিত্বের মূলমন্ত্র স্মরণ করিতেছি। মধুসূদন দেশবৎসল। "সীন্‌" তাঁহার স্মৃতিপট হইতে কপোতাক্ষের ছবি মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই।—

"জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে।
বহু দেশে দেখিয়াছি, বহু নদ দলে
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমিস্তনে।"

দেশমাতার প্রতি প্রেম ভক্তির এমন সুন্দর ছবি, দেশাত্মবোধের এমত মমতাপূত অভিব্যক্তি বাঙ্গালা সাহিত্যে আর আছে কি?

(৯)

মাইকেল সহানুভূতি ও সমবেদনার উৎস, এবং তাহাই মাইকেলের বিশেষত্ব, পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি। মাইকেল উদার, অকুতোভয়, সমবেদনায় নির্বিচার। বীর কবি বীরের ভক্ত। ব্যথিতের বেদনায় কবির প্রাণ কাঁদে। স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, পাতালে মধুসূদনের মমতার অমৃতনদী বহিয়া যায়।

আদি কবি বাল্মীকি হইতে ভারতবর্ষের সকল কবিই অযোধ্যার রাজ-বংশের সহিত সমবেদনা ও সহানুভূতির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। সোনার লঙ্কা ছারখার হইল, রাবণের বংশ গেল। এ জন্য ভারতের কোনও কবির চিত্ত বেদনায় চঞ্চল হয় নাই,—কেহ এক বিন্দু অশ্রুপাতে সে শোচনীয় নিয়তির বিধানকে স্নিগ্ধ করিবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু মাইকেল রাবণ পরিবারেও সমবেদনা ও সহানুভূতির অমৃতধারা ঢালিয়া দিয়াছেন। ইন্দ্রজিতের বীরত্বে মুগ্ধ না হয়, এমন বাঙ্গালী কে আছে? প্রমীলার দুঃখে বিগলিত না হয়, এমন পাষাণ কে আছে? যুগযুগান্তর সঞ্চিত বিরাগের হিমাচলকে যে সমবেদনার অশ্রুজলে ভাসাইয়া দিতে পারে, তাহার শক্তির গভীরতার পরিমাণ কে করিবে?

মাইকেল শুধু বীর-রসের কবি নন, তিনি করুণরসেও সিদ্ধহস্ত। মাইকেলের সমবেদনা, সহানুভূতি ও করুণায় বাঙ্গালার মরুক্ষেত্র স্নিগ্ধ হউক।

(১০)

মাইকেলের দুইটি উপদেশ বাঙ্গালীর মনে যুগযুগান্তর দেদীপ্যমান থাকুক। "তিলোত্তমা সম্ভবে" মধুসূদনের নিরাকারা দূতী বলিয়াছেন,—

"ভ্রাতৃ ভেদে ক্ষয় আজি দানব দুর্জ্জয়।"

বাঙ্গালী! ইহা স্মরণ রাখিও।

মেঘনাদবধের ষষ্ঠ সর্গ বাঙ্গালীর জীবনবেদ হউক। অরিন্দম, কর্ব্বুরকুলগর্ব্ব, মেঘনাদ রাঘবের দাস বিভীষণকে যে তিরস্কার করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালীর মনে আগ্নেয় অক্ষরে লিখিয়া দাও। আর,—

"—শাস্ত্রে বলে গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি,
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ; পর পর সদা।"

আজ মধুসূদনের মৃত্যুদিনে বাঙ্গালার গগনে পবনে এই 'লাখ কথার এক কথা' ছড়াইয়া দাও। প্রত্যেক বাঙ্গালীর—ভারতবাসীর হৃদয়ে এই কয়টি কথা গাঁথা থাকে। তা যদি থাকে, তাহা হইলে এ দেশের মধুসূদনের জন্ম সার্থক। তা যদি না হয়, তাহা হইলে, বাঙ্গালায় মধুসূদনের আবির্ভাব নিষ্ফল।

কবি তুমি লিখিয়াছিলে, সন্দিগ্ধচিত্তে ভাবিয়াছিলে,—

'লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে
বালিতে রে কাল! তোর সাগরের তীরে?
ফেনচুড় জলরাশি আমি কি রে ফিরে,
মুছিতে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর লিখনে?'

বাঙ্গালার মহাকবি, বাঙ্গালীর মধুসূদন! না, তোমার 'জলের লেখা' নয়, তোমার 'লিখন' মুছিবার নহে। অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে যে রচনা 'ক্লাসিক' হইয়াছে, মহাকালও তাহা মুছিতে পারিবে না। আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সার্থক করিতে পারি;—আমরা যেন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি,—

"নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পর পর সদা।"

বাঙ্গালী, ১৪।৩।২৯

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
সেট

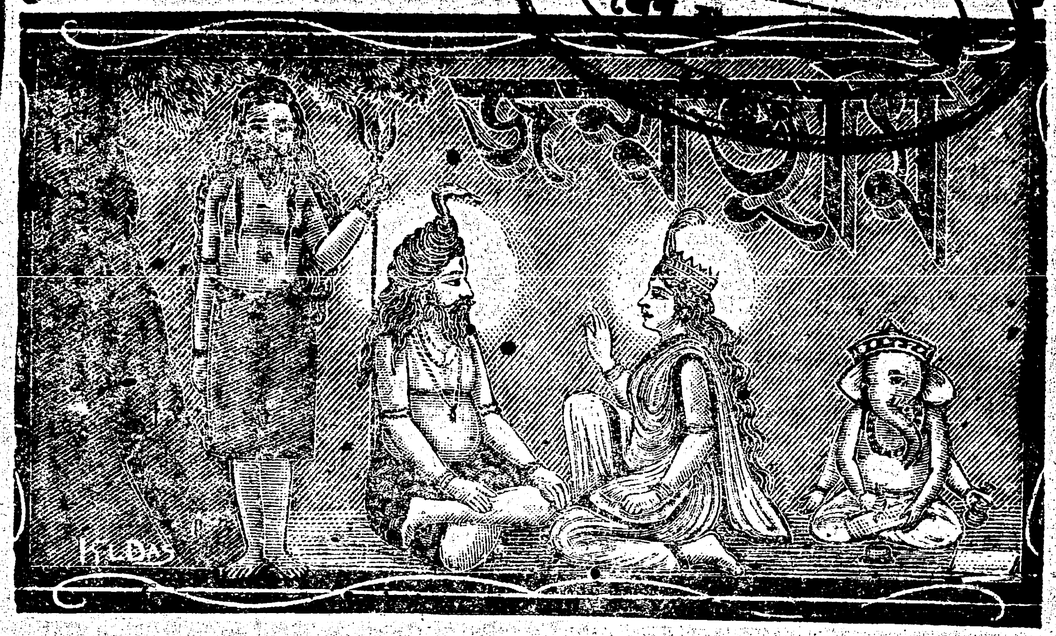

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

২৮শ, বর্ষ। | ১৩২৯ সাল, ভাদ্র। | ৫ম, সংখ্যা।

তত্ত্ব-প্রসঙ্গ।

লেখক,—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার পাত্র।

বর্ষান্তে শরৎকাল। দিবা অবসান প্রায়। প্রাকৃতিক শোভা বড়ই সুন্দর। সহরের পশ্চিমপ্রান্তে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা পূতসলিলা ভাগীরথী বর্ষার বারিধারা সহযোগে স্ফীতবক্ষে দুই কূল প্লাবিত করিয়া যেন নব অনুরাগে লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হইয়া কল কল নিনাদে একটানে একমনে সাগরাভিমুখে খরতর বেগে চলিয়াছে। এই সুযোগে বায়ু প্রতিকূল হইলেও দক্ষিণদিগাভিমুখী নৌকার মাঝিগণ দাঁড়ির সহযোগে আনন্দে গান করিতে করিতে আরোহী লইয়া নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে চলিয়াছে। আবার উত্তরদিগাভিমুখী কত শত নৌকার মাঝিগণ স্রোত প্রতিকূলগামী হইলেও অনুকূল বায়ুর সাহায্যে বাদাম তুলিয়া দিয়া প্রফুল্লচিত্তে চলিয়াছে। এদিকে গঙ্গাতীরে ইষ্টক নির্ম্মিত সোপানাবলী সমন্বিত

ঘাটের উপরিভাগে বসিয়া দুইটী যুবক বায়ুসেবন ও অস্তগামী সূর্য্যদেবের লোহিত কিরণ প্রভায় পশ্চিম গগনের বিচিত্র শোভা সন্দর্শন করিতেছে। অদূরে ঘাটের নিম্ন সোপানে বসিয়া কয়েকজন কর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সায়ংকালীন সন্ধ্যাহ্নিক ক্রিয়া ও উপাসনায় নিবিষ্ট আছেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল। সহসা অনতিদূরে জনৈক মধুর কণ্ঠে গাহিল :—

খাম্বাজ—একতালা

"হতে ছেলে খেলা গেল বেলা, সাঁজের আঁধার সাম্‌নে এ'ল।
খেলা ঘরের ধূলা মাথা মলা গায়ে রয়ে গেল॥
শিশু সনে শিশু খেলা, যৌবনে যুবতী মেলা,
ধন আশা যশতৃষা ভালবাসায় মন মজিল;
খেলার ছলে, আসল ভুলে, বুড়ি ত না ছোঁয়া হ'ল॥
রঙ্গ রসে অঙ্গ ঢেলে, সাজান খেলেনা ক'লে,
খেলিতে জীবন গেল, খেলা রহিল;
ফাঁকা খেলায় দিন ত ফুরাল॥ (এবার বুঝি)"

যুবকদ্বয় একমনে উক্ত গীত শুনিতেছিল। সহসা সুবোধের প্রাণে কেমন একটা ধাক্কা লাগিল। গীত শেষ হইলে সুবোধ বলিল, "চল ভাই বিনোদ, উহার নিকটে গিয়া বসি।" এই বলিয়া উভয়ে উঠিয়া গায়কের নিকট উপস্থিত হইল। গায়ক মহাশয় বয়ঃজ্যেষ্ঠ ও প্রবীণ। সুবোধ তাঁহাকে বলিল, "মহাশয়, আপনার যেমন কণ্ঠস্বর গানটীও তেমনি সুন্দর। কিন্তু আমাদের দুই একটী কথা জিজ্ঞাস্য আছে, যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।"

গায়কের নাম তারাপদ। তিনি যুবকদ্বয়কে সাদরে বলিলেন, "কি জিজ্ঞাস্য আছে বলুন, ইহাতে আর আপত্তি কি?"

সুবোধ। "খেলা ঘরের ধূলামাথা মলা গায়ে রয়ে গেল," এবং "বুড়ী ত না ছোঁয়া হ'ল," এই কথাগুলির প্রকৃত অর্থ কি?

তারাপদ। আপনার প্রশ্ন শুনিয়া বড় সুখী হইলাম। আপনারা ছেলেবেলায় "চোর চোর খেলা" কখন করেন নি, কি দেখেন নি? একজন বুড়ী সাজে এবং কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া থাকে, একজন আঁদি হয়—অর্থাৎ চোর সাজে, যে চোর সাজে, তার চক্ষে কাপড় বেঁধে দেওয়া হয়, আর সব খেলুড়ীরা তখন নিভৃত স্থানে লুকাইয়া থাকে। বুড়ী চোরের চক্ষু বন্ধন করিয়া দিলে

চোর তখন দুইবাহু প্রসারণ করিয়া খেলুড়ীদের ইতস্ততঃ খুজিয়া ধরিতে চেষ্টা করে। খেলুড়ীরা তখন চোরের মাথায় পশ্চাৎ হইতে হঠাৎ টোকা মারিয়া ছুটাছুটি করিতে থাকে। এইরূপ খেলা করিতে করিতে যখন কোন খেলুড়ীকে চোর ধরিয়া বা ছুঁইয়া ফেলে, তাহা হইলে সেই খেলুড়ীকে চোরের অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়, এবং প্রথম চোরের বন্ধন তখন বুড়ী আসিয়া খুলিয়া দেয়। দ্বিতীয় চোর তখন দুইবাহু প্রসারণ করিয়া অন্য খেলুড়ীদের ধরিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায় আর বুড়ীর নিকট হইতে হয় ত ক্রমশঃ দূরে গিয়া পড়ে; যদি সে কোনরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে বুড়ীকে ছুঁইতে পারে, তখন তাহারও বন্ধন মোচন হয়। আর যদি খেলা আরম্ভ করিয়াই চোর বুড়ীকে ছুঁইয়া ফেল; বুড়ী সে ছোঁয়াকে না মঞ্জুর করে। বলে, "ও কি ভাই, খানিক আগে খেল, তারপর ছোঁও।" অর্থাৎ বুড়ীর ইচ্ছা যে, কিছুক্ষণ খেলুড়ীদের লইয়া খেলা করে, তারপর যখন দেখে যে খেলুড়ীরা বড় ক্লান্ত হইয়াছে, আর খেলিতে সাধ নাই, ঘন ঘন বুড়ীর দিকে চাহিতেছে, তখন বুড়ী খেলুড়াদের নিকটে আসিয়া সকলকে বলে যে, আজ খেলা থাক। তখন কেহবা বুড়ীকে স্পর্শ করিয়া কেহবা অমনি ঘরে চলিয়া যায়।

দেখুন, আমরাও সেইরূপ এই ভবের মাঝে বাসনা বা সঙ্কল্প বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বাসনা তৃপ্তির জন্য ছুটাছুটি করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। কামাদি ষড় রিপুর সহিত খেলিতে গিয়া তাহাদের উত্তেজনায় তাহাদেরই পেছু পেছু ঘুরিয়া ঘুরিয়া যখন অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হয়, তখনই মুক্তির জন্য আদ্যাশক্তি মহামায়া শরণাপন্ন হই। যতক্ষণ না তিনি দয়া করিয়া মায়ার বন্ধন খুলিয়া দেন, ততক্ষণই মায়ার রাজ্যে জন্ম-জন্মান্তর ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। তাঁহার দয়া হইলেই ষড়্‌রিপু তখন বন্ধুর মত কার্য্য করে।

অসার বিষয় বাসনায় এতদিন কাটিয়া গেল, জীবন প্রদীপ কবে যে নিভিবে—কে জানে? সময় সময় বিষয় বাসনা জনিত কি দৈহিক, কি মানসিক নানা কষ্টে পড়িয়া অত্যন্ত বিরক্তি আসিলেও, এখনও তাহাতে অরুচি হয় নাই। সুতরাং বাসনা জনিত কালিমা বুঝি এ যাত্রা জীবনের সাথী হইয়া রহিয়া গেল। মনুষ্য জীবনের সর্ব্ব প্রধান উদ্দেশ্য যে "ঈশ্বরলাভ" তাহা আর হইল কৈ!

সুবোধ। মহাশয়! ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা বলেন। কেহ বলেন, ঈশ্বর, কেহ বলেন, ব্রহ্ম, কেহ ভগবান, আবার কেহ তাঁহাকে সাকার, কেহ নিরাকার, এইরূপ কত কি বলিয়া বর্ণনা করেন; কত বড় বড় শাস্ত্রীয়

শ্লোক উল্লেখ করিয়া তাহা সাক্ষাত করিতে যান। এই সকল বিষয় বুঝিয়া উঠা বড়ই কঠিন। আপনি যে বলিলেন, মনুষ্য জীবনের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য "ঈশ্বরলাভ" তাহা কিরূপ এবং তাহা ব্যতীত মনুষ্য জীবনের আর কি কোন উদ্দেশ্য নাই? আপনি এ সকল বিষয় সরল ভাষায় আমাদিগকে কি কিছু বলিতে পারেন, যাহাতে আমরা সহজে তাহা বুঝিতে পারি।

তারাপদ। আপনাদের কি এই সকল বিষয় প্রকৃতই জানিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে, না কথা প্রসঙ্গে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তাই প্রশ্ন করিতেছেন? যেমন আজ কাল অনেক যুবকেরা করিয়া থাকেন।

সুবোধ। না মহশেয়, আমাদের এ বিষয় জানিবার জন্য প্রকৃতই আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে, আপনাকে বৃথা কষ্ট দিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি না।

তারাপদ। ঈশ্বরিক তত্ত্ব জানিবার জন্য আপনাদের যদি প্রকৃতই পিপাসা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভগবদ্ কৃপায় আপনারা তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন; তবে ইহা সময় সাপেক্ষ। এক দিনের আলোচনায় কিছু হয় না। নিত্য আলোচনা আবশ্যক। গুরুকৃপায় এবং সাধুসজ্জনদিগের নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছি এবং তাঁহাদের কৃপায় যাহা ধারণা এবং উপলব্ধি হইয়াছে, তাহাই আপনাদিগকে বলিতে ইচ্ছা করি, কারণ আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রও অগণন এবং মতও ভিন্ন ভিন্ন—অর্থাৎ নানা ভাবের। সুতরাং তাহাদের আয়ত্ত করিয়া সামঞ্জস্য করা বড়ই কঠিন।

সুবোধ। আজ্ঞে হাঁ। এক্ষণে যাহাতে আমরা সহজে বুঝিতে পারি, সেই ভাবে বলুন।

তারাপদ। ঈশ্বর আছেন, ইহাত আপনারা বিশ্বাস করেন?

বিনোদ। লোকে বলে, ভগবান আছেন, তাই শুনি। কিন্তু তিনি সাকার কি নিরাকার, কোথায় তাঁর স্থিতি, এবং কি উপায়ে তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাহা কিছুই জানিনা। তবে এই পর্য্যন্ত বুঝি যে, এই দুনিয়ার একজন মালিক নিশ্চয়ই আছেন। লোকে আপনার বুদ্ধির দোষে কষ্ট পাইলে বা বিপদে পড়িলে উদ্ধার হেতু তাঁহারই উপাসনা করে।

তারাপদ। বেশ কথা। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আপনাদের যে একটী মোটামুটি বিশ্বাস আছে, এবং এক্ষণে তাঁহার তত্ত্ব জানিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়।

"ঈশ্বরলাভ" কিরূপ প্রকার, অর্থাৎ যথার্থ নিজেরই ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন বা

অনুভূতি হয় নাই, তখন আপনাদিগকে তাহা কি প্রকারে বুঝাইব। তবে শ্রীগুরু কৃপায় যাহা কিছু শুনিয়াছি, তাহার আভাষ জ্ঞান যাহা কিছু ধারণায় আছে, তাহাই যথাসম্ভব কিছু বলা যাইতে পারে। প্রকৃত কথা—ইহা কথায় ঠিক ঠিক বুঝান যায় না। ভগবদ্ কৃপায় যখন যাহার তদ্বিষয় যতটুকু উপলব্ধি হয়, তিনি ততটুকুই বুঝিতে পারেন, কিন্তু তাহা যথাযথ ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন না।

সুবোধ ও বিনোদ। বুঝিলেও তাহা প্রকাশ করিতে পারা যায় না। সে কি প্রকার?

তারাপদ। আপনারা ক্ষীরের পুর দেওয়া সন্দেশ এবং ক্ষীরমোহন এই দুই মিষ্টান্ন বোধ করি খাইয়াছেন।

সুবোধ ও বিনোদ। আজ্ঞা হাঁ।

তারাপদ। এই দুই মিষ্টান্নই ছানা, চিনি এবং ক্ষীর দ্বারা প্রস্তুত—অর্থাৎ মাল্ মসলা উভয়েরই এক—উভয়ই মিষ্ট ও সুস্বাদু। কিন্তু একরূপ আস্বাদন কি?

সুবোধ ও বিনোদ। আজ্ঞা না।

তারাপদ। কিরূপ প্রভেদ প্রকাশ করুন। (ক্ষণপরে) উভয়েই যে নীরব রইলেন

সুবোধ। দুইটী মিষ্টান্নই ভাল, সুমিষ্ট ও সুস্বাদু—মিষ্টতার কম বেশী বলা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত উভয়ের আস্বাদনের তারতম্য সম্বন্ধে আর কিছু কথায় বলা যায় না।

তারাপদ। এখন বুঝিতে পারিলেন কি? যাহা আমরা প্রত্যক্ষ হাতে পাইয়া ও ভালরূপ আস্বাদন করিয়াও তাহা সম্যক্ প্রকাশ করিতে পারি না, তখন যাহা ঠিক ঠিক পাই নাই—যাহার স্বরূপ প্রত্যক্ষ দর্শন করি নাই,—যিনি কত বড় মহান্ ইয়ত্তা করা যায় না,—যাহার ইচ্ছায় এই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়;—যাহাকে পাইবার জন্য কত লোক কত ভাবে কঠোর তপস্যা করিতেছে, তাঁহার বিষয় কি দুইখানা গ্রন্থ পড়িয়া, কি লোকমুখে তাঁহার কিছু মাহাত্ম্য বা নাম গুণগান শুনিয়া তাঁহাকে কি ঠিক ঠিক বুঝা যায়—না বুঝান যায়।

সাধারণতঃ মানুষ অভাব গ্রস্থ ও অশান্ত চিত্ত। যখন যে অভাব যে বোধ করে, তখন তাহা পূরণের জন্য সে চেষ্টা করে। কখন কোন বিষয়ে তাহার চেষ্টা সফল হয়, কখন হয় না। বিপদকালে চিত্ত বড়ই অশান্ত হয়। যখন বিদ্যা বুদ্ধির দ্বারা প্রতিকারের আর কোন উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যখন

নিরুপায়, তখন ভগবানের নাম আপনা আপনি হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে বাহির হয়, আর তাঁর নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই যেন অশান্তির মাত্রা একটু কমিয়া যায়। আপনাদের জীবনে কখন এরূপ ঘটিয়াছে কি ?

বিনোদ। আজ্ঞে হাঁ মহাশয়! আমার একবার ভারি ব্যয়রাম হইয়াছিল। বড় বড় ডাক্তারে একরূপ জবাব দিয়ে ছিল। ধরে তুলসী দেওয়া, শান্তি স্বস্তয়ন ঐরূপ কত কি হয়েছিল। ভগবানের নামে অশান্তির মাত্রা যে কমে তাহা তখন বোধ হইয়াছিল।

তারাপদ। এখন বলুন দেখি—যিনি ঐই দুনিবার মালিক, যিনি জীবের ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের আহারের জন্য মাতৃস্তনে দুগ্ধ যোগান, সারাজীবন যাপনোপযোগী আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কোন না কোন ভাবে প্রদান করেন, বিপদে সম্পদে রক্ষা করেন—করেন কি—রক্ষা করিতেছেন, যাহার দয়ায় ও ভালবাসার ইয়ত্তা নাই, এমন কি যাহার নাম উচ্চারণে বিপদকালে প্রাণে শান্তি আসে, তাঁহার দর্শন পাইতে, তাঁহার বিশেষ কৃপা লাভ করিয়া কি এই মনুষ্য জীবনকে ধন্য করিতে ইচ্ছা হয় না ? তাহা কি জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে।

সুবোধ। আজ্ঞা হাঁ।

তারাপদ। এই সকল বিষয় আমদের ঘরে ঘরে তেমন আলোচনা না হওয়াতে ইহা জানিবার জন্য তেমন আকাঙ্ক্ষা হয় না, তত্ত্বলাভের পিপাসাও পায় না। সুতরাং এই ভোগ বিলাসের হাটে আপাতঃ মধুর অসার আমোদ প্রমোদে মন সহজে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। অসার আমোদ প্রমোদ জনিত আনন্দ স্বল্পক্ষণ স্থায়ী। পরক্ষণেই অবসাদ, ভয়, কষ্ট, আত্মগ্লানি এই রূপই হইতে থাকে। যাহারা ভগবদ্ কৃপায় তত্ত্ব বিষয়ে কিছু মিষ্ট আস্বাদন পইয়াছেন, তাঁহাদেরই ঐ বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং সুবিধা ও সুযোগানুযায়ী ক্রমশঃ তাঁহারা ঐ পথেই অগ্রসর হইতে থাকে; আর বোধ হয় বাঞ্ছা কল্পতরু দয়াময় শ্রীহরি পিপাসু ভক্তের বাঞ্ছাপূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছি,—"মনুষ্য জীবনের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য যে ঈশ্বরলাভ তাহা আর হইল কৈ!"

সুবোধ। আপনি যাহা বলিলেন, তাহা বড় সার কথা বলিয়াই মনে হয়। তবে সাধারণের উপকার করা উদ্দেশ্যে কত লোক কত প্রশংসনীয় কার্য্য করিতেছে। তাহাদের উদ্দেশ্যগুলিকে ত সৎ এবং মহান্ বলিতে হইবে।

তারাপদ। অবশ্য—যদি সেগুলি কর্ম্মীলোকে নিঃস্বার্থ ভাবে করে। তবে ইহাই চরম নহে। এই সকল কর্ম্ম তত্ত্বলাভের সহায় হয়। ঈশ্বর কৃপায় ক্রমশঃ ইহা বুঝিতে পারিবেন।

বিনোদ। তাঁহাকে দর্শন পাওয়ার কথা যে বলিলেন, তাঁহার স্বরূপ কি ? কিরূপ আকৃতিতে এবং কোথায় কেমনে দেখা পাওয়া যায়, মোটামুটি সহজ কথায় আমাদিগকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা বুঝাইয়া বলুন।

তারাপদ। এক্ষণে কথা হইতেছে যে ভগবানের স্বরূপ তত্ত্ব আলোচনা করিবার পূর্ব্বে কেন আমরা তাহা (স্বরূপ তত্ত্ব) জানিবার জন্য সময়ে লালায়িত হই, এ সম্বন্ধে আর একটু আলোচনা করা যাউক। আপনারা দেখিয়াছেন যে নবপ্রসূত শিশুরা যখন শয্যায় শায়িত থাকে, তখন কখন কাঁদে, কখন হাঁসে, এবং কখন বা চুপ করিয়া থাকে। এ প্রকার ভাবান্তর শিশুতে পরিলক্ষিত হয় কেন ? যদিও এক সময় আমরাও ঐরূপ অবস্থায় ছিলাম, কিন্তু তদবস্থার কথা এখন কাহারও স্মরণ নাই। সুতরাং কেন যে কাঁদিতাম এবং কেনই বা হাঁসিতাম, তাহার হেতু সঠিক হেতু কিছুই বলা যায় না; কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সময়ে সময়ে যে আমরা কাঁদিয়া আকুল হই, চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, কিছু না কিছুর অভাব হইয়াছে, সহজে তাহার পূরণ না হওয়াতেই আমাদের ক্রন্দন।

সুবোধ। সুতরাং বোধ হইতেছে যে, শিশু কাঁদে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু অভাবের জন্য। এক্ষণে জিজ্ঞাসা যে শিশুর ত কোন জ্ঞান হয় নাই, তবে তাহার অভাব বোধ হয় কি প্রকারে ?

তারাপদ। শিশুর অভাব বলিয়া একটা বোধ না হইতে পারে, কিন্তু তাহার যে কিছু অভাব হইয়াছে—ইহাত নিশ্চয়; নতুবা সে কাঁদে কেন ? শিশু কাঁদিতেছে, তাহার জননী আসিয়া তাহাকে স্তনপান করাইলে সে চুপ করিল। এ ক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে যে, শিশুর ক্ষুধা পাইয়াছিল—অর্থাৎ আহার্য্য সামগ্রীর অভাব হইয়াছিল, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিতে অপারক হওয়ায় সে কাঁদিতেছিল। এক্ষণে তাহার সেই অভাব পূর্ণ হইবামাত্র সে শান্তি লাভ করিল; কিন্তু যদি মাতার স্তনপান করিয়াও শিশু স্থির না হয়, তখন তাহার জননী অশান্তির অন্য কারণ অনুসন্ধান করেন। অর্থাৎ ছারপোকা কি পিপীলিকা দংশন, কি শয্যায় কোন কাঁকর বা কঠিন পদার্থ জনিত যাতনা প্রভৃতির অনুসন্ধান করেন। ইহাতে কৃতকার্য্য না হইলে শিশুর কোন-প্রকার ব্যাধি হইয়াছে মনে করিয়া

তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করেন। এইরূপ অভাবই সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা কিছু আমরা করি বা অন্য কাহাকে করিতে বলি, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, কোন না কোন অভাব মোচনের জন্য।

সুবোধ। আপনি যাহা বলিলেন এ সকলইত দৈহিক বা পারিবারিক অভাব মোচনের জন্য; কিন্তু ভগবানের স্বরূপ জানিবার জন্য যে বাসনা হয়, তাহাও কি অভাব?

তারাপদ। হাঁ। মন দিয়া শুনুন, ক্রমে বুঝিতে পারিবেন। আমাদের দৈহিক ও পারিবারিক অভাব মোচনের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া থাকি, তাহা কিছুই স্থায়ী হয় না। একটী সাময়িক অভাব মোচন হইবার পরক্ষণেই দেখিতে পাওয়া যায়, যেন আর একটী অভাব সম্মুখে বর্ত্তমান এবং তাহার প্রতীকার যেন না করিলেই নয়। এইরূপে দুঃখে সুখে দিন কাটিয়া যাইতেছে।

আমাদের অভাবরাশির মধ্যে ক্ষুধা, তৃষ্ণার ন্যায় কতকগুলি স্থূল অভাব আমরা স্পষ্ট বুঝিয়া থাকি; কিন্তু যদ্যপি স্থূল ভাব অতিক্রম করিয়া তাহাদের কারণ সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন আমাদের ভূমিষ্ঠ কাল হইতে সারাজীবন পাঞ্চভৌতিক শরীরের অবস্থাগত প্রয়োজনীয় যাবতীয় অভাব প্রতীকারের চেষ্টাও স্বাভাবিক নিয়মে পূরণ হইয়া যাইতেছে, মানসিক অভাবও সেইরূপে পূরণ হইয়া থাকে। "দৈহিক বা মানসিক অভাব হইলে দেহ এবং মন উভয়েই ক্লেশ পায় এবং তাহার পূরণ হইলেই উভয়ই শান্তিলাভ করিয়া থাকে।" আপনারা হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, অত্যন্ত ক্ষুধার সময় আহার না পাইলে মুখ শুকাইয়া যায়, মাথা ধরে, কিছু ভাল লাগে না, মন চঞ্চল হয়, মনের অস্থিরতা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু যখনই বলকারক খাদ্য আহার করা যায়, যেন তখনই শারীরিক বলাধানের সঙ্গে সঙ্গে মাথা ধরা ছেড়ে যায়, মুখের সে শুষ্কভাব তিরোহিত হয়, মনশ্চাঞ্চল্য দূর হয় ও মন প্রফুল্লিত হয়। ইহাকেও মনের সম্পূর্ণ অভাব পূরণ বলা যায় না। মনের প্রকৃত অভাব জ্ঞান। কোন বিষয় মানসগোচর হইলেই তাহার তত্ত্ব জানিবার জন্য—অর্থাৎ তাহার ভিতরে কি আছে, তাহা দেখিবার নিমিত্ত মনের ব্যগ্রতা জন্মায়। যেমন এই ক্ষণভঙ্গুর শরীরের অন্তকাল পর্য্যন্ত তাহার অভাব পূরণ হয় না, তদ্রূপ মনের বিলয়কাল পর্য্যন্ত তাহার অজ্ঞানতা এবং আত্মজ্ঞান বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষাও

বিদূরিত হয় না। সুতরাং অশান্তিও যেন কোন না কোন ভাবে আমাদিগের সাথী হইয়া রহিয়াছে পরিলক্ষিত হয়।

সুবোধ। যাহা বলিলেন, তাহা কিছু কিছু উপলব্ধি হইতেছে বটে; কিন্তু সমস্যা ত বড়ই বিষম।

তারাপদ। কি সমস্যা বলুন?

সুবোধ। তবে কি অশান্তির হাত এড়াইবার আমাদের কোন উপায় নাই?

তারাপদ। আছে বই কি। বিশ্ব রাজ্যে নাই কি? যেখানে মুস্কিল—সেই খানেই আসান। এই নিমিত্ত বোধ হয় জগতপাতা তাঁহার সৃষ্টিতে অন্যান্য অভাব মোচন বা পূরণ হইবার ন্যায় অশান্তির হাত এড়াইবারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সাধন এবং সময় সাপেক্ষ। নশ্বর বাসনা ত্যাগ এবং ভগবানে চিত্ত সমাধান। ভগবানে চিত্ত আকৃষ্ট হইলেই আর কোন বিষয়ে মন থাকেনা সুতরাং বাসনা ত্যাগ তাঁহার কৃপায় আপনা আপনিই হইয়া যায়। সমাহিত যোগীরা তাহার দৃষ্টান্ত। সমাধিকালে দেহ বোধ থাকে না। বিভু পাদ-পদ্মে মনঃ সংযোগ হেতু আপনার অস্তিত্ব বোধ বিলুপ্ত হয়। সমাধি অবস্থায় দেহের ক্রিয়া না থাকিলেও দেহ যেমন বিনষ্ট হয় না, তদ্রূপ মনেরও তেমনি জ্ঞান বিচারাদি করিবার শক্তি না থাকিলেও মনের একবারে লয় বা লয় হয় না। সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের ভাবে মন পর্য্যবসিত হওয়ায় মনের আর তখন অভাব বা অশান্তি বলিয়া কিছু থাকে না। ভগবদ্‌ভাব মনে যতক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ অপরভাব মনে স্থান পায় না, প্রাণে শান্তি বিরাজমান থাকে। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ভগবানই জীবের অভাব মোচন বা অশান্তি নিবারণের উপায় এবং সেই নিমিত্তই তাঁহার বিষয় শুনিবার জন্য, তাঁহার তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য ও তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আমাদের ইচ্ছা হয়; সেই নিমিত্ত তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আমরা সময়ে সময়ে লালায়িত হই।

সুবোধ। মহাশয়! যদ্যপি আমাদের অভাব ও অশান্তি দূর করিবার জন্য ভগবানকেই একান্ত প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে কিরূপে তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে?

তারাপদ। উত্তম প্রশ্ন। এক্ষণে দুইটী সমস্যা উপস্থিত। ভগবান কিরূপ প্রকার? এবং তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় কি? এই দুই প্রশ্নের আলোচনা ও মীমাংসা করিতে হইলে, যাহারা এ বিষয়ে সিদ্ধিলাভ পূর্ব্বক তাঁহাদের

নিজ নিজ পন্থা বা ভগবদ্‌লাভের উপায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের অনুসরণ করাই বিধেয়। "মহাজন যেনো গতঃ স পন্থা।" অর্থাৎ—মহাজনগণের নির্ব্বাচিত পথই প্রকৃষ্ট পন্থা।

সুবোধ। মহাশয়! যাহা বলিলেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু মহাজন ত দুইটী কি চারিটি নহেন, তাঁহারা যে বহু এবং নানা মুনির নানা মত। এক্ষণে কাহার মত অবলম্বনীয়?

তারাপদ। অদ্য অনেক আলোচনা হইয়াছে, একদিনে অধিক হইলে সব গোল হইয়া যাইবে। আর একদিন এই প্রসঙ্গ হইবে। যে সকল বিষয় লইয়া আমাদের কথাবার্ত্তা হইল, তাহা আপনারা মনে মনে চিন্তা করিবেন। এক্ষণে আসুন, ভগবানের নামগুণ গান করিয়া ঘরে যাওয়া যাক্।

গীত।

বেহাগ মিশ্রিত—কাওয়ালী।

জেনেছি জেনেছি তুমিছ মরমে,
এ পতিতে তারিতে এসেছ। (হরি)
তুমি কৃপাসিন্ধু, দীনজন বন্ধু,
দীন বেশে উদয় হয়েছে॥ (ভাই)
অসার আমোদে মাতনু জীবনে,
(কত) বিপদে রক্ষা করেছ। (আমায়)
(প্রভু) না জানি তোমারে, চাহিনি জীবনে,
(তুমি) নিজগুণে দয়া করেছ॥ (মোরে)
(আমায় গুণহীন পতিত দেখে)
বিষাদ সাগরে, আশা তরি দিয়ে,
কুল পানে কত টেনেছ।
সন্দেহ তুফানে, ডুবি ডুবি ডুবি,
(আমায়) হাত ধরে তুলে নিয়েছ॥ (শ্রীগুরু রূপে)
মোহের কুহকে, কত যে মজেছি,
(তবু) চরণে স্থান দিয়েছ। (প্রভু)
তোমার মহিমা, দিতে নারি সীমা,
এ হৃদয়ে জাগায়ে রেখেছ॥ (করুণার)
অকৃতি অধম, (এ) পাতকীর বোঝা,
(আহা) সাধ করে তুমি বয়েছেশ (হাসিমুখে)
(আহা এখনও তুমি বহিছ)

নহিলে কি হ'তাম, কোথা ভেসে যেতাম,
দয়া করে সে বুঝ দিয়েছ॥ (প্রাণে)
অজ্ঞান অধম, হেরিয়ে যখন,
দয়া করে স্থান দিয়েছ। (হরি চরণে)
কর তম নাশ, হও সুপ্রকাশ,
(আমার) অন্তরে বাহিরে বিরাজ॥ (প্রভু)
অনন্ত তোমার, রূপের মাধুরি,
গীতা মুখে কত কয়েছ।
দাও দরশন, হৃদয় রঞ্জন,
(দুটী) আঁখি যখন দিয়েছ॥ (ঠাকুর)
দরশন প্রভু দাও হে—
যখন চরণে স্থান দিয়েছ—তখন দিতে যে হবে—
দরশন বিনে কি প্রাণ ধীরে থাকে হে—
দরশন দিতে যে হবে হে—দুটী আঁখি যখন দিয়েছ॥

সাধক-কমলাকান্ত।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ডাকাইতেরা হাততালি দেওয়া দেখিয়া ও গান শুনিয়া বলিল, "কা তুমি কমল ঠাকুর বটে, শুনেছি কমল ঠাকুর পয়সা নেয় না, পয়সা সঙ্গে রাখে না, যাও ঠাকুর যাও।" বিশের সেই ভাব, নয়নে জল, সাধকের দিকে একদৃষ্টি, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস। ডাকাইতেরা বিশেকে বলিল, "ওরে বিশে আয়, কোথাও ডাকাতীর চেষ্টা দেখিগে, ভণ্ডামী কল্লে ত পেট ভরবে না।" বিশে উত্তর করিল, "তোরা যা, আমি আর ঘরে ফিরে যাবনা, আর তোদের সঙ্গে মানুষ মেরে বেড়াব না, অনেক পাপ করেছি, পাপের জ্বালা বিছের কামড়, দেহ জ্বলে গেল, কোথা যাব, এই ঠাকুরই আমার মা কালী। আমার চোখ ঠাকুরের

পা ছাড়া হলেই দেহ জ্বলে যাচ্ছে। আমি আর কারোদিকে চাইব না, কারো কথা শুনবো না, তোরা যা বলিস বিশে ঠাকুর পেয়েছে " ডাকাইতেরা বলিল, "তুই কি পাগল হলি, ঠাকুরের সঙ্গে কোথা যাবি, শেষে কি আমাদিগকে ধরিয়ে দিবি।", হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, "চল, ঠাকুরকে যেতে দে, যদি ঠাকুরের সঙ্গে যাস তোকে খুন করে ঘরে যাব।" বিশে বলিল, 'ঠাকুর আমার দয়াল হরি, তোরা জানিস না বিশে কি ধন পেয়েছে, ঠাকুরের সবাই ছেলে, ঠাকুর কি কাউকে ধরিয়ে দেয়, দেয় ত আমাকে দেবে, আমি ঠাকুরের কাছে আমাকে বলি দিয়ে পাপের জ্বালা জুড়োবো, তোরা আমাকে খুন কর্ব্বি, কর আমার মাথাটা ঠাকুরের পায়ে দিস।" ডাকাইতেরা সাধককে কহিল, "হাঁ ঠাকুর! বিশের একি কল্লে, বিশে আমাদের সর্দ্দার, আমাদিকে বিপদে ফেল্‌বে দেখ্‌ছি, ভালয় ভালয় তোমাকে ছেড়ে দেলাম, তার বুঝি এই ফল, কি মন্ত্র পড়েছ, নাও মন্ত্র ফিরে নাও।" সাধক বলিলেন; "বাবারা আমি ত কিছুই জানিনা, আমার মহামন্ত্র কালীনাম।" বিশে সেই কথা শুনিয়া হাত তুলিয়া নাচিতে নাচিতে বলিল, "আমার মহামন্ত্র কালীনাম, ঠাকুরের মুখের কালীনাম, আমার কানের ভেতর ঢুক্‌লো, আমার বুকের পাঁজরের ভেতর ঢুক্‌লো, ওই কালী মা আমার মুখের ভেতর বসেছে, যা তোরা চলে যা, নইলে এখনি সাজা পাবি, জানিস তো মায়ের আমার অসুরের মুণ্ডুকাটা স্বভাব, যদি বাঁচ্‌বার ইচ্ছে থাকে এখনি চলে যা।" বিশের বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্যান্য দস্যুরা কোন কথা কহিতে পারিল না, বিশের ভাব দেখিয়া তাহাদের ভয় হইল, বিশের মুখপানে চাহিয়া রহিল। সাধক দস্যুদিগকে কহিলেন, "বিশের মনের বিকার উপস্থিত হইয়াছে, পতিত পাবনী বিশের মনের অবস্থা ফিরাইয়াছেন, বিশে কোনমতে আমার সঙ্গ ত্যাগ করিবে না, তোমাদের ভয় নাই, আমি তোমাদিগকে বিপদে ফেলিব না, এখন রাত্রিকাল, আর এখানে বেশীক্ষণ থাকা ভাল নয়।" ডাকাইতেরা বলিল, "ঠাকুর তোমার ভয় কি! রাত্রির ভয় তো আমরা, বিশের ভাব দেখে বোধ হচ্ছে, বিশে তোমার সঙ্গে যাবে দেখো যেন আমরা বিপদে না পড়ি, বিশের মাথা একটু ঠাণ্ডা হলে, তাকে ঘরে ফিরে পাঠিয়ে দিও, আমাদেরও ভয় হচ্ছে পাছে আমাদেরও মন ওই রকম হয়ে যায়, যাও ঠাকুর আর বেশীক্ষণ তোমার কাছে থাকা ভাল নয়।" এই বলিয়া তাহারা বিদায় হইল। ডাকাইতেরা বিশেকে পরিত্যাগ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলে, সাধক কহিলেন, "মা সর্ব্বমঙ্গলা! তোমার লীলা অসীম, যাহারা মানুষের প্রাণকে পিপীলিকার প্রাণ অপেক্ষা

তুচ্ছ জ্ঞান করে, যাহারা ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডেরও লোভ সম্বরণ করিতে পারে না, আজ তাহাদের বিকার জন্মাইলে।" সাধক করযোড়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন, "বিবাদে বিষাদে, প্রমাদে প্রবাসে, জলেচানলে, পর্ব্বতে শত্রুমধ্যে, অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি, গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী।" এই বলিয়া সাধক জগদম্বার চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া, বিশের সহিত প্রান্তর পথে চলিতেছেন। নিকটবর্ত্তী গ্রাম কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী। শরতের আকাশ, ক্ষীণচন্দ্র হইলেও প্রভাসম্পন্ন, প্রান্তর পথ সম্পূর্ণ ভাবে অলক্ষিত নহে। পথ সংলগ্ন তৃণরাশির শিশিরে সাধকের পদদ্বয় সিক্ত হইতেছে। তৃণরাশি যেন সাধকের বিপদে দুঃখিত হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। বিশে সাধকের চরণের দিকে চক্ষু রাখিয়া নতমুখে সাধকের সঙ্গে চলিতেছে। সাধক কহিলেন, "বিশু ওই দেখ গ্রাম দেখা যাইতেছে, আজ রাত্রিতে ওই গ্রামে আশ্রয় লইব, কাল সকালে উঠিয়া অমরার গড় যাইব, তুমি আমার সঙ্গে কোথায় যাইবে, ঘরে ফিরিয়া যাও।" বিশে গদ্‌গদকণ্ঠে বলিল, "আর ঘরে ফির্ব্বোনা, যতদিন বাঁচ্‌বো, ওই চরণ দর্শন কর্ব্বো, তোমার মুখের মিষ্ট কথা শুনে কাণ জুড়োবে, কালী কালী বলে হাত তুলে নাচ্‌বো, ঠাকুর আমি অনেক পাপ করেছি; অনেক মানুষ খুন করেছি, ঠাকুর আমার গতি কি হবে। সাধক কহিলেন, "বিশু একথা তোমার আগে মনে হয় নাই আজ একবারেই এমন হইল কেন? আমাকে বুঝাইয়া বলিতে পার। বিশে কহিল, "ঠাকুর তোমাকে খুন কর্ব্বার জন্য যখন তোমার কাছে এলাম, দেখলাম তোমার চার ধারে কি এক আলো, আমাদের ধর্ম্ম আছে, প্রতিদিন কালী পূজা করে, মাকে প্রণাম করে, মায়ের পায়ে জবা বিল্বদল দিয়ে ডাকাতী কর্ত্তে যাই, দেখলাম মায়ের মূর্ত্তি চারধারে, মায়ের পায়ে যে জবা দিয়ে ছিলাম সেই জবা এখনও পায়। মা আমাকে কাণে কাণে বল্লে বিশে ঠাকুর পেয়েছিস ছাড়িস না, যা সঙ্গে যা, মন ঘুরে গেল, তোমার মুখে মায়ের গান শুনে সব ভুলে গেলাম, যদি সঙ্গে না নাও, দাও গলায় ছুরী দাও, আমরা ছুরী সঙ্গে রাখি, (ছুরী দূরে নিক্ষেপ করিয়া) কহিল, "ওঃ এই ছুরী আমাকে কত পাপে ডুবিছে, ঠাকুর আমাকে ধরে তোল, বিশে পাপী, পাপী বলে ত্যাগ করোনা! তুমি না সঙ্গে নিলে হয় আমি জলে ঝাপ দিয়ে মর্ব্বো, না হয় বিষ খাব, এ দেহ বদ্‌লাব।" সাধক বিশের অকস্মাৎ নিরতিশয় বৈরাগ্য দেখিয়া ভাবিলেন, "ইহা খণ্ড বৈরাগ্য নহে, কোন কারণ বশতঃ উপস্থিত হয় নাই, ইহা দৈব প্রসূত, পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির উদয়, নিশ্চয় স্থায়ী হইবে। বিশের কর্ম্মফল ক্ষয়িত

হইলেও দুষ্কৃত বিনাশিনীর প্রতি অচলা ভক্তি সে বিশ্বেশ্বরীকে নিজকর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রীদেবী বলিয়া আরাধনা করিত, মাতার ভক্তির গুণে তাহার দিব্যজ্ঞান দিয়াছেন, এখন বিশের নিজকর্ম্মকে অতি অপকর্ম্ম বলিয়া বোধ হইয়াছে, ভক্তির সহ জ্ঞানের উদয় হইতেছে, আর ইহাকে ভুলান দুঃসাধ্য।" ইহা ভাবিয়া সাধক কহিলেন, "বিশু! তোমার পত্নী, পুত্র-কন্যা আছে?" বিশে কহিল, "এখন আমার মা কালী, আর আপনি আর কিছু নাই যে ছিল সে ছিল, যে আছে সে থাকুক, আমার সেই পরিবার; আমার পুত্র-কন্যারা আমার গলার ফাঁসী। ঠাকুর! মানুষ মেরে যেদিন টাকাকড়ি না আনতে পারতাম, তারা মুখভার করতো, আমি তা'দিকে খুসী কর্ব্বার জন্য পরদিন ডাকাতী কর্ত্তে যাবার আগে মাকে কেঁদে কেঁদে কত কথা বল্‌তাম, পয়সা চাইতাম, ঠাকুর আমার কি ভুল, আমার ওসব কথা মনে হলে বুকফেটে যাচ্ছে, ঠাকুর আমাকে রক্ষে কর।" সাধক বিশের এই সকল কথা শুনিয়া ভাবিলেন, "বিশুর বিষমতর আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, নিজকর্ম্মকে অতি অকর্ম্ম বোধ হওয়াতে বিশু মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইতেছে, ইহার সহিত আর ইহার অতীত কর্ম্মের আন্দোলনে প্রয়োজন নাই।" ক্রমে ক্রমে ওড়গ্রামের প্রান্তর অতিক্রান্ত হইল ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম নয়নগোচর হইল। গ্রামের কোলাহল তখনও অন্তর্হিত হয় নাই, দূর হইতে অল্প অল্প শ্রুত হইতেছিল। গ্রামস্থ দেবালয় নাদিত শঙ্খ ও ঘণ্টার শব্দ গ্রাম সংলগ্ন শষ্যক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া প্রান্তর প্রান্তে ক্ষীণভাবে চলিতেছিল। গ্রামের মধ্যে দুই এক স্থানে দীপাগ্নি ও কার্ত্তিকমাসদত্ত স্বর্গবাতি দৃষ্ট হইতেছিল। গ্রামের বহির্ভাগের বাসগৃহ হইতে রাখাল ও শ্রমজীবীদিগের আনন্দ সঙ্গীত অতি মধুর বোধ হইতেছিল। সাধক কহিলেন, "বিশু এই আমরা গ্রামে আসিয়াছি। এই গ্রামের জনৈক পরিচিত লোকের গৃহে অদ্য রাত্রির জন্য আমরা আশ্রয় গ্রহণ করিব। বিশু! যদি কেহ তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে তুমি কি পরিচয় দিবে?" বিশু বলিল, "ঠাকুর! আমাকে এ অঞ্চলে কে না জানে! আমি প্রাণখুলে বল্‌বো আমি বিশে ডাকাত, খুনেরা, মহাপাপী, আমি কত গেরস্তের সর্ব্বনাশ করেছি, কত মানুষ মেরেছি, রাতদুপুরে ছেলেপিলে মেয়ে মানুষকে শাস্তি দিয়েছি, আয় গাঁয়ের লোক আয়, সবাই মিলে এসে আমাকে শাস্তি দে, যে রকম শাস্তিতে তোরা সুখী হ'স, বিশে পাপের ফলভোগ করুক।" বিশুর এই কথা শুনিয়া সাধক কহিলেন, "বিশু আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি তুমি আজ রাত্রে কেবল তোমার সেই কালীমার ধ্যান করিবে, মুখে কোন কথা

কহিবেনা, গৃহস্থ যাহা তোমাকে খাইতে দিবে, কোন কথা না কহিয়া খাবে; যাহা করিতে বলিবে, কোন কথা না কহিয়া করিবে; তোমার সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা আমি বলিব।" বিশু বলিল, "যে আজ্ঞা ঠাকুর! তোমার কথার একতিলও অন্যরূপ কর্ব্বোনা।" এই বলিয়া সাধক গ্রাম প্রবেশ পূর্ব্বক পরিচিত ব্যক্তির গৃহে গমন করিলেন, সাধকের আগমনে গৃহস্থের আনন্দের সীমা রহিল না। পরিচিত ব্যক্তি সাধককে আসন প্রদান পূর্ব্বক স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পরিচিত ব্যক্তির পুত্র সাধকের পদদ্বয় ধৌত করিয়া দিলেন। গৃহের রমণীগণ তাঁহার জলযোগ ও রাত্রির আহারীয় দ্রব্যের প্রস্তুত জন্য ব্যস্ত হইলেন। সাধক বিশুর মনের অবস্থা জানিয়া সে রাত্রে ওড়গ্রামের প্রান্তরের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন না। বিশু বহির্দ্বারে উপবিষ্ট, অবনত বদন, কটিদেশে পরিধানবস্ত্র, কপালদেশে অন্য এক বস্ত্রখণ্ড দ্বারা আবৃত, তাহার হৃদয়ে অভয়া বরদামূর্ত্তি, নয়নে জল, হৃদয় ব্যাকুল, সে মনে মনে বলিতেছে, "মা বিশে আর মানুষ মারতে চায়না, বিশে আর ডাকাতী কর্ত্তে চায়না, বিশে আর ডাকাতী করে, গয়না, টাকাকড়ি এনে পরিবার ছেলেদিগে দিয়ে তাদের হাসিভরা মুখ দেখ্‌তে চায়না, বিশে চায় এই ঠাকুরের সঙ্গ, আর তোমার দুটী রাঙ্গাচরণ, পোঁকাভরা ডোবা পুকুরের জলের মত বিশের বুক পাপপোকেতে ভরা পাপপোকাগুলো বিল বিল কচ্ছে, মা ভাল পুকুরের পদ্মতুলে, রক্তচন্দন মাখা ভাল জবা তোমার পায়ে দিয়ে তোমাকে মনে মনে বুকেরমাঝে বসাচ্ছি, চোখেরজলে রাঙ্গাচরণ দেখে মনে হচ্ছে এইবার বুঝি পাপপোঁকা গেল, কিন্তু পাপপোঁকাগুলো মাথার ভেতর ঢুকে চোক আঁধার করে দিচ্ছে, আর তোমাকে বুকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না, বুঝেছি পাপীর বুকে থাকতে তোমার কষ্ট হচ্ছে, মা বুক ছেড়োনা মা! মা তুমি যেখানে যাও আমি তোমাকে ছাড়্‌বোনা।" এমন সময় বিশেকে জলখাবার আনিয়া দিল, বিশে অবনত বদনে তন্ময়, খাদ্যদ্রব্যের প্রতি লক্ষ্য নাই। সাধক কহিলেন, "বিশু জল খাও।" বিশু কহিল, "ঠাকুর! খাই।" পরিচিত ব্যক্তি কহিলেন, "লোকটী বোধ হয় ক্লান্ত হইয়া ঢুলিতেছে, অদ্য আপনি পদব্রজে অনেক দূর হইতে আসিয়াছেন, শীঘ্র আপনার ভোজন ও শয়নের ব্যবস্থা করা উচিত হইয়াছে।" সাধক সেই রাত্রে পরিচিত ব্যক্তির গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়া, প্রত্যুষে উঠিয়া গৃহস্থের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক বিশুর সহিত অমরাবগুড় অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

হেমন্তকাল, কার্ত্তিকের শেষ, সায়ংসন্ধ্যায় শীতঋতুর শুভাগমনের নিদর্শন

পাওয়া যাইতেছে। সূর্য্যদেব শিশির মাখিয়া স্নিগ্ধ কলেবরে উদয় হইতেছেন। পাদপপত্রে, তৃণরাশিতে ধান্যক্ষেত্রে, ফলভরে অবনত ধান্যশীর্ষে মুক্তামালার ন্যায় শিশির বিন্দু সকল সূর্য্যরশ্মিতে পরমশোভা ধারণ করিয়াছে। সূর্য্যকিরণ সুমধুর বোধ হইতেছে। সাধক বিশুর সহিত নানাবিধ কথোপকথনে অমরার গড়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। অমরারগড় গ্রাম অতি প্রাচীন। পূর্ব্বে ইহা রাজা মহেন্দ্রের গড় ছিল, তাঁহার মহিষীর নাম অমরা, তদনুসারে এই গড়ের নাম অমরারগড় হইয়াছে। রাজা মহেন্দ্রের পিতামহ ভল্লুপদ এই নগর স্থাপন করেন। রাজা ভল্লুপদের জন্ম সম্বন্ধে প্রবাদ আছে তিনি ভল্লুকগুহায় রক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম ভল্লুপদ হইয়াছে। কথিত আছে যখন নন্দবংশ ধ্বংশ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অমানুষিক মেধাবীসম্পন্ন চাণক্য পণ্ডিত মগধে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করেন, তখন মগধের অনেক ক্ষত্রিয় সস্ত্রীক বঙ্গদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই ক্ষত্রিয়গণের অনুগামিনী জনৈক রমণী অমরারগড়ের নিকটবর্ত্তী বনমধ্যে এক পুত্ররত্ন প্রসব করিয়া তাহাকে ভল্লুকগুহায় স্থাপন পূর্ব্বক প্রস্থান করেন। কোন ব্রাহ্মণ সেই বনমধ্যে কাষ্ঠ আহরণে গিয়াছিলেন। সদ্য-প্রসূত শিশুর ক্রন্দন শব্দ শ্রবণ করিয়া অনুসন্ধান পূর্ব্বক দেখিলেন, সূর্য্যসম পরম রূপবান একটী শিশু একটী গুহায় শায়িত রহিয়াছে। গুহাটী ভল্লুকের আবাস ছিল বলিয়া বোধ হইল। ব্রাহ্মণ সেই বালককে গৃহে আনিয়া সাদরে প্রতিপালন করিলেন এবং তাঁহাকে ভল্লুক গুহায় প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম ভল্লপদ রাখিলেন। শৈশবেই মানবের জাতীয় শক্তি ও বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বালক নিদাঘ সূর্য্যের ন্যায় শৈশবেই অসীম তেজ সম্পন্ন হইলেন। নানাবিধ অদ্ভুতকর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক সকলকে বিস্মিত করিতে লাগিলেন। সূক্ষ্মদর্শী ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া নিশ্চয় করিয়া তাঁহার ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারাদি করিলেন। বালক যৌবনে পদার্পণ পূর্ব্বক ভুজবলে নিকটবর্ত্তী রাজগণকে পরাজয় পূর্ব্বক অমরারগড়ে রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র গোপালও পিতার ন্যায় বলশালী ছিলেন। গোপালের পুত্র রাজা মহেন্দ্র। ইনি সিয়োরের (সিউরী বা বীরভূমের) রাজকন্যা অমরার পাণি গ্রহণ করেন। অমরা বিবাহে স্বয়ম্বরা হন। সেই স্বয়ম্বরে বঙ্গের তৎকালিক চক্রবর্ত্তী রাজা সুদর্শন ও অন্যান্য রাজগণ উপস্থিত ছিলেন। অমরা সমুদয় রাজগণকে পরিত্যাগ করিয়া রাজা মহেন্দ্রকে মাল্য প্রদান করেন. সেই জন্য রাজা সুদর্শন ও অন্যান্য রাজগণ একত্রিত হইয়া অমরারগড় আক্রমণ করেন। রাজা মহেন্দ্র নিজ গুরু শিবরাম

স্বামীর বুদ্ধি কৌশলে রাজগণকে পরাজয় পূর্ব্বক বঙ্গে বলবীর্য্যে অদ্বিতীয় হইয়া উঠেন। এই সকল বিষয় "শিবাখ্যা কিঙ্কর" নামক মহাকাব্যে বিশদরূপে বর্ণিত আছে। রাজা মহেন্দ্রের উপাস্য দেবতা দেবী শিবাখ্যা। দেবীর অনুপম মনোহর দশভুজা পাষাণময়ী মূর্ত্তি এখনও অমরারগড়ে বিদ্যমান আছে। শিবাখ্যা প্রসিদ্ধ দেবতা। ঐ স্থানের ভৈরব শিবলিঙ্গ, নাম দুগ্ধেশ্বর জাগ্রত দেবতা। রাজা মহেন্দ্রের গুরু শিবরাম স্বামী অমরারগড়ে দেহত্যাগ করিলে তাঁহার সমাধির উপর এককালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে সেই কালী মূর্ত্তির পার্শ্বে শিবরাম স্বামীর সিদ্ধাসন আছে, সেই সিদ্ধাসনে বসিয়া নির্ব্বিঘ্নে জপ করিতে পারিলে সিদ্ধি লাভ হয়। সেই কালীমূর্ত্তির নাম সিদ্ধেশ্বরী। প্রবাদ আছে সাধক কমলাকান্ত ও কেণারাম চট্টোপাধ্যায় সেই সিদ্ধাসনে জপ করিয়াছিলেন। অমরারগড়ের পূর্ব্ব চিহ্নমধ্যে গড়খাই ও বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় সকল বিদ্যমান আছে। গড়খাই সকল অনেক স্থলেই বিচ্ছিন্ন ও শস্যক্ষেত্রে পরিণত, জলাশয় সকল পঙ্কিল ও গভীরতাশূন্য। জলাশয় সকলের কাহারও নাম রাজার, কাহারও নাম রাণীর, কাহারও নাম মৃত রাজার, ইঁহাদের যমুনাদীঘি অতি প্রকাণ্ড, প্রস্থে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ এবং দীর্ঘে প্রায় একক্রোশ, ইহারও অবস্থা অন্যান্য জলাশয়ের ন্যায় শোচনীয়। দেবী শিবাখ্যা, দেবী সিদ্ধেশ্বরী ও ভৈরব দুগ্ধেশ্বরের পূর্ব্ব মন্দির সকল বর্ত্তমান নাই, পরবর্ত্তী সময়ে যে সকল মন্দির রচিত হইয়াছিল তাহাও ভগ্নপ্রায়। একশত বৎসর পূর্ব্বে অমরার গড়ের অবস্থা বর্ত্তমানের ন্যায় ছিল না। বৃহৎ পুষ্করিণী ও উদ্যান সকল তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। বৃহৎ জলাশয় সকল বিদ্যমান থাকাতে জলকষ্ট কি জলাভাব জনিত প্রাণহানি হইত না। সকলেই সুখে সচ্ছন্দে দিন অতিবাহিত করিতে। বর্ত্তমানের ন্যায় দ্বেষ, হিংসা ও কুটিলতা ছিল না, উৎসব, আমোদ আহ্লাদে, সাধারণের উপকার উদ্দেশে কৃত কর্ম্মসমূহে গ্রামের কর্ম্মীদিগের সময় অতিবাহিত হইত। গ্রামস্থ কোন লোক বিপন্ন হইলে অনেকেই নিজ পরিবারস্থ ব্যক্তিবিশেষ বিপন্ন বিবেচনা করিয়া দুঃখিত হইতেন, গ্রামে গুণী, সাধক সন্ন্যাসী সমাগত হইলে তাঁহাদিগকে নিজ নিজ অতিথি বিবেচনা করিয়া পরিচর্য্যা করিতেন।

ক্রমশঃ

উদ্দেশে।

লেখক,—ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,

(১)

বক্ষের কবাট খুলিয়া আমার,
প্রাণের উৎস ছোট ত আবার,
প্লাবিত করিয়া হৃৎমরু-ভূমি—
উদ্দেশে তাহার ধাও দেখি তুমি ॥

(২)

কামনা বাসনা ভরসা পিয়াসা—
তারি তরে প্রাণ পোরা ভালবাসা—
আর আর মানসিক বৃত্তিচয়,
আয় আয় তোরা আয় সমুদয় ॥

(৩)

আয় আয় তোরা আয় সবে মিলি,
আয় আয় তোরা করে কোলাকুলি,
আয় আয় তোরা আয় নিরিবিলি—
সে পদ সরোজে দিয়ে আসি ডালি ॥

(৪)

ওরে ভ্রান্ত মন কিসের কারণ,
বৃথা ভয়ে তুমি হও উচাটন,
যার দান তারে করি সমর্পণ—
জীবের কর্ত্তব্য কররে সাধন ॥

(৫)

ইথে—ইথে ভয় অযোগ্য তোমার,
ইথে হবে তোর সৌভাগ্য অপার,
তারি নামে বাধা-বিঘ্ন সমুদয়—
শত—শত হস্ত দূরে সবি রয় ॥

(৬)

তাই বলি, তাহে লক্ষ্য রাখি স্থির,
ছোট তারি তরে হইয়ে অধীর,
পথমাঝে যদি ঘটে দুর্ঘটন—
চলিওনা তাহে একটী চরণ ॥

(৭)

দূরে হের ঐ ক্ষীণা নির্ঝরিণী—
ধাইছে সবেগে মিশিতে তটিনী—
হৃদয় তাহার মিলা সমুদয়,
শতধা করিছে হয়ে নিচাশয় ॥

(৮)

ভ্রুক্ষেপও তাহে না করি নির্ঝর,
ধাইছে তেমতি দ্রুত দ্রুত তর,
লয়ে ছিন্নবক্ষ মথিত পরাণে—
মিশিছে আসিয়া তটিনীর সনে ॥

(৯)

পুনঃ দেখ দূরে সুন্দরী তটিনী,
ধাইছে কেমন হয়ে উন্মাদিনী,
বন উপবন, নগর প্রান্তর—
দ্রুতবেগে সবে করিছে অন্তর।

(১০)

সেও দেখ শেষে আলুথালু বেশা,
মিটাতে আপন প্রাণের পিয়াসা,
নিজেরে ঢালিয়ে হইয়ো অধীর—
মিশিতে অনন্ত সাগরের নীর ॥

(১১)

তুই ও কেন না ওদেরি মতন,
অবিরাম গতি চল ওরে মন।
পরমাত্মা সনে মিশায়ে নিজের—
জন্মান্তরগ্রহ খণ্ড চিরতরে ॥

(১২)

সেই সে কেবল মহান ও উচ্চ—
আর যত সকলি যে তুচ্ছ—
সেই সে এক বরাভয় নাশন,
দীনজনে শরণ দীনতারণ,
অভয় দানিতে এ বিশ্বসংসারে—
সে বিনে যে কেহত নাই, দীনহীন তরে ॥

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

নালু বাবু।

লেখক,—শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

লালমোহন নামে কোন বালক বঙ্গ-বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়া শুনা করিত। তাহার সহপাঠী বালকেরা তাহাকে নালু বাবু বলিয়া ডাকিত। তাহার কারণ, নালু বাবু ভাল ভাল কাপড় পরিয়া প্রতিদিন বিদ্যালয়ে আসিত। নালু লেখা পড়া খুব মন দিয়া শিখিত এবং তাহার শ্রেণীতে সে একটী ভালছেলে ছিল। বিধু মাষ্টার মশাই তা'কে বড় ভাল বাসিতেন। নালু ভাল করিয়া ইংরাজী ভাষা শিখিত, কিন্তু অঙ্ক বিদ্যায় তত মন দিত না, সেই জন্য অঙ্কশাস্ত্রের শিক্ষক মহাশয় তাহাকে দেখিতে পারিতেন না। নালু অঙ্কে তত মন দিত না সুতরাং অঙ্ক ভাল করিয়া শিখিতে পারিত না। নালু কোন এক সুদূর পল্লীগ্রামের পাঠশালা হইতে আসিয়া এই বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছিল।

নালু এই বিদ্যালয়ে আসিবার কিছু দিনের মধ্যে পঞ্চম শ্রেণীর বালকদিগের একে একে নানাদ্রব্য চুরি যাইতে লাগিল। কাহারও বই, কাহারও পেন্‌সিল্, কাহারও বা খাতা চুরি গিয়াছিল। কেহই চোর ধরিতে পারিত না। যদি কোন বালক শিক্ষক মহাশয়কে বলিত, "পণ্ডিত মশাই, আজ আমার বাঙ্গলা বইখানি ছুটীর পরে এখানে আসিয়া দেখিতে পাইতেছি না"—নালু তখনই বলিয়া উঠিত, "পণ্ডিত মশাই আমারও পেন্‌সিল্ দেখিতে পাইতেছি না।" ক্রমে এই কথা হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের কাণে উঠিল। তিনি এক নবাগত

ঝাড়ুদারের উপর সন্দেহ করিলেন। বিধু বাবু একদিন হেড মাষ্টার মহাশয়কে চুপি চুপি বলিলেন, "আমার পঞ্চম শ্রেণীতে শ্যামাচরণ নামে যে নাপিতের ছেলেটী পড়ে, আমার বোধ হয় ওরই কায। সেই দিন হইতে হেড মাষ্টার মহাশয় ও বিধু বাবু শ্যামাচরণের উপর খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখিলেন। শ্যামাচরণ অনেক সময় বিনা কারণে তিরস্কৃত হইতে লাগিল। সে কিছুতেই বুঝিতে পারিত না কেন শিক্ষক মহাশয়েরা তাঁহাকে তিরস্কার করেন। ক্রমে চুরির মাত্রা বাড়িতে লাগিল। কাহারও ছাতা, কাহারও শ্লেট, কাহারও বহি রাখিবার ব্যাগ, চুরি যাইতে লাগিল। অথচ চোরকে কেহ ধরিতে পারিত না। একদিন বেলা দুইটার সময় বিধুবাবুর কাছে পঞ্চম শ্রেণীর বালকেরা ইংরাজী পড়িতেছে. এমন সময় একখানি ভাড়াটে গাড়ী করিয়া একটি ভদ্রলোক সেই বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার গাড়ীর মধ্যে পাঁচ ছয়টা নূতন ও পুরাতন ছাতা, ১০।১২ খানা বই, ৩।৪ খানা শ্লেট, আর নানারকমের কতকগুলা পেন্‌সিল্ ছিল। সেই ভদ্রলোকটি এই সমস্ত দ্রব্য লইয়া পঞ্চম শ্রেণীতে উপস্থিত হইলেন এবং বিধুবাবুকে বলিলেন, "মহাশয়, আপনার ছাত্র এবং আমার পুত্র নালু এই জিনিসগুলি ভুলক্রমে আমার বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল। আমি তাহার পড়িবার ঘরে তক্তপোষের নীচে আজ এই দ্রব্যগুলি দেখিতে পাইলাম, সেই জন্য আজই লইয়া আসিলাম। যে যে বালকের যে যে জিনিষ তাহাদের আপনি তাহা দিন।

এই বলিয়া তিনি হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং নিজ পুত্রকৃত গুরুতর অপরাধের জন্য করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ও বলিলেন, "আপনি যদি আমার ছেলেকে ক্ষমা করিতে না পারেন তো উহাকে জেলে দিন, তাহাতে আমি দুঃখিত হইব না—আমার ছেলে বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ভাল।" হেড্‌মাষ্টার মহাশয় অতিশয় সদ্‌বিবেচক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নালুর পিতাকে বলিলেন, "আপনি এ বিষয় লইয়া আমার বিদ্যালয়ে কোন গোলমাল করিবেন না। জিনিষগুলি পঞ্চমশ্রেণীর বালকদিগের সম্মুখে বিধু বাবুকে না দিয়া, আমার নিকট দিলে বুদ্ধিমানের কাজ করিতেন। সে যাই হউক, এবার আমি নালুকে ক্ষমা করিলাম। ছেলেটিকে বাড়ীতে বিশেষ করিয়া বুঝাইবেন, আর অধিক কথার প্রয়োজন নাই।"

নালুর পিতা বাড়ী চলিয়া গেলেন। পরে হেড্‌মাষ্টার মহাশয় বিধুবাবুকে এবং পঞ্চমশ্রেণীর অপর অপর শিক্ষকদিগকে ডাকাইয়া বলিয়া দিলেন যেন

এ বিষয় লইয়া আর কোন আন্দোলন করা না হয়, ছেলেরাও নিজের নিজের দ্রব্য ফেরত পাইয়া দিন কতক পরে, যেমন ছোট ছেলেদের স্বভাব, সব ভুলিয়া গেল এবং নালুকে লইয়া আগেকার মত খেলা ও গল্প করিত।

যে দিন নালুর পিতা সকলের সাম্‌নে নালুর চুরি বিদ্যা ধরাইয়া দিলেন, সেই দিন বাড়ী গিয়া নালুর খুব জ্বর হইল। দশ পনের দিন জ্বর ভোগ করিয়া যে দিন সে বিদ্যালয়ে যায়, সেই দিন সে তার পিতা মাতার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে ও বলে, "আমাকে আপনারা এই শেষবার ক্ষমা করুন, আমি আপনাদের কাছে অনেকবার অনেক রকম অপরাধ করিয়াছি, আর এ জীবনে কখন কোন অন্যায় কাজ করিব না।" তাহার পিতা মাতা তাহাকে ক্ষমা করিলেন এবং সেই দিনই তাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন।

নালু বিদ্যালয়ে গিয়া কাহারও সহিত বেশী কথা কহিত না, পড়াশুনা খুব মন দিয়া করিতে লাগিল।

কয়েক বৎসর পরে নালু বাবু বঙ্গদেশের মধ্যে একজন প্রধান নীতিশাস্ত্রবেত্তা বলিয়া সুপরিচিত ও যশস্বী হইয়াছিলেন এবং তাহার পুত্রেরা প্রভূত ধনবান, বিদ্বান বলিয়া স্বদেশের গৌরবস্বরূপ হইয়াছিলেন। লালমোহন বাবু বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত কথায় কথায় প্রায়ই বলিতেন, "ক্ষমার তুল্য ধর্ম্ম এ জগতে নাই।"

ললিতা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত বাণীকুমার গুপ্ত।

(১)

রাঘব পুরের যামিনী রায় যখন মারা যান, তখন তাঁহার সংসারে কন্যা ললিতা ও পুত্র নরেশ ব্যতীত আর কেহ ছিল না। ললিতার বয়স তখন পনের বৎসর ও নরেশের বয়স দশ বৎসর। পার্শ্ববর্ত্তী একটী গ্রামে ললিতার বিবাহ হইয়াছিল; ললিতা তখন শ্বশুরালয়েই ছিল।

যামিনী রায় স্বগ্রামেই এক জমিদারের বাড়ীতে সাত টাকা বেতনে সরকারের

কার্য্য করিতেন, তাঁহার জমি-জমা কিছুই ছিল না, সুতরাং তাঁহাকে অতি কষ্টেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত।

কালের স্রোত অবরোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই; মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমে যামিনী রায় অকস্মাৎ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। তিনি চিরদিন বিশ্বস্তসূত্রে জমিদারের কর্ম্ম করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু সুযোগ বুঝিয়া অর্থগ্রাহী জমিদারের প্রধান কর্ম্মচারি তহবিল তছরূপের অপরাধ জনিত মিথ্যা নালিশে ডিক্রী পাইয়া, অনাশ্রিত নরেশের বসতবাটীখানি পর্য্যন্ত দখল করিয়া বসিলেন। এক্ষণে নরেশ পথের কাঙ্গাল। অনন্ত পিতৃশোকের সঙ্গে সঙ্গে দৈন্যতা আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিল। নরেশের সে কান্তি নাই,—সহপাঠী বন্ধুবর্গের সহিত বাক্যালাপে সে আনন্দ উচ্ছ্বাস নাই। শরীর শীর্ণ, পরিধান জীর্ণ বসন; সহসা দেখিলে চিনিয়া উঠা কঠিন।

ললিতা যখন শুনিল—যে তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, নরেশকে বঞ্চিত করিয়া জমিদার সরকারের কর্ম্মচারিগণের নানা ষড়যন্ত্রে তাহাদের কুঁড়ে ঘরখানি পর্য্যন্ত অপরে অধিকার করিয়াছে। তখন তাহার হৃদয়ের মধ্যে ভ্রাতৃস্নেহের ভীষণ বন্যা বহিতে লাগিল। অতীতের ঘটনাগুলি যেন তাহার চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া প্রকাশ হইতে লাগিল। যে দিন তাহার মাতা তাহাদিগকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যান, সেই দিনের কথা ঘটনা সকল তাহার মনে পড়িল। যে ভাইকে সে না খাওয়াইলে খাইত না,—না শোয়াইলে সে শয়ন করিত না, সেই ভ্রাতার অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া ললিতা নয়নজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল।

নরেশের দুর্দ্দশা ভাবিয়া ললিতা মুহূর্ত্তমাত্র স্থির হইতে পারিল না। দুঃসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই তখনই তাহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইল। পরদিন অনাথ নরেশ শীর্ণকায়, রুক্ষকেশে, ছিন্নবস্ত্রে—ললিতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন ললিতার বুক ফাটিয়া গেল। ভাইকে বুকের মধ্যে টানিয়া ললিতা কাঁদিতে লাগিল; নরেশও চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল। পাড়ার বর্ষীয়সী রমণীরা ক্রমে ক্রমে নরেশকে দেখিতে আসিল, আর বলিল, "হায়! হায়! এমন সোনার চাঁদ, এই বয়সে মা, বাপ হারা হ'ল গা?"

(২)

দিন সকলেরই কাটে, ললিতারও সুখে দুঃখে দিন কাটিতে লাগিল। ললিতার স্বামী রাধাচরণের—যে বিশেষ কিছু ছিল, তা নয়, তবে কষ্টে সৃষ্টে কোন

রকমে দিন কাটাইতেন। এই অনাটনের মধ্যেও নরেশের পড়ার যাহাতে ক্ষতি না হয়, সেই জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন। নরেশও বুদ্ধিমান, অল্পদিনেই স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। তাহাকে যে আবার কলিকাতায় রাখিয়া উচ্চ শিক্ষা দিবেন, রাধাচরণের এরূপ ইচ্ছা ছিল কিন্তু অবস্থা ছিল না; সুতরাং নরেশের এই খানেই পড়াশুনা শেষ হইল।

নরেশ এখন বড় হইয়াছে। ললিতার ইচ্ছা, ভাইএর বিবাহ দিয়া একটী টুক্ টুকে বৌ ঘরে আনে। রাধাচরণ পত্নীর বিরুদ্ধে কখনও কোন কথার প্রতিবাদ করেন নাই; ললিতারই কথা রহিল। ঘোষপাড়ার যাদব চৌধুরীর কন্যা লক্ষ্মী, ভ্রাতৃ-বধূ রূপে গৃহে আনীত হইল। ললিতার আনন্দ আর দেখে কে, নববধূর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া, প্রতিবাসিনীদের কাছে সগর্ব্বে বলিল, "ঘরে বৌ আন্‌তে হয় ত এমনি! গুণেও লক্ষ্মী, রূপেও লক্ষ্মী, ঘর যেন আলো করে রয়েছে।" এই কথা বলিতে বলিতে দুই এক ফোঁটা আনন্দাশ্রু তাহার গণ্ড বহিয়া পড়িয়া গেল।

নরেশের শ্বশুর কলিকাতায় চাকুরী করিতেন। তিনি নরেশের একটী চাকরী করিয়া দিবার জন্য রাধাচরণের মত চাহিলেন, রাধাচরণ কি জানি কি ভাবিয়া যেন কতকটা বিষণ্ণ ভাবে তাঁহার কথার সম্মতি প্রদান করিলেন। ৺পূজার বন্ধে নরেশের শ্বশুর বাড়ী আসিয়াছিলেন, ছুটীর শেষে নরেশকে লইয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলেন।

(৩)

দেখিতে দেখিতে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। তদবধি নরেশ কলিকাতাতেই থাকে। মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে নরেশের শ্বশুর একটী চাকরী করিয়া দিয়াছেন। তিন দিবসের ছুটী থাকিলেও নরেশ স্নেহময়ী ভগ্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়।

নরেশ নিজের অধ্যবসায়ে ও যত্নে দিন দিন উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে লাগিল। আফিসের কর্ম্মাধ্যক্ষ তাহার কার্য্য পটুতায় সন্তুষ্ট হইয়া ২৫৲ টাকা হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন ধার্য্য করিয়া দিলেন। অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম হইয়া নরেশ অধিক দিন শ্বশুরের অন্নে প্রতিপালিত হওয়া লজ্জাকর বিবেচনা করিয়া, কলিকাতায় একটী ছোট বাটী ভাড়া করিয়া সস্ত্রীক সেই স্থানে বাস করিতে লাগিল।

একদিন বেলা দশটার সময় নরেশ যখন আফিস যাইবার জন্য সদর দরজায় দিয়া বহির্গত হইতেছিলেন, এমন সময়ে পিয়ন সম্মুখে আসিয়া ডাকিল, "বাবু! চিট্ হায়।" নরেশ চিঠিখানি লইয়া পড়িতে লাগিল। পত্রখানি তাহার ভগ্নী ললিতার লিখিত। পত্রে লেখা ছিল,—

"ভাই নরেশ!

এতদিনের পর আমার কপাল ভাঙ্গিল! এই চক্রবৎ ঘূর্ণয়মান সুখ দুঃখ বিজড়িত সংসারের এককোণে বসিয়া একটু সুখের অধিকারিণী হইয়াছিলাম; কিন্তু বিধাতা আমার সে সুখটুকু অপহরণ করিয়া লইলেন। আমার নয়নের আলো, জীবনের আরাধ্য দেবতা, পরকালের মুক্তির পথ, আমায় ফাঁকি দিয়া, আমায় অপার সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া ইহধাম হইতে চলিয়া গেলেন। আমি কেবল যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য জীবিত থাকিলাম। জানি না—কত দিন এ ভাবে জীবন যাপন করিব; কতদিন পরে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে তাঁহার সহিত মিলিত হইব। অধিক আর কি লিখিব। ইতি—

তোমার হতভাগিনী—ভগ্নী।"

ললিতার অবস্থা চিন্তা করিয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া নরেশ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। সে দিন আর তাহার আফিস্ যাওয়া হইল না।

(৪)

ললিতার স্বামীর মৃত্যুর দশবৎসর কাটিয়া গিয়াছে। শোকের আগুণ কখনও নির্ব্বাপিত হয় না। তবে যতদিন গত হয়, তত যেন চাপা পড়ে। ললিতার তাহাই হইয়াছে। যদিও সে স্বামীশোক ভুলিতে পারে নাই,—তথাপি সংসারে জীবন ধারণ করিয়া থাকিতে হইলে সমস্তই সহ্য করিতে হইবে, ভাবিয়া ধৈর্য্যশালিনী ললিতা কতকটা ধৈর্য্য ধরিয়াছে।

কিছু দিন গত হইল, নরেশ, ললিতা ও তাহার দশমবর্ষীয় পুত্র বিমলকে তাহার কলিকাতার বাটীতে লইয়া আসিয়াছে। প্রথমে ললিতা তাহার স্বামীর বাড়ী ত্যাগ করিয়া আসিতে স্বীকৃতা হয় নাই, কিন্তু নরেশের ভ্রাতৃস্নেহ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া কলিকাতায় আসিতে বাধ্য হয়।

নরেশ ললিতা ও ছেলেটীকে খুবই ভালবাসে। নিজের ছেলের ও ললিতার ছেলের পোষাক পরিচ্ছদে, আদর যত্নে বিন্দুমাত্র পার্থক্য দেখা যায় না। ললিতা ও বিমল তাহার বাড়ীতে থাকায়—সে যেন কত আনন্দিত; কিন্তু ললিতা এখানে আসায় বিলাসিনী লক্ষ্মীর মন ততটা সন্তুষ্ট হয় নাই; ভাব ভঙ্গীতে

ললিতা ইহা বুঝিতেও পারিয়াছিল। প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক কার্য্যেই সে তাহাকে বাধা দিত, কখন কখন বা বেশ দু'চারিটী মিষ্ট কথাও শুনাইয়া দিত। সাধ্বী ললিতা কিন্তু তাহার কোন কথায় কাণ দিত না, সে কেবল সংসারের কাজ কর্ম্মেই লিপ্ত থাকিত। সময় পাইলে লক্ষ্মীর ছেলেটীকে লইয়া আদর যত্ন করিত।

একদিন বৈকালবেলা নরেশ আফিস হইতে আসিয়া মুখহাত ধুইয়া বসিয়া আছে, তখনও তাহাকে জলখাবার দেওয়া হয় নাই। লক্ষ্মী ইহা দেখিয়াও তখন তাহার সজ্জাগৃহে গিয়া মাথা আচ্‌ড়াইতে ছিল।

ললিতা আসিয়া লক্ষ্মীকে বলিল, "হাঁ গা! নরেশকে এখনও জল খেতে দাও নি? কতক্ষণ বসে রয়েছে।" লক্ষ্মী বলিল, "ভাইএর উপর যদি এতই ভালবাসা, তা'ত নিজেই দিতে পার।" ললিতা আর কোন কথা না বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

(৫)

সম্প্রতি নরেশের পরিবারে আর একটা ঘটনা ঘটিল। নরেশের জনৈক বন্ধু কর্ত্তৃক তাহার কন্যার বিবাহোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া, নরেশ ও তাহার ভগ্নী ললিতা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেল। লক্ষ্মী জেদাজেদি সত্ত্বেও তথায় যায় নাই। বন্ধুর বাটীতে দুই চারি দিন বিলম্ব হইবে—এইরূপ কথা ছিল; সুতরাং ললিতা বিমলের পড়াশুনার বিশেষ ক্ষতি হইবে ভাবিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া গেল না।

হঠাৎ বিমলের একদিন খুব জ্বর হইল। নরেশ ও ললিতা ইহা শুনিয়া বাড়ীতে উদ্বেগে ছুটিয়া আসিল, আসিয়া দেখিল,—বিমলের জ্বর অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে; সে তখন নীচে একটা সেঁত সেঁতে ঘরে শুইয়া আছে। তাহারা তাহাকে এইরূপ অবস্থায় শুইয়া থাকিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। লক্ষ্মী বলিল, "সে তাহাকে অনেক সাধ্য সাধনা করিয়াছে, কিন্তু সে উপরে শুইতে যায় নাই।" যাহা হউক, নরেশ তৎক্ষণাৎ তাহাকে কোলে করিয়া উপরে লইয়া গেল। সামান্য জ্বর ভাবিয়া তাহারা ততটা গা দিল না। নরেশ বেলা দশটার সময় আহারাদি শেষ করিয়া আফিস চলিয়া গেল। লক্ষ্মী তখন বঙ্কিম বাবুর 'বিষবৃক্ষ" খানি লইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িতে লাগিল। ললিতা আপনার কক্ষে পুত্রের শিয়রে বসিয়া বিমলের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "এখন কেমন আছ বাবা?" বিমল ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "এখন একটু ভাল আছি মা, মা! কবে বাড়ী যাবে।"

ললিতা পুত্রের শেষের কথাটী শুনিয়া বিস্মিত হইল। সে এতদিনের মধ্যে এমন কথা একদিনও তাহার মুখে শুনে নাই; আজ হঠাৎ এমন কথা বলিল কেন? ললিতা বলিল, "কেন বল্ দেখি? এখানে কি তোর ভাল লাগ্‌ছে না।" "না মা মামী মা আমাকে ভাল বাসেন না। কাল্‌কে তাঁর তক্তাপোষের উপর একটা সুগন্ধি তেলের শিশি রেখেছিলেন; কি জানি কে সেটা নীচে ফেলে দিয়েছিল, শিশিটা ভেঙ্গে গিয়েছে; তা মামী মা ভ্রু কুঞ্চিত করে তীব্র দৃষ্টিতে আমাকে বল্লে এ তোরই কাজ, বল্‌বো কি মা, আমায় নানা কটুক্তিতে ঘাড় ধরে রাস্তায় বার করে দিলেন, আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে কত কাঁদ্‌লেম কিন্তু কিছুতেই ঘরে ঢুক্‌তে দিলেন না। আমি সমস্ত রাত্রি রকটায় পড়ে রইলেম। আমি শীতে যে, কষ্ট পেয়েছি, তা তোমায় কি বল্‌বো। না মা, তুমি এখান থেকে চ'লে চল।"

বিমলের কথায় ললিতার অন্তরকে পূর্ব্বস্মৃতির ঘাত প্রতিঘাতে অস্থির করিয়া তুলিল। ললিতা বিমলের নিকট আত্মসম্বরণ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু নয়নের আসার তাহা অপ্রকাশ রাখিতে দিল না; মর্ম্মস্পর্শী বেদনায় তাহার বুকের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তাহার মুখ হইতে একটীও কথা সরিল না। নিতান্ত নিরুপায়। পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল ভাবে বসিয়া বিমলের দুঃখ কাহিনী একটির পর একটী শুনিয়া যাইতে লাগিল। ললিতা বহুকষ্টে সামলাইয়া বলিল, "ছি বাবা! মামী মা বলেছে, তা কি হবে? ওসব কথা বল্‌তে নেই।" বিমল কান্নাস্বরে বলিল, "না মা আর বল্‌বো না।"

বিধাতার বিধান অখণ্ডনীয়! বিমলের জ্বর ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সপ্তম দিবসাবধি অদ্য দ্বাদশ দিবস রোগের প্রাবল্য বই কম দেখা গেল না। নরেশ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না; ত্রয়োদশ দিবসে অবতারণ ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিল। রোগ পরীক্ষান্তে ডাক্তার বাবু বলিলেন, "বড়ই শক্ত ব্যারাম, দুই এক দিন পূর্ব্বে আমাকে সংবাদ দেওয়া আপনাদের উচিত ছিল, দেখিতেছি রোগ ডবল্ নিউমোনিয়ায় দাঁড়াইয়াছে।" বলিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিলেন; পরে নরেশকে বলিলেন, "আসুন! আমার সঙ্গে, ঔষধ লইয়া আসিবেন।" উভয়ে যাইতে যাইতে নরেশ সদর দরজার নিকট অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে ডাক্তার বাবুকে বলিলেন, "রোগ কি মারাত্মক?" ডাক্তার বাবু বলিলেন, "আমার সন্দেহ হয় অদ্য রাত্রি পার হইবে কিনা?" তাহাই হইল, রাত্রি আনাজ তিন

টার সময়, ললিতার অঞ্চলের নিধি বিমল ললিতার স্নেহ ডোর ছিন্ন করিয়া দেহ পিঞ্জর হইতে পলাইয়া গেল।

(৬)

তখন আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল। জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোকে চারিদিক ভাসিয়া গিয়াছিল; উন্মুক্ত বাতায়ন পথে ললিতা তাহাই দেখিতে ছিল।

আজ কয়দিন হইল, তাহার খুব জ্বর। এই অসুখ যে তাহার শোকজ, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রাণের পুত্তলিকা, পরলোকে পিণ্ড পাইবার একমাত্র অবলম্বন বিমল তাহাকে উন্মাদিনী করিয়া চলিয়া গিয়াছে। স্বামী শোক ভুলিতে না ভুলিতে, দারুণ পুত্রশোক তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিল। এমন শোকের পসরা মাথায় লইয়া ললিতা এখনও জীবিতা, ইহা তাহার অপ্রমেয় ধৈর্য্যগুণ।

নরেশ তাহার শিয়রে বসিয়া ব্যজন করিতেছিল? উভয়েই ক্ষণকাল নীরব। সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ললিতা বলিল, "ভাই নরেশ! তোদের সংসারে এসে, আমি অনেক কষ্ট তোদের দিয়েছি। আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করে, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, যেন নিশ্চিন্ত হয়ে স্বামীর কাছে যেতে পারি।"

বজ্রগর্ভ মেঘের মত নরেশের বুকের ভিতরটা ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু সে মাথা হেট করিয়া মৌনভাবে বসিয়া রহিল। ললিতা বলিল, "আমার একটী কথা তোকে রাখ্‌তে হবে।"

নরেশ মৃদুকণ্ঠে বলিল, "কি কথা?" ললিতা বলিল, "আমার কথা নিয়ে তুই কোন দিন লক্ষ্মীর সঙ্গে ঝগড়া করিস্ নে।"

নরেশ বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "তার মানে?" ললিতা কহিল, "মানে যদি কোন দিন শুন্‌তে পাস, সেদিন শুধু এই কথাটী মনে করিস্, আমি যেমন করে নিঃশব্দে সব সহ্য করে চলে গেছি, একটী কথারও প্রতিবাদ করিনি।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আবার বলিল, "কিন্তু একদিনও যদি আমার অসহ্য হত সেই দিন—না—থাক্—" তাহার কথা শেষ না হইতে লক্ষ্মী কপাট খুলিয়া ছেলেটীকে কোলে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ললিতার পদতলে বসিয়া পড়িল, বলিল, "ওগো আমায় ক্ষমা কর, আমার উপর রাগ করে তুমি যেওনা।"

ললিতা বলিল, "ভয় নাই; আমি মোরব না, দে নরুকে আমার কাছে দে।"

ভক্তের ভিক্ষা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী।

গৌর হে!
দাও মোরে দাও, অসীম যন্ত্রণা,
রোগ শোক দুখ ভার।
দাও মোরে দাও, জগতের পাপ,
করিব কণ্ঠের হার॥
দাও মোরে দাও, অনন্ত নরকে,
চিরদিন বাস স্থান।
দাও মোরে দাও, জ্ঞান কর্ম্মের
যত কিছু অভিমান॥
দাও মোরে দাও, যত ব্যথা আছে
জীবের দুঃখের তরে।
সকলি সহিব অম্লান বদনে
নাচিব আনন্দ ভরে॥
একটি দুঃখ দিও না হে মোরে
এই নিবেদন মোর।
(তব) চরণ বিস্মৃতি, পদ হতে চ্যুতি
এই ত বিপদ ঘোর॥
এ হ'তে যাতনা, অধিক বেদনা
কিবা হ'তে পারে আর।
এই কথা বলি, দুই বাহু তুলি
নাচে হরি বারম্বার॥

কোষ্ঠী-শিক্ষা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত পশুপতি সরকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জাতকের জন্ম দিন ও তাহার পূর্ব্বদিন দেখিয়া জানা গেল শ্রবণার ভোগ পরিমাণ ৬১ দণ্ড ২১ পল, এবং ভোগ্য অংশ ৩৩ দণ্ড ৩০ পল। অতএব পরিমাণ ৬১×৬০×২১—৩৬৮১ পল শ্রবণার ভোগ্য অংশ ৩৩+৬০+৩০—২০১০ পল আর ৭ বৎসর ১ মাস ১৫ দিন ৮৫×৩০×১৫—২৫৬৫ দিন। অতএব শ্রবণার ভোগকাল ৩৫৬৫ দিন। এখন ২৩৮১ পলে যদি ২৫৬৫ দিন ভোগ হয়—তবে ২০১০ পলে ভোগ কত হইবে? ভোগ্যমান পলকে ভোগ দিন দিয়া গুণ করিয়া গুণফলকে নক্ষত্র মান পল দিয়া ভাগ করিলেই ভোগ্য দিন নির্ণীত হয়। ঐরূপ করিয়া দেখা গেল যে জাতকের বৃহস্পতির দশায় শ্রবণার ভোগ্য অংশ ৩ বৎসর ১০ মাস ২০ দিন ৩৬ দণ্ড থাকিলে জন্ম। জাতকের জন্ম সময়ের দশার ভোগকাল নিরূপিত হইল এইরূপে দশাকাল যোগ করিয়া পরবর্ত্তী দশা নির্ণয় করা যায়। জাতকের দশাফল দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

দশাফল লিখিবার সময় গ্রহগণ উচ্চ, স্বক্ষেত্র, মূল ত্রিকোণ, কেন্দ্র প্রভৃতি স্থানে অবস্থান অথবা রাশ্য বা ভাগ্য স্থানের অধিপতির সহিত যুক্ত হইয়া বলাবল কিম্বা নীচস্থ, শত্রুক্ষেত্রে অবস্থান প্রভৃতি কারণে হীনবল কিনা? বিচার করিয়া ফল লিখিতে হয়। পুস্তক লিখিত ফল নকল করা বড় দোষ কেননা কোন জাতকের ৫ বৎসর বয়সের সময় স্ত্রী লাভ লেখা আছে সে স্থলে জাতকের জন্ম কুণ্ডলী চক্র, পত্নী স্থান, পত্নীকারক গ্রহের অবস্থান ইত্যাদি বিচার করিয়া ঐ সময়ে জাতকের পত্নী লাভ সম্ভব কিনা? দেখা আবশ্যক। যদি না হয় তবে লেখা কতদূর অন্যায় তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। আজ কাল অধিকাংশ লোকেরই কোষ্ঠীর প্রতি অনাস্থা দেখা যায়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল পুঁথিগত বাঁধিগৎ উদ্ধৃত করা! সুতরাং একটু সতর্কতার সহিত বিশেষ বিচার করিয়া ফল লিখিলেই কলহ অমিল হইবে না। বিশেষতঃ ইহাতে প্রশংসা ও পয়সা দুইই আছে।

দশাফল।

রবি।

রবি যদি উচ্চ, স্বক্ষেত্র, মূলত্রিকোণে অবস্থিতি করেন, অথবা কর্ম্ম কি ভাগ্য স্থানের অধিপতির সহিত যুক্ত বা স্থান বিনিময় করেন কিম্বা শুভ গ্রহের দৃষ্টি প্রাপ্ত বা একাদশে থাকেন তবে জাতক উক্ত দশায় নানাবিধ সুখ কর দ্রব্য, রাজ সম্মান ইত্যাদি লাভ করিয়া থাকে। যদি নীচস্থ বা সাম্যভাবে অবস্থান করিয়া হীন বল হন তবে জাতকের আত্মীয় বন্ধুগণের সহিত বিরোধ, পিতৃনাশ স্ত্রী, পুত্র হানি, জ্বর রোগ, দেশান্তরে গমন, ভৃত্যের সহিত কলহ ইত্যাদি অশুভ ফল হইয়া থাকে। রবি শুভ ও অশুভ ভাবে থাকিলে মিশ্র ফল হয়।

চন্দ্র।

চন্দ্র যদি বলবান হইয়া শুভ স্থানে থাকেন, তবে জাতকের নানাবিধ ধনরত্ন, বাহন, শুভকার্য্য, মিষ্টান্ন, পুষ্প, বস্ত্র ইত্যাদি লাভ হয়। আর চন্দ্র যদি হীনবল হইয়া অশুভ স্থানে থাকেন অথবা ক্রূর গ্রহ কর্ত্তৃক পূর্ণ দৃষ্ট হন—তাহা হইলে জাতকের শারীরিক জড়তা, মনো ব্যাকুলতা, মানসিক চিন্তা, মাতৃনাশ, ধনহানী প্রভৃতি অশুভ ফল হয় এবং ষষ্ঠ অষ্টম স্থানে ক্রূর গ্রহের সহিত যুক্ত হইলে উক্ত গ্রহের দশায় জগতের অশুভ ফল হইয়া থাকে।

মঙ্গল।

মঙ্গল উচ্চ, স্বক্ষেত্রে, মূলত্রিকোণ বা একাদশ স্থানে অবস্থিতি করিয়া পূর্ণবল যুক্ত হয়েন তাহা হইলে জাতকের শত্রুজয় ভ্রাতৃবর্গ, অশ্ব, অজা, মেষ, বহুমূল্য বস্ত্রাদি ও সুখ লাভ হইয়া থাকে। আর যদি মঙ্গল অশুভ স্থানে হীনবল হইয়া অবস্থান করেন, তবে জাতকের কলহ, জ্বর, মেহ, জড়তা, হতভাগ্য লোকের সহিত বাস, দুঃখ ইত্যাদি অশুভ ফল হইয়া থাকে।

বুধ।

বুধ উচ্চ, স্বক্ষেত্রে, মূলত্রিকোণ বা কেন্দ্র স্থানে থাকেন তবে এই দশায় জাতকের সৎবুদ্ধি, পুত্র, কলত্র, ধন, জ্যোতিষশাস্ত্রে জ্ঞান, সুস্থ শরীর, কাব্য শিল্প বিদ্যাদি এবং ধর্ম্ম প্রভৃতি শুভ ফল লাভ হইয়া থাকে। আর যদি বুধ অশুভ স্থানে বলহীন হইয়া অবস্থান করেন, তবে জাতকের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, রাজদ্বেষ, বহু-কলহ, মানসিক ব্যথা প্রভৃতি অশুভ ফল এবং স্মৃতি, মেধা, মূত্রকৃচ্ছ প্রভৃতি রোগ হইয়া থাকে।

সমালোচনা।

শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের পাঁচালী।—বিক্রমপুরের প্রাচীন কবি স্বর্গীয় দ্বিজ রামকৃষ্ণ বিরচিত; বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত মূল্য দুই আনা মাত্র।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের দেশে হিন্দু সমাজে শ্রীশ্রী৺সত্যনারায়ণ সেবাব্রত সর্ব্বত্র সুপ্রচলিত। বিক্রমপুরের প্রাচীন কবি স্বর্গীয় দ্বিজ রামকৃষ্ণ এই পাঁচালী পুঁথিখানি লিখিয়া গিয়াছিলেন। এই পাঁচালী পুঁথিখানি এতদিন প্রাচীন হস্ত লিখিত পুঁথির তালিকাভুক্ত ছিল। অনেকেই নিজ অভিপ্রায় মত দুই চারিটী শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া দুই এক পংক্তি নূতন বসাইয়া মূল পুঁথির গৌরবের হানি করিতে ছিলেন। যারপর নাই আনন্দের বিষয় বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণেতা সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই আলোচ্য পুঁথিখানি সম্পাদন করিয়া হিন্দু সংসারে শ্রীশ্রী৺সত্যনারায়ণ দেবের উদ্দেশে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার সুবিধা ও সুযোগ উপস্থিত করিয়া দিয়া হিন্দু ধর্ম্ম সংসারে মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। আমরা যোগেন্দ্র বাবুর এই পুঁথি সম্পাদনের জন্য সাধুবাদ প্রদান করিতেছি।

দেবদাসী।—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রলাল দাস বি, এল, প্রণীত, কলিকাতা [illegible] নং হ্যারিসন রোড হইতে শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র এম, এ, বি, এল, কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ছয় আনা মাত্র।

গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র নাটকের সূচনায় লিখিয়াছেন, "পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই নাটকখানি কোনও বাঙ্গালী লেখিকার একটি ক্ষুদ্র গল্পের ছায়া অবলম্বন করিয়া রচনা করিয়াছিলাম। এ যাবৎ নাটকটি প্রকাশ করি নাই। এখন বন্ধু বান্ধবের অনুরোধে "দেবদাসী" প্রকাশিত হইল।"

নবীন নাট্যকার কোন্ বাঙ্গালী লেখিকার গল্পের ছায়া অবলম্বন করিয়া এই ক্ষুদ্র নাটকখানি রচনা করিয়াছেন? এই সূচনায় তাঁহার নাম প্রকাশ করা উচিত ছিল নাকি? গোপন করিবার কারণ কি? নাটকখানি ক্ষুদ্র হইলেও বঙ্গরঙ্গমঞ্চে স্থান পাইবার উপযুক্ত। নাটকীয় নায়ক নায়িকার চরিত্র চিত্রাঙ্কণে লেখকের বাহাদুরী আছে। সঙ্গীতে ভাবুকতা ও কবিত্ব আছে। নাট্যকারের নাটক রচনার উদ্দেশ্য সফল হইলে সুখী হইব।

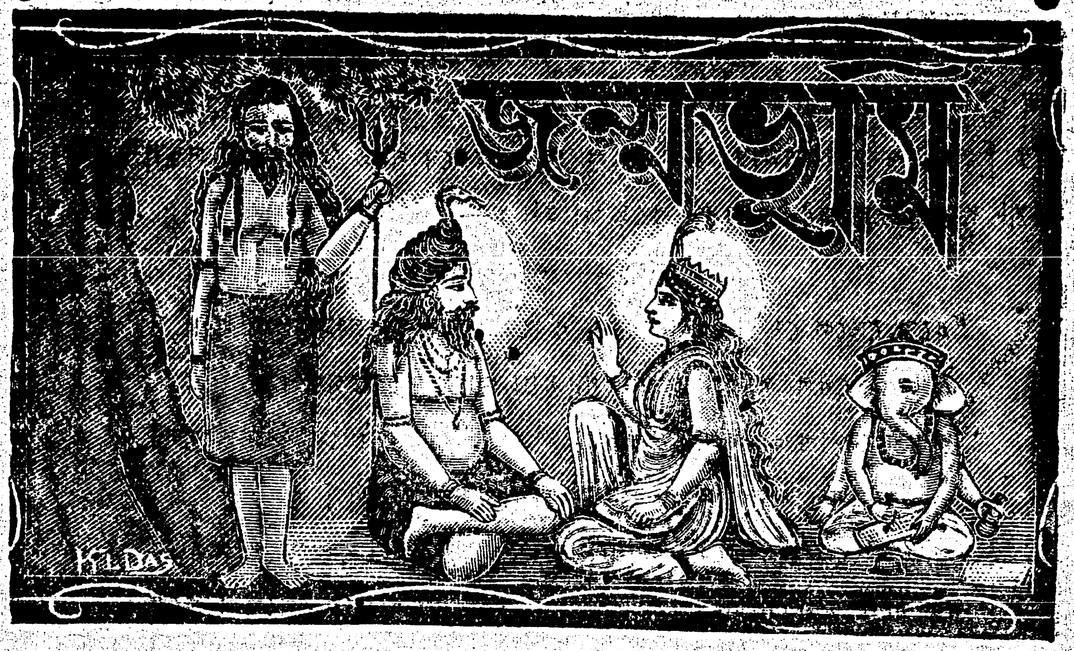

—o—

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

২৮শ, বর্ষ। | ১৩২৯ সাল, ভাদ্র। | ৫ম, সংখ্যা।

তত্ত্ব-প্রসঙ্গ।

লেখক,—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার পাত্র।

বর্ষান্তে শরৎকাল। দিবা অবসান প্রায়। প্রাকৃতিক শোভা বড়ই ·· দর। সহরের পশ্চিমপ্রান্তে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা পূতসলিলা ভাগীরথী বর্ষার বারি ধারা সহযোগে স্ফীতবক্ষে দুই কূল প্লাবিত করিয়া যেন নব অনুরাগে লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হইয়া কল কল নিনাদে একটানে একমনে সাগরাভিমুখে খরতর বেগে চলিয়াছে। এই সুযোগে বায়ু প্রতিকূল হইলেও দক্ষিণদিগাভিমুখী নৌকার মাঝিগণ দাঁড়ির সহযোগে আনন্দে গান করিতে করিতে আরোহী লইয়া নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে চলিয়াছে। আবার উত্তরদিগাভিমুখী কত শত নৌকার মাঝিগণ স্রোত প্রতিকূলগামী হইলেও অনুকূল বায়ুর সাহায্যে বাদাম তুলিয়া দিয়া প্রফুল্লচিত্তে চলিয়াছে। এদিকে গঙ্গাতীরে ইষ্টক নির্ম্মিত সোপানাবলী সমন্বিত

ঘাটের উপরিভাগে বসিয়া দুইটী যুবক বায়ুসেবন ও অস্তগামী সূর্য্যদেবের লোহিত কিরণ প্রভায় পশ্চিম গগনের বিচিত্র শোভা সন্দর্শন করিতেছে। অদূরে ঘাটের নিম্ন সোপানে বসিয়া কয়েকজন কর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সায়ংকালীন সন্ধ্যাহ্নিক ক্রিয়া ও উপাসনায় নিবিষ্ট আছেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল। সহসা অনতিদূরে জনৈক মধুর কণ্ঠে গাহিল :—

খাম্বাজ—একতালা

"হতে ছেলে খেলা গেল বেলা, সাঁজের আঁধার সাম্‌নে এ'ল।
খেলা ঘরের ধূলা মাখা মলা গায়ে রয়ে গেল॥
শিশু সনে শিশু খেলা, যৌবনে যুবতী মেলা,
ধন আশা যশতৃষা ভালবাসায় মন মজিল ;
খেলার ছলে, আসল ভুলে, বুড় ত না ছোঁয়া হ'ল॥
রঙ্গ রসে অঙ্গ ঢেলে, সাজান খেলেনা কলে,
খেলিতে জীবন গেল, খেলা রহিল ;
ফাঁকা খেলায় দিন ত ফুরাল॥ (এবার বুঝি)"

যুবকদ্বয় একমনে উক্ত গীত শুনিতেছিল। সহসা সুবোধের প্রাণে কেমন একটী ধাক্কা লাগিল। গীত শেষ হইলে সুবোধ বলিল, "চল ভাই বিনোদ, উহার নিকটে গিয়া বসি।" এই বলিয়া উভয়ে উঠিয়া গায়কের নিকট উপস্থিত হইল। গায়ক মহাশয় বয়ঃজ্যেষ্ঠ ও প্রবীণ। সুবোধ তাঁহাকে বলিল, "মহাশয়, আপনার যেমন কণ্ঠস্বর গানটীও তেমনি সুন্দর। কিন্তু আমাদের দুই একটী কথা জিজ্ঞাস্য আছে, যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।"

গায়কের নাম তারাপদ। তিনি যুবকদ্বয়কে সাদরে বলিলেন, "কি জিজ্ঞাস্য আছে বলুন, ইহাতে আর আপত্তি কি ?"

সুবোধ। "খেলা ঘরের ধূলামাখা মলা গায়ে রয়ে গেল," এবং "বুড়ী ত না ছোঁয়া হ'ল," এই কথাগুলির প্রকৃত অর্থ কি ?

তারাপদ। আপনার প্রশ্ন শুনিয়া বড় সুখী হইলাম। আপনারা ছেলে বেলায় "চোর চোর খেলা" কখন করেন নি, কি দেখেন নি ? একজন বুড়ী সাজে এবং কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া থাকে, একজন আঁদি হয়—অর্থাৎ চোর সাজে, যে চোর সাজে, তার চক্ষে কাপড় বেঁধে দেওয়া হয়, আর সব খেলুড়ীরা তখন নিভৃত স্থানে লুকাইয়া থাকে। বুড়ী চোরের চক্ষু বন্ধন করিয়া দিলে

সা-পরিষৎ-গ্রন্থাগার

চোর তখন দুইবাহু প্রসারণ করিয়া খেলুড়ীদের ইতস্ততঃ খুঁজিয়া ধরিতে চেষ্টা করে। খেলুড়ীরা তখন চোরের মাথায় পশ্চাৎ হইতে হঠাৎ টোকা মারিয়া ছুটাছুটি করিতে থাকে। এইরূপ খেলা করিতে করিতে যখন কোন খেলুড়ীকে চোর ধরিয়া বা ছুঁইয়া ফেলে, তাহা হইলে সেই খেলুড়ীকে চোরের অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়, এবং প্রথম চোরের বন্ধন তখন বুড়ী আসিয়া খুলিয়া দেন। দ্বিতীয় চোর তখন দুইবাহু প্রসারণ করিয়া অন্য খেলুড়ীদের ধরিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায় আর বুড়ীর নিকট হইতে হয় ত ক্রমশঃ দূরে গিয়া পড়ে ; যদি সে কোনরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে বুড়ীকে ছুঁইতে পারে, তখন তাহারও বন্ধন মোচন হয়। আর যদি খেলা আরম্ভ করিয়াই চোর বুড়ীকে ছুঁইয়া ফেলে, বুড়ী সে ছোঁয়াকে না মঞ্জুর করে। বলে, "ও কি ভাই, খানিক আগে খেল, তারপর ছোঁও।" অর্থাৎ বুড়ীর ইচ্ছা যে, কিছুক্ষণ খেলুড়ীদের লইয়া খেলা করে, তারপর যখন দেখে যে খেলুড়ীরা বড় ক্লান্ত হইয়াছে, আর খেলিতে সাধ নাই, ঘন ঘন বুড়ীর দিকে চাহিতেছে, তখন বুড়ী খেলুড়ীদের নিকটে আসিয়া সকলকে বলে যে, আজ খেলা থাক। তখন কেহবা বুড়ীকে স্পর্শ করিয়া কেহবা অমনি ঘরে চলিয়া যায়।

দেখুন, আমরাও সেইরূপ এই ভবের মাঝে বাসনা বা সঙ্কল্প বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বাসনা তৃপ্তির জন্য ছুটাছুটি করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। কামাদি ষড় রিপুর সহিত খেলিতে গিয়া তাহাদের উত্তেজনায় তাহাদেরই পেছু পেছু ঘুরিয়া ঘুরিয়া যখন অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হয়, তখনই মুক্তির জন্য আদ্যাশক্তি মহামায়া শরণাপন্ন হই। যতক্ষণ না তিনি দয়া করিয়া মায়ার বন্ধন খুলিয়া দেন, ততক্ষণই মায়ার রাজ্যে জন্ম-জন্মান্তর ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। তাঁহার দয়া হইলেই ষড়রিপু তখন বন্ধুর মত কার্য্য করে।

অসার বিষয় বাসনায় এতদিন কাটিয়া গেল, জীবন প্রদীপ কবে যে নিভিবে —কে জানে ? সময় সময় বিষয় বাসনা জনিত কি দৈহিক, কি মানসিক নানা কষ্টে পড়িয়া অত্যন্ত বিরক্তি আসিলেও, এখনও তাহাতে অরুচি হয় নাই। সুতরাং বাসনা জনিত কালিমা বুঝি এ যাত্রা জীবনের সাথী হইয়া রহিয়া গেল। মনুষ্য জীবনের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য যে "ঈশ্বরলাভ" তাহা আর হইল কৈ !

সুবোধ। মহাশয়! ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা বলেন। কেহ বলেন, ঈশ্বর, কেহ বলেন, ব্রহ্ম, কেহ ভগবান, আবার কেহ তাঁহাকে সাকার, কেহ নিরাকার, এইরূপ কত কি বলিয়া বর্ণনা করেন; কত বড় বড় শাস্ত্রীয়

নিজের করিয়া লই। তাঁহার কাছে মান-অভিমান থাকে না, লজ্জা-সরম থাকে না, উচ্চ নীচের প্রতিযোগিতা থাকে না। মা!—আমার মা! সাধের, সুখের, স্নেহের, ভক্তির আমার মা! আমার জননী,—জন্মদাত্রী ধাত্রী, প্রসূতি, সর্ব্বাণী, সর্ব্বময়ী! এমন সম্বন্ধ কি আর হয়? যাহার মা নাই, তাহার সংসারে কেহ নাই; যে মা বলিতে জানে না, সে দেবতার সুধাভাণ্ডের সুধাকণার আস্বাদে বঞ্চিত থাকে। যাহার জননী নাই, তাহার মা আছে—জগজ্জননী, জগদাধাররূপিনী, স্নেহময়ী, ভাবময়ী মা আছে। সেই মা আসিতেছেন—বিশ্বপ্রসূতি আদ্যাশক্তি আসিতেছেন। এই মৃণ্ময় বাঙ্গালায়, এই গঙ্গার পলিমাটির দেশে, এই সুজলা শ্যামলা বঙ্গভূমিতে মা আসিতেছেন—মৃণ্ময়ী হইয়া, রূপে চণ্ডীমণ্ডপ আলো করিয়া, দালান-জোড়া প্রতিমা, মা আসিতেছেন। এমন আনন্দ কি আর আছে?

এই শরৎকালে, যখন বর্ষার প্লাবনতরঙ্গ শুকাইয়া আইসে, নদ নদীর দুই পার্শ্বে কর্দ্দমের বিস্তার ফুটিয়া উঠে, তখনই মায়ের মাটির প্রতিমা, গড়িতে হয়; আর সেই প্রতিমায় মা আসিয়া প্রকট হন। পুরাণের কাহিনী আছে যে, উমা কৈলাস হইতে নামিয়া, পিতৃগৃহে আসিয়া থাকেন। তিন রাত্রি বাস করিয়া চলিয়া যান। এই তিন দিন মায়ের পূজা করিলে মায়ের দেখা পাওয়া যায়, মায়ের সহিত কথা কহিতে পারা যায়। মায়ের কাছে মনোদুঃখ জ্ঞাপন করিলে আর কোন দুঃখ থাকে না—সকল দুঃখ দূর হয়। এই মা কেমন? ঋগ্বেদীয় দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তে অম্ভৃণ-কন্যা "বাক্" মায়ের গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। এই সূক্তই চণ্ডীর মূল—শক্তিবাদের আদি। বাক্ বলিয়াছেন,—

"আমি বসুরুদ্র-সনে করি বিচরণ,
বিচরি, আদিত্যে আর, বিশ্বদেব-সনে;
মিত্র ও বরুণে করি আমিই ধারণ,
আমি ধরি অশ্বীদ্বয়ে ইন্দ্র হুতাশনে। (১)
অরি-নাশী অই সোমে আমি আছি ধরি,
আমি করি ত্বষ্টা-ভগ-সুষণে ধারণ;
হবি দাতা, সোম যাজী, দেবতৃপ্ত-কারী—
যজমান তরে ধরি যজ্ঞ-ফল ধন॥ (২)
সবার ঈশ্বরী আমি ধন-প্রদায়িনী,
আত্মজ্ঞানময়ী আমি যজ্ঞীয় প্রধানা;

বহুভাবে স্থিতা, সর্ব্বভূতাবিষ্টা আমি,
এরূপে সর্ব্বত্র দেবে করেন ধারণা॥ (৩)
আমার শক্তিতে করে—যে করে ভক্ষণ,
কিংবা করে প্রাণ কার্য্য শ্রবণ দর্শন;
না জানি আমায়—ক্ষয় হয় লোকগণ,
হে শ্রুত! সে তত্ত্ব কহি, করহ শ্রবণ॥ (৪)
যে তত্ত্ব সেবিত নরে অমর নিকরে,
তাহাই কহিনু এবে আমিই আপনি;
রক্ষিতে বাসনা যারে—শ্রেষ্ঠ করি তারে,
তারে করি—ব্রহ্মা ঋষি কিংবা তত্ত্বজ্ঞানী॥ (৫)
বিনাশিতে ব্রহ্মদ্বেষী হিংস্রক অসুরে,
আমিই রুদ্রের ধনু করেছি বিস্তার;
যুঝি আমি অরি সনে লোকরক্ষা তরে,
আমিই প্রবিষ্ট স্বর্গ পৃথিবী মাঝার॥ (৬)
সৃজি আমি পিতা ব্যোমে ব্রহ্ম-শিরপরে,
সলিলে সাগরে আছে কারণ আমার।
তাহা হ'তে ব্যাপি বিশ্ব-ভুবন অন্তরে,
মায়া দেহে স্বর্গ অই আছি স্পর্শ করি॥ (৭)
আমিই সৃজন-কালে এ বিশ্ব-ভুবন—
ব্যাপি নিজে—বায়ুসম হই প্রবর্ত্তিত;
অতিক্রমি মর্ত্ত্য—স্বর্গ করি অতিক্রম,
ঈদৃশী মহিমা হয়েছিলা সমুদ্ভূত॥ (৮)

ইহাই হইল মাতৃপরিচয়ের গোড়ার কথা—বেদের শ্রুতির কথা। এই মাতৃপরিচয়টা মার্কণ্ডেয় পুরাণ অন্তর্গত চণ্ডীতে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে—মজার গল্প করিয়া আসল কথাটা সোজা করিয়া বলা হইয়াছে। ব্রহ্মা স্তব করিয়া বলিতেছেন,—

"হও সৃষ্টি-কালে সৃষ্টিরূপা তুমি,
পালনে স্থিতি রূপিনী;
তুমি জগন্ময়ি! অন্তে জগতের
হও সংহার-কারিণী!

রকমে দিন কাটাইতেন। এই অনাটনের মধ্যেও নরেশের পড়ার যাহাতে ক্ষতি না হয়, সেই জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন। নরেশও বুদ্ধিমান, অল্পদিনেই স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। তাহাকে যে আবার কলিকাতায় রাখিয়া উচ্চ শিক্ষা দিবেন, রাধাচরণের এরূপ ইচ্ছা ছিল কিন্তু অবস্থা ছিল না; সুতরাং নরেশের এই খানেই পড়াশুনা শেষ হইল।

নরেশ এখন বড় হইয়াছে। ললিতার ইচ্ছা, ভাইএর বিবাহ দিয়া একটী টুক্ টুকে বৌ ঘরে আনে। রাধাচরণ পত্নীর বিরুদ্ধে কখনও কোন কথার প্রতিবাদ করেন নাই; ললিতারই কথা রহিল। ঘোষপাড়ার যাদব চৌধুরীর কন্যা লক্ষ্মী, ভ্রাতৃ-বধূ রূপে গৃহে আনীত হইল। ললিতার আনন্দ আর দেখে কে, নববধূর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া, প্রতিবাসিনীদের কাছে সগর্ব্বে বলিল, "ঘরে বৌ আন্‌তে হয় ত এমনি! গুণেও লক্ষ্মী, রূপেও লক্ষ্মী, ঘর যেন আলো করে রয়েছে।" এই কথা বলিতে বলিতে দুই এক ফোঁটা আনন্দাশ্রু তাহার গণ্ড বহিয়া পড়িয়া গেল।

নরেশের শ্বশুর কলিকাতায় চাকুরী করিতেন। তিনি নরেশের একটী চাকরী করিয়া দিবার জন্য রাধাচরণের মত চাহিলেন, রাধাচরণ কি জানি কি ভাবিয়া যেন কতকটা বিষণ্ণ ভাবে তাঁহার কথায় সম্মতি প্রদান করিলেন। পূজার বন্দে নরেশের শ্বশুর বাড়ী আসিয়াছিলেন, ছুটীর শেষে নরেশকে লইয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলেন।

(৩)

দেখিতে দেখিতে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। তদবধি নরেশ কলিকাতাতেই থাকে। মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে নরেশের শ্বশুর একটী চাকরী করিয়া দিয়াছেন। তিন দিবসের ছুটী থাকিলেও নরেশ স্নেহময়ী ভগ্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়।

নরেশ নিজের অধ্যবসায়ে ও যত্নে দিন দিন উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে লাগিল। আফিসের কর্ম্মাধ্যক্ষ তাহার কার্য্য পটুতায় সন্তুষ্ট হইয়া ২৫৲ টাকা হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন ধার্য্য করিয়া দিলেন। অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম হইয়া নরেশ অধিক দিন শ্বশুরের অন্নে প্রতিপালিত হওয়া লজ্জাকর বিবেচনা করিয়া, কলিকাতায় একটী ছোট বাটী ভাড়া করিয়া সস্ত্রীক সেই স্থানে বাস করিতে লাগিল।

একদিন বেলা দশটার সময় নরেশ যখন আফিস যাইবার জন্য সদর দরজার দিয়া বহির্গত হইতেছিলেন, এমন সময়ে পিয়ন সম্মুখে আসিয়া ডাকিল, "বাবু! চিট্ হ্যায়।" নরেশ চিঠিখানি লইয়া পড়িতে লাগিল। পত্রখানি তাহার ভগ্নী ললিতার লিখিত। পত্রে লেখা ছিল,—

"ভাই নরেশ!

এতদিনের পর আমার কপাল ভাঙ্গিল! এই চক্রবৎ ঘূর্ণয়মান সুখ দুঃখ বিজড়িত সংসারের এককোণে বসিয়া একটু সুখের অধিকারিণী হইয়াছিলাম; কিন্তু বিধাতা আমার সে সুখটুকু অপহরণ করিয়া লইলেন। আমার নয়নের আলো, জীবনের আরাধ্য দেবতা, পরকালের মুক্তির পথ, আমায় ফাঁকি দিয়া, আমায় অপার সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া ইহধাম হইতে চলিয়া গেলেন। আমি কেবল যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য জীবিত থাকিলাম। জানি না—কত দিন এ ভাবে জীবন যাপন করিব; কতদিন পরে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে তাঁহার সহিত মিলিত হইব। অধিক আর কি লিখিব। ইতি—

তোমার হতভাগিনী—ভগ্নী।"

ললিতার অবস্থা চিন্তা করিয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া নরেশ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। সে দিন আর তাহার আফিস্ যাওয়া হইল না।

(৪)

ললিতার স্বামীর মৃত্যুর দশবৎসর কাটিয়া গিয়াছে। শোকের আগুণ কখনও নির্ব্বাপিত হয় না। তবে যতদিন গত হয়, তত যেন চাপা পড়ে। ললিতার তাহাই হইয়াছে। যদিও সে স্বামীশোক ভুলিতে পারে নাই,—তথাপি সংসারে জীবন ধারণ করিয়া থাকিতে হইলে সমস্তই সহ্য করিতে হইবে, ভাবিয়া ধৈর্য্যশালিনী ললিতা কতকটা ধৈর্য্য ধরিয়াছে।

কিছু দিন গত হইল, নরেশ, ললিতা ও তাহার দশমবর্ষীয় পুত্র বিমলকে তাহার কলিকাতার বাটীতে লইয়া আসিয়াছে। প্রথমে ললিতা তাহার স্বামীর বাড়ী ত্যাগ করিয়া আসিতে স্বীকৃতা হয় নাই, কিন্তু নরেশের বারংবার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া কলিকাতায় আসিতে বাধ্য হয়।

নরেশ ললিতা ও ছেলেটীকে খুবই ভালবাসে। নিজের ছেলের ও ললিতার ছেলের পোষাক পরিচ্ছদে, আদর যত্নে বিন্দুমাত্র পার্থক্য দেখা যায় না। ললিতা ও বিমল তাহার বাটীতে থাকায়—সে যেন কত আনন্দিত; কিন্তু ললিতা এখানে আসায় বিলাসিনী লক্ষ্মীর মন ততটা সন্তুষ্ট হয় নাই; ভাব ভঙ্গীতে

সমালোচনা।

শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের পাঁচালী।—বিক্রমপুরের প্রাচীন কবি স্বর্গীয় দ্বিজ রামকৃষ্ণ বিরচিত; বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত মূল্য দুই আনা মাত্র।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের দেশে হিন্দু সমাজে শ্রীশ্রী৺সত্যনারায়ণ সেবাব্রত সর্ব্বত্র সুপ্রচলিত। বিক্রমপুরের প্রাচীন কবি স্বর্গীয় দ্বিজ রামকৃষ্ণ এই পাঁচালী পুঁথিখানি লিখিয়া গিয়াছিলেন। এই পাঁচালী পুঁথিখানি এতদিন প্রাচীন হস্ত লিখিত পুঁথির তালিকাভুক্ত ছিল। অনেকেই নিজ অভিপ্রায় মত দুই চারিটী শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া দুই এক পংক্তি নূতন বসাইয়া মূল পুঁথির গৌরবের হানি করিতে ছিলেন। যারপর নাই আনন্দের বিষয় বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণেতা সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই আলোচ্য পুঁথিখানি সম্পাদন করিয়া হিন্দু সংসারে শ্রীশ্রী৺সত্যনারায়ণ দেবের উদ্দেশে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার সুবিধা ও সুযোগ উপস্থিত করিয়া দিয়া হিন্দু ধর্ম্ম সংসারে মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। আমরা যোগেন্দ্র বাবুর এই পুঁথি সম্পাদনের জন্য সাধুবাদ প্রদান করিতেছি।

দেবদাসী।—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রলাল দাস বি, এল, প্রণীত, কলিকাতা ৫ নং হ্যারিসন রোড হইতে শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র এম, এ, বি, এল, কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ছয় আনা মাত্র।

গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র নাটকের সূচনায় লিখিয়াছেন, "পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই নাটকখানি কোনও বাঙ্গালী লেখিকার একটি ক্ষুদ্র গল্পের ছায়া অবলম্বন করিয়া রচনা করিয়াছিলাম। এ যাবৎ নাটকটি প্রকাশ করি নাই। এখন বন্ধু বান্ধবের অনুরোধে "দেবদাসী" প্রকাশিত হইল।"

নবীন নাট্যকার কোন্ বাঙ্গালী লেখিকার গল্পের ছায়া অবলম্বন করিয়া এই ক্ষুদ্র নাটকখানি রচনা করিয়াছেন? এই সূচনায় তাঁহার নাম প্রকাশ করা উচিত ছিল নাকি? গোপন করিবার কারণ কি? নাটকখানি ক্ষুদ্র হইলেও বঙ্গরঙ্গমঞ্চে স্থান পাইবার উপযুক্ত। নাটকীয় নায়ক নায়িকার চরিত্র চিত্রাঙ্কণে লেখকের অধিকার আছে। সঙ্গীতে ভাবুকতা ও কবিত্ব আছে। নাট্যকারের নাটক রচনার উদ্দেশ্য সফল হইলে সুখী হইব।

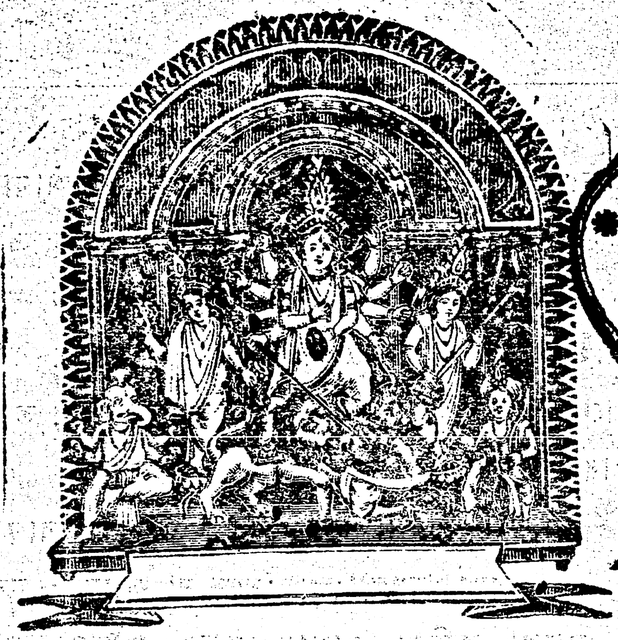

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থা[গার]
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

জন্মভূমি

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

২৮শ, বর্ষ। { ১৩২৯ সাল, আশ্বিন। { ৬ষ্ঠ, সংখ্যা।

আগমনী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,

মা আসিতেছেন। তাই মা-হারা ছেলে আমোদে আটখানা হইয়াছে। আবার প্রাণভরা, বুকভরা মা নামে ডাকিতে পারিবে, আবার মায়ের কাছে দাঁড়াইয়া মায়ের মুখখানি নয়ন ভরিয়া দেখিতে পারিবে, আবার মায়ের প্রসাদ খাইবে, আবার ব্যথার কথা—অভিমানের কথা মায়ের কাছে বলিতে পারিবে—মায়ের কোলে মুখখানি লুকাইয়া কাঁদিতে পারিবে; তাই কত সুখে, কত আশায়, কত ভরসায় মা-হারা ছেলে মায়ের আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছে।

মা—এমন মধুর নাম কি আর আছে? মা বলিলে পাপ তাপ থাকে না। মা'র মতন মধুময় সম্বন্ধ আর আছে কি? মা বলিলে প্রাণ জুড়ায়, সংসারের সকল জ্বালা দূর হয়। যাঁহাকে মা বলিয়া ডাকি, তাঁহাকে যেন ষোল আনা

নিজের করিয়া লই। তাঁহার কাছে মান-অভিমান থাকে না, লজ্জা-সরম থাকে না, উচ্চ নীচের প্রতিযোগিতা থাকে না। মা!—আমার মা! সাধের, সুখের, স্নেহের, ভক্তির আমার মা! আমার জননী,—জন্মদাত্রী ধাত্রী, প্রসূতি, সর্ব্বাণী, সর্ব্বময়ী! এমন সম্বন্ধ কি আর হয়? যাহার মা নাই, তাহার সংসারে কেহ নাই; যে মা বলিতে জানে না, সে দেবতার সুধাভাণ্ডের সুধাকণার আস্বাদে বঞ্চিত থাকে। যাহার জননী নাই, তাহার মা আছে—জগজ্জননী, জগদাধাররূপিনী, স্নেহময়ী, ভাবময়ী মা আছে। সেই মা আসিতেছেন—বিশ্বপ্রসূতি আদ্যাশক্তি আসিতেছেন। এই মৃণ্ময় বাঙ্গালায়, এই গঙ্গার পলিমাটির দেশে, এই সুজলা শ্যামলা বঙ্গভূমিতে মা আসিতেছেন—মৃণ্ময়ী হইয়া, রূপে চণ্ডীমণ্ডপ আলো করিয়া, দালান-জোড়া প্রতিমা, মা আসিতেছেন। এমন আনন্দ কি আর আছে?

এই শরৎকালে, যখন বর্ষার প্লাবনতরঙ্গ শুকাইয়া আইসে, নদ নদীর দুই পার্শ্বে কর্দ্দমের বিস্তার ফুটিয়া উঠে, তখনই মায়ের মাটির প্রতিমা, গড়িতে হয়; আর সেই প্রতিমায় মা আসিয়া প্রকট হন। পুরাণের কাহিনী আছে যে, উমা কৈলাস হইতে নামিয়া, পিতৃগৃহে আসিয়া থাকেন। তিন রাত্রি বাস করিয়া চলিয়া যান। এই তিন দিন মায়ের পূজা করিলে মায়ের দেখা পাওয়া যায়, মায়ের সহিত কথা কহিতে পারা যায়। মায়ের কাছে মনোদুঃখ জ্ঞাপন করিলে আর কোন দুঃখ থাকে না—সকল দুঃখ দূর হয়। এই মা কেমন? ঋগ্বেদীয় দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তে অম্ভৃণ-কন্যা "বাক্" মায়ের গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। এই সূক্তই চণ্ডীর মূল—শক্তিবাদের আদি। বাক্ বলিয়াছেন,—

"আমি বসু রুদ্র-সনে করি বিচরণ,
বিচরি, আদিত্যে আর, বিশ্বদেব-সনে;
মিত্র ও বরুণে করি আমিই ধারণ,
আমি ধরি অশ্বীদ্বয়ে ইন্দ্র হুতাশনে। (১)
অরি-নাশী অই সোমে আমি আছি ধরি,
আমি করি ত্বষ্টা-ভগ-পূষণে ধারণ;
হবি দাতা, সোম যাজী, দেবতৃপ্ত-কারী—
যজমান তরে ধরি যজ্ঞ-ফল ধন॥ (২)
সবার ঈশ্বরী আমি ধন-প্রদায়িনী,
আত্মজ্ঞানময়ী আমি যজ্ঞীয় প্রধানা;

বহুভাবে স্থিতা, সর্ব্বভূতাবিষ্টা আমি.
এরূপে সর্ব্বত্র দেবে করেন ধারণা॥ (৩)
আমার শক্তিতে করে—যে করে ভক্ষণ,
কিংবা করে প্রাণ কার্য্য শ্রবণ দর্শন;
না জানি আমায়—ক্ষয় হয় লোকগণ,
হে শ্রুত! সে তত্ত্ব কহি, করহ শ্রবণ॥ (৪)
যে তত্ত্ব সেবিত নরে অমর নিকরে,
তাহাই কহিনু এবে আমিই আপনি;
যাহারে বাসনা যারে—শ্রেষ্ঠ করি তারে,
তারে করি—ব্রহ্মা ঋষি কিংবা তত্ত্বজ্ঞানী॥ (৫)
বিনাশিতে ব্রহ্মদ্বেষী হিংস্রক অসুরে,
আমিই রুদ্রের ধনু করেছি বিস্তার;
যুঝি আমি অরি সনে লোকরক্ষা তরে,
আমিই প্রবিষ্ট স্বর্গ পৃথিবী মাঝার॥ (৬)
সৃজি আমি পিতা ব্যোমে ব্রহ্ম-শিরপরে,
সলিলে সাগরে আছে কারণ আমার।
তাহা হ'তে ব্যাপি বিশ্ব-ভুবন অন্তরে,
মায়া দেহে স্বর্গ অই আছি স্পর্শ করি॥ (৭)
আমিই সৃজন-কালে এ বিশ্ব-ভুবন—
ব্যাপি নিজে—বায়ুসম হই প্রবর্ত্তিত;
অতিক্রমি মর্ত্ত্য—স্বর্গ করি অতিক্রম,
ঈদৃশী মহিমা হয়েছিলা সমুদ্ভূত॥ (৮)

ইহাই হইল মাতৃপরিচয়ের গোড়ার কথা—বেদের শ্রুতির কথা। এই মাতৃপরিচয়টা মার্কণ্ডেয় পুরাণ অন্তর্গত চণ্ডীতে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে—মজার গল্প করিয়া আসল কথাটা সোজা করিয়া বলা হইয়াছে। ব্রহ্মা স্তব করিয়া বলিতেছেন,—

"হও সৃষ্টি-কালে সৃষ্টিরূপা তুমি,
পালনে স্থিতি রূপিনী;
তুমি জগন্ময়ি! অন্তে জগতের
হও সংহার-কারিণী!

তুমি মহামায়া হও মহাবিদ্যা,
মহামেধা মহাস্মৃতি ;
হও মহামোহ, দেব-অসুরের
তুমি সমষ্টি-শকতি ।
হও সবাকার তুমিই প্রকৃতি
ত্রিগুণ-বিকাশ-কারী ;
তুমি কালরাত্রি মহারাত্রি তুমি,
দারুণ মোহ শর্বরী ।
তুমি শ্রী-ঈশ্বরী, তুমি মা সুমতি,
বুদ্ধিজ্ঞান-বিকাশিনী ;
তুমি লজ্জা তুষ্টি পোষণ শকতি,
ক্ষান্তি-শান্তি প্রদায়িনী ।
তুমি গো মা খড়্গে গদা শূল চক্রে,
ধর শক্তি ভয়ঙ্করা ;
শঙ্খ চাপ-শরে ভুষণ্ডী পরিঘে,
শাস্ত্ররূপী শক্তি ঘোরা ।
সৌম্যারূপা তুমি অতি শোভাময়ী,
সৌন্দর্য্যে অতি সুন্দরী ;
শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠা শ্রেষ্ঠতমা তুমি ;
তুমি মা পরমেশ্বরী ।
বিশ্ব আত্মা তুমি— বস্তু সদসত
যাহা কিছু আছে সর্ব,
সেই সবাকার শক্তি তুমি হও
কি আর করিব স্তব ।
যিনি বিশ্ব স্রষ্টা বিশ্বের বিধাতা,
যাঁ হতে বিশ্ব সংসার,
রেখেছ তাঁরেও তুমি নিদ্রাবেশে,
কে পারে স্তব তোমার ।”

ইনিই মা। যে শক্তি সর্বভূতে নিত্য বিরাজমানা, স্থূলে সূক্ষ্মে, জড়ে ও জীবে যিনি রহিয়াছেন, যিনি আছেন বলিয়াই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে তিনিই মা—জননী

জগদম্বা। এই মায়েরই শরৎকালে পূজা করিতে হয় ; যখন বসুন্ধরা শস্য-শ্যামলা, পুকুর-ভরা জল ও মাছ, মরাই-ভরা ধান, ক্ষেত্র ভরা শস্য, নয়ন-ভরা হাসি, প্রাণ-ভরা আশা, বুক-পোরা ভরসা—তখনই মায়ের পূজা করিতে হয়। অথবা যখন রোগ ভরা গ্রাম, দারিদ্র-ভরা গৃহস্থ, রোদন-ভরা গৃহস্থলী, শ্মশান-ভরা মৃতদেহ—তখনই মায়ের পূজা করিতে হয়। মা সুখের সময়ে দেখা দেন—মা অতি দুঃখের সময়ে দেখা দেন। যখন সুখ ছিল, তখন শরৎকালেই সুখ ছিল—সারা বর্ষের সুখের সূচনা ছিল তখন শরৎকালেই মায়ের বোধন হইত ; এখন বড় দুঃখের দি।—এখনও ঐ শরৎকালেই মায়ের বোধন হইয়া থাকে। ভক্তের গান শুন নাই কি ?—

আর কারে ডাক্‌বো মাগো,
ছাওয়াল কেবল তোমায় ডাকে—
আমি—এমন ছেলে হব না মা
ডাক্‌বো যে গো যাকে তাকে।

মায়ের ছেলে মা-ছাড়া অন্য শব্দ জানে না, মা ছাড়া অন্য কাহারও প্রসাদ খায় না, মা ছাড়া অন্য কাহারও কাছে দুঃখের কথা বলে না। মায়ের ছেলে হওয়া বড় কঠিন—অসামান্য সরল হইতে হইবে, অতুল্য সত্যবাদী হইতে হইবে—আপনাকে মায়ের চরণে লুটাইয়া দিতে হইবে—তবে মায়ের ছেলে হইতে পারিবে। ধ্রুব মায়ের ছেলে ছিল বলিয়াই মায়ের কথায় একনিষ্ঠ বিশ্বাসী হইয়া অতি ঘোর গহন বনে পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে গিয়াছিল। ধ্রুব মায়ের কথায় বিশ্বাস করিত, মাতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিত বলিয়াই সে ভগবানকে পাইয়াছিল। কেবল ভগবানকে ধ্রুব লাভ করে নাই, শ্রীভগবানের গোলোকধামের উপরে ধ্রুবপুরী রচনা করিয়া ভগবান মাতৃভক্তের সমাদর করিয়াছিলেন। মায়ের তেমনি ছেলে হইয়া আগমনী গান যদি গাহিতে পার, তাহা হইলে মা স্বয়ং আসিয়া দেখা দিবেন—দশ হাত প্রসারিত করিয়া তোমায় কোলে তুলিয়া লইবেন। জন্মভূমির পাঠককে আগমনীর নূতন কথা বুঝাইবার নাই।

আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারের উপায় নির্ণয়।

লেখক,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র সেন।

পাশ্চাত্য রীতি, নীতি, জ্ঞান বিজ্ঞান, চিকিৎসা প্রভৃতিরই আদর। আমরা যেন তাহাদের প্রভাতেই প্রভান্বিত। যাহা পাশ্চাত্য তাহাই ভাল আর যাহা দেশী তাহাই মন্দ; এই একটা ধারণা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল. অধুনা তাহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। সুবাতাস যে বহিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই, আমরা যদি এ শুভ মুহূর্ত্তের সুযোগ ত্যাগ করি, তাহা হইলে অমানিশার ঘোর অন্ধকারেই আমাদিগকে থাকিতে হইবে। আমাদের না ছিল কি? আর এখন আছে কি? আমাদের ছিল বলিয়াই আমরা গর্ব্ব অনুভব করি। কার্য্য দ্বারা তাহার ফলভোগ করে অপরেরা।

প্রাচীন অনেক রত্ন ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় লুক্কাইত আছে, দুর্ভাগ্যের কথা সে রত্নের অনুসন্ধান কেহই করেন না। অনুসন্ধান করিয়া তাহা যদি যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে সুফল অবশ্য ফলিতে পারে। তবে অনুসন্ধান করিয়া প্রয়োগ করিতে হইলে যে বিদ্যা, তন্ময়তার প্রয়োজন তাহা আমাদের আছে কি? তাহা একবারেই নাই। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন যে,—

"ওরে বাছা মাতৃকোলে রতনের রাজি।
এ ভিখারি দশা তোর কেন তবে আজি॥"

দেশীয় ভূতত্ত্ব, দেশীয় গণিত, দেশীয় কৃষিতত্ত্ব প্রভৃতি লুপ্তপ্রায়। দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রও প্রচণ্ড নদীতীরে ভগ্ন অট্টালিকার ন্যায় দণ্ডায়মান। কখন যে প্রবল তরঙ্গাঘাতে উহা অতল জলে ডুবিবে তাহার ঠিক কি?

পাশ্চাত্য চিকিৎসা মতাবলম্বীরা তাহাদের অস্ত্র, শস্ত্র, যন্ত্রাদি সহায়ে বলীয়ান্ আর আমরা ঔষধ সম্বল মাত্র। যদি তাহারাও সে বিষয়ে সলক্ষ হইতে পারে তাহা হইলে আর আমাদের উপায় কি?

হিন্দু চিকিৎসক কিনা করিতে পারিতেন? শবব্যবচ্ছেদ, অস্ত্র পরিচালন, সন্তান-প্রসব, ভগ্নসন্ধান, ব্যাধি নির্দ্দেশ, নিদানতত্ত্ব প্রভৃতি সকল বিষয়েই আর্য্য সর্ব্বোচ্চ গুণগণা প্রকাশ করিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদে ব্যবস্থা আছে সবই, কিন্তু আমাদের সে তন্ময়তা নাই, সে আলোচনা নাই, প্রগাঢ় বিশ্বাসও আছে কিনা সন্দেহ, কাজেই আমাদের এই দুর্দ্দশা। নব উদ্ভাবিত বিজ্ঞান বলে বলীয়ান পাশ্চাত্য চিকিৎসা ক্রমশঃ উন্নতিমার্গে উন্নত হইতেছে, আর আমরা, আমাদের সনাতন শাস্ত্র ক্রমে ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছি। এখনও কার চিকিৎসা ক্ষেত্রে নববলে বলিয়ান পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র আমাদের কত নীচে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা দেশবাসী মাত্রেই উত্তমরূপে অবগত আছেন।

দেশীয় চিকিৎসা কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইলেও অঙ্গহানি প্রযুক্ত পদে পদে পরের সহায়তা আবশ্যক হইয়া পড়ে। যেমন কোন জলোদর রোগীর চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদ মতে হইতে পারিলেও ঐ রোগীর উদরে এত জল জমিল যে তাহার নিষ্কাষণ নিতান্ত প্রয়োজন। সনাতন আর্য্য শাস্ত্রও তাহা উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান কালের চিকিৎসক সম্প্রদায়ের সাহায্য ব্যতীত উহা আর হইবার উপায় নাই। এইরূপ উদাহরণ নিত্য প্রত্যক্ষ।

সকল বিষয়ের সুন্দর সমাবেশ দ্বারা আমাদের শাস্ত্র সম্পূর্ণ থাকিলেও আমাদের দোষে সনাতন শাস্ত্রের যে সকল অঙ্গের হানি জন্মিয়াছে বা মলিনতা হইয়াছে তাহা দূর করিবার চেষ্টা আমাদের নাই। আমাদের ত্রুটীতে শাস্ত্রের যে ত্রুটী পরিলক্ষিত হইতেছে,—কি, কি, উপায় অবলম্বন করিলে তাহা দূর করা যাইতে পারে তাহারও আলোচনা নাই। যাহার কল্যাণে এখনও ভারতবর্ষের বহুলোক রোগমুক্ত হইতেছে, যাহার চিকিৎসা প্রণালী দেখিয়া পাশ্চাত্যগণ পর্য্যন্ত মুগ্ধ। আর কিছু না থাকিলেও যাহা দ্বারা একটী জাতি বলিয়া পরিচিত, যে ব্যবসায় একমাত্র প্রাচীন ব্যবসায়, এখন উহা কেবল আমাদের উদর ভরণের উপায় মাত্র। বর্ত্তমান কালের কবিরাজ মণ্ডলী ইহাতে প্রগাঢ় বিশ্বাসী হইলে, ইহার আর এ হীনাবস্থা থাকিত না। যদি তাঁহাদের যত্ন চেষ্টা থাকিত তাহা হইলে কি ইহার এত দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়? দেশীয় লোক দেশীয় চিকিৎসার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করে? আমাদের ত্রুটীতেই আমাদিগকে হীন করিয়া রাখিয়াছে।

প্রথমতঃ যে শরীর লইয়া আমাদের কার্য্য, যাহা চিকিৎসাক্ষেত্র, আমাদের আদৌ সে বিষয়ে জ্ঞান নাই। অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, শিরা, স্নায়ু, ধমনী অস্থি প্রভৃতির কথা অধিক থাকিলেও প্রত্যক্ষ কোন জ্ঞান নাই।

মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন :—

"ত্বক্ পর্য্যন্তস্য দেহস্য যোঽয়মঙ্গ বিনিশ্চয়ঃ।
শল্যজ্ঞানাদৃতে নৈষ বর্ণ্যতেঽঙ্গেষু কেষু চিৎ॥

তস্মা নিঃসংশয়ং জ্ঞানং কর্ত্রা শস্ত্রস্য বাঞ্ছতা।
শোধয়িত্বামৃতং সম্যগ্ দৃষ্টব্যোঽঙ্গ বিনির্ণয়ঃ।
প্রত্যক্ষতো হি যদ্ দৃষ্টং শাস্ত্র দৃষ্টঞ্চ যদ্ভবেৎ।
সমাসত স্তদুভয়ং ভূয়ো জ্ঞান বিবর্দ্ধনং॥"

আমাদের শাস্ত্রের দোষ কি? যখন আমাদেরই পূর্ব্ব পুরুষগণ শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন, তখন যাহা যাহা প্রয়োজন তাহারা তাহাই ব্যবস্থা করিতেন। শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন যে,—

"শরীরে চৈব শাস্ত্রে চ দৃষ্টার্থঃ স্যাৎ বিশারদঃ।
দৃষ্টশ্রুতভ্যাং সন্দেহমবাপোহ্যাচরেৎ ক্রিয়াঃ।"

ইহা হইতে আর অধিক কথা কি হইতে পারে। তৎপর অস্ত্র শস্ত্র যন্ত্রাদির অভাব। আমাদের শাস্ত্রে যে সকল যন্ত্রাদির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাতে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। সেই সকল অস্ত্রাদি পরিচালনার জ্ঞানেরও অভাব। ধাত্রী বিদ্যা, শরীর বিদ্যা, অস্ত্র বিদ্যা পঞ্চকর্ম্ম প্রভৃতি কার্য্যে আমরা বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ অপারগ।

দেশে নূতন নূতন যে সকল ব্যাধি প্রবেশ করিয়া গ্রাম নগর জনপদ ধ্বংস প্রায় করিতেছে, তৎসম্বন্ধেও আমাদিগের তাদৃশ আলোচনা দেখিতে পাই না। বর্ত্তমান কালের "রঞ্জন লাইট" প্রভৃতি আবিষ্কার দ্বারা দেহমধ্যস্থ যাবতীয় পদার্থ দেখার কত সুবিধা হইয়াছে, আমরা তাহার কি সংবাদ রাখি। বৈজ্ঞানিক উপায়ে মূত্রাদির যে পরীক্ষা হইয়া, উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ও শারীরিক কোন কোন পদার্থের কারণ হইতেছে ইত্যাদি বিষয়েও আমরা একরূপ অজ্ঞ। কোন নূতন দ্রব্যের বা কোন নূতন জ্ঞানের আবিষ্কার হইবামাত্র যাহারা তাহা নিজেদের করিয়া লইতে পারেন, তাহারাই জীবিত বলিয়া পরিগণিত। আর যাহারা তাহা না পারেন, তাহারাই মৃতকল্প। বর্ত্তমান সময়ে আমাদেরও তাহাই ঘটিয়াছে। ভাব মিশ্রের সময় এরূপ ছিল না, তিনিও নূতন যাহা পাইয়াছেন তাহা তাঁহার গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন। চোব চিনি প্রভৃতি ঔষধ ফিরঙ্গরোগ প্রভৃতি তাঁহারই সময়ে আয়ুর্ব্বেদে প্রবেশ করিয়াছে। কাচপাত্রে জল পান ও উহার প্রশংসা তাঁহার গ্রন্থেই দৃষ্ট হয়।

যে দেশে যাহার জন্ম, এবং তথাকার আলো বাতাস জল প্রভৃতি দ্বারা যাহারা বর্দ্ধিত, তাহাদের পক্ষে সেই দেশীয় আহার, আচার, পোষাক পরিচ্ছদ যেমন ভাল, সেই দেশীয় ঔষধও তাহার পক্ষে তত উপযোগী। তবে আমরা বিদেশীয়

চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করি কেন? বিদেশীয় তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ ব্যবহার বশতঃই আমাদের এত দুর্ব্বলতা এত খর্ব্বতা, এত পীড়া, এত মৃত্যুর আধিক্য হইতেছে কিনা তাহাও একটা ভাবিবার বিষয়। অন্য শত কারণ থাকিলেও ইহাও যে একটা কারণ নহে, সে কথা জোর করিয়া বলা যায় না।

বর্ত্তমান কালে ইয়োরোপীয় চিকিৎসা রাজ চিকিৎসা এবং তাঁহাদের সকল কর্ম্মেরই অধিকার, কাজেই তাঁহাদের আদরও অত্যধিক। রাজ চিকিৎসা বা সকল কর্ম্মে অধিকার বলিয়াই কি তাঁহাদের এত বিস্তৃতি জন্মিয়াছে? না অন্য কোন হেতুও বর্ত্তমান।

প্রথমতঃ উহা রাজ চিকিৎসা, তৎপর অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি সকল অঙ্গ দ্বারাই তাহারা পুষ্ট, দ্বিতীয়তঃ প্রথম প্রথম দেশীয় ভাষায় তাহাদের তাবদ শাস্ত্রের অনুশীলন। এবং ঐ অনুশীলনের ফলেই দেশে তাহাদের এত বিস্তৃতির হেতু।

এখন দেখা যাউক কোন কোন উপায় অবলম্বন করিলে আমাদেরও শাস্ত্রের প্রকৃত উন্নতি বিধান হইয়া উহার পুনরুদ্ধারের উপায় হইতে পারে।

প্রথমতঃ পঞ্চকর্ম্ম, অস্ত্র শস্ত্র শবব্যবচ্ছেদ প্রভৃতি কার্য্য হাতে কলমে শিক্ষা।

দ্বিতীয়তঃ বৈজ্ঞানিক উপায়ে নূতন যে কোন আবিষ্কার হইয়াছে বা হইবে তাহা আপন করিয়া লওয়া।

তৃতীয়তঃ ঔষধ ইত্যাদি নূতন পাইলে উহার গুণ পরীক্ষা করিয়া আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্নিবিষ্ট করা।

চতুর্থতঃ প্রয়োজন হইলে ঐ সকল কার্য্যের জন্য বৈদেশীক যন্ত্রাদির সাহায্য গ্রহণ;

পঞ্চমতঃ নূতন নূতন পীড়ার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আয়ুর্ব্বেদের থিওরির মধ্যে ফেলিয়া চিকিৎসার বিধি নিষেধ স্থির করা।

ষষ্ঠতঃ আয়ুর্ব্বেদের প্রচার কল্পে দেশীয় ভাষায় উহার গ্রন্থাদি প্রকাশ।

সপ্তমতঃ আয়ুর্ব্বেদ বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপন, পরীক্ষা গ্রহণ উপাধি দান।

অষ্টমতঃ আয়ুর্ব্বেদিক দাতব্য ঔষধালয়, চিকিৎসাগার, বাগান, অকৃত্রিম ভেষজ প্রভৃতি।

আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারের যে অষ্ট প্রকার হেতু উল্লিখিত হইল, উহার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক, ঐ পথই ভাল না অন্য কোন পথ অবলম্বনীয়।

প্রথম যে পঞ্চকর্ম্ম ও অস্ত্র যন্ত্রাদির আবশ্যকতার উল্লেখ করা হইয়াছে, উহাতে কাহারও মতদ্বৈধ হইতে পারে না। ঐ সকল কার্য্য আমরা ভুলিয়াই

আমাদিগকে নিম্নাভিমুখী করিয়াছে। এখন এ বিষয়ে আমাদের উপদেষ্টারও অভাব। ঐ সকল কার্য্য শিক্ষা করিতে হইলে প্রথমতঃ বিদেশীয়দিগের শিষ্যত্ব গ্রহণ ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। ঐ বিষয় শিক্ষার পর কার্য্যক্ষম হইয়া দেশীয় শাস্ত্রানুসারে উহার প্রয়োগ প্রণালী দেখিয়া আপন আপন শিষ্যগণকে শিক্ষা দিতে হইবে। কোন কার্য্য শিক্ষা করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যদি উহার ব্যবহার না থাকে তাহা হইলে উহা ক্রমে মলিন হইয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে যাহারা ডাক্তারি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ডিপ্লোমা পাইয়া আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা করিতেছেন, তাঁহারাই এক্ষেত্রে আমাদের আদর্শ। তাঁহরা যদি আয়ুর্ব্বেদ মতে অস্ত্র চিকিৎসা ও ধাত্রীবিদ্যা করেন এবং উহার কৌশল সমূহ আপন আপন শিক্ষার্থী ছাত্রগণকে শিক্ষাদান করেন এবং শবব্যবচ্ছেদ প্রভৃতি দেখান এবং তাহারা জ্ঞান লাভ করিবার পর আপন আপন শিষ্যদিগকে উপদেশ দেয়, তাহা হইলেও সামান্যত এ সকল জ্ঞান জন্মিতে পারে।

দ্বিতীয় প্রস্তাবেরও যথেষ্ট আবশ্যক দেখা যায়। চক্ষুপীড়ায় বর্ত্তমান সময়ে বহু প্রকারের চসমার বহুল প্রচার হইয়াছে কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে উহার কোন উল্লেখ নাই। চিকিৎসা শাস্ত্রকে বর্ত্তমান কালোপযোগী পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে ঐ সকল বিষয়ের সমাবেশ হওয়া উচিত। উপাক্ষের ব্যবহার বিষয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন হইলেই বর্ত্তমান কালের আলোক বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়েও আমাদের যাহাতে জ্ঞান হয় সে ব্যবস্থাও হওয়া আবশ্যক। উহা ব্যতীত আর চলিতেই পারে না।

তৃতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখা হউক, উহা কতদূর সমীচীন, দেশে বিদেশীয় চিকিৎসার প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি ঔষধ সর্ব্বসাধারণে খুব ব্যবহার করিতেছেন, উহাতে আপাততঃ ফলও না দেখা যাইতেছে তাহা নহে। ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনাইন, গরমী পীড়ায় পটাশ আইওডাইড, ক্ষতে কার্ব্বলিক এসিড দদ্রুতে ক্রোইছোফণিক এসিড প্রভৃতির খুবই প্রচলন। গভর্ণমেণ্টও জ্বরের কুইনাইন চিকিৎসা বলিয়া উহার প্রচার করিতেছেন, কবিরাজ মহাশয়গণও কোথাও কোথাও গোপনে গোপনে উহার ব্যবহার না করিতেছেন এমত নহে, উহা যদি প্রকৃত গুণশালী হয়, আয়ুর্ব্বেদের বিধান অনুসারে যদি উহা ঔষধ বলিয়াই স্থিরিকৃত হয়, তাহা হইলে উহা প্রকাশ্যে ব্যবহারেই বা দোষ কি? যাহা ভাল, যাহার গুণ দেখিতেছি, যাহা দ্বারা শত শত স্থলে লোক উপকৃত হইতেছে, তাহা দেশী হউক, আর বিদেশী হউক গ্রহণযোগ্য। এবং উহা নিজ অঙ্গীভূত করিয়া লওয়াই সঙ্গত ও জীবিতের লক্ষণ।

চতুর্থ প্রস্তাবে কি দোষ বা গুণ আছে দেখা যাউক, আমাদের বস্তিকর্ম্ম নিরুদ্ধ প্রকাশে শলাকা, ব্রণাদি ছেদন ভেদন শিবন প্রভৃতি কার্য্যে যে সকল অস্ত্র শস্ত্রাদি ব্যবহৃত হইত এখন আর তাহা নাই। দেশেও উহা প্রস্তুত হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে না। কোন কোন স্থলে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট যন্ত্রাদিও দেখা যায়, উহা আপন করিয়া লইয়া ব্যবহারে কোন দোষ হইতে পারে না। যাহারা সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত তাহারাও যখন ভিন্ন ভিন্ন স্থলের দ্রব্যাদি লইতে বাধ্য হয়, তখন আমাদের সম্বন্ধে আর কি আপত্তি হইতে পারে। তবে ঐ যন্ত্রশস্ত্রাদির যে সকল আকৃতি হইয়াছে তাহার প্রতিকৃতি, নামকরণ ও ব্যবহার প্রণালী বিধিবদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ বিনোদলাল সেন মহাশয় আমাদের অগ্রণী, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার পুস্তকের তত প্রচার হয় নাই।

পঞ্চম প্রস্তাব সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। বর্ত্তমান কালে উদ্ভূত বহুরোগ প্রভূত পরিমাণে এ দেশে দেখা যাইতেছে, ফিরঙ্গ বিষাক্ত মেহ, প্লেগ, ওলাউঠা, বেরি বেরি প্রভৃতি রোগের কারণ নির্ণয় করিয়া বায়ু পিত্ত কফের বিভাগ ক্রমে বিভক্ত করিয়া উহার চিকিৎসা পদ্ধতি প্রভৃতি লিপিবদ্ধ হওয়া একান্ত আবশ্যক।

বর্ত্তমান কালে সকল পীড়ারই কীটাণুতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্র গভীর গবেষণা পূর্ব্বক উহা ধ্বংশের পরামর্শ দিতেছেন। সুশ্রুতাদি গ্রন্থেও বহু চক্ষুর অগোচর কীটের কথা জানা যায়, তথাপিও ঐ সংহিতার বেদোৎপত্তি অধ্যায় পাঠে জানা যায় যে, প্রাণী সৃষ্টির সময়ে ব্যাধি পীড়া কিছুই ছিল না। পরে তাহাদের অহিত আহার বিহারের দ্বারা পীড়ার উদ্ভব হয়। ঐ মত সম্বন্ধেও যথেষ্ট আলোচনা ভাল, উহার সত্যাসত্য নির্ণীত হইয়া আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গ পুষ্টি হয় ইহাই একান্ত বাঞ্ছনীয়।

ষষ্ঠ প্রস্তাবও প্রয়োজনীয় বোধ হইতেছে, হোমিওপ্যাথি কি এলোপ্যাথি চিকিৎসার এদেশে যে এত বহুল প্রচার তাহার মূলেও প্রথমতঃ দেশীয় ভাষায় উহার গ্রন্থাদি লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। আমরা যে জ্ঞানই কেন গ্রহণ না করি উহা আমাদের মাতৃভাষার মধ্য দিয়া যত সহজে লইতে পারি, ভিন্ন ভাষার মধ্য দিয়া তত সহজে পারি না।

তৎপর দেশের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা। তাহা পর্য্যালোচনা করিলেও দেশীয় ভাষার সাহায্যে উহার প্রচার সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

দেশে পীড়াদির এত বাহুল্য অথচ দরিদ্রের সংখ্যাই অধিকাংশ। এমন বহু স্থান আছে যে ৮।১০ মাইল মধ্যেও একজন উপযুক্ত চিকিৎসক নাই।

এখন সকল শ্রেণীর মধ্যেই অল্পাধিক লেখা পড়ার চর্চ্চা হওয়াতে ও দেশীয় ভাষায় উহার প্রচার হইলে সমধিক কার্য্যকরি হইবার সম্ভাবনা।

যাহারা উচ্চ অঙ্গের জ্ঞান লাভ করিবেন, তাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করুন কিন্তু দেশবাসীর সর্ব্বশ্রেণীর মঙ্গল বিধানের জন্য তাহাদের প্রাণরক্ষার জন্যও এ কার্য্যে ব্রতী হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। ভাষার সমস্যাও একটা কম কথা নহে। যদি সংস্কৃত ভাষার কঠিন আবরণ মুক্ত হইয়া আমাদের আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থাদি দেশীয় ভাষায় প্রচার হয় তবে অন্যান্য চিকিৎসার ন্যায় দেশে আমরাও সর্ব্বত্র আদৃত হইতে পারিব। আমাদিগকে স্বদেশে বিদেশীর মত আর থাকিতে হইবে না। এ উদ্দেশ্যে কেবল সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করিলেই চলিবে না, রীতিমত পুস্তক রচনা করিতে হইবে। কেবল অনুবাদের দ্বারা ফললাভ হয় না। তাই বলিয়াই যে সংস্কৃত পুস্তক প্রচার করিতে হইবে না বা উহা উঠাইয়া দিতে হইবে তাহা নহে। উহার প্রচার রাখিতেই হইবে। আমাদের দেশীয় ভিন্ন ভাষা ভাষীর সহিত সংযোগ রাখিবার উহাই একমাত্র মূলগ্রন্থী।

এখন দেখা যাউক সপ্তম প্রস্তাবের কোন মূল্য আছে কিনা। বর্ত্তমান কালে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থীগণ আয়ুর্ব্বেদ পারদর্শী পণ্ডিতগণের শিষ্যত্ব গ্রহণে আয়ুর্ব্বেদ পাঠ ও চিকিৎসা প্রণালী, ঔষধ প্রস্তুত, রোগ নির্ণয় প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষা করিয়া থাকেন। অধ্যাপকগণও শিক্ষা ও অন্ন উভয়ই প্রদান পূর্ব্বক প্রাচীন ধারা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

শিষ্য গুরুর অধিগম্য বিদ্যা পারদর্শিতা প্রভৃতি আয়ত্ব করিতে পারেন কিন্তু সেই অধিকার অন্য ব্যক্তি পাইতে পারেন না।

এজন্য আয়ুর্ব্বেদের বহু বিষয় গোপন থাকে। যে শাস্ত্রের উপর লোকের জীবন মরণ নির্ভর করে তাহার প্রতিভা যত প্রকাশিত হয়, ততই মঙ্গল। বিশ্ব বিদ্যালয় হইলে ঐ সঙ্গে পরীক্ষাগার প্রভৃতি থাকিলে এবং উপযুক্ত অধ্যাপকগণ পরীক্ষা ও অধ্যাপক হইতে সকল ছাত্রই কৃতিত্ব লাভ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের মহিমা প্রচার করিতে পারে।

বিশ্ব বিদ্যালয় হইলে ডাক্তারী কলেজ ও স্কুলের ন্যায় দুইটী বিভাগ থাকা প্রয়োজন বোধ করি। যাহারা উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা সকল অধ্যয়ন করিবেন,

তাহারা সংস্কৃত ভাষায় এবং যাহারা নিম্ন অঙ্গের বিষয় আয়ত্ব করিবেন, তাহারা দেশীয় ভাষায় করিবেন। উপাধি ঐরূপ দ্বিবিধ করিতে হইবে।

অষ্টম প্রস্তাব অনুসারে নূতন নূতন ঔষধ কিম্বা নূতন নূতন রোগ ইত্যাদি দাতব্য ঔষধালয় যেরূপ শীঘ্র শীঘ্র পরীক্ষিত হইতে পারে, অন্য উপায়ে সেরূপ পারে না। শুধু ঔষধালয় থাকিলে চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসালয় থাকা প্রয়োজন, তাহা হইলেই ছেদন, ভেদন শিবন প্রচলন নিষ্কাষণ প্রভৃতি কার্য্য সহজেই আয়ত্ব হইতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ে ঔষধ সমূহও পূর্ব্বের ন্যায় প্রশস্ত কালে প্রশস্ত স্থান হইতে সংগ্রহ হয় না। অনেক সময় একই নামে বহুদ্রব্য অভিহিত থাকায় উহা প্রয়োগেও গোলযোগ ঘটে। বহু সময়ে কত কালের কীট ভক্ষিত দ্রব্যাদি পাওয়া যায় যে, তাহা দ্বারা কোনই ফল লাভ হয় না। বর্ত্তমান সময়ে খণিজ ধাতু প্রভৃতিও কৃত্রিম হইয়াছে। বাজারে উত্তম স্বর্ণ বলিয়া যাহা বিক্রয় হয়; তাহাতে "খাদ" দুষ্ট হয়। উহা ঔষধার্থে প্রযোজ্য হইলেও সোনার গুণ হয়? এ সকল অভাব যাহাতে পূর্ণ হয়, তজ্জন্যও নাগান প্রভৃতিও রসায়নাগার স্থাপিত করিয়া যাহাতে প্রকৃত উত্তম ভেষজ সংগৃহীত হয়, সে পক্ষেও চেষ্টা কর্ত্তব্য।

আয়ুর্ব্বেদকে পুনর্ব্বার জীবিত করিতে হইলে উহাকে অন্যান্য মতের সহিত সমকক্ষ করিতে হইলে, ইহাতে জগতের আদি চিকিৎসা বলিয়া এবং ইহা হইতেই যে পৃথিবীর সকল চিকিৎসার মূল গৃহীত হইয়াছে, তাহা প্রচার করিতে হইলে উক্ত অষ্টবিধ উপায় অবশ্যই অবলম্বন করিতে হইবে।

এখন ভারতবর্ষীয় অধিকাংশ লোকই আয়ুর্ব্বেদের কল্যাণে রোগমুক্ত হইয়া থাকেন। আমরা যদি পূর্ব্বের ন্যায় আবার অষ্টাঙ্গের পূর্ণতা ঘটাইতে পারি, তাহা হইলে বোধ হয়, অন্যান্য চিকিৎসাকে শ্রেষ্ঠত্ব দেখাই আমাদের আসনে আমরাই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি। তাহা আর হইবে কি? দেশীয় মহানুভব ব্যক্তি মাত্রেই সামান্য চেষ্টাতেই এ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে বলিয়াই আমাদের ধারণা।

সাধক-কমলাকান্ত।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সাধক দেবী শিবাখ্যা, দেবী সিদ্ধেশ্বরী ও ভৈরব দুগ্ধেশ্বরের চরণ বন্দনা পূর্ব্বক গ্রাম প্রবেশ করিলেন। কেণারাম চট্টোপাধ্যায়ের বহির্গৃহের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সম্মুখে বিষ্ণু মন্দির, দুইপার্শ্বে দুইটী শিবালয় ও পার্শ্বে শ্যামাগৃহ। সাধক ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রসবিনী ত্রিনয়নীর চরণ বন্দনা পূর্ব্বক দেবগণের চরণে প্রণিপাত করিয়া শ্যামাগৃহে প্রবেশ করিলেন। কেণারামের আনন্দের সীমা রহিল না। কেণারাম সস্মিত বদনে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। কেণারামের সহোদর দ্বয় সাধকের সহিত পরিচয় করিয়া সুখী হইলেন। কেণারামের তিন পুত্র সাধকের পরিচর্য্যায় ব্যস্ত হইলেন। কেহ তাঁহার চরণ ধৌত, কেহ বা মৃদুমধু ব্যজন করিয়া শ্রম নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেণারাম তাদৃশ সমৃদ্ধিশালী না হইলেও তাঁহার সাংসারিক অভাব ছিল না। গৃহ ও গ্রামজাত দ্রব্য সম্ভারে পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ, অতিথি সৎকার ও দেব সেবাদি সচ্ছন্দে চলিত। কেণারাম স্বভাব লীন ও সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ছিলেন। বাদ্যযন্ত্রে ও সঙ্গীত বিদ্যায় তাঁহার বিশেষ পার দর্শিতা ছিল। তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতেন, তিনি পরমার্থ চিন্তা; দেবসেবা প্রভৃতি সৎকর্ম্মে সময়ের সার্থকতা সম্পাদন করিতেন। তিনি গ্রামের মধ্যে জ্ঞানে, আচারে, বিচারে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য ছিলেন।

স্নানাহার ও বিশ্রামের পর সাধক কেণারাম চট্টোপাধ্যায়ের শ্যামাগৃহে উপবেশন করিলেন। গ্রামের গণ্য মান্য ও শিক্ষিত লোক সকল তথায় আগমন করিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক আহ্লাদিত মনে সাধকের সহিত পরিচয় করিতে লাগিলেন। সকলের মুখে মৃদুহাস্য, আনন্দে নয়ন উৎফুল্ল, যেন তাঁহাদের বিদেশাগত আত্মীয়ের সহিত বহুদিনের পর সাক্ষাৎ হইয়াছে। বিশু একান্তে উপবিষ্ট ছিল, সে গ্রাম বাসীদিগের ঠাকুরের দর্শনে আনন্দ উৎসব দেখিয়া ভাবিতে লাগিল, "ওঃ সেই এক, আর এই এক, আমার বেশ মনে পড়ছে গেরুয়া কাপড় পরা, মাথায় জটা, গলায় হাড়ের মালা, কাঁধে ঝুলি কত ফকিরের পিছু পিছু মার মার শব্দে দৌড়েছি, ভেবেছি, বেটা আমাদের ভয়ে

ফকিরের বেশ ধরে যাচ্ছে, ওর ঝুলির ভেতর পয়সা আছে। কাজেই এই ঠাকুরের পিছু পিছু তেমনি করে দৌড়ে ছেলাম। হায়, এই যে এরা এখানে এসে ঠাকুরের পা ছুঁয়ে কতই হাসছে, কতই খুসী হচ্ছে, আমিও মানুষ এরাও মানুষ। মা কালী তোমাকে ত আমি কেঁদে কেঁদে পয়সা চাইতাম, তখন কেন মনটা ঘুরিয়ে দাও নাই। মা তোমার রাঙ্গা পায়ে জবা দিয়ে, বেলপাতা দিয়ে, ভাল পদ্মফুল দিয়ে, কত রক্তচন্দন দিয়ে, হেসে হেসে লাঠী হাতে করে বেরুতাম তখন কেন বল নাই, বিশে মানুষ মার্ত্তে যাবনা, তখন কেন আজকার মত মনের ভাব দাও নাই। তখন কেন বল, নাই বিশে! সব মানুষ আমার ছেলে।" বিশু এতক্ষণ জগদম্বার চরণে মন রাখিয়া মনের কথা কহিতেছিল। বিচলিত চিত্তে বহির্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল, একটী ক্ষুদ্র পুষ্প বৃক্ষে বহু সংখ্যক কীট পুষ্প কলিকা সকল দংশন করিতেছে, বিশুর মনের উৎবেগ গুরুতর হইল, সে ভাবিল, সংসারের সুন্দর বস্তু বিনাশের জন্য এই সকল কীটের জন্ম, আমি এই সকল কীটের অধম, এরা একটী ফুলগাছ নষ্ট কচ্ছে, আমি কত শত সংসার নষ্ট করেছি। মা, বাপ, ভাই; বোন ছেলে মেয়ে নিয়ে হেসে হেসে সুখে সচ্ছন্দে যে লোক ঘর কচ্ছিল, হয়ত আমি এমন কত লোককে পথের মাঝে একলা পেয়ে খুন করেছি, চিরকালের জন্য সেই সংসারটাকে কাঁদিয়েছি।" এই সকল ভাবিয়া বিশুর প্রাণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল, তাহার দৃষ্টি স্থির, নয়নে জল। সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি বিশুর ভাব দেখিয়া কহিলেন, "এ লোকটী কাঁদিতেছে কেন? বোধ হয় ইহার কোন মানসিক কষ্ট আছে।" এই কথা শুনিয়া সমাগত অনেকে বিশুর নিকট উপস্থিত হইলেন ও তাহার চিত্ত বিকারের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। সাধক বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "উহার মানসিক বিকার জন্মিয়াছে, উহাকে বিরক্ত করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। ইহা শুনিয়া সকলে নিরস্ত হইল। কেহ কেহ কহিলেন, "ইহার কেশ, বেশ ও শরীরের বন্ধন দেখিয়া অনুমান হয়, এ ব্যক্তি আমাদের দেশীয় ডোম, মল্লক্রীড়ায় পারদর্শি।" ইহা শুনিয়া বিশু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার নাম বিশে ডোম, আমি ডাকাত আমি মহা-পাপী। আমায় তোমরা শাস্তি দাও, আমাকে তোমরা মুক্তি কর। আজ যাকে তিলেক না দেখে থাকতে পাচ্ছি না, কাল আমি আমার এই দয়াল ঠাকুরকে খুন কর্ব্বার জন্যে তাড়া করে ছেলাম, ঠাকুরের রূপ দেখে, গান শুনে, ঠাকুরের মধ্যে আমার মা কালীকে দেখে, আমার নেশা ছুটেছে, দেখ্‌ছি আমার

মত পাপী দুনিয়ায় আর নাই। ওই দেখ ওই, পোকাগুলো ওই ফুলের গাছের ফুল কাটছে, একটী ফুলগাছ নষ্ট কচ্ছে, আমি কত সংসার নষ্ট করেছি, হায় হায়, এই বড় দুঃখ হচ্ছে মা কালী কেন আমাকে ডাকাতী শিখিয়েছিল, কেন আগে এই ঠাকুরের ও তোমাদের মত লোকের সঙ্গ দেয় নাই।" বিশুর এই সকল কথা শুনিয়া তথ্য জানিবার জন্য সকলে কৌতুহলে ঠাকুরের মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। সাধক কহিলেন, "বিশু যাহা কহিল তাহা সত্য। বিশুর কাল সন্ধ্যার সময় ওড়গামের ডাঙ্গায় সদলে শড়কী হস্তে আমার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিল। আমি সেই ভীষণ শঙ্কট সময়ে জগদম্বার নিতান্ত শরণাপন্ন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার গুণগান করিলে, বিশু মোহিত হইয়া শড়কী দূরে নিক্ষপ পূর্ব্বক আমার পায়ে আসিয়া পতিত হইল, দেখিলাম, তাহার সংজ্ঞালোপ হই- য়াছে। আমি ইহাকে হস্তদ্বারা উঠাইলে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া বিশু নিজ কৃত কর্ম্মের অনুতাপ করিতে লাগিল। ইহার জগদম্বার উপর অভিমান ও আত্মগ্লানি ইত্যাদি শুনিয়া আমার বিবেচনা হইল বিশুর অকস্মাৎ বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে। বিশু ডাকাইতের সর্দ্দার, ডাকাইতদিগকে বিদায় দিয়া আমার অনেক প্রবোধ বচন সত্বেও বিশু কোন ক্রমেই আমার সঙ্গ ত্যাগ করিল না। বিশুর অকস্মাৎ বৈরাগ্য ও প্রেমের উদয় দেখিয়া অনুমান হয়, ইহা বিশুর জন্মান্তরের সুকৃতির পথ।" সাধকের কথা শ্রবণ করিয়া সকলে বিশুর দিকে বিস্ময় ও প্রফুল্ল নয়নে চাহিয়া রহিল ও পরে উহাদের মধ্যে অকস্মাৎ বৈরাগ্য উদয়ের প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। কেহ বা সাধকের গত বিপদে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। কেহ বা তাঁহার সঙ্গীত দ্বারা মন বিমোহনের অপূর্ব্ব শক্তির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ওড়গ্রামের ঘটনা ক্রমে ক্রমে গ্রাম মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল ও অনেকে বিশুকে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিল। কেণারাম চট্টোপাধ্যায় সাধকের ইচ্ছা অনুসারে বিশুর বিরক্ত জনক জনস্রোত বন্ধ করিয়া দিলেন।

এই গ্রন্থের আরম্ভে প্রথম অংশে সাধকের জন্মকাল নির্ণয় সময়ে যে বৃদ্ধের কথা উল্লেখ আছে, তাঁহার নিবাস অমরারগড়, নাম দুর্গাচরণ রায়। সাধক কমলাকান্ত সম্বন্ধীয় অধিকাংশ জনশ্রুতি তাঁহার নিকট প্রাপ্ত। সাধকের অনেক গান তাঁহার সংগ্রহ ছিল। স্থল বিশেষ, ঘটনা বিশেষে যে সকল গান সাধকের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল, তিনি সে সকল ঘটনা ও গান বলিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন। যখন তাঁহার বয়স বার তের বৎসর, তখন তিনি সাধককে দেখিয়াছিলেন, তিনি বলিতেন, "বিশে ডাকাইতকে তাঁহার বেশ মনে পড়ে,

বিশের চাঁচর চুল, কালবর্ণ, বলিষ্ঠ শরীর তাঁহার বেশ স্মরণ হইতেছে। কেণা- রাম চট্টোপাধ্যায় বিশুকে কেহ বিরক্ত করিওনা, বলিয়া আমাদিগকে তাড়াইয়া দিতেছেন, ইহা যেন আমার সে দিনের কথা বলিয়া মনে হইতেছে, সাধকের সঙ্গীত, বহুলোকের সমাগম, তাঁহাদের আহ্লাদ, কোন কোন ব্যক্তির সঙ্গীত শ্রবণে অশ্রুপাত, সাধকের গলে ও কেণারাম চট্টোপাধ্যায়ের গলে মাল্য প্রদান আমার যেন অতি অল্প দিনের ঘটনা বলিয়া মনে হইতেছে, সেই বৈঠকের চিত্র কালের ছায়াতে যেন কিছুমাত্র মলিন হয় নাই।"

কেণারাম চট্টোপাধ্যায়ের শ্যামাগৃহে প্রতিদিনই সঙ্গীত হয়, বহু লোকের সমাগম হয়। সাধকের অভিমান নাই, অহঙ্কার নাই, তিনি জগতকে আপনার বলিয়া বোধ করেন। তিনি অনেক সময় বালকের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। বালকের ন্যায় হাসা কৌতুকে তিনি সুখী হইতেন। কেণারামের অন্তঃপুর- বাসিনী রমণীগণ তাঁহাকে পিতার ন্যায় পূজা করিতেন। সাধক নিজ উদারতা গুণে কেণারামের পরিবার বর্গের মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন, এ বিষয়ে নানাবিধ জনশ্রুতি আছে, তাহার মধ্যে একটী ঘটনা উল্লেখ যোগ্য। একদিন কেণারামের ভ্রাতৃকন্যা শ্যামাগৃহের নিকট আসিয়া তাহার পিতা শ্যামাগৃহে আছেন বিবেচনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "বাবা আজ কাঠ নাই, কাঠ না দিলে রান্না হবে না।" শ্যামাগৃহে তৎকালে সাধক ব্যতীত আর কেহ উপস্থিত ছিলেন না। সাধক বাহিরে আসিয়া বালিকাকে কহিলেন, "ওমা কাঠ কোথায় আছে, কুড়ুল আন, আমি কাঠ কেটে দেব।" বালিকা কহিল, "কাঠ খামারে আছে।" এই বলিয়া বালিকা গৃহ হইতে কুঠার আনিতে চলিল। ঐ প্রদেশে ছোট ছোট শাল কাঠ রান্নার কাঠের জন্য ব্যবহার হয়। বালিকা কুঠার লইয়া উপস্থিত হইয়া সাধককে খামার গৃহ ও শালকাঠ দেখাইয়া দিল। সাধক কুঠার হস্তে লইয়া কাঠ কাটিতে আরম্ভ করিলেন। বালিকা কহিল, "তুমি পার্ব্বেনা, এখনি জনরা মাঠ থেকে জল খেতে ঘরে আসবে তারাই কাঠ কেটে দেবে।" সাধক কহিলেন, "আমাদেরও জন মজুরের মত হাত পা আছে, কেন পার্ব্বো না।" বালিকা কহিল, "তুমি গান কর্ত্তে পার, আবার কাঠও কাটতে পার নাকি? আমার বাবা কি কাকা ত পারেনা। তোমার কপালে ঘাম পড়ছে, আর থাকুক, অনেক কাঠ কেটেছ, বয়ে নিয়ে যেতে পার্ব্বোনা, তোমার হাত কাঁপছে আর কেটোনা।" সাধক ভাবিলেন, "বালিকার হৃদয় কোমল, আমার কপালে ঘর্ম্ম, হস্ত কম্পন দেখিয়া তাহার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইয়াছে।" এই

ভাবিয়া সাধক হৃদয়বাসিনী বিমলার প্রতি কহিলেন, "স্ত্রীয়ঃ সকলা, তব দেবী ভেদা। না জানি মা তোমার হৃদয় কত কোমল।" বালিকাকে প্রকাশ্যে কহিলেন, "তোমাদের যত কাঠ আছে, সব কেটে ফেল্‌বো, গাড়ী করে আমাদের বাড়ী নিয়ে যাব।" বালিকা কহিল, "তাই বুঝি কাঠ কাট্‌তে এলে? সব কাঠ গুলি নিয়ে গেলে আমার মা রাঁধ্‌বে কিসে?" এমন সময় কেণারামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সাধককে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া, সাধকের হস্ত হইতে কুঠার লইয়া চরণস্পর্শ পূর্ব্বক কহিলেন, "একি আপনাকে এরূপ কার্য্য কে করিতে বলিল?" সাধক বলিলেন, "অন্তর্বাসিনী জগদম্বা রূপিণী এই কন্যা।" আপনাকে কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য আপনার কন্যা বাহিরে আসিয়া বলাতে আমার কাষ্ঠ ছেদনের ইচ্ছা হইল, আমি আপন ইচ্ছায় কাষ্ঠ ছেদন করিয়াছি এবং আনন্দ অনুভব করিতেছি, শারীরিক পরিশ্রম কি মন্দ? নিজ হস্তে সমুদয় গৃহকর্ম্ম করা ভাল, আপনি ক্ষুণ্ণ হইবেন না।" ইত্যবসরে বিশু আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুরকে কাষ্ঠ কাটিতে দেখিয়া বিশু গদ গদ কণ্ঠে কহিল, "একদিন লোক কাঠ কাট্‌তে বল্‌লে দেমাক করে বল্‌তাম পার্‌ব না, ভাব্‌তাম, রেতের রোজগার মজুর খাটার পঞ্চাশ গুণ, মুজুরী কর্ব্বো কেন? হায় হায় কি দুর্ম্মতিই ছিল, এমন ভাল কাজে পেটের ভাত রোজগার না করে মানুষ মেরে খেতাম, আমি রাক্ষস, মানুষ নই।" এই বলিয়া কাটা কাষ্ঠের বোঝা বাঁধিতে আরম্ভ করিল। কেণারামের ভ্রাতা কহিলেন, "বিশু! তোমাকে কাষ্ঠ বহিয়া লইয়া যাইতে হইবে না। আমার লোক আসিতেছে, তাহারাই কাষ্ঠ লইয়া যাইবে।" বিশু কহিল, "আমি ঠাকুরের কাটা কাঠ মাথায় করে লইবো।"

গ্রাম মধ্যে তাঁহার এই বৃত্তান্ত শীঘ্রই প্রচারিত হইল, কেহ তাঁহার অমায়িকতার, কেহ বা অভিমান শূন্যতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কেণারাম চট্টোপাধ্যায় কার্য্যবশতঃ স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, তিনি বাটী আসিয়া সাধকের কাষ্ঠ ছেদন বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, "শুনিলাম আজ আপনি আমার গৃহের রন্ধন কাষ্ঠের আয়োজন করিয়াছেন, কিন্তু আমি আপনার নিকট সামান্য সম্বল সংগ্রহের প্রত্যাশী নহি। আপনি পরকালের অনন্ত পথের সম্বল বলিয়া আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। এ কথাও আপনিই বলিয়াছেন।" এই বলিয়া নিম্ন লিখিত গানটী আবৃত্তি করিলেন :—

ওরে! কিছু পথের সম্বল কর রে ভাই।

... সময় হল হল নাই নাই॥

ক্রোশেক দু ক্রোশ যেতে গেঁটে বেঁধে লও খেতে

সে বড় দুর্গম পথ, মাথা খুড়্‌লে পাবে নাই॥

বাণিজ্য ব্যবসায় এসে, মূলে টানাটানি শেষে,

এখন উপায় বল, কল্পতরু মূলে যাই।

কমলাকান্তের মন, যথা আছে মহাধন,

সকল আশায় দিয়ে ছাই, দৃঢ় করে ধর তাই॥

ক্রমশঃ

কালী-স্তুতি।

লেখক—শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ কাব্যতীর্থ বিরচিত।

জয় কালী কাল বারিণী।

মহাকাল কামিনী॥

দনুজ দলনী নর-শিরোমালিনী,

অরুণ লোচনী শ্যামা শশি ভালিনী॥

শব-শিশু-শ্রবণা ভীমা ঘন বরণা,

শবাসনা সুহসনা অসি ধারিণী॥

হর-হৃদয় মাঝে শ্যামা-পদ বিরাজে,

(কিবা) কমলে কমল মরি মধুর সাজে॥

(কোটী) প্রভাকর হায়, পদ-কমলে লুটায়

এলোকেশী কোটী শশিরূপ-শোভিনী॥

দীন অভাজনে মা গো আপন গুণে,

রাখ' রাখ' হররমা রাঙা-চরণে॥

(ঘোর ভব-ভয়ে মুক্ত কর' অভয়ে!

(আজি) অধম তনয়ে তার' দীন তারিণী॥

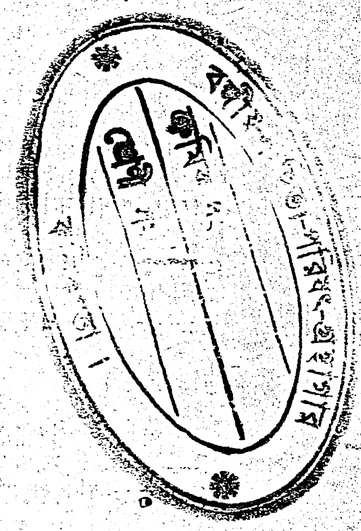

দাদা থাকৃতে দিদি বিধবা হল কি করে ?

কানাই ও বলাই দুই সহোদর। কানাই জ্যেষ্ঠ—বলাই কনিষ্ঠ, কানাই বিদেশে চাকুরী করে, বলাই বাটীতে থাকিয়া সংসারের কাজ কর্ম্ম দেখে, কানাইয়ের স্ত্রী অনেক দিন যাবৎ ছেলে মেয়ে লইয়া বাপের বাটীতে আছে। ঘর-কন্নার কাজকর্ম্ম বলাইয়ের দিদিই সম্পন্ন করে। বলাইয়ের দিদি কানাইয়ের ছোট।

বলাইকে সকলে "বোকবলাই" বলিয়া ডাকিত, কারণ বলাই লেখা পড়া জানিত না, বুদ্ধি শুদ্ধি ছিল না। ৺দুর্গা পূজা আগত প্রায় একদিন বলাইয়ের দিদি বলাইকে ডাকিয়া বলিল, "বলাই, অনেক দিন হইল, বড় বৌয়ের খবর পাই নাই, ছেলেরা কেমন আছে ? জানি না, তাঁদের সংবাদ পাবার জন্য মনটা কেমন কচ্ছে। তুই তাদের একবার দেখে আয়, আর বলিস্ দাদা পূজার ছুটিতে বাড়ী আসিবেন।"

বলাই। আমি এখনি যাবো, পান বিঁড়ী খাবার পয়সা, আর ছাতাটা দাও দেখি, আমি তাদের খবর নিয়ে আসি।

দিদি। (পয়সা ও ছাতা হস্তে দিয়া) যাও, দেখিও কুটুম্ববাড়ী গিয়ে বেশী বাজে কথা কহিও না, তারা একটা কথা বললে—তুই হাজার কথা বলে বসিস, এই বড় তোর দোষ। সাবধান,—বেশী কথা বলিসনে, তারা যদি পাঁচটা কথা বলে, তুই একটা কথা বল্‌বি। বেশী কথা বল্‌লে তারা তোকে বোকা ঠাওরাবে।

ভগ্নির উপদেশ বাক্য প্রণিধান পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া বলাই মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা, আমাকে আর তোমায় শিখিয়ে দিতে হবে না। আমি সব জানি।" এই কথা বলিয়া বলাই ছাতা ও পান বিড়ীর পয়সা লইয়া কানাইয়ের শ্বশুর বাড়ীর দিকে গমন করিল।

বলাই সন্ধ্যার সময় দাদার শ্বশুরবাড়ীতে পৌছছিল। কানাইয়ের ছেলে মেয়ে দুটি বলাইকে দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। "কাকাবাবু আসিয়াছে" এই বলিয়া তাহারা অন্দর মহলে গিয়া কানাইয়ের স্ত্রীকে সংবাদ দিল। তাড়াতাড়ি একজন দাসী আসিয়া কানাইয়ের স্ত্রীর উপদেশানুসারে বলাইকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের জামাইবাবু কেমন আছেন ?"

বলাই কোন উত্তর না দিয়া মনে মনে ভাবিল,—"১।" অর্থাৎ পূর্ণ পাঁচটী কথা না হইলে ত বলাই কথা কহিবে না। সে তাহার দিদির উপদেশ ভুলে নাই। দাসী আবার জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁগা বাবু তুমি কি আমার কথা শুন্‌তে পাচ্ছ না, আপনার দাদা কেমন আছেন ?"

বলাই মনে মনে ভাবিল,—"২।" দাসী আবার ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ওগো বাবু কথা কচ্ছ না কেন ? তবে কি তাঁর কোন ভাল মন্দ হয়েছে নাকি ?

বলাই মনে মনে গুণিল, "৩।" দাসী আর স্থির থাকিতে পারিল না; রোরুদ্যমান কণ্ঠে বলিল,—"তবে আমাদের সিধুর (কানাইয়ের স্ত্রীর নাম সিদ্ধেশ্বরী) কপাল ভাঙ্গিয়াছে বুঝি। শীঘ্র বলুন, আপনার দাদা তবে মারা গিয়াছেন কি ?" বলাই দেখিল, এ কথার উত্তর না দিলে নয়। কিন্তু এখনও পাঁচটা কথা পূর্ণ হয় নাই।

সুতরাং সে স্থির করিল,—আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলেই সব কথা খুলিয়া বলিব। কিন্তু কেহ তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। দাসী অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। বাড়ীর সকলেই মনে করিল—ভ্রাতৃশোকে কাতর হইয়া বলাই কথা কহিতে পারিতেছে না, এবং সেই জন্যেই দাসীর কথার কোন প্রতিবাদ করে নাই। অচিরে বাটীর মধ্যে মহা কান্নাহাটী পড়িয়া গেল। কানাইয়ের স্ত্রী ও শাশুড়ীর কান্নায় পাড়া পড়সীরা ছুটিয়া আসিল। সকলে হায়, হায় করিতে লাগিল।

একজন প্রতিবেশী কানাইয়ের স্ত্রীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গৃহে ফি[illegible] যাইতেছিল। বলাই তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁগা এ বাড়ীর অন্তঃপুরে মেয়েরা এত কান্নাকাটী কচ্ছে কেন ?" সেই স্ত্রীলোক বিস্মিত হইয়া বলিল,—"সে কি কথা ? আপনার ভায়ের স্ত্রী বিধবা হল কাঁদ্‌বে না ?" বলাই এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইল, সে ভাবিল,—বয়ের যখন এমন সর্ব্বনাশ হইল, তখন আর আমার এ বাড়ীতে থাকা ভাল দেখায় না। শীঘ্র শীঘ্র বাড়ী যাই, বাড়ী গিয়া দিদি ও দাদাকে এই সংবাদ দি। এই ভাবিয়াই সে কাহাকেও কিছু না বলিয়াই বাড়ীর দিকে ছুটিয়া চলিল।

বলাই যথা সময়ে বাড়ী আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার দিদি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"কি হয়েছে বলাই ?"

বলাই। কি আর হবে সর্ব্বনাশ হয়েছে। বউ বিধবা হয়েছে !

দিদি। বলিস্ কি? এও কি হয়। কে তোকে বোকা দেখে তামাসা করেছে।

বলাই। হ্যাঁ তামাসা করেছে, আমি এমন বোকা কিনা যে আমাকে তামাসা করেছে। আমি এইমাত্র দাদার শ্বশুর বাড়ীতে দেখে এলাম, বৌ বিধবা হয়েছে, আর তারা সবাই মিলে কাঁদ্‌তে লেগেছে।

দিদি। দূর বোকা দাদা বেঁচে থাক্‌তে কি বৌ বিধবা হতে পারে!

বলাই। ইস্ তুমি আমাকে একেবারে বোকা মুখ ঠাউরিয়েছ আর কি? দাদা থাক্‌তে যদি বৌ বিধবা হতে পারে না, তবে দাদা বেঁচে থাক্‌তে তুমি বিধবা হলে কি করে?

বলাইয়ের দিদি আর সহ্য করিতে পারিল না, হাতের কাছে একটা খ্যাংরা পড়েছিল, তাহা লইয়া বলাইকে প্রহার করিতে গেল। দিদির ঝাঁটার তেজ কত, বলাই তাহা জানিত—সুতরাং উদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

বুদ্ধির দৌড়।

পশ্চিমের কোন জমিদার গ্রামের ধারে একটী কুয়া কাটাইবেন,—একজন লোকের সঙ্গে ঠিকা বন্দোবস্ত হইল। সে লোকটী সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া গভীর করিয়া খানিকটা ভূমি খনন করিয়া ফেলিল এবং বাকীটুকু পরদিন আসিয়া শেষ করিবে বলিয়া সন্ধ্যার সময় নিজ গৃহে চলিয়া গেল। পর-দিন ভোর বেলা কাজ করিতে আসিয়া দেখে সমস্ত মাটী পড়িয়া গিয়া কুয়াটী প্রায় ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। তখন সে নিকটবর্ত্তী একটী গাছের ডালে তাহার পাগড়ীটী এবং বৃক্ষ তলে তাহার নাগরা জুতা, হুঁকা-কলিকা, তামাক-টিকা ও দেশলাইটী রাখিয়া নিজে একটা ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া বসিয়া রহিল। একটু বেলা হইলে গ্রামের লোকেরা একে একে কুয়া কতদূর কাটা হইল, তাহা দেখিবার জন্য সেখানে আসিতে লাগিল, ক্রমে জমিদারও আসিয়া পৌছিলেন। সকলে গাছের তলায় জুতা ও তামাক খাইবার সরঞ্জাম এবং গাছের ডালে পাগড়া ঝুলিতে দেখিয়া এবং ঠিকাদারকে সেখানে না দেখিয়া মনে করিল, হয় ত ঠিকাদার যখন কুয়ার ভিতরে গিয়া মাটী খুঁড়িতেছিল, তখন সে মাটী চাপা পড়িয়া থাকিবে। জমি-দার বলিলেন, চেষ্টা করিলে হয় ত এখনও লোকটীকে বাঁচানো যায়। গ্রামের

লোকেরা তখন তাড়াতাড়ি ঝুড়ি ও কোদাল আনিয়া আলগা মাটী তুলিয়া ফেলিতে লাগিল। দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই প্রায় সমস্ত মাটী উঠানো হইলে যতদূর পর্য্যন্ত কুয়া খনন হইয়াছিল লোকেরা তথায় গিয়া পৌছিল, কিন্তু ঠিকা-দারের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইল না। এদিকে ঠিকাদার যখন দেখিল, মাটী প্রায় সমস্তই তোলা হইয়াছে, তখন সে ঝোপের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া গ্রামের লোক গুলিকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। অনর্থক এই মেহনত করিতে হইল বলিয়া অনেকে তাহার উপর বিলক্ষণ চটিয়া গিয়াছিল; কিন্তু জমিদার মহাশয় তাহার বুদ্ধির দৌড় দেখিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। কাজেই সে যাত্রা ঠিকাদার বিনা দণ্ডে অব্যাহতি লাভ করিল।

ভক্তি পরীক্ষা।

বৎসরান্তে জগদম্বা পিত্রালয়ে গমন করেন। মা পিত্রালয়ে গমন করিবেন জানিয়া কুবের তাঁহার ভাণ্ডারে যত কিছু উৎকৃষ্ট রত্ন ছিল, তাহা লইয়া সাধ্যমত মাতাকে সজ্জিতা করিলেন। যেখানে যে মণি, যেখানে যে হীরক, যেখানে যে রত্ন, যেখানে যেমন মতি শোভা পাইতে পারে, তাহাই দিয়া মাতাকে অতি যত্নে সুসজ্জিতা করিয়া কুবেরের মনে বড়ই অহঙ্কার হইল। আরও তাহার আনন্দের কারণ এই যে, হিমগিরি-রাজনন্দিনী পার্ব্বতী ভিখারী গৃহিণী বলিয়া সকলে মাকে ভিখারিণী বলেন, রাজনন্দিনী ভিখারিণী এ কথা কুবেরের বুকে বাজের অধিক বাজে, কাজেই তিনি রত্ন ভাণ্ডার শূন্য ক'রে উৎকৃষ্ট, মণিমুক্তা রত্নাদিতে মাকে সুসজ্জিতা করিয়া একা সে সৌন্দর্য্য দেখিয়া তৃপ্ত হইতে পারিলেন না, সত্বর নন্দীকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, "নন্দী দেখ, দেখ, মায়ের কি শোভা হয়েছে, দেখ নন্দী অয়স্কান্তমণি, সূর্য্যকান্তমণি, চন্দ্রকান্তমণি, নীলকান্তমণি প্রভৃতি যেখানে যেটি দিলে অধিক শোভা হবে, সেখানে সেই মণি দিয়ে মাকে সাজিয়েছি। দেখ নন্দী, মাকে কেমন দেখ্‌তে হয়েছে।" নন্দী বলিল, "কুবের দাদা, ওসব দিয়ে সাজালে কি মায়ের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়, এতে মায়ের সৌন্দর্য্য হ্রাস হয়েছে। যাঁর চরণ-নখরে দশচন্দ্র বিদ্যমান, তাঁর গলায় চন্দ্রকান্তমণি কি শোভা

পায় না, মার রূপের জ্যোতির কাছে কি মণি-কাঞ্চনের জ্যোতিঃ শোভা পায়।" কুবের বলিল, "তুই জংলী, তুই রত্নমণিমাণিক্যের মর্ম্ম কি বুঝবি?" নন্দী বলিল, "কুবের দাদা, তবে তোমার সাজের যে ত্রুটি হয়েছে, তা আমি সংশোধন ক'রে দিচ্ছি, তুমি রাগ করো না। এই বলিয়া নন্দী অক্ষতদূর্ব্বা, পঞ্চমুখী রক্তজবা, ত্রিপত্র বিল্বদল ও রক্তচন্দনে সিক্ত করিয়া আনিয়া মাতার চরণে অর্পণ করিয়া বলিল,—

"কুবের দেখ্ রে নয়নে।
কি শোভা হয়েছে মায়ের রাঙা চরণে।
যে পদে হয় মোক্ষপদ, সাধকের হয় সাধনা পদ,
সাজ্ বে কিরে ও পাদপদ্ম অন্ত ভূষণে॥"

তোমার রত্ন-ভাণ্ডারের রত্ন অপেক্ষা দীন জননী দীন দয়াময়ী মায়ের দীন প্রদত্ত এ ভক্তি উপচার কেমন দেখাচ্ছে বল দেখি। কুবেরের নয়নে অশ্রু বিগলিত হইল। তিনি বলিলেন, "ভাই নন্দী, তুইই ধন্য! মা যে দীনের প্রতি অধিক দয়াময়ী। মা যে ধনরত্ন অপেক্ষা দীনের ভক্তির প্রার্থিনী তা আমি বুঝলাম। তোর ঐ সামান্য অর্ঘ্য আমার অমূল্যরত্ন অপেক্ষাও বহুমূল্য। এ শোভা ভক্তের, ভক্তের পরিচায়ক। আমার সজ্জা রাজসিক, তোমার সজ্জা সাত্বিক. তোমারই জয় হয়েছে। ভক্তি পরীক্ষায় তুমিই উত্তীর্ণ হয়েছ। ধন্য ভক্ত!

মাতৃ-শক্তি।

লেখক,—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস।

(গল্প)

জামতাড়া মহকুমার অন্তঃপাতী কোন এক গ্রামে সরোজনাথ ঘোষের বাস। সরোজনাথ একত্রিংশ বৎসরের পূর্ণ যুবক। সরোজনাথ ব্যতীত সরোজনাথের সংসারে তাঁহার দ্বাবিংশ বর্ষীয় যুবতী পত্নী নগবালা ও পঞ্চম বর্ষীয় পুত্র মণিলাল ... ব্যতীত একটি চাকর, একটি ঝি ও একজন স্বজাতীয়া

অষ্টাদশবর্ষীয়া বিধবা যুবতী শৈলজাসুন্দরী তাঁহার সংসারে প্রতিপালিত হইত। পুত্রের পরে সরোজনাথের এক কন্যা সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু সূতিকাগারেই কন্যাটির প্রাণান্ত হয়।

এক্ষণে বাধ্য হইয়া, শৈলজার পরিচয় পাঠক পাঠিকা গণকে একটু পরিষ্কার রূপে দিতে হইতেছে। সরোজনাথের গ্রামেই শৈলজার পিত্রালয়। বিবাহের দুই বৎসর পরেই শৈলজা বিধবা হয়। সে সময়ে বৃদ্ধা পিতামহী ব্যতীত তাহার পিত্রালয়ে আর কেহই ছিল না। বিধবা হইবার পর শৈলজা স্বইচ্ছায় দুইবার শ্বশুর বাটী গিয়াছিল, কিন্তু সেখানে খাশুড়ী ও ননদিনীর অত্যাচারে পীড়িত হওয়ায়, তাহাকে বাধ্য হইয়া পিতামহীর নিকটে ফিরিয়া আসিতে হয়। কালক্রমে বৃদ্ধাও গতাসু হন, সে সময় হইতে সরোজনাথ, অভিভাবকহীনা শৈলজাকে নিজের আশ্রয়েই রাখেন। শৈলজা সরোজনাথের সংসারে মধ্যে মধ্যে পরিচারিকার কার্য্য করিত এবং দুই বেলা নিকটস্থ সরোবর হইতে পানীয় জল আহরণ করিয়া আনিত. পুকুরের স্বচ্ছ জল থাকিতে পল্লীগ্রামের লোকে কূপ ইন্দারার জল পানীয়রূপে ব্যবহার করে না। তাই তখন প্রত্যেক জমিদারই স্ব স্ব জমিদারীর মধ্যে প্রত্যেক গ্রামে একাধিক পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিতেন। এখনও সে সকল পুষ্করিণী লুপ্তাবস্থায় বা অর্দ্ধলুপ্তাবস্থায় অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। হায়! সেদিন কি আর আসিবে।

পল্লীগ্রামের পাঁচজনের হিসাবে সরোজনাথের অবস্থা উন্নত। কৃষিকার্য্য দ্বারাই সরোজনাথের সংসার খরচ নির্ব্বাহ হয়, হাতে কিছু নগদ টাকাও জমে। তিনি অনেক লোককে নগদ টাকা ও ধান্য চাউল কর্জ্জ দেন। গোয়ালে ২০।২৫টি গরু বাছুর আছে—দুইটি খড়ের কোঠাবাড়ী, একটি গো-শালা, একটি রান্নাঘর এবং বাহিরে প্রকাণ্ড চারিচালা চণ্ডীমণ্ডপ আছে। পিতৃ পিতামহের আমল হইতে প্রতি বৎসর সরোজনাথের বাটীতে দুর্গোৎসব হয়, অনেক দীনদুঃখী সে সময়ে উদর পূর্ণ করিয়া আহার করে। অন্নপূর্ণারূপে স্বয়ং নগবালা অক্লান্ত পরিশ্রমে সকলকে আহার প্রদান করেন। রূপে, গুণে, কার্য্যে নগবালা সত্য সত্যই নগবালা।

সুখ কাহারও ভাগ্যে চিরকাল সমান থাকে না, অথবা সুখই ভাবী দুঃখের পথ প্রদর্শক। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ" সরোজনাথের নগবালার সুখের অবসান হইল,—এরূপ সুখের সংসারও অকস্মাৎ মহাদুঃখাগুণে জ্বলিয়া উঠিল। শৈলজার রূপই ইহার মূলীভূত কারণ। অনেকে হয়ত মনে

মনে ভাবিলেন,—শৈলজার রূপ। তবে কি শৈলজা সুন্দরী? আবার কেহ কেহ হয়ত বলিবেন,—শৈলজার কেমন রূপ? শৈলজা কেমন সুন্দরী? কেবলমাত্র তাঁহাদিগের জন্যই অল্প কথায় বলি,—শৈলজার রূপ আছে, শৈলজা সুন্দরী। পদের নখাগ্র হইতে মাথার কেশ পর্য্যন্ত সে সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিতে লেখক নিতান্ত অপারগ। লোকে যে সকল রমণীকে সুন্দরী বলিয়া অভিহিত করে, শৈলজা তেমনই সুন্দরী। নায়কের দৃষ্টিতে নায়িকা যেমন সুন্দরী, পতির সোহাগে পত্নী যেমন সুন্দরী, বোধ হয় শৈলজার সৌন্দর্য্যও তদনুরূপ হইবে।

অগ্নির উত্তাপে ঘৃত গলিয়া গেল,—শৈলজার চাহনিতে, শৈলজার কথায়, শৈলজার রূপে, শৈলজার কার্য্যে, পদক্ষেপে সরোজনাথের হৃদয় গলিল, সরোজনাথ শৈলজার প্রেমে মজিলেন। নগবালা পতিকে কুপথ হইতে ফিরাইতে পারিলেন না। ভাদ্রমাসের ভরাগাঙ্গের প্রবল তরঙ্গতাড়নে নৌকা ছুটিল, হালের বা দাঁড়ের সাহায্যে নাবিক নৌকা ফিরাইতে পারিল না, নাবিক ও নৌকার ভবিষ্যত যে কি হইবে, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। নগবালা সর্ব্বাই চণ্ডীমণ্ডপে যাইয়া মাথা কুটিয়া বলিতেন,—"মা আমার স্বামীকে সুপথে আনয়ন কর।"

মায়েরও প্রাবৃটকালের বিবেকশূন্য মৎস্যের দৌড় দেখিবার সাধ হইল, সুতরাং নগবালার কাঁতর অনুরোধ তাঁহার নিকট উপেক্ষিত হইল।

ঘটনাটা ক্রমে ক্রমে গ্রামে রাষ্ট্র হইল। পথে, মাঠে, ঘাটে সরোজনাথ ও শৈলজার আলোচনা হইতে লাগিল। এরূপ ভাবে থাকা অনুচিত ভাবিয়া সরোজনাথ, পত্নীপুত্রের মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক নগদ টাকা ও অলঙ্কারাদি লইয়া, একরাত্রে শৈলজার সহিত গৃহ হইতে পলায়ন করিলেন। তাঁহার আর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর,—এইরূপে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। পতি-বিয়োগ-বিধুরা নগবালা সাধ্যানুযায়ী তিন বৎসরই মাতৃপূজা সম্পন্ন করিলেন। তিনি শ্বশুরকুলের মান বজায় রাখিলেন বটে, কিন্তু সাংসারিক আয় ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে লাগিল। খাতকেরা সুযোগ বুঝিয়া, টাকা বা ধান্য চাউল আদায় দেয় না, জমি হইতে ভালরূপ ফসলও পাওয়া যায় না, বৎসরের মধ্যে ২।৩ বার করিয়া বাড়ীতে চুরীও হইতে লাগিল। পতিশোকে নগবালা ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। তিনি মাতৃপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া, পুত্রের সহিত সশঙ্কচিত্তে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। একদিন

অকস্মাৎ সংবাদ আনিল,—সরোজনাথ, শৈলজার সহিত একজন পুরুষকে খুন করিয়া ধরা পড়িয়াছেন, তাঁহাকে দুমকার দায়রায় সোপরদ্দ করা হইয়াছে, অমুক তারিখে তাঁহার বিচার হইবে। নগবালার মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

সরোজনাথ শৈলজার সহিত নানাস্থানে ঘুরিয়া অবশেষে দেওঘরে গোপনে বাস করিতেছিলেন। তথায় কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর, আর একজন যুবকের সহিত শৈলজার অনুরাগ সঞ্চার হয়। সরোজনাথ কোন কার্য্যোপলক্ষে একদিন বাহিরে গিয়াছিলেন, সে দিন তাঁহার ফিরিবার কথা ছিল না, কিন্তু কার্য্যগতিকে রাত্রিতেই বাসায় ফিরিতে হইল। তিনি শৈলজার সহিত একজন যুবককে নিজের শয্যায় দেখিয়া, ক্রোধে আত্মহারা হইলেন। তাঁহার সম্মুখেই একটি কুঠার পড়িয়াছিল, তিনি সেই কুঠারখানি লইয়া শয্যাশায়িত যুবককে এরূপভাবে আঘাত করিলেন যে, যুবককে চীৎকার করিতেও হইল না। ইহা দেখিয়া শৈলজা বিকটরবে চীৎকার করিয়া উঠিল, চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ কুঠারাঘাতে তাহারও প্রাণহীন দেহ ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। সরোজনাথ পলায়নের জন্য গৃহ হইতে বাহির হইতেছিলেন কিন্তু দ্বারের সম্মুখে দুইজন পাহারাওয়ালাকে দেখিয়া পলায়ন করিতে পারিলেন না। শৈলজার চীৎকার শুনিয়াই পাহারাওয়ালাদ্বয় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা সরোজনাথকে ধৃত করিয়া থানায় সংবাদ পাঠাইল। সদলবল দারোগা বাবু আসিয়া আসামীসহ মৃতদেহ দুইটীকে থানায় লইয়া গেলেন। পরে আসামী দায়রা সোপরদ্দ হইল।

নগবালা মোকদ্দমার তদ্বিরের জন্য নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে আনাইলেন। ভদ্রবাড়ী ও চণ্ডীমণ্ডপ ব্যতীত সমস্ত ভূসম্পত্তি, গরু বাছুর বন্ধক দিয়া রীতিমত উকীল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না, সরোজনাথ বিচারক সমীপে স্বমুখেই সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিলেন। জুরিগণ একবাক্যে আসামীকে হত্যাপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। বিচারপতি সরোজনাথের রূপাপরবশ হইয়া প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ করিলেন।

পরে নগবালা বাঁকীপুর হাইকোর্টে আপীল মোশন করিলেন, তাহাতেও ফললাভ হইল না। নগবালা সংবাদ শুনিয়া পাগলিনীর মত হইলেন।

নগবালা সহায় সম্পদহীনা হইলেন। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অদ্বৈত রায়,

তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইতে চাহিলেন; কিন্তু নগবালা স্বামীর ভিটা ত্যাগ করিতে চাহিলেন না। তাঁহার ভ্রাতার অবস্থাও সেরূপ স্বচ্ছল নয়, সুতরাং ভ্রাতাও ভগিনীকে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিলেন না।

অবশেষে নগবালার অবস্থা এমন শোচনীয় হইল যে, তাঁহাকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইল। নগবালা বাড়ীর বাহির হইতেন না, পুত্র মণিলালই ভিক্ষায় যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিত, জননী তাহাই পুত্রকে ভোজন করাইয়া নিজে একরূপ উপবাসই থাকিতেন। ক্রমে পূজার দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল; নগবালা অত্যন্ত চিন্তিতা হইলেন। ঘরে অন্ন নাই, পরিধেয় বস্ত্র নাই, তাহার উপর বহুকালের পূজা লোপ পাইতে বসিল। নগবালা মধ্যে মধ্যে চণ্ডীমণ্ডপে যাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন,—"মা! বোলে দাও, এই হতভাগিনী তোমার পুজা কিরূপে সম্পন্ন করিবে।"

গ্রামের মধ্যে চণ্ডীচরণ সরকার নামে জনৈক লোক ছিল। নগবালার দুরবস্থা দেখিয়া সে কু-অভিপ্রায়ে নগবালাকে হাত করিবার ইচ্ছা করিল। প্রথমে ২।৪ জন মন্দ স্ত্রীলোককে লাগাইয়া প্রলোভন দেখাইতে লাগিল; নগবালা ঘৃণার সহিত তাহাদিগকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিলেন। শেষে চণ্ডীচরণ একদিন নিজেই নগবালার নিকটে যাইয়া সবিনয়ে তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিতে লাগিল। নগবালা ঘৃণার সহিত তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বেশ গোটাকতক কথা শুনাইয়া দিলেন। চণ্ডীচরণ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিল,—"তুমি যে কেমন সতী সাবিত্রী তা দেখা যাবে; কে তোমাকে রক্ষা কর্ব্বে, তাই চিন্তা কর।"

সক্রোধে, সমান উত্তরে নগবালাও বলিয়া উঠিলেন,—"সতী ভগবতীই সতীর মান রক্ষা কর্ব্বেন, দানবদলনী মা আমার তোমার ন্যায় দুর্ব্বৃত্ত দানবকে দমন কর্ব্বেন। আমার জীবন থাকিতে তোমার মত নরাধম আমার পদের কনিষ্ঠাঙ্গুলিও স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

"আচ্ছা কার্য্যকালে দেখা যাবে" বলিয়া চণ্ডীচরণ সে স্থান হইতে সবেগে প্রস্থান করিল।

... কি সতীর মান রক্ষা কর্ব্বেন? নগবালা অত্যন্ত চিন্তান্বিতা ও শঙ্কিতা হইলেন। অন্ন... বস্ত্রের চিন্তা—মায়ের পূজার চিন্তা—আবার এই নূতন বিপদের চিন্তা! এই সকল দু... চিন্তায় তাঁহার হৃদয় তুষানলের মত জ্বলিতে লাগিল। চণ্ডীচরণ অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত, তাহা... র আরও কয়েকজন সঙ্গী আছে, তাহাদের অসাধ্য

কর্ম্ম কিছুই নাই,—যখন এইরূপ চিন্তা হইত, তখন নগবালা ভয়ে শিহরিয়া উঠিতেন; কাঁদিতে কাঁদিতে ব্যাকুল হৃদয়ে বলিতেন,—"সতী কি সতীর মান রক্ষা কর্ব্বেন না? একমাত্র মাতৃশক্তি ব্যতীত এ বিপদ হইতে আমার উদ্ধারের আশা নাই। ইচ্ছাময়ি, মঙ্গলময়ি মা! তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তবে দেখো মা, প্রাণ থাকিতে যেন কেহ এই হতভাগিনীর অঙ্গস্পর্শ করিতে না পারে। স্বামিন্! গুরো! হৃদয়ারাধ্য দেবতা! তুমি কোথায়? দাসীকে এ বিপদে রক্ষা কর।"

সারারাত্রি এইরূপ চিন্তা করিয়া নগবালা প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই একখানি পত্র লিখিলেন। তিনি সামান্যরূপ লেখাপড়া জানিতেন। পরে পুত্র মণিলালকে ডাকিয়া বলিলেন,—"মাণ! সেদিন তুমি আমাদের গ্রামে আমাদের জমিদার পুত্র জগৎবাবুকে দেখিয়াছিলে?"

বালক মণিলাল বলিল,—"হাঁ মা দেখেছি, তিনি বড় ভাল লোক, আমাকে দেখে আমার হাতে দুটি টাকা দিয়েছিলেন।"

মাতা। হাঁ বাবা তিনি বড় ভাললোক, বড় দয়ালু, পরোপকারী এবং সুশিক্ষিত। আজ এই চিঠিখানি ল'য়ে তোমায় তাঁর কাছে যেতে হবে। তিনি কোথায় থাকেন, জান ত?

পুত্র। হাঁ মা, জানি। আমাদের জমিদার মহাশয় জামতাড়ায় থাকেন, সুতরাং তিনিও জামতাড়ায় আছেন।

মাতা। ঠিক কথা। জামতাড়া এখান থেকে ৫ মাইল হবে। তুমি এই চিঠিখানি তাঁর হাতে দিয়া বোধ হয়, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাড়ী ফির্তে পার্বে। কেমন চিঠিখানি দিতে পার্বে ত? তুমি ভিন্ন আমার আর বিশ্বাসী লোক নাই।

পুত্র। মা, আপনার আশীর্ব্বাদে নিশ্চয়ই তাঁর হাতে চিঠিখানি দিতে পার্বো। আমি তাঁকে বেশ চিনি।

মাতা। যাও বাছা, বড় বিপদে পড়েই তোমাকে এইরূপ কষ্টকর কার্য্যে পাঠাচ্ছি। তোমার এই কার্য্যের সহিত আমার জীবন মরণের সম্বন্ধ রয়েছে। আশীর্ব্বাদ করি, কার্য্যান্তে নিরাপদে বাড়ী প্রত্যাগমন করিও, মা মঙ্গলা তোমার মঙ্গল করুন। নগবালা বসনাঞ্চলে নেত্র মার্জ্জনা করিলেন।

বালক মণিলাল মাতৃচরণে ও চণ্ডীমণ্ডপে প্রণাম করিয়া, বাড়ী হইতে বহির্গত হইল।

নগবালা পুত্রকে বিদায় দিয়া, পতির প্রতিমূর্ত্তি বক্ষে ধারণ করিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। অতঃপর স্নানান্তে চণ্ডীমণ্ডপে যাইয়া বিল্বদল দ্বারা মায়ের পূজা করিতে লাগিলেন। আজ তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া, তন্ময়চিত্তে মায়ের পূজা ও স্তব করিতে লাগিলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া, মায়ের বেদীর নিকটে কাঁদিতে লাগিলেন। যখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইল, তখন বেলা অবসন্ন। তিনি ফিরিয়া চাহিবামাত্র পুত্র মণিলালকে চণ্ডীমণ্ডপে দেখিতে পাইলেন। মণিকে দেখিয়া আবেগভরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বাবা খবর কি ?"

মণিলাল মায়ের হাতে ৫টী টাকা দিয়া বলিল,—"মা জগৎবাবুর হাতে চিঠিখানি দিয়াছি, তিনি খরচের জন্য ৫টী টাকা দিয়াছেন, কোন কথা বলেন নাই।"

"আমি ত অর্থ ভিক্ষা করি নাই বাবা! তবে কি তিনিও আমার বিপদে আমার প্রতি নিদয় হলেন।" এই কথা বলিয়া নগবালা অত্যন্ত কাতরা হইলেন। পুত্রকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গিয়া আহার করিতে দিলেন।

ইহার দুই দিন পরে প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রে নগবালা পুত্র মণিলালকে লইয়া শুইয়া আছেন, মণিলাল নিদ্রিত কিন্তু আশঙ্কায় ও চিন্তায় নগবালার নিদ্রাকর্ষণ হয় নাই। এমন সময়ে বহির্দ্বারের কবাট সশব্দে খুলিয়া গেল। নগবালা শয্যা হইতে উঠিয়া, সচকিতে গবাক্ষ পথে দেখিলেন, আট দশ জন লোক মশাল হাতে করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। নগবালার বুঝিতে কিছুই বাকি রহিল না, আতঙ্কে তাঁহার আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল। তিনি কাতরস্বরে বলিলেন, —"দুর্গতিনাশিনী দুর্গে, এ বিপদে রক্ষা কর; মা দুর্ব্বল হৃদয়ে সাহস দাও, শক্তি দাও, এ বিপদে মাতৃশক্তিই আমার একমাত্র অবলম্বন।"

নগবালা স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল দৃঢ়রূপে কোমরে বন্ধন করিলেন। তিনি বলিদানের খড়্গটী শয্যা পার্শ্বেই রাখিতেন, তাহা দৃঢ়রূপে হস্তে ধারণ করিয়া দ্বারের নিকটে দাঁড়াইলেন। দ্বারের কবাট অর্গলাবদ্ধ ছিল, দস্যুরা আসিয়া কবাটে সজোরে পদাঘাত করিতে লাগিল। নগবালা দুই হস্তে কবাট চাপিয়া ধরিলেন, দস্যুরা অনেক চেষ্টাতেও কবাট খুলিতে পারিল না। তখন একজন দস্যু চীৎকার স্বরে বলিয়া উঠিল,—"ঘরে আগুণ লাগাও।" স্বর চণ্ডীচরণের।

নগবালা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি নিজ হস্তেই কবাট উন্মোচন করিয়া দিলেন এবং খড়্গ উত্তোলন করিয়া "জয় মা দুর্গে" বলিয়া দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার বদ্ধ চিকুরগুচ্ছ মুক্ত হইয়া পৃষ্ঠদেশে

বিলম্বিত হইল; মা যেন প্রকৃতই রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইলেন। সে সময়ে একজন দস্যু মশালের অগ্নি গৃহ চালে দিতে যাইতেছিল, নগবালা সহুঙ্কারে লম্ফ প্রদান করিয়া, দস্যুর মশালধৃত হস্তখানি খড়্গ দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিলেন। দস্যু যন্ত্রণায় বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল, অন্যান্য দস্যুরা এই ব্যাপার এবং নগবালার ভৈরবীমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ভয়ে পিছাইয়া গেল। ঠিক এই সময়ে "মা ক্ষান্ত হউন, আর ভয় নাই" এই কথা বলিতে বলিতে দশ বারোজন পুলিশ কর্ম্মচারীর সহিত স্বয়ং জগৎবাবু বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, দস্যুদলকে ঘেরাও করিলেন। দস্যুগণ সহজেই ধৃত হইল। কর্ত্তিতহস্ত দস্যুটি স্বয়ং চণ্ডীচরণ, সে নিজেই ঘরে অগ্নি দিতে যাইতেছিল। দুর্ব্বৃত্তের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে আরম্ভ হইল।

জমিদার পুত্র বাবু জগৎনারায়ণ সিংহ মণিলালের কাছে পত্র পাইয়া, প্রকাশ হইবার ভয়ে নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। তিনি দুইজন বিশ্বস্ত অনুচর লইয়া, সেই রাত্রেই গোপনে নগবালার বাড়ী দেখিতে আসিয়াছিলেন। কয়েকজন লোককে রাত্রির অন্ধকারে গ্রামের বহির্ভাগস্থিত শিব মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, তাঁহার মনে সন্দেহ হইল। জগৎবাবু অনুচরসহ তাহাদের কার্য্য দেখিতে গেলেন, মন্দিরের বহির্ভাগ হইতেই তাহাদের অনুচ্চ কণ্ঠধ্বনি শ্রুত হইল। তিনি মন্দিরের দ্বারের নিকটে গোপনে থাকিয়া, তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন। জগৎবাবু বুঝিলেন,—দুই দিন পরে নগবালার বাড়ীতে ডাকাতী হইবে। তাই তিনি পুলিশ লইয়া, যথাসময়ে ডাকাতি ধরিতে আসিয়াছেন। রাত্রি প্রভাত হইলে পুলিশ কর্ম্মচারিগণ দস্যুদিগকে থানায় লইয়া গেলেন। জগৎবাবু যাইবার সময় নগবালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা, এবৎসর মায়ের পূজার কিরূপ বন্দোবস্ত করিতেছেন ?"

ব্যথিত হৃদয়ে নগবালা বলিলেন,—"আমি কি কর্ব্বো বাবা, যার কাজ তিনিই কোর্ব্বেন, আমার কোন ক্ষমতা নাই।"

জগৎবাবু মণিলালের হস্তে খরচের জন্য কয়েকটি মুদ্রা দিয়া প্রস্থান করিলেন, তিনি নগবালাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

যথাসময়ে সূত্রধার আসিয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া গেল,—মালাকর আসিয়া প্রতিমা সাজাইয়া গেল। কেহ নগবালাকে কোন কথা বলিল না, নগবালা জিজ্ঞাসা করিয়াও কিছু জানিতে পারিলেন না! পরে পূজার সময় পূজক ব্রাহ্মণ আসিলেন, শকটযোগে ঘৃত, ময়দা, চিনি, দধি প্রভৃতি দ্রব্যে

সহিত কতকগুলি লোকজনও আসিল। নগবালা ও মণিলালের জন্য নূতন বস্ত্র আসিয়া পৌছিল, সকলের শেষে স্বয়ং জগৎবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নগবালা সমস্তই বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার নয়নদ্বয়ে কৃতজ্ঞতাশ্রু বহির্গত হইল। ব্রাহ্মণ ও দীন দুঃখিগণের কলারের ধূম পড়িয়া গেল। বালক মণিলাল, চণ্ডী-মণ্ডপে উপবেশন করিয়া মনের আনন্দে গাহিল,—

আসিলে আনন্দময়ি, শারদ সপ্তমী পেয়ে।
হাসিল প্রকৃতি সতী আনন্দে উন্মত্তা হয়ে ॥
তোমাধনে বিদায় দিয়ে, সারা বর্ষ ছিলেম চেয়ে,
আছি দু খে মলিন হয়ে, হের গো পাষাণী মেয়ে ॥
কেমন ছিলে হরের ঘরে, বল দেখি মা দয়া ক'রে,
রাজার মেয়ে কেমন ক'রে ছিলে গো শ্মশানালয়ে ॥
বামে বাণী, ষড়ানন; নারায়ণী গজানন,—
দক্ষিণেতে সুশোভন, হেরে মা জুড়াল হিয়ে ॥
পড়িল আনন্দ সাড়া, সুরেন্দ্র আনন্দে সারা,
আনন্দে নাচিল ধরা, তোমা ধনে কোলে লয়ে ॥

মায়ের বোধন ও সপ্তমীবিহিত পূজা সম্পন্ন হইল; মহাষ্টমীর দিন পূজক ব্রাহ্মণ মাতৃপূজা করিলে পর নগবালা আসিয়া মাতৃপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগিলেন। পূজা সমাধা করিয়া পতির জন্য মায়ের নিকটে কত কাঁদিলেন, পতিকে পাইবার জন্য মায়ের চরণতলে মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন। মায়ের বুঝি দয়া হইল না, একটি কথাও কহিলেন না।

পূজা সাঙ্গ করিয়া নগবালা উঠিলেন। এমন সময়ে মণিলাল আসিয়া বলিল,—"মা, তুমি মাতৃপূজা করিলে কিন্তু আমার মাতৃপূজা বাকি আছে। তুমি দাঁড়াও, আমি মৃণ্ময়ী মায়ের পূজা করিয়া জীবন্ত প্রতিমার পূজা করি।" মণিলালের হস্তে নানাবিধ পুষ্পপূর্ণ সাজী।

নগবালা দাঁড়াইলেন। মণিলাল জগন্মাতার চরণ সরোজে মায়ের সম্মুখে মায়ের—সতীর সম্মুখে সতীর পূজা করিতে বসিলেন। তন্ত্রমন্ত্রজ্ঞানহীন বালক অঞ্জলিপূর্ণ পুষ্প লইয়া নয়নজলে ভাসিতে ভাসিতে নগবালার চরণে দিতে লাগিল। মণির নয়নজলও থামে না, মাতৃপূজাও সম্পন্ন হয় না। পুত্রের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া নগবালা বলিয়া ফেলিলেন,—"বাবা, তুমি কি চাও?"

"কি চাই মা? কিছুই জান না? এইরূপভাবে এক সঙ্গে আমি পিতা-মাতার পূজা কর্ত্তে চাই, নতুবা আমার তৃপ্তি হবে না।" মণি কাঁদ কাঁদ স্বরে এই কথা বলিয়া, পুনরায় মাতৃপূজা করিতে লাগিল।

নগবালা বলিলেন,—"বাবা, আমি যদি পতিব্রতা হই, এই সতী মায়ের পাদপদ্মে যদি আমার অচলা ভক্তি থাকে, তবে অদ্য তুমি নিশ্চয়ই পিতৃপাদপদ্ম দর্শন করিবে এবং আমিও স্বামীদর্শন করিয়া ধন্যা হইব।" নগবালার চমক ভাঙ্গিল। তিনি পুত্রকে একি বর দিলেন। স্বামী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসে, আসিবেন কিরূপে; নগবালা ব্যাকুল হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে যুক্তকরে দেবীকে বলিলেন,—"মা, একি তোমার ছলনা। না প্রকৃতই আশীর্ব্বাদ! মা আমি কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিলাম। দেবি, তুমিই ত আমার মুখ দিয়া একথা বলাইলে! হে জননি! হে দীনার্ত্ত দুঃখহারিণী, সর্ব্বব্যাপিকে শিবে, আজ এ দাসীর মান রক্ষা কর, যেন তোমার কৃপায় আমাকে মিথ্যাবাদিনী হইতে না হয়।"

সহসা জনসঙ্ঘ হইতে মলিন বস্ত্র পরিহিত শীর্ণ দেহ জনৈক পুরুষ দ্রুতপদে চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া, "দেবি দেহি পদপল্লবমুদারম্"—রবে নগবালার চরণতলে পড়িয়া গেলেন। নগবালা চাহিয়া দেখিলেন,—স্বামী সরোজনাথ পদতলে বিলুণ্ঠিত।

হরি! হরি!! লজ্জার মাথা খাইয়া, রুচির সীমা অতিক্রম করিয়া একি লিখিলাম—পতি পত্নীর পদতলে "দেহি পদপল্লবমুদারম্" রবে বিলুণ্ঠিত! বোধ হয়, বর্ত্তমানকালের সুসভ্য সুশিক্ষিত, রুচিপ্রিয় যুবক যুবতী, পাঠক পাঠিকাগণের নিকট আমার এ অপরাধ অমার্জ্জনীয় হইবে, তাঁহারা হয়ত সম্মার্জ্জনী হস্তে আমার উপর কটূক্তি বর্ষণ করিতে পারেন। কিন্তু যখন লিখিয়া ফেলিয়াছি, তখন নিরুপায়! বাধ্য হইয়া সকলই সহ্য করিতে হইবে। তবে একমাত্র ভরসা—অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত, অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য প্রাচীন প্রাচীনাগণ তাঁহারা বোধ হয়, এ ব্যাপারে নাসিকাকুঞ্চন করিবেন না, তাঁহারা হয়ত বলিতে পারেন,—পতি পত্নীর সম্বন্ধই এইরূপ—দাম্পত্য প্রেমের এইরূপই বিচিত্র গতি। পত্নী পতির অর্দ্ধাঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিণী, পত্নী পতির নিকট কখনও দেবী, কখনও জননী, কখনও সখী এবং কখনও দাসী স্বরূপা। আর 'দেহি পদপল্লব-মুদারম্' লেখকের স্বকৃত নয়, ইহা বঙ্গবরেণ্য প্রাচীন কবি পূজ্যপাদ ৺জয়দেব গোস্বামী গাহিয়া গিয়াছেন, এই বলিয়া একদিন স্বয়ং ভগবান শ্রীনন্দ-নন্দন

শ্রীমতী রাধিকার পাদপদ্ম মস্তকে ধরিয়াছিলেন, এই ভাবিয়া একদিন মহাদেবও মহাদেবীর পদ বক্ষে লইয়াছেন। তাঁহাদের আদর্শ কি আমাদের শিক্ষার উপযোগী নয়?

"দেবতা দাসীর প্রতি একি ব্যবহার" এই কথা বলিয়া, নগবালা সরোজনাথকে তুলিলেন এবং প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইলেন। আনন্দে আত্মহারা হইয়া, নগবালা কাঁদিয়া বক্ষ ভাসাইতে লাগিলেন। কান্না বড় সুখের, যে কাঁদতে জানে, সেই প্রকৃত সুখী, সরোজনাথও কাঁদিতে লাগিলেন। বালক মণিলাল, কাঁদিতে কাঁদিতে পিতৃমাতৃ পদধূলি গ্রহণ করিয়া; উভয়ের পদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিল; মাতৃপূজার ফলে, মাতৃশক্তিতে তাহার মনোভিলাষ পূর্ণ হইল। অবশেষে নগবালা দেবীর চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"মা, দাসীর প্রতি তোমার অসীম কৃপা, ধন্য তোমার লীলা, ধন্য তোমার শক্তি।"

জগৎবাবু নিকটেই ছিলেন। তিনি সরোজনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সরোজবাবু, আমি বিস্ময়ে হতভম্ব হইয়াছি, আপনি কিরূপে মুক্তি পাইলেন।"

সরোজনাথ বলিলেন, "সম্রাটের শুভ ঘোষণা বাণী অনুসারে।"

নগবালা বলিলেন,—"মাতৃশক্তি প্রভাবে, মাতৃশক্তিই আমার একমাত্র সম্বল।"

মণিলাল বলিল,—"শুধু তোমার মাতৃশক্তিতে নয়, আমার মায়েরও যথেষ্ট শক্তি আছে। তিনি আমার পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে আমায় বর দিয়েছিলেন।"

মণিলালের চিবুক ধরিয়া নগবালা বলিলেন,—"অবোধ ছেলে, অমন কথা বোল্‌তে নাই। আমার তোমার যদি কিছু শক্তি থাকে, তবে এই জগজ্জননী কর্ত্তৃক প্রদত্তই সেই শক্তি, সুতরাং সেও মাতৃশক্তি।"

মহাসমারোহে মাতৃপূজা সম্পন্ন হইল। পূজার পর জগৎবাবু স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। দায়রার বিচারে দস্যুগণের যথোপযুক্ত দণ্ড হইল। সাহসিকতার জন্য নগবালা গুণগ্রাহী গবর্ণমেণ্ট হইতে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার পাইলেন। বন্ধকী সম্পত্তি পুনরায় সরোজনাথের হস্তগত হইল। মাতৃপূজা মাহাত্ম্যে, মাতৃশক্তিতে দম্পতিযুগল পরমানন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

গোকুল-কাহিনী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম, এ,

গো-গৃহে গো-বৃন্দ সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—"হাম্বা।"

গোয়ালা-বৌ ভাতে কাটি দিতে দিতে আপনার মনেই বলিয়া উঠিল,—"মরণ আর কি, এইত জাবনা ত'রে জাব দিয়ে এনু। কাপড়টী কেচে হেঁসেলে ঢুকিচি, আর দেখ না—"

গোয়ালে বিষম গোলযোগ। শ্যামলীর দলের সহিত ধবলীর দলের মত কিছুতেই মিলে না।

শ্যামলীর শীং বাঁকা আর ধবলীর শীং সোজা। বেশী করিয়া ধবলী চায় ঘাস, আর শ্যামলী চায় খড়। ধবলী চরিতে চায় মাঠে অন্ততঃ দিনের বেলায়, শ্যামলী থাকিতে চায় ঘর—দিনে রাত্রে।

দু-দলেই একটা বিষয়ে শুধু এক মত—পেট ভরে না। বহুক্ষণ ধরিয়া গো বৃন্দের মধ্যে গবেষণা চলিল। সহসা উভয় দলেই একযোগে প্রস্তাব করিয়া উঠিল—উপায় চাই।

শ্যামলীর দলের অভিমত—দুহিতে আসিলে গোয়ালার গা চাটিতে হইবে—মানুষে কিন্তু পা চাটে।

ধবলীর দল অস্বীকার করিয়া বলিল,—শিং নাড়িতে হইবে। গা চাটিলে—প্রথমতঃ গোয়ালা যদি চটিয়া যায় ত হঠাৎ দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করিবার সুবিধা না হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ সব সময়েই মনে রাখা উচিত, গা চাটা গো জাতির পক্ষে নিতান্ত হীনতার কার্য্য। জিভ্ নাড়ার সুবিধা এই—গোয়ালা চটিবে যতটা, ভয় পাইবেও ততটা।

তুমুল তর্ক বাঁধিয়া গেল।

কুকুরটা দাওয়ার পৈঁঠার উপর শুইয়া অর্দ্ধ মুদ্রিত চক্ষে একটু আরাম করিয়া লইতেছিল, হাম্বা রবে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ডাকিয়া উঠিল—ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ।

উভয় দলেরই অসন্তোষ বাড়িয়া গেল এবং উত্তেজিত ভাবে আবার সুর উঠাইল "হাম্বা—আ।"

গয়লা বৌ অত্যন্ত চটিয়া ছেলেকে ডাকিল,—"দেখত কেষ্ট, হতভাগারা অমন কচ্ছে কেন। হাজার হোক্ গরুত, বুদ্ধি আর হবে কত"—বলিয়া ঘন ঘন ভাতে কাটি দিতে লাগিল।

নারিকেল খণ্ড চিবাইতে চিবাইতে কেষ্ট মন্থন গমনে গোয়াল ঘরের দিকে চলিল।

কেষ্টকে দেখিয়া উভয় দলের উৎসাহ মাত্রা ছাপাইয়া গেল। শ্যামলী গা চাটিবার জন্য জিহ্বা বাহির করিল, এবং ধবলী গুঁতাইবার ভঙ্গীতে শিং নামাইল।

সহসা উভয় দলে স্তম্ভিত হইয়া দেখিল—কেষ্টর করে পাচনী।

পাচন বাড়ির অদ্ভুত প্রভাব দেখিয়া কেষ্ট একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল এবং শ্যামলী ধবলী সকলের পিঠে পরম কুতুহলে নির্ব্বিচারে ঘা কতক কসিয়া বসাইয়া দিল।

ফলে কোলাহল দ্বিগুণ হইয়া উঠিল।

এমন সময় গয়লা ঘরে ফিরিল। আজ মনটা তাহার ছিল ভাল। অনেক দিনের অনাদায়ী টাকা সুদে আসলে উসুল হইয়া আসিয়াছে। বলাই ঘোষের নামে সে ফৌজদুরী মোকর্দ্দমা করিয়াছিল। জজসাহেব ঘোষের পোকেও শ্রীঘরে ঠেলিয়া দিয়াছেন একেবারে তিনটি বছর। আজ তার বড় আনন্দ।

গোপরাজ গোয়াল ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—"আহা মাচ্ছিস্ কেন রে কেষ্ট,—অবলা জন্তু, কেষ্টের জীব! দড়ী একটু খাটো করে বেঁধে দে—গুঁতোতে পারবে না। আর দে—খড়ের সঙ্গে চাড্ডি বেশী করে খোল মেখে দে। একটু তোয়াজ না হ'লে কি খেতে পারে।

গোয়ালার মিষ্টি মিষ্টি কথায় শ্যামলীর চোকে জল আসিল। গোল গোল ডাব ডেবে চক্ষু দুটি তুলিয়া, অত্যন্ত করুণ দৃষ্টিতে গয়লার মুখের পানে তাকাইয়া অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল।

ধবলীর দল মুখ নীচু করিয়া গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া মনে মনে পাচন বাড়ী সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিবার কল্পনা করিল।

বাপের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, কেষ্ট ভুষির সঙ্গে চাড্ডি খোল মিশাইয়া দিল।

একটী গরু শুধু ঐ আন্দোলনে যোগ দেয় নাই। সে গরুদের মধ্যে আধ্যাত্মিক। যখন চেঁচাইতে ছিল, সেই গো ব্রাহ্মণ তখন গো লোকের কথা স্মরণ

করিয়া নিমীলিত রোমন্থন করিতেছিল। সেই অদ্ভুত আত্মজ্ঞানের বিকাশ দেখিয়া গোয়ালা বলিল,—"আচ্ছা বেঁচে থাক্।"

দড়ী ছোট হইয়াছিল, কিন্তু ঘাস এবং জাবের প্রাত্যহিক বরাদ্দ বাড়িয়াছিল কিনা, ইতিহাস সে সম্বন্ধে নীরব।

বিদ্বান জামাই।

জামাই বাবু এম্-এস্ সি পড়েন। নূতন বিবাহ হইয়াছে। পূজার ছুটিতে নৌকা করিয়া শ্বশুরবাড়ী যাইতেছেন।

পার হইতে হইতে মাঝি, জামাই বাবুকে বলিল,—"পশ্চিম দিকে একখানা কালো মেঘ উঠেছে—দেখেছেন বাবু!"

জামাই বাবু মাঝির অজ্ঞতা দেখিয়া সুগভীর এক নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,—"বাপু, ঐ যে কথাগুলো বল্লে—, সমস্তই ভুল। কোনও বর্ণ না থাকলেই তাকে কালো বলে। কাল মেঘ হয় না। আর মেঘ উঠেছে বলাও ভুল। মেঘ উঠেও না, পড়েও না। বাতাসে শুধু ঘুরে বেড়ায়।—হায়, হায় তুমি এসব কথা জান না। তোমার তো জীবনের দেখছি—আট আনাই নষ্ট হয়েছে।"

মাঝি একটু হাসিয়া কহিল,—"আমরা জেলের ছেলে—মুখ্যু মনিষ্যি—ও সব কথা কেমন কোরে জান্ব মশাই! সব লোকে যা' বলে—আমরাও তাই বলে থাকি।"

জামাই বাবু বিষম বিমর্ষ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"যে দেশের লোক বিজ্ঞানের গোড়াকার কথাই জানে না, সে দেশের কি আর উন্নতি হয়?"

এমন সময় নৌকা নদীর মাঝামাঝি আসিল। জামাই বাবু একটু দুঃখিত স্বরে মাঝিকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা মাঝি, তোমরা লোকের কথা শুনে কথা কও কেন? নিজেদের মাথা আছে—হাত পা আছে, সে সব খাটাতে জান না?"

মাঝি একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল,—"হাত পা খাটাতে জানিনে তো মশাই নৌকা চল্‌চে কেমন কোরে?"

জামাই বাবু এই কথা শুনিয়া আরও অবাক্ হইয়া গেলেন। স্বাধীন-চিন্ত জিনিষটাকে তিনি অমন সাদা বাঙ্গালায় বলিবার চেষ্টা করিলেন,—তাহা কিন্তু মাঝি বুঝিল না। তিনি তখন চটিয়া বলিলেন,—"চেখ, তোমার বার আনা জীবনই মাটি হয়েছে!"

এমন সময় সহসা ঝড় উঠিল—নৌকা আর রাখা যায় না। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া মাঝি জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া জামাই বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু, সাঁতার জানেন তো?"

জামাই বাবু ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—"দোহাই তোমার! রক্ষে কর! সাঁতার-টাতার আমি কিছু জানি নে।"

মাঝি সাঁতার দিতে দিতে কহিল,—"বাবু, আমার জীবনের তো বার আনা বাদ দিয়েছিলেন,—কিন্তু আপনার জীবনের যে ষোল আনাই এখন বাদ পড়ে!"

—o—

বর্ত্তমান বাঙ্গালী চরিত।

১। নেতা কে?—যে লোক কেবল চলিতে বলে, কিন্তু নিজে এক পা চলে না।

২। দেশ-হিতৈষী কে?—যে ব্যক্তি গানে ও বক্তৃতায় স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য রোদন করে, কিন্তু ঘরে গিয়া ভাই-ভগ্নীকে চিনিতে পারে না,—পিতা-মাতাকে অন্ন দেয় না।

৩। সমাজ সংস্কারক কে?—যে ব্যক্তি নিজের ঘরটিকে বাদ দিয়া অপরের ঘরের বিধবার বিবাহ দিতে চায়—জাতিভেদ উঠাইয়া দিতে বলে।

৪। ত্যাগী কে?—যে ব্যক্তি ত্যাগ স্বীকারের জন্য পরকে উপদেশ দেয়, অথচ নিজের বেলায় এক পয়সা মা-বাপ।

৫। তেজস্বী কে?—যে ব্যক্তি বড় লোকের কাছে জুজু, কিন্তু গরীবের কাছে নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী।

৬। বড়লোক কে?—যে ব্যক্তি গরীবের রক্ত শোষণ করিয়া আপন অভ্যুদয়ের সোপান নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

৭। সুলেখক কে?—যাহারা স্কুল-বুক লেখে।

৮। কবি কে?—যাহার কবিতায় বুঝিবার কিছু থাকে না,—থাকে শুধু গন্ধ।

৯। ঔপন্যাসিক কে?—বিলাতী গল্পের প্লট গ্রহণ করিয়া স্বদেশী পরিচ্ছদে যে, তাহা প্রকাশ করে।

১০। নাট্যকার কে?—কথোপকথন ছলে ছাই-ভস্ম লিখিয়া যিনি থিয়েটারের ম্যানেজারের পায়ে তৈল মর্দ্দন করেন।

১১। বিদ্বান কে?—বিলাতী লেখকদের মুখস্থ করা বুলি যিনি সময়ে অসময়ে কপ্‌চাইয়া থাকেন।

১২। বড় কবিরাজ কে?—যাঁহার ভুঁড়ি ও টিকি খুব বড়।

১৩। বড় ডাক্তার কে?—যাঁহার মোটর আছে ও যাঁহার দর্শনী বেশী।

১৪। সত্যবাদী কে?—উকীল, এটর্ণী ও ব্যারিষ্টার।

১৫। কর্ত্তব্য পরায়ণ কে?—মিউনিসিপালিটির লোক।

১৬। প্রবীণ কে?—যে ছোক্‌রা দাড়ী গোঁফ কামাইয়া থান্ কাপড় পরে এবং নস্য লয়।

১৭। স্বদেশের কাজ করিতেছেন কাহারা?—যাঁহারা যখন তখন স্বদেশী ফণ্ড খুলিয়া থাকেন।

—•—

আবাহন।

লেখক,—শ্রীযুক্ত জীবঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আজি শারদ উষার প্রভাতে
মনমুগ্ধ মন্দ মারুতে,
তব অমল কমল পদেতে
আজি বঙ্গরাণি মা নমি গো। ১
আজি গুঞ্জরি অলি বিহরে
আজি বহিছে সমীর সুধীরে,

আজি যাথি যুঁথি বেলা শিহরে'
ঢালে চরণে অর্ঘ্য রাশি গো ॥ ২
আজি জড়তা গিয়াছে ছুটিয়া
আজি দুঃখ গিয়াছে ঘুচিয়া,
আজি সবে একসাথে মিলিয়া
তব পদ-পঙ্কজে নমি গো। ৩
আজি সুপ্ত বাঙ্গালী জেগেছে
তব স্নেহের পদ পরশ পাইয়া,
প্রাণে প্রীতির উৎ ঝরিছে
বুঝি তব কৃপাবলে দেবী গো ॥ ৪
তবে উঠ দেখি ভাই বাঙ্গালী
তব কর্ম্ম রাশিরে ফেলিয়া,
দেখ মা যে আজি তব দুয়ারে
এবে মিছে কাজ কি যে সাজে গো। ৫
হৃদি নিভৃত নিলয় মাঝারে
আজি হৈম আসন পাতিয়া,
লহ ভকতি অরঘ সাজায়ে
দেহ মাতৃ চরণে ঢালি গো ॥ ৬
আজি এসেছি সাজায়ে যতনে
ভরি মানস কুসুমে ডালিটী,
আজি সাজাব ও রাঙ্গা চরণ
মম হৃদয় শোণিত ঢালি গো। ৭
মম মঙ্গলময়ী দেবি গো
আমি কি দিয়া পূজি মা তোরে,
মোর যা কিছু সকলি দিয়াছি
এবে নয়ন বারিতে বরি গো ॥ ৮

সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার

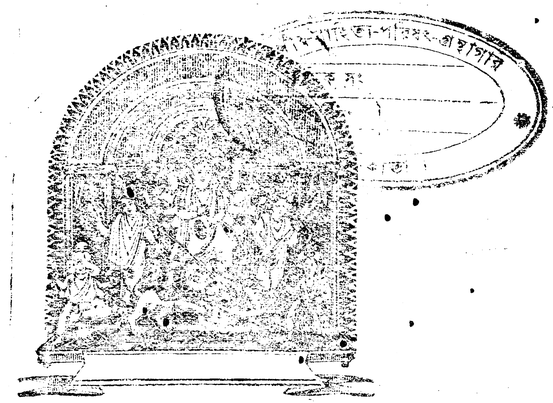

জন্মভূমি

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

২৮শ, বর্ষ। ১৩২৯ সাল, আশ্বিন। ৬ষ্ঠ, সংখ্যা।

আগমনী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,

মা আসিতেছেন। তাই মা-হারা ছেলে আমোদে আটখানা হইয়াছে। আবার গালভোরা, বুকভরা মা নামে ডাকিতে পারিবে, আবার মায়ের কাছে দাঁড়াইয়া মায়ের মুখখানি নয়ন ভরিয়া দেখিতে পারিবে, আবার মায়ের প্রসাদ খাইবে, আবার ব্যথার কথা—অভিমানের কথা মায়ের কাছে বলিতে পারিবে—মায়ের কোলে মুখখানি লুকাইয়া কাঁদিতে পারিবে; তাই কত সুখে, কত আশায়, কত ভরসায় মা-হারা ছেলে মায়ের আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছে।

মা—এমন মধুর নাম কি আর আছে? মা বলিলে পাপ-তাপ থাকে না। মার মতন মধুময় সম্বন্ধ আর আছে কি? মা বলিলে প্রাণ জুড়ায়, সংসারের সকল জ্বালা দূর হয়। যাঁহাকে মা বলিয়া ডাকি, তাঁহাকে যেন ষোল আনা

আজি যাথি যূথি বেলা শিহরে'
ঢালে চরণে অর্ঘ্য রাণি গো ॥ ২
আজি জড়তা গিয়াছে ছুটিয়া
আজি দুঃখ গিয়াছে ঘুচিয়া,
আজি সবে একসাথে মিলিয়া
তব পদ-পঙ্কজে নমি গো। ৩
আজি সুপ্ত বাঙ্গালী জেগেছে
তব স্নেহের পদ পরশ পাইয়া,
প্রাণে প্রীতির উৎ ঝরিছে
বুঝি তব কৃপাবলে দেবী গো ॥ ৪
তবে উঠ দেখি ভাই বাঙ্গালী
তব কর্ম্ম রাশিরে ফেলিয়া,
দেখ মা যে আজি তব দুয়ারে
এবে মিছে কাজ কি যে সাজে গো
হৃদি নিভৃত নিলয় মাঝারে
আজি হৈম আসন পাতিয়া,
লহ ভকতি অরঘ সাজায়ে
দেহ মাতৃ চরণে ঢালি গো ॥ ৬
আজি এসেছি সাজায়ে যতনে
ভরি মানস কুসুমে ডালিটী,
আজি সাজাব ও রাঙ্গা চরণ
মম হৃদয় শোণিত ঢালি গো। ৭
মম মঙ্গলময়ী দেবি গো
আমি কি দিয়া পূজি মা তোরে,
মোর যা কিছু সকলি দিয়াছি
এবে নয়ন বারিতে বরি গো ॥ ৮

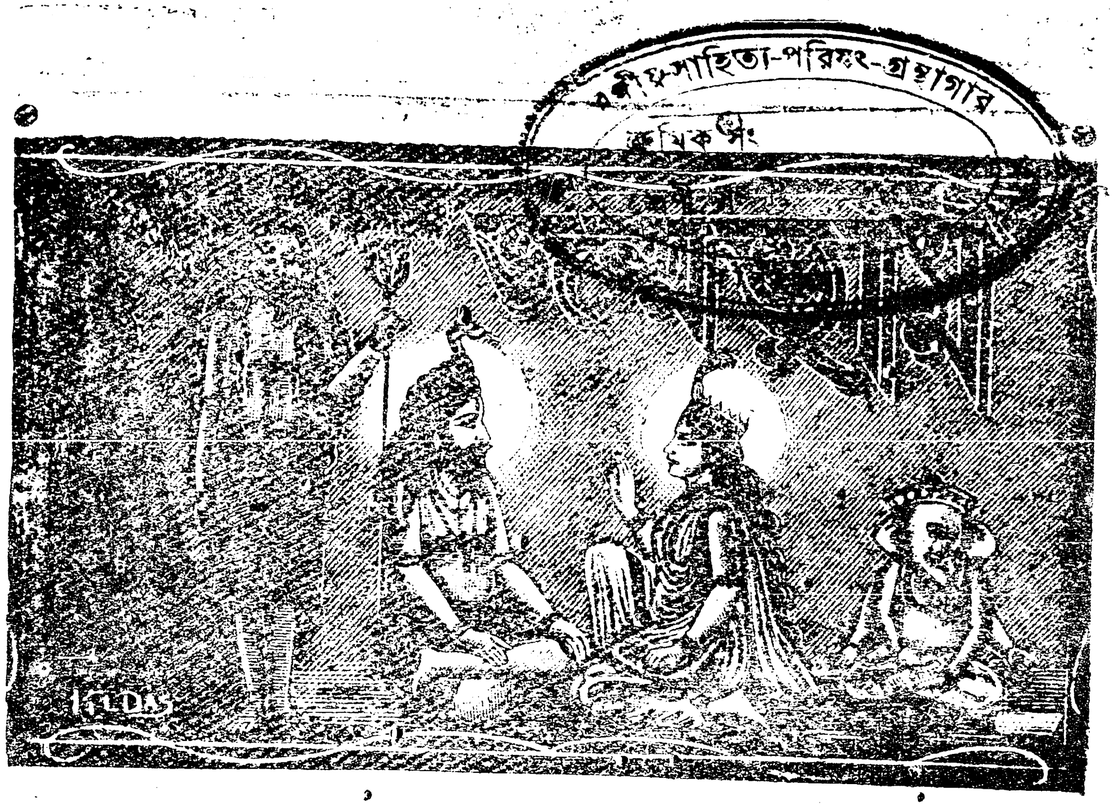

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

২৮শ, বর্ষ। ১৩২৯ সাল, কার্ত্তিক। ৭ম, সংখ্যা।

বিজয়ার অভিবাদন।

জন্মভূমির গ্রাহক, অনুগ্রাহক, লেখক, গুরুজন, স্বজন-পরিজন বান্ধব সকলকেই আমরা শ্রীশ্রী৺বিজয়ার প্রণাম, নমস্কার, অভিবাদন, আলিঙ্গন করিতেছি। তাঁহাদেরই শুভ আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া আবার আমরা জননী জন্মভূমির সেবায় নিযুক্ত হইলাম।

বিজয়ার প্রীতিসম্ভাষণ, বড় মধুর ও প্রীতি-প্রদ। তাহারই বিকাশ সাদরালিঙ্গন (কোলাকুলি)। মহাপূজা সমাপন হইলে, সর্ব্বত্র জয়লাভ হয়। এমন কি, যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক পূজার কার্য্য সমাধা করিয়াছেন, তাঁহারা বহু দিনের শত্রুতা ভুলিয়া শত্রুর সহিতও কোলাকুলি করিয়া থাকেন। কেনই বা না হইবে, পঞ্চদশ দিন ব্রতপক্ষে সংযম করিয়া চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়াছে। অনন্তর

পিতৃপক্ষে পঞ্চদশ দিন শুদ্ধাচারে ভীষ্মাদি মহাপুরুষের তর্পণান্তর প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ বা দেবীপক্ষ। এই কাল হইতেই বিজয়ার সূচনা।

মহাদেবীর মহাপূজা ভক্তিপূর্ব্বক আরম্ভ না করিলে কি সর্ব্বত্র বিজয়লাভের সূচনা হয়? বিজয়াদশমী হইতে সংবৎসরকাল জয়যুক্ত হইয়া সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

অনেকে দেবীবিসর্জ্জনকে বিজয়া বলেন, সেটি ভুল। চিত্তপটে অঙ্কিত দেবী মূর্ত্তির আর বিসর্জ্জন হইবার নহে! বিসর্জ্জন হয়—মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঘট ও প্রতিমা এবং শিরোধারণ পূর্ব্বক নির্ম্মাল্যেরও বটে। এই প্রতিমা বিসর্জ্জন মনুষ্যদিগের পক্ষে পাল্টা উত্তর দেওয়াও বলিতে পারা যায়। চৌরাশী লক্ষ জন্ম আমাদিগকে তৃণ, বৃক্ষ, জলজন্তু, খেচর এবং পশু ও মনুষ্য প্রভৃতি প্রতিমাতে (উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ, জরায়ুজ প্রভৃতি দেহতে) মূল প্রকৃতি (আদ্যাশক্তি) আমাদিগকে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া দেহোপযোগী নানা ভোগে তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক সেই সেই প্রতিমার বিসর্জ্জন বা মৃত্যু সংঘটিত করিয়াছেন। এই প্রকারে অসংখ্য বার আমরা তাঁহার ক্রীড়ার পুতুল সাজিয়াছি। এখন আমরা দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়া সেই আদ্যাশক্তি ভগবতীর প্রতিমা গঠনানন্তর প্রাণপ্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক ভোগরাগ সহকারে পূজা সমাপন করিয়া প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতেছি।

ভাই সাধক! মনে বুঝিয়া দেখ দেখি, ইহা আমাদেরও কি পাল্টা জবাব দেওয়া নহে? তাই সাধকশ্রেষ্ঠ ভক্তি মন্দাকিনীর রাজহংস রামপ্রসাদ উচ্চ কণ্ঠে গাহিয়াছেন :—

"মায়ের মূর্ত্তি গড়াতে চাই, মনের ভ্রমে মাটী দিয়ে।
মা বেটী কি মাটীর মেয়ে, মিছে খাটী মাটী নিয়ে॥
করে অসি মুণ্ডমালা, শ্যামাটী কি মাটীর বালা?
মাটীতে কি মনের জ্বালা দিতে পারে নিভাইয়ে॥
শুনেছি মার বরণ কালো, সে কালোতে ভুবন আলো,
মায়ের মত হয় কি কালো, মাটীতে রং মাখাইয়ে॥
মায়ের আছে তিনটী নয়ন, চন্দ্র সূর্য্য আর হুতাশন—
কোন্ কারিকর আছে এমন, দিবে একটী নিরমিয়ে॥
অশিবনাশিনী কালী সে কি মাটী খড় বিচালি?
কে ঘুচাবে মনের কালী, প্রসাদে কালী দেখাইয়ে॥"

মনের ভ্রমে যাহা করা যায়, তাহা ছেলে খেলা ব্যতীত আর কিছুই নহে॥

সে খেলাত আমরা মহামায়ার নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছি; তবে ৮৩,৯০,৯৯৯ তিরাশী লক্ষ নব্বই হাজার নয়শত নিরানব্বই বার জন্মের পরে, কেবল মনুষ্য জন্মে এই অধিকার লাভ করিয়াছি।

এই যে লক্ষ লক্ষ বার মহামায়ার মায়াতে অভিভূত হইয়া, সং সাজিয়া কত রঙ্গ দেখাইয়াছি এবং এখনও দেখিতেছি। তথাপি কি আমরা মায়াকে ভয় করিব? আমরা তেমন মায়ের ছেলে নহি :—

মহামায়ার দেখে মায়া, ভয় করে কি আমার মন!
মায়াতে লইয়ে জন্ম, মায়ার ভয় কি কারণ।
জলচর জলে থাকে, জলে হয় তার দেহ সৃজন।
জলে তুফান হলে পরে, সে কি করে পলায়ন॥
বিষে জন্ম বিষকীট, বিষে করে দেহ ধারণ,
কে কোথায় দেখেছ বল, বিষের জ্বালায় তার মরণ,
যে চরণ ভুলে শিব, সেই চরণে হও মগন।
কালিদাসের মন যদি হও ছেড়োনাকো ঐ চরণ॥

শিব যে চরণে লুণ্ঠিত হইয়া মঙ্গলময়, আমরাই বা সে চরণ পরিত্যাগ করিব কেন?

মহামায়ার মহাপূজা সমাপন করিয়া আজ, জগৎ প্রফুল্ল। তাই সকলে মিলিত হইয়া শান্তি-জল গ্রহণান্তে কোলাকুলি। সর্ব্বত্র সিদ্ধিলাভ হইবে বলিয়া সিদ্ধি পান ও মিষ্টান্নাদি ভোজন করিয়া কতই আনন্দ। এরূপ আনন্দলাভ কি আর কোন উৎসবে হইয়া থাকে?

বিশ্বজননীর পূজা সমাপনান্তে যে সর্ব্বত্র বিজয় লাভ হইবে। মাতৃভাব অনুপ্রাণিত না হইলে ত আর বিজয়লাভ হয় না। ভগবান্ রামচন্দ্র মাতৃভাবে আদ্যাশক্তির পূজা করিয়া ত্রিভুবনবিজয়ী রাবণকে নিহত করিয়াছিলেন। মাতৃভাব যে সকল ভাবের উপর, ইহা কাহারও অবিদিত নহে। জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত মাতৃভাব হৃদয়ে গাঁথা থাকে, সে জন্য যে কোন ক্লেশ উপস্থিত হইলে মর্ম্মস্পর্শী "মা" শব্দ উচ্চারিত হইয়া থাকে।

পিতৃভাব, ভ্রাতৃভাব প্রাণপ্রতিম বন্ধুভাব, কেহ না দেখিয়াছেন, কাহারও বা ভাগ্যে দর্শন হয় নাই। কিন্তু গর্ভস্থ জীবের চৈতন্যোদয় হইবামাত্র মাতৃভাবের উপলব্ধি হয়।

পাঠক! চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি? জীব যখন মাতৃগর্ভে অবস্থিতি করে, তখন কি শীতোষ্ণ বর্ষার কষ্ট অনুভব করিয়া থাকে? এবং তখন কি তাহাকে খাদ্য সংগ্রহের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে হয়? সেখানে কি জীবকে আশায় আশ্বস্ত হইয়া নানা কার্য্যে বিব্রত হইতে হয়? কিংবা কামাদিরিপু কি তাহাকে উৎপীড়ন করিতে পারে? গর্ভস্থ জীবের যখন সংসার দেখিবার বাসনা জন্মিল, অমনি ভূতলে পতিত হইয়াই চিরজীবনের জন্য ক্রন্দনের রোল তুলিল। কিন্তু মায়ের দয়া এতই প্রবলা যে, উদর হইতে নিপতিত সেই অবশ দেহ শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া স্তনপান করাইতে লাগিলেন।

হায়! এ মমতা কি আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়? যাহাকে পরিত্যাগ করিলেও যিনি ছাড়িতে চাহেন না। তাই বলিতেছিলাম যে, আমরা আশৈশব মাতৃভাবে অনুপ্রাণিত। তবে আর সমস্ত জগতের মূলীভূত কারণকে মাতৃভাব ব্যতীত অন্য ভাবেই বা ভাবিব কেন?

আমরা হইগো মায়ের ছেলে, বাবার কোন ধার ধারি না।
বন্ধ্যাজনের হ'লে ছেলে, সে ছেলে কারে মানে না॥
প্রলয়েতে বন্ধ্যামাতা, পরেতে হয় সত্য ত্রেতা।
বুঝিয়ে সে মায়ের কথা, মা বই কিছু বলি না॥
দ্বন্দ্ব হ'লে মাতাপিতায় ছেলে তখন মাতাকে চায়,
তাই মন সপেছি মাতায়, মা বই কিছু জানি না॥
বাবা পড়ে মায়ের পায়, মা ছেড়ে কে বাবা পায়,
মর্ম্ম বুঝে তত্ত্ব কথায়, কালিদাস তাই মা ছাড়ে না।

চণ্ডীতেও আছে :—

"স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলাঃ জগৎসু"

সমস্ত স্ত্রীজাতি মহামায়ার স্বরূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এ মাতৃভাব কি ভুলিতে পারা যায়! না এই ভাবের বিসর্জ্জন হইতে পারে? তাই বলিতেছিলাম, বিজয়া বিসর্জ্জন নহে, ইহা মহাপূজার মহাফল জয়লাভ। এই জয়লাভ ব্যতীত দুস্তর ভব সংসারে কি বিচরণ করিতে পারা যায়?*

* বৈদ্যরত্ন কবিরাজ স্বর্গীয় কালিদাস বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিত।

বর্ষা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ বি, এ,

বসন্ত ঋতু—সম্রাট, বর্ষা—দীন দরিদ্র প্রজা। সম্রাটের স্তুতিগান করিলে কবিত্ব ও কৃতিত্বের দাবী করা যায়; তাই ঋতু-সম্রাট বসন্তের গুণগান করিতে কাহাকেও অবসরের প্রতীক্ষা করিতে দেখা যায় না। দীন বর্ষার কথা কহিতে অবসরের অপেক্ষা আছে।

ঋতুরাজের রাজোচিত গুণ গরিমাই নিখিল মানবের আকর্ষণের কারণ। ভৃঙ্গের গুঞ্জন, কোকিলের কলধ্বনি প্রস্ফুটিত পুষ্পের সৌন্দর্য্য, শস্য রাশির শ্যামলতা, গ্রহগণের উজ্জ্বলতা মৃদুমন্দ সুগন্ধ পবনের সুখসঞ্চার, প্রত্যেকটীই মাদকতাপূর্ণ। আর বর্ষার ভেকধ্বনি, জলভারশীর্ণ কুসুমের মলিনচ্ছবি, কর্দ্দমের বহুলতা, নিষ্প্রভ দিবস, ঘোর তমসাচ্ছন্ন যামিনী, শীকরবাহী ঝঞ্ঝাবাত, কোনটাই ত মানবের চিত্ত আপ্যায়িত করিতে পারে না। ঋতুরাজের রাজ্যে যিনিই প্রবেশ করিবেন, তাঁহাকেই উন্মাদনা অনুভব করিতে হইবে। অকবি কবি হইবেন, কবি ভাবমদিরায় বিভোর হইয়া যাইবেন। ঋতুরাজের শুধু সাক্ষাৎকার নহে, তাঁহার চিন্তা করিলেও সুখের অনুভূতি হইবে—এমন গুণীর পানে কাহার অবসর না আসে?

বর্ষার দিকে চাহিতে হইলেই দৃষ্টিতে করুণা মাখাইতে হইবে। সে যে দীন প্রজা—তাহার প্রভাব নাই—প্রতিপত্তি নাই—জানে শুধু আত্মত্যাগ। সম্রাটের নিকটেও তাহার যাইবার শক্তি নাই। ঋতু-সম্রাটের উভয় পার্শ্বেই দুইটী প্রবল প্রহরী নিযুক্ত আছে। একটী শীত, অপরটী গ্রীষ্ম। শীতের দিক্ দিয়া বর্ষা যখন সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়—তখন তাহার অগ্রসর হইবার উপায় থাকে না—তয়ে জমাট বাঁধিয়া যায়। গ্রীষ্মের প্রতাপও কম নহে। তাহার কাছেও বর্ষার বিড়ম্বনা খুবই। কখনও ফুৎকারে উড়াইয়া দেয়, কখনও উত্তাপে শুষ্ক করিয়া দেয়। কাজেই বর্ষা এতই ঋতুরাজের ব্যবধানে যে, উভয়ের মিলন একপ্রকার অসম্ভব।

ঋতুরাজের রাজধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ আছে। শুধু ভৃঙ্গ-কোকিলের সঙ্গীত আর পুষ্প-রাশির সাজসজ্জা লইয়াই যে তিনি নিশ্চিন্ত তাহা নহে—ভাণ্ডারে শস্যরাশি

সঞ্চিত। প্রহরী শীত আপনার প্রয়োজন মত শস্যটুকু গ্রহণ করিয়া রাজকোষে জমা দেন ও আপনার উদারতা প্রকাশ করেন—গ্রীষ্ম মহোদয়ও রাজপ্রসাদের অবশেষটুকু ব্যবহার করিয়া থাকেন। দীন প্রজা বর্ষা কাজে কাজেই চিরদিন নিরন্ন। সে নিজের দেহ-পাত করিয়া আপনার মুখের গ্রাসটুকু ফেলিয়া রাখিয়া কোনরূপে তার ভবিষ্যৎ সফলতায় মণ্ডিত করিতে চাহে—কিন্তু এমনই কঠোর বিধি কৌশল—যে সকল ভবিষ্যৎ ভোগ করিবার একমাত্র অধিকারী সম্রাট ঋতুরাজ, আর তাঁরই অনুগৃহীত পার্শ্বচর বর্গ। বর্ষার মত এমন ভাগ্যহীন (ভারত ব্যতীত) আর কে আছে? তাই তার কথা উঠিলেই অবসরের অপেক্ষা আসিয়া পড়ে। দুঃখীর কথা কহিতে চাহে কে?

আহা! বর্ষা বড় দীন দরিদ্র। তাহার কিছু নাই, আছে শুধু অশ্রুধারা। মাথায় তার দুঃখের বোঝা। দুর্বহ ঘনভার মাথায় করিয়া সে চলিয়াছে। তাহার মাথার বোঝায় চন্দ্র সূর্য্য, তারকার স্নিগ্ধ আলো করা রশ্মিখানা ঢাকিয়া গিয়াছে। চক্ষে তার অন্ধকার—চতুর্দ্দিকে শুধু আঁধারের ঘটা। ঘাটে মাঠে বনে গৃহের প্রাঙ্গণে যেখানে সে দাঁড়াইয়াছে, আহা! তার চক্ষের জলে সব ভিজিয়া গিয়াছে।

দীন দরিদ্র হইলেই বুঝি ঘৃণার পাত্র হইতে হয়? তাই বর্ষা বড় ঘৃণ্য অন্যের অস্পৃশ্য। ধনীর গৃহদ্বারে বর্ষা উপস্থিত; পাছে একটু দেউড়িতে বসে, তাই দেউড়ির সম্মুখভাগ পর্দ্দায় আঁটা। ছাদে উঠিয়া সারাদিন কাঁদিলেও গৃহমধ্যে প্রবেশ-অধিকার পায় না। সে এমনই অস্পৃশ্য যে জনমানব বাটীর বাহির হইতে চায় না। যদি বা বাহির হয়, এমনই সাজসজ্জা যেন বর্ষার সঙ্গে লড়াই করিতে চাহে! এই ত গেল ভদ্রলোকের ব্যবহার! তবু, চাষারা সারাদিন বর্ষার সঙ্গে কাটায়। বর্ষা তখন আর অভিমান চাপিয়া রাখিয়া পারে না। সেই চাষা সঙ্গীদের কাছে কত অভিমান জানাইয়া সমবেদনার সহিত অজস্র অশ্রু বর্ষণ করে। কিন্তু বর্ষার এমনই অভাগ্য—সেই সঙ্গীরাই যখন আবার আপনাদের গৃহে গমন করে তখন বর্ষার কথা মনেও করে না। তাহারা গৃহে যাইয়া পরিবার বর্গের সহিত একত্র মিলিয়া কেহ গৃহকোণে কেহ চুল্লীপৃষ্ঠে বসিয়া কত আনন্দে কাল যাপন করে—বর্ষার কথা একবার স্মরণ করে না। বর্ষা অনেক অনুসন্ধান করিয়া চালাঘরের ছিদ্রপথ দিয়া সেই আদরের সঙ্গীদের কাছে কোনরূপে উপস্থিত হইল ও অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিল—সঙ্গিগণ অমনি সেস্থান হইতে পলায়ন করিল। বর্ষা যদি

পুনরায় তাহাদের কাছে কখনও যায়, তখন সহচরবর্গ যেন ক্রোধে ও ক্ষোভে বর্ষার আগমন পথ একেবারে রুদ্ধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে। আর কাহার কথা বলিব?

কি কঠোর শাসন! বর্ষার দুঃখের বোঝা—ঘোর ঘনভার একটু এদিক্ ওদিক্ করিবার অধিকার নাই। করিয়াছ কি—বিকট ভৎর্সনা, তীব্র কশাঘাত। সে কশাঘাতে জগৎ চমকাইয়া উঠে।

এত দুঃখ সহিয়া সহিয়া বর্ষা কতদিন থাকিতে পারে? সে যে কাঁদিয়া কাঁদিয়াই গলিয়া যায়। বর্ষার কথা কেহ ভাবিবে কি? সকরুণ দৃষ্টিতে তাহার প্রতি কেহ চাহিবে কি?

কালিদাসের দুষ্মন্ত বর্ষার দিকে চাহে নাই বটে—কিন্তু শাপভ্রষ্ট মহিমা দীন যক্ষ বড় সাগ্রহনেত্রে তাহাকে দেখিয়াছিল—সাদরে আহ্বান করিয়াছিল। আর রমণীজনসুলভ মুখের মৃদু তিরস্কার ও অন্তরের আকাঙ্ক্ষার সহিত বর্ষা মাথায় করিয়া বিরহিণী বসন্তসেনাও একদিন চারুদত্তের বিরহ-কাতর পূর্ণ চিত্ত জুড়াইতে শোভাযাত্রায় বহির্গত হইয়াছিল। আর মনে পড়ে—বাল্মীকির সেই আদর্শ চরিত্র ত্রেতাবতার শ্রীরামচন্দ্রকে। তিনি আদর্শ সম্রাট ছিলেন, তিনি প্রজার প্রাণ ছিলেন—তিনি তুচ্ছ রাজসুখ পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র ভূমণ্ডলের দুর্ব্বহ ভারহরণের জন্য দীনবেশ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন—তাই দীন বর্ষার সহিত তাঁহার হৃদয়ও সমস্বরে বাজিয়াছিল। কি সমবেদনা!

এষা বর্ষপরিক্লিষ্টা নববারিপরিপ্লুতা।
শীতেন শোকসন্তপ্তা মহী বাষ্পং বিমুঞ্চতি॥
কশাভিরিব হৈমীভির্বিদ্যুদ্ভিরভিতাড়িতম্।
অন্তস্তনিতনির্ঘোষং সবেদনমিবাম্বরম্॥
নীলমেঘাশ্রিতা বিদ্যুৎ স্ফুরন্তী প্রতিভাতি মে।
স্ফুরন্তী রাবণস্যাঙ্কে বৈদেহীব তপস্বিনী॥
অহন্ত হৃতদারশ্চ রাজ্যাশ্চ মহতশ্চ্যুতঃ।
নদীকূলমিব ক্লিন্নমবসীদামি লক্ষ্মণ॥

যুগে যুগে দীন বর্ষা মহতের সমবেদনা পাইয়া আসিয়াছে—যুগে যুগে বর্ষার গুণগ্রাহী ভারত অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই বর্ষা ধন্য হইয়াছে, তাহাতেই তাহার আত্মত্যাগ সার্থক হইয়াছে। আজ স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া কেহ দরিদ্র প্রজারূপী বর্ষার দিকে না চাহিতে পারে, তাহাতেও বর্ষা আপনার প্রকৃতি পরিত্যাগ করিবে না। বর্ষা দীন হইলে মহান্—ইহা বিশ্বজগতে বিদিত।

সাধক-কমলাকান্ত।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কেণারাম কহিতে লাগিলেন, "ভবের হাটে এসে আমি মূল হারাইতে বসিয়াছি, আর কেনা বেচা কতদিন চলিবে, পূর্ব্বধন সব ফুরাইয়া আসিল, পরকালের সম্বল কিছু মাত্র করি নাই, করিতেও পারিতেছি না। আপনি সকল আশায় ছাই দিয়া মহাধনের অনুসন্ধান করিতে বলিতেছেন, কিন্তু হায় হায়! আমার যতদিন যাইতেছে, তত আশালতা বাড়িতেছে, মনকে জড়ীভূত করিতেছে, সে আশালতা ছিঁড়িবার শক্তি, আপনাকেই দিতে হইবে, সে লতার মূলচ্ছেদের উপায় আপথাকেই বলিয়া দিতে হইবে।" বিশু কেণারামকে কহিল, "দাদা ঠাকুর! তুমি পরকালের জন্য ভাবছ, তা হলে আমার কি গতি হবে। তোমার গা খোলোসা, আমার যে পাপের বোঝা মাথায়। ঠাকুরের পেছু পেছু যাবার শক্তি নাই, ঠাকুরকে আমার পাপের বোঝাটী নিতে হবে, না হলে আমি কিছুতে ছাড়্‌ব না।" সাধক নির্দ্দোষ হাস্য পরিহাসপ্রিয় ছিলেন, কেণারামের আসিবার পূর্ব্বে বিশুর সহিত একান্তে বসিয়া বালকের ন্যায় নানা কথায় হাস্য পরিহাস করিতেছিলেন, এখন বিশুর এই কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বিশুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বিশু! তোমার মাথার বড় বোঝাটী কি শেষে এই রোগা বামুণের ঘাড়ে ফেলিয়া দিবে এই মতলব ঠিক করিয়াছ? বোঝাটা তুমি নিজে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতে পারিবে না।" বিশু কহিল, "ঠাকুর! তুমি শক্তি দিলেই পার্ব্বো, বুঝেছি সে শক্তি দেবার কর্ত্তা তুমি।" সাধক কহিলেন, "শক্তি দিবার কর্ত্তা আমি নয়, শক্তি উপার্জ্জন করিবার কর্ত্তা তুমি, তোমার মন, তোমার আত্মা, এ সব কথা তুমি এখন বেশ বুঝিতে পারিবে না, তুমি যার ভাবনা ভাবিতেছ, তাঁহাকেই নিতান্ত আশ্রয় কর, তিনিই তোমার পাপের বোঝা লইবেন, কালীনাম রসায়নে তোমার হৃদয়ের সমুদয় কলুষ কাটিয়া যাইবে, তুমি নির্ম্মল হইবে।" সাধক কেণারামকে কহিলেন, "ভাই! তুমি সংসারী হইয়াও সন্ন্যাসী। সংসারে অবস্থান করিয়া যাহা না করিলে প্রত্যবায় আছে, দেখিতেছি, তাহাই তুমি করিয়া থাক। তোমার সরস প্রাণে মায়ার বন্ধন শিথিল

অবলোকন করিতেছি। তোমার সংসারে আসক্তি পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় বোধ হইতেছে। আমি তোমাকে অনেক দূর অগ্রসর দেখিতেছি, আমি তোমাকে সর্ব্বদা ব্যাকুল দেখিতেছি। এই ব্যাকুলতাই তোমার পরকালের দুর্গমপথের যষ্টি স্বরূপ।" কেণারাম কহিলেন, "এই সংসারের জন্য সিদ্ধেশ্বরীর নির্জ্জন সাধনার সময় পাই না। আমি ক্রিয়াহীন। আমি মনে করি, চিন্ময়ীকে চিত্ত হইতে তিলেক ত্যাগ করিব না, কিন্তু সংসার অনেক সময় আমাকে অন্য চিন্তায় রাখে।" সাধক কহিলেন, "যে জন চিন্তাহরা চিন্ময়ীকে চিত্ত মধ্যে রাখিয়া চলিতে পারেন, তাঁহার বাহ্য সাধনা বা ক্রিয়ার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না। জগদম্বার চরণে সর্ব্বদা মনের সন্নিবেশ হইতে ভক্তি আইসে, ভক্তি হইতে জ্ঞান আইসে, জ্ঞান হইতে ধ্যান আইসে, ধ্যান হইতে তন্ময়ভাব আইসে, তন্ময়ভাব হইতে কর্ম্মফল ত্যাগ ও কর্ম্মফল ত্যাগ হইতে চিরশান্তির লাভ হয়। "অভ্যাসাৎ জ্ঞান মুচ্যতে, জ্ঞানস্য ধ্যানং বিশিষ্যতে, ধ্যানাৎ কর্ম্মফল ত্যাগঃ, ত্যাগাচ্ছান্তি নিরন্তরং।" ইহা অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের শ্রীমুখের বাক্য নিত্য সত্য। ভক্তিযোগে সাধনা মন্দিরের মধ্যে যাইবার পথ পাইয়াছ, অক্লান্ত ভাবে ত্যাগ স্বীকার করিয়া চল, উপাস্য দেবতার দর্শন পাইবে। বাহ্য সাধনা কেবল মাত্র চিত্তশুদ্ধির জন্য। যখন চিন্ময়ীকে সর্ব্বদা চিত্ত মধ্যে ধ্যান করিতে অভ্যাস করিয়াছ, তখন বাহ্য সাধনার প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া সাধক গাহিলেন,—

যার অন্তরে জাগিল ব্রহ্মময়ী, তার বাহ্য সাধন কিছুই নয়।
অচিন্ত্য চিন্তিলে অন্য চিন্তা আর কি মনে লয়॥
যেমন কুমারী কন্যার খেলা, নানাভাবে হয়।
তাদের পতির সঙ্গে সঙ্গ হলে, সে সব খেলা কোথা রয়॥
কি দিয়া পূজিবে তাঁরে সে যে সর্ব্বতত্ত্ব ময়।
দেখ নির্গুণ কমলাকান্ত, তারেও করে গুণাশ্রয়॥

সাধক কহিলেন, "মূলাধারের নিদ্রাগত যোগমায়াকে জাগাইবার জন্য চিত্ত শুদ্ধির প্রয়োজন। চিত্তশুদ্ধির জন্য বাহ্য সাধনার প্রয়োজন। আমি দেখিতেছি, তোমার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, তোমার বাহ্য সাধনার প্রয়োজন কি? চিত্তশুদ্ধিমান ব্যক্তির বৈদিক ক্রিয়া কলাপও নিষ্প্রয়োজন। তাহার ফল পুষ্পাহরণ, নৈবেদ্যাদির চেষ্টার কিছু প্রয়োজন দেখি না। দেখ কুমারী কন্যা নানাভাবে খেলা করে, সে মাটীর সংসার পাতায়, বালির ঘর করে, উনান

পাতে, শাক পাতা লইয়া তরফারী করে নিমন্ত্রণ করে, পরিবেশন করে, পুতুলের বিবাহ দেয়, জামাই বেহাই পাতায়, কিন্তু যখন সেই কুমারীর সংসারের উপাস্য দেবতা পতির সহিত মিলন হয়, তখন উপাস্য দেবতা পতিকে হৃদয়ে স্থান দিয়া সত্যের সংসারকে অবলম্বন করে, পাতান মিথ্যার সংসার ভুলিয়া যায়, তেমনি বাহ্য সাধনা মিথ্যার সংসার, সেই বাহ্য সাধনায় চিত্তের চাঞ্চল্য দূর হইলে, জীবভাব দূরীভূত হইলে, চিন্ময়ীকে চিত্ত মধ্যে সর্ব্বদা স্থিতিভাবে রাখিতে পারিলে, আর বাহ্য সাধনার প্রয়োজন কি? বাহ্য সাধনার অঙ্গ, পূজাদি, কিন্তু কি দিয়া তাঁহার পূজা করিবে? তিনি ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম প্রভৃতি সমুদয় পদার্থ। তোমার বাহ্য সাধনা নাই বলিয়া তুমি দুঃখিত হইওনা। চিন্ময়ীকে স্থিতি ভাবে হৃদয়ে রাখিতে অভ্যাস কর. তোমাকে সকল গুণ আশ্রয় করিবে। দেখ, আমি জানি আমার কোন গুণই নাই; আমি জানি, আমি, কেবল জগদম্বার অতি শরণাগত, তাই তোমরা আমাকে গুণবান বলিতেছ। এইরূপ সদালাপে কেণারাম ও সাধকের অনেক সময় অতি বাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু কেণারামের ভাগ্যে সাধকের সহবাস সুখ সম্ভোগ বেশী দিন ঘটিল না। সাধকের অম্বিকার ধনাঢ্য শিষ্যের গৃহে কোন বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে সাধককে শীঘ্রই অম্বিকায় যাইতে হইল। অম্বিকায় যাইবার পূর্ব্বে সাধক বিশুকে গৃহে প্রত্যাগমন করিবার জন্য পুনর্ব্বার অনুরোধ করিলেন, কিন্তু, বিশু বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়া সাধকের চরণে পতিত হইল, সাধক বিশুকে সঙ্গে লইয়া অম্বিকায় যাইতে স্বীকৃত হইলেন। যাইবার পূর্ব্বে বিশু সাধককে কহিল, "ঠাকুর! আমি বেশ বদ্‌লাব, মাথা মুড়াব।" ঠাকুর কহিলেন, "বেশ বদ্‌লান শক্ত নয়, মন বদ্‌লান শক্ত, বেশ বদ্‌লান মুহূর্ত্তে হয়, কিন্তু মন বদ্‌লান হয়ত জন্মেও হয় না। বিশু গেরুয়া বসন পরিল, তাঁহার চাঁচর চুল মুড়াইল। সাধক কেণারাম ও গ্রামবাসীগণের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী বেশী বিশুর সহিত অম্বিকা যাত্রা করিলেন।

পঞ্চম অংশ।

"ঈশ্বর সাধনা কহি শোন স্থির।
একমাত্র নহে পরম যোগীর॥

পরম করম তার সদা পর-উপকার,
লোক হিত কর কার্য্যে জীবন তাহার।
ব্যয়িত হইবে বলি ত্যজে সে সংসার॥

নিবিড় নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে, পর্ব্বত গুহায় যোগ সাধনা করিয়া লোকহিতকর কার্য্যে জীবন ব্যয়িত না হইলে কোন সাধকের, কোন যোগীর চিত্তের প্রসন্নতা আইসে না। ব্যাস, বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণ তপঃসিদ্ধ হইয়াও লোক সমূহের ত্রিতাপ বিনাশের জন্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ সকল রচনা করিয়াছেন। বিশ্বামিত্র নারদাদি, ঋষিগণ মানবগণের উদ্ধারের জন্য নিজ নিজ তপস্যার অংশ প্রদান পূর্ব্বক সিদ্ধ মন্ত্র সকল প্রচার করিয়াছেন। রাজপুত্র ভগবান বুদ্ধ এই লোক শিক্ষার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। সিদ্ধার্থ কঠোর তপস্যায় শান্তিলাভ করিতে না পারিয়া আধি ব্যাধি পীড়িত লোক সমূহের চিরশান্তি মোক্ষের পথ উদ্ভাবন করিয়াছেন। অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ভগবান শঙ্করস্বামী বৌদ্ধমতাবলম্বী সমুদয় রাজগণকে স্বমতে আনয়ন পূর্ব্বক ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত জয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। এই সমুদয় মহাপুরুষগণ রাজগণ কর্ত্তৃক পূজিত ছিলেন, প্রজাশক্তির সমষ্টি রাজশক্তির আশ্রয়ে তাঁহাদিগের লোকশিক্ষার পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। মহাত্মা মহম্মদ ধনশালিনী খাদিজা নাম্নী রমণীর পাণিগ্রহণে ও কোরে নামক ধনশালী বণিকের সাহায্যে নিজ মত প্রচারের সাহায্য প্রাপ্ত হন। রোমসম্রাট টাইবিরিয়াসের শাসন সময়ে জুডিয়ার শাসনকর্ত্তা পন্টিয়াসের আদেশে তাঁহার শূল শাস্তি হয়। যে কোন প্রকারে হউক রাজগণের সহিত সংস্রব ব্যতী ধীশক্তির সাফল্য লাভ হইতে অনেক দিন আবশ্যক করে। ঈশ্বর সদৃশ মহাপুরুষগণ হইতে সামান্য কবিকুল পর্য্যন্ত রাজশক্তির সাহায্যে কৃতার্থ হইয়া থাকেন। এখন সাধক কমলাকান্ত সেই রাজশক্তির আশ্রয় গ্রহণ জন্য অম্বিকায় চলিলেন। তিনি বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর কর্ত্তৃক পূজিত হইতে চলিলেন। তাঁহার রচিত পদাবলী সাধারণে সাদরে গ্রহণ করিলেও বর্দ্ধমানাধিপতির সংস্রবে তাঁহার রচিত পদাবলির বহুল প্রচার আরম্ভ হয়।

সাধক কেণারামের সহিত বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক অমরারগড় হইতে চান্নায় প্রত্যাগত হইতেছেন। চান্না হইতে অম্বিকা যাত্রা করিবেন। সাধক বিশুর সহিত সেই ওড়গ্রামের ডাঙ্গায় প্রবেশ মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাধক কহিলেন, "বিশু! তোমার বাড়ী কোন গ্রামে?" বিশু কহিল, "ঠাকুর! আমার বাড়ী শিবদে, আমরা আমার গ্রামের পাশ দিয়া যাইতেছি।" সাধক

কহিলেন, "বিশু! তোমার গ্রাম প্রবেশের ইচ্ছা হইতেছে না? তোমার আত্মীয় স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা হইতেছে না? তোমাকে আবার বলিতেছি, তোমার মায়ার জিনিস এখনও বর্ত্তমান আছে, তুমি শান্তি লাভ করিতে পারিবে না, বাটী ফিরিয়া যাও।" বিশু কহিল, "ঠাকুর! আমার কাহাকেও দেখ্‌তে ইচ্ছে নাই, গায়ে আগুণ লাগা লোকের মত ব্যাকুল হয়েছি, তোমাকে ধরে দাঁড়ালে শান্তি পাচ্ছি, জ্বালা যাচ্ছে, ওই দেখুন আমার গ্রামের ধার, ওই দেখুন পুকুর, পদ্মফুলে আলো হয়ে আছে, ওই দেখুন, বেলগাছ, ওই ফুল তুলে, ওই বেলপাতা তুলে মা কালীর পায়ে দিতাম, ওদিকে আমি বড় ভালবাসি, ওরাত আমাকে ডাকাতী কর্ত্তে বল্‌তো না, ওরা এখন আমাকে হেসে হেসে বল্‌ছে যা বিশে বেঁচে গেলি। আমি গাঁয়ের গাছ পালাদিগকেও বড় ভালবাসি, ওরা ত আমাকে ডাকাতী কর্ত্তে বলে নাই। ঠাকুর! পরিবার দিকেও ভাল বেসেছি, মন প্রাণ ঢেলে দিয়েছি, যদি পরিবার বলেছে আজ সোণার গহনা পরেনা বিশে আহ্লাদে আটখানা হয়ে, নিজের প্রাণের দিকে না চেয়ে, বড় লোকের বাড়ী ডাকাতী কর্ত্তে বেরুয়েছে, যদি পরিবার আকাশের চাঁদ চেয়েছে, চাঁদ ধর্ব্বার জন্য পাগলের মত লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়িয়েছি, ঠাকুর আর না, যদি তোমাকে পেতাম, যদি আমার মা কালীকে তেমনি করে ভাল বাস্‌তাম, তাহলে আজ এমন করে কাঁদ্‌তে হত না। আমি আমার মা বাপের চরণে প্রণাম করে, গ্রামের ঐ সকল গাছ পালা, সাধু সজ্জনের কাছে বিদায় চাচ্ছি, সকলের কাছে জনমের মত বিদায় চাচ্ছি, সকলে আমাকে আশীর্ব্বাদ করুক, যেন বিশের পাপের ক্ষয় হয়। ঠাকুর! ঐ শুনুন কাক কোকিল, গরু বাছুর সকলে একেবারে ডাক্‌ছে, ওরাত কেউ আমার শত্রু নয়, কি বল্‌ছে জানেন, যা বিশে তোর মুক্তি হবে, ঠাকুর পেয়েছিস ছাড়িস্ না।" সাধক দেখিলেন বিশুর বৈরাগ্য অতিশয়। ঔরসজাত সন্তান, পাণিগ্রহিতা পতিপরায়ণা পত্নী, শৈশবের সুহৃদ, আজন্ম পরিচিত তরুলতা, জলাশয়, বাসস্থান, ক্রীড়াস্থান জন্মের মত পরিত্যাগ করিতে যাহার হৃদয় ব্যথিত না হয়, তাহার হৃদয় লৌহ অপেক্ষাও কঠিন। ক্রমে তাঁহারা ওড়গ্রামের ডাঙ্গার মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রাতঃকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে। সূর্য্যদেব বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উজ্জ্বল করিয়া দক্ষিণ পথ অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন। সমুদয় জগৎ কোলাহল পূর্ণ হইলেও প্রান্তর বৃক্ষাদি রহিত, বিহঙ্গমগণের গতিবিধি বর্জ্জিত অতি নীরব। বিশু যাইতে যাইতে দাঁড়াইল, সাধকের পদতলে পড়িয়া

কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ঠাকুর! এই সেই স্থান, যেখানে দড়্‌কী হাতে করে তোমাকে খুন কর্ব্বার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলাম, তোমার গান শুনে, তোমার পা ছুঁয়ে আমার জ্ঞান এসেছিল, এই ডাঙ্গা আমার পাপের পাহাড়, মানুষ যাবে, ঘর দুয়ার যাবে, গাছপালা কিছুই থাক্‌বে না, কিন্তু এই ডাঙ্গা থাক্‌বে, আমার পাপের গন্ধ থাক্‌বে।" ঠাকুর। কহিলেন, "বিশু! কিসের পাপ! যে জন কালীনাম করে তার কি পাপ থাকে?" প্রান্তরের সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সে দিনের ঘটনা মনে হওয়াতে সাধকের কিছু ভাবান্তর ঘটিল, তিনি জগদম্বার ধ্যান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গাহিলেন,—

এই সময় ভজ মন! তারা।
গেলে এ সময়, হবে অসময়,
তখন স্থূলে মূলে ভুলে হবে দিশে হারা॥
কাল ফিরিছে অণু, জীর্ণ করিছে তনু,
বহে গেলে দিন, হবে পরাধীন,
হবে ভ্রান্ত নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ে সারা॥
সম্পদে বাড়িছে সুখ, আজ বই কাল দুখ,
দুখের উপর দুখ, যখন হবে জরা।
কমলাকান্তের কাছে, এখনও উপায় আছে,
রঙ্গী রসনা, মাকে ডাকনা,
পাবে ভবে মুক্তি, শিবের উক্তি, ভাব্‌লে ভব দারা॥"

গান শুনিয়া বিশুর নয়নবারি বিগলিত হইতে লাগিল। সে সাধকের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান, নির্ব্বাত, সময়ে পাদপের ন্যায় নিশ্চল সঙ্গীত শেষে বিশু কহিল, "ঠাকুর! এ তোমার গান নয়, ঘুমপাড়া মন্ত্র, কালী সাক্ষাৎ হয়ে তোমার গান শোনেন।" এই বলিয়া বিশু সাধকের সহি পরমানন্দে চলিল এবং অতীত বেলায় চাল্লায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সাধ দেবী বিশালাক্ষীর চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক ওড়গ্রামের ডাঙ্গার ঘটনা স্মরণ করি কহিলেন, "লীলাময়ী! তোমার খেলা কে বুঝিবে? মা! শৈল সমুদ্র শালি বসুন্ধরা তোমার ইচ্ছায় থর থর কম্পিত হয়, রাজ রাজেশ্বরের মুকুট বিচলিত হইয়া ভূমে পতিত হয়, সূর্য্যজ্যোতিঃ চন্দ্র জ্যোতিঃ বিলুপ্ত হইয়া পৃথি

অন্ধকার হয়, অতি শরণাগত সেবককে ঘৃণিত পরিণাম হইতে রক্ষা করা তোমার পক্ষে অতি অকিঞ্চিৎকর, একজন পাশণ্ডের বিকার উপস্থিত করা অতি তুচ্ছ।" এই বলিয়া দেবীর আরাধনা পূর্ব্বক সে দিন চাল্লার অবস্থান করিয়া পরদিন প্রত্যুষে বিশুর সহিত অম্বিকা যাত্রা করিলেন।

ক্রমশঃ

প্রতিহিংসা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সিংহ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একটী শৈল শিখরের পাদদেশে একটী ক্ষীণাঙ্গী তটিনী ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। উপরে বহুদূর বিস্তৃত অনন্ত গিরিশ্রেণী। এই গিরি-কন্দর হইতে নদীটী বহির্গত হইয়া পর্ব্বতের পাদদেশ ধৌত করিয়া শ্বেত, কৃষ্ণ, ধুসর প্রভৃতি উপলখণ্ডের উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। একদিকে একটী বিস্তীর্ণ সমতলভূমি, অপরদিকে পর্ব্বতশ্রেণী স্তরে স্তরে শোভমান হইতেছে। এই উপত্যকা শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত তরুপল্লব শোভিত। গিরিগাত্র বিবিধ পার্ব্বত্যবৃক্ষে আচ্ছাদিত। নদীটী বক্রভাবে চলিয়াছে, পর্ব্বতগাত্রস্থ বৃক্ষগুলি নীবক্ষে অবনত হইয়া শ্যামল স্নিগ্ধ ছায়ায় কোন কোন স্থান আচ্ছাদিত করিয়াছে। এইরূপ একটী স্থানে একটী শালবৃক্ষতলে একটী বালক ও বালিকা একটী অনুচ্চ শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া আছে। সেই শালবৃক্ষের মূলদেশ নির্ম্মল ছসলিল স্নাত হইয়া যাইতেছে। শিলাখণ্ডগুলি ধীর মৃদু তরঙ্গাঘাতে নিয়ত ধৌত হইয়া—মসৃণ হইয়া গিয়াছে। কে জানে—কত যুগ যুগান্তর হইতে শিলাখণ্ডগুলি গিরিপ্রবাহিনীর কোমল আঘাত বক্ষে ধারণ করিয়া চলিয়াছে। সে আঘাতে ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে—কিন্তু এমনি ভালবাসা যে শিলাখণ্ডগুলি তাহের প্রণয় ভুলিতে পারে নাই—এখনও আনন্দভরে বুকে ধরিয়া চলিয়াছে। বালক ও বালিকা—বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। বালক—সপ্তদশবর্ষীয় হইবে, বালিকাটী এখনও দশমবর্ষ উত্তীর্ণ হয় নাই। বালক অতীব সুন্দর—অবয়ব

আশ্চর্য্যভাবে সুগঠিত—কিন্তু স্থূল নহে, ঈষৎ ক্ষীণ। মুখাকৃতি অতি অমায়িক স্নেহমমতাপূর্ণ, অথচ সেই শান্ত প্রকৃতির মধ্যে একটী জ্যোতিঃ পরিলক্ষিত হয় সে জ্যোতিঃ অপার্থিব দেবতাদুর্লভ।

বালকটীর অঙ্গে একখানি গিরিরঙ্গের বস্ত্র—স্কন্ধে একখানি উত্তরীয় রহিয়াছে। কেশ কর্ত্তিত নহে, লম্বমান হইয়া পৃষ্ঠদেশে পড়িয়া রহিয়াছে। বালিকাটী একখানি কৃষ্ণবর্ণের শাটী পরিধান করিয়া রহিয়াছে। বালিকার সৌন্দর্য্য অপার্থিব মনমুগ্ধকর। শরীর ক্ষীণ অথচ নির্জ্জীব নহে—সুন্দরভাবে গঠিত—বর্ণ গৌর অপূর্ব্ব কোমলতাময়। মুখখানি যেন শত শত বাসন্তী কুসুমের সৌন্দর্য্য নিষ্পেসিত করিয়া গঠিত হইয়াছে। মস্তকের দীর্ঘ কেশরাশি—তৈল ভাবে রুক্ষ—ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত। যদিও বালিকার বেশভূষা নাই, তথাপি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মহিমায় আবরিত দেহলতা মৃদু আন্দোলিত। বালিকার চক্ষু দুটী কি যে মোহময়, তাহা দৃষ্টি না করিলে বুঝা যায় না—নয়নজ্যোতিঃ শান্ত অথচ সরলতাময় চঞ্চল।

বালকটীর দৃষ্টি একটী অর্দ্ধ নিমজ্জিত প্রস্তরখণ্ডের উপর পড়িয়াছে—আর বালিকাটী তাহার ক্ষুদ্র কোমল পা দু'খানি সেই মৃদুপ্রবাহিত জলের উপর রাখিয়া খেলা করিতেছে। জল গভীর নহে—বালুকার উপর ক্ষীণভাবে ধীরে ধীরে চলিয়াছে। বালিকা পা দুখানি দিয়া সেই ধীর প্রবাহিত বালুকা কখনও উঠাইতেছে—কখনও পা দিয়া জলের গতিরোধ করিতেছে—কখনও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উজ্জ্বল শিলাখণ্ডগুলি সেই অমল পদ দ্বারা ধীরে অপসারিত করিয়া দিতেছে। সেই নদীজল বিধৌত পা দুখানির সৌন্দর্য্য অভিনব তুলনা-রহিত—কেবল মানস নেত্রেই কল্পনা করা যায়।

বালকটীর দৃষ্টি সেই বালিকার দিকে রহিয়াছে—তাহার প্রতি পদ সঞ্চালনে তাহার প্রত্যেক গতিবিধি নিবিষ্টমনে দেখিতেছে—আর সেই দৃষ্টি কি ভাবেপূর্ণ জানিনা—তাহার হৃদয়ে কি ভাবের উৎস প্রবাহমান—আমরা অনুমান করিতে পারি না—হৃদয়ের ভাব হৃদয়েই মগ্ন—বাহিরে প্রকাশ হইবে কি করিয়া?

অদূরবর্ত্তী একটী শিশুগাছ হইতে একটী পাখী ডাকিয়া উঠিল—সেই নব আগন্তুকের সঙ্গীতে সেই নিস্তব্ধতা, সেই বালক বালিকার মগ্নতা—প্রকৃতির ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল।

বালিকা জল হইতে পা উঠাইয়া লইয়া দাঁড়াইল—সেই বালকটীর দিকে চাহিয়া সহসা বলিল,—"দাদা! কত বেলা হ'ল দেখ—বাড়ী যেতে হবে।"

বালকের সেই মহাধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল—বিস্ময় নেত্রে চমকিত ভাবে বলিল;—

"তাইত সবি! আমি সব ভুলে গিয়েছিলেম—জানি না কতক্ষণ এসেছি—তুই ত আমাকে এতক্ষণ কিছু বল্‌লি না—তুই খেলা পেলে আর ত কিছু চাস্ না?" এখন বল্‌ছ—এত দেরীতে বাড়ী গেলে বাবা কত বক্‌বেন—আমাদের বিলম্ব দেখে তিনি কতই না ভাব্‌চেন!"

বালিকা হাসিল, সূর্য্যকিরণ পুলকে সূর্য্যমুখী ফুল যেমন হাসে তেমন নহে—নিদাঘতপ্ত কচিৎ সান্ধ্যসলিল সিঞ্চিত মল্লিকার মত—সে হাসিতে উদ্দাম নাই—উচ্ছৃঙ্খল উদ্বেলিত ভাব নাই, আছে কেবল শুষ্ক অথচ মধুময়—বিষাদমাখা অথচ আনন্দ কিরণ আচ্ছাদিত! বালিকা বলিল, "দাদা! তুমি ভুলে যাও, না আমি ভুলে যাই—কে এত ভুলে, আমি না তুমি? দাদা! তুমি ভুলে গেছ ব'লে আমিও ভুলে গেছি—কখন বাড়ী যেতে হবে একেবারেই মনে নাই।"

বালক বলিল, "সবি! (বালিকার নাম সবিতা) চল্ সত্বর বাড়ী চল্—আর দেরী করা হবে না।" এই বলিয়া বালক বালিকা সেই নদী তীর হইতে চঞ্চল পদে ত্রস্তভাবে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

একখানি ক্ষুদ্র কুটীর, খড় দিয়া ছাওয়া। কুটিরের তিনটী কক্ষ, একটী শয়ন করিবার, একটী তৈজসপত্র রাখিবার, এবং একখানি ঘর খালি। ঘরগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—কক্ষমধ্যে যে সামান্য তৈজসপত্র আছে, তাহা বেশ সাজান গোছান রহিয়াছে। আসবাবের মধ্যে বেশী কিছু নাই, তিনখানি কম্বল, কয়েকখানি মাদুর, দুটী প্রদীপ, রন্ধন করিবার কয়েকটী পাত্র ও কয়েকখানি থালা বাটী রহিয়াছে। একটী কাঠের বাক্স—তাহার উপরে কয়েকখানি পুরাতন বই সাজান রহিয়াছে। ঘরে একটী আল্‌না টাঙ্গান রহিয়াছে, তাহাতে কয়েকখানি কাপড় ঝুলিতেছে।

প্রাঙ্গণ পরিচ্ছন্ন, চারিদিকে কামিনী গাছের বেড়া। প্রাঙ্গণের একপার্শে একটী বেলগাছ, বৃক্ষে ফল নাই, কিন্তু অপরিব্যাপ্ত হরিদ্বর্ণ নবপাতায় আচ্ছাদিত হইয়া বড়ই শোভা ধারণ করিয়াছে। গাছের তলাটী গোময় দ্বারা বেশ পরিষ্কার ভাবে লেপা রহিয়াছে। গৃহে গৃহপালিত পশু পক্ষী প্রভৃতি কিছুই নাই, কোনরূপ কোলাহল নাই, আছে কেবল নীরবতা, আর মধ্যে মধ্যে সেই গভীর নিরবতা ভাঙ্গিয়া, সেই নববিকশিত বিল্বপত্র, সেই অপুষ্পিত কামিনী বৃক্ষের

নিবিড় শাখাগুলিকে দোলাইয়া বায়ু বহিয়া যাইতেছিল। ধীর বায়ু প্রকৃতির নীরবতা ভঙ্গ করে না, বরং আরও গভীরতর করিয়া তুলে।

একটী বালক ও বালিকা সেই কামিনীফুলের বেড়ার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল, বালকটী ধীরপদ সঞ্চারে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল, কিন্তু বালিকাটী ভয় চকিত ও উৎসুক নয়নে বেড়ার একপার্শে দাঁড়াইয়া বাটীর ভিতরের কোন শব্দের আশায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

বালকটী গৃহমধ্য, প্রাঙ্গণের চারিধার, বেলগাছতলা, দেখিয়া বুঝিল, সেখানে জনমানব নাই—মৃদুভাবে ডাকিল, "সবি!"

সবি সেই সুন্দর ত্রাস্ত মুখখানি, সেই শ্যামকান্তি বেড়ার পাশ হইতে উত্তর দিল, "দাদা!" বালিকার সুবিন্যস্ত কপোল প্রদেশ বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে—দু চারটী কেশগুচ্ছ মুখমণ্ডল ঘেরিয়া ধীরে ধীরে দুলিতেছে।

শারদ প্রভাতে, শিশিরসিক্ত ফুল যেমন মৃদু বায়ু হিল্লোলে দুলিতে থাকে—সবিতার সুন্দর মুখখানিও সেইরূপ বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া সেই শ্যাম স্নিগ্ধ কামিনীফুলের বেড়ায় ফুটিয়া দুলিয়া উঠিল। ঊষার কুসুম নীরব ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করে,—কিন্তু এই বেড়ার কুসুমটী সজীব, চকিত নয়নে চাহিয়া ডাকিয়া উঠিল, "দাদা!"

ধীরে ধীরে সবিতা গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল, বালকটী আস্তে আস্তে বলিল, "সবি! বাবা বাড়ী নাই, বোধ হয়, আমাদিগকে খুঁজিতে গিয়াছেন।"

সবিতার মুখ বিষণ্ণ হইল, মুহূর্ত্তমাত্র স্থির ভাবে থাকিয়া বলিল, "বড় অন্যায় হয়েছে!" ভাই বলিল, "সবি! বাবা না আসিতে আসিতে পূজার আয়োজন সব ক'রে ফেল্, তারপর যা পারিস্ রান্না চড়িয়ে দে।"

ভগ্নী বলিল, "বেশ বলেছ দাদা! তুমিও বাবার এই বইগুলো পূজার ঘরে সাজিয়ে রাখগে।" সবিতার মুখ তখন হর্ষ বিকশিত, বর্ষার নব জলসঞ্চারে নিদাঘতপ্ত কুসুম যেমন হাসিয়া উঠে, সবিতাও তেমনি পুলকিত অন্তঃকরণে প্রভূত উৎসাহের সহিত পিতার পূজার আয়োজন করিতে চলিল।

সেই বিল্ববৃক্ষমূলে, সেই গোময়লিপ্ত ভূমে, একখানি মৃগচর্ম্ম বিছাইয়া দিল, একটী তাম্রপাত্রে বিভিন্ন জাতীয় পুষ্প সাজাইয়া রাখিল, একটী কোশাকুশি জলপূর্ণ করিয়া দিল। ছোট একখানি গোল প্রস্তরে চন্দন ঘসিয়া রাখিল।

গৃহমধ্য হইতে মৃত্তিকার একটী পাত্র আনিয়া তাহাতে কয়েকখানি শুষ্ককাষ্ঠ অগ্নিতে জ্বালাইয়া অঙ্গার করিয়া ফেলিল, তৎপরে ধূনা দিয়া সেই বিল্ববৃক্ষের চতুর্দ্দিক ঘুরাইয়া আনিল।

সেই নীরব পবিত্র বিল্বমূল, সেই ধূনার সুগন্ধে পরিপ্লাবিত হইয়া গেল। যে স্থানটীতে সবিতা মৃগচর্ম্ম বিছাইয়া দিল, সে স্থলে সূর্য্যকিরণ ঢলিয়া পড়ে নাই। বিল্ববৃক্ষের নিবিড় শাখাপল্লবে সে স্থানটী আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, যেন একটী ছায়া বিতান।

এদিকে বালক পিতার পুঁথি যাহা পূজার সময় প্রয়োজন হইবে—তাহাই অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

একটী কাঠের ভাঙ্গা তক্তার উপরে পুরাতন জীর্ণ কয়েকখানি পুস্তক সাজান রহিয়াছে। বালক একখানি উঠাইল দেখিল, সাংখ্যদর্শন,—তাহা একস্থানে বেশ করিয়া ধূলা ঝাড়িয়া রাখিয়া দিল, আর একখানি বই দেখিল,—গৌতমের ন্যায়সূত্র, অতি জীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, ভাবে বোধ হইল, ইহার প্রত্যেক পত্র, প্রত্যেক ছত্র, এমন কি প্রত্যেক অক্ষরটী পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই—সে গুলি মলিন হইয়া গিয়াছে। অতীব যত্নে উহা রাখিয়া, আর একখানি লালরঙ্গের কাপড় জড়ান পুঁথি, হাতে করিয়া উঠাইল দেখিল, উহা জয়দেব গোস্বামীর গীতগোবিন্দ—একপৃষ্ঠা উল্‌টাইয়া দেখিল, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে হাতের লেখা আছে, "আমি ধূলিকণা হ'য়ে, চরণে রহিব লাগিয়া।"

আর একখানি বৃহৎ পুস্তক উঠাইল দেখিল, বাল্মীকির রামায়ণ, স্থানে স্থানে কতকগুলি তৃণ দিয়া পত্র সংখ্যা চিহ্নিত করা হইয়াছে।

এইরূপে অনেকগুলি পুস্তক বেশ সুবিন্যস্ত করিয়া রাখিয়া, সর্ব্বশেষে চন্দন-লিপ্ত একটী কৃষ্ণবর্ণ পুঁথি বাহির করিল, দেখিল, উহা শিবপুরাণ, পুঁথিখানি ধূলি ঝাড়িয়া একটী পাতা উল্‌টাইতেই দেখিতে পাইল, পুঁথির একটী কোণে লেখা আছে, "ব্যোমাতীত নিরঞ্জনং।"

সেই বইখানি লইয়া সেই বিল্ববৃক্ষমূলে, পূজার স্থানে একখানি কুশাসনের উপর রাখিয়া দিয়া, অনতিদূরে বসিয়া রহিল।

এদিকে সবিতা তাহার ক্ষুদ্র ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়াছে, একটী হাঁড়ি হইতে কিছু আতপ চা'ল বাহির করিল, আর একটী মাটির পাত্র হইতে একপোয়া আন্দাজ মটরের দাইল এবং একটী বাঁশের পেটরা হইতে কিঞ্চিৎ লবণ ও রান্নার মসলা বাহির করিয়া একটী পাত্রে লইয়া রান্না ঘরে গেল।

ছোট ছুটী উনন, তেমন বেশী বড় নহে, সামান্য ভাবে তাহাতে পাক হয়। তেমন বেশী কাঠ প্রয়োজন হয় না। দুচারখানি কাঠ দিয়া উনন ধরাইল। উনন ধরাইতে সবিতাকে একটু কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কাঠগুলি কিছু ভিজা ছিল, আর উনন তত পরিসর ছিল না। কাঠে আগুণ ধরাইয়া সবিতাকে ফুঁ পাড়িতে হইল।

অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যময় কোমল মুখখানি ধূমে ও অগ্নি উত্তাপে রক্তিম হইয়া উঠিল। মুখ হেট করিয়া উননে যখন ফুঁ পাড়িতে লাগিল, তখন সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কেশগুলি চঞ্চলভাবে মুখে আসিয়া পড়িতে লাগিল, আর বারে বারে সবিতা রাগভরে তাহা পিঠে অপসারিত করিয়া দিতে লাগিল, শেষে এমন বিরক্ত হইয়া উঠিল যে, চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, অধৈর্য্য ভাবে কেশগুলি মাথার উপর উচু করিয়া বাঁধিয়া দিল।

সেই সুন্দর নলিনীদলের মত চক্ষুদুটী জলভারপূর্ণ, আর সেই কেশগুলি মাথার উপর উচু করিয়া বাঁধা—মুখে বিরক্তি ও দৃঢ়তার ভাব বড়ই মনোরম।

কি জানি বালিকার অন্তঃকরণ বুঝিয়া বুঝি, উননটী দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সবিতার মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। প্রাবৃটের মেঘমুক্ত সূর্য্য যেমন হাসিয়া উঠে, সবিতার গম্ভীর চিন্তা ও বিরক্তিব্যঞ্জক মুখখানিও সেইরূপ প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল। হৃষ্ট অন্তঃকরণে রন্ধনে মনোনিবেশ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রণাম হই—ভট্‌চাজ্ মশায়—এত বেলায় কোথায় যাবেন? "জয়স্তু" ত্রিপুরেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, জয়স্তু। ভট্‌চাজ্ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "গয়ানাথ! এদিকে আমার ছেলে দুটীকে যেতে দেখেছ কি? অনেক বেলা হ'ল তারা ঘরে এখনও ফিরে আসে নি। তাই দেখ্‌তে বেরিয়েছি, তারা কোথায় গেল।"

গয়ানাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কহিল, "কি যেন স্মরণ হইতেছে না, এইরূপ ভাব দেখাইয়া কিছুক্ষণ পরে বলিল, "আজ্ঞা হ্যাঁ ভট্‌চাজ মশায়, যোগবল ও সবিতাকে উস্রি নদীর জঙ্গলে দেখে এসেছি। আমার একটী মহিষ জঙ্গলে ছুটে গিয়েছিলো, তাকে তাই আন্‌তে গিয়েছিলেন। দেখি যে যোগবল ও সবিতা কতকগুলি শালপাতা ভেঙ্গে ব'য়ে নিয়ে আসছে। প্রায়ই তাদিকে আমি জঙ্গলে দেখি, তাই তাদিকে কিছু না বলে, আমি চলে এসেছি।

ত্রিপুরেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

গয়ানাথও প্রণাম হই বলিয়া, একটী ঘাসের বোঝা মাথায় করিয়া গৃহে ফিরিল। গয়ানাথ ভাবিল, আহা ভট্‌চাজ মহাশয়ের কত দরদ,—একটুক্ষণ ছেলেদের মুখ দেখ্‌তে না পেয়ে ছুটে ছুটে চলেছেন। আবার ভাবিল, আমিই বা কি? যে দিন গয়লানী, তার ছেলে দুটিকে নিয়ে আমার উপর রাগ করে, তার বাপের বাড়ী চলে গিয়েছিল—কৈ আমি ত বেশীক্ষণ তা দিকে না দেখে থাকতে পারি নি, ছুটে শ্বশুর বাড়ীতে মেয়ে হাজির হলেম। আহা যার দরদ্ সেই বোঝে। এখানে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, গয়ানাথ জাতিতে গোয়ালা তার স্ত্রী ও ছুটি পুত্রকন্যা বই আর সংসারে অপর পরিবার কেহ নাই। দুচারটি গরু আছে, দুধ দেয়, একটি জোড়া মহিষ আছে, চাষ আবাদ হয়। আর ছেলেদের খাবার দুধ-রাখিয়া যাহা বাঁচে, তাহা বিক্রয় করে। দু চার বিঘা জমী আছে, সম্বৎসরের খাবারটা ঐ জমী হইতে চলে। সুতরাং গয়ানাথের সংসার একরূপ স্বচ্ছল, কোন রকমে মোটা ভাত, মোটা কাপড়ে গয়ানাথের জীবন-যাত্রা বেশ আনন্দে নির্ব্বাহ হয়।

গয়ানাথের শরীর বেশ সুস্থ ও সবল, একাই চাষ করে, অপর লোকজন রাখে না।

এদিকে গয়লানীর শরীরও বেশ দোহারা, হাড়ে মাসে জড়িত, মোটাও নহে—পাতলাও নহে, রূপোর দুগাছা তাবিজ দুই বাহুতে বাঁধা, সেই নিটোল বাহুযুগল দেখিলে বোধ হয়, গয়লানীর নীরোগ শরীরে প্রভূত শক্তি আছে। সে একাই ছেলে পিলে লালন পালন করে, জল তুলে বাসন মাজে, গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম করে, স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করে; আবার নিজের শরীরের প্রতিও যত্ন নাই। তাহার সংসারের কাজ করিবার জন্য দু পাঁচটা লোক রাখে না, বা সংসারের কাজ লইয়া ব্যতিব্যস্ত ও বিরক্তও হয় না। সে আপন মনেই, নীরবে আপনার কাজ আপনিই করিয়া যায়।

আহা, আমাদের বঙ্গ সমাজের ভদ্ররমণীরাও যদি এইরূপ আত্ম নির্ভর করিয়া চলিত, তাহা হইলে কত সুখের হইত! যাক এসব দুঃখের কথা, আমি মূল আখ্যান হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, সে সূত্র এখন ধরা যাক।

ত্রিপুরেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়, উস্রি নদীর তীরাভিমুখে চলিয়াছেন, মন কিছু চঞ্চল—অপর দিকে দৃষ্টি নাই—লক্ষ্য তাঁহার গন্তব্য স্থান। কিছু দূর যাইতে না যাইতে তিনি যেন শুনিতে পাইলেন, পিছন থেকে তাঁকে যেন কেউ ডাক্‌ছে, "ও ভট্‌চাজ মশায়, ও ভট্‌চাজ মশায়!" প্রথমে অন্যমনস্ক ছিলেন, বলিয়া

তিনি শুনিতে পান নাই, যখন শুনিতে পাইলেন, তখন পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, গয়ানাথ ছুটিয়া আসিতেছে। ত্রিপুরেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় গয়ানাথের এই অসম্ভাবিত আগমনে, স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন, বুঝি বা কোন দুঃসংবাদ শুনিবার জন্য মন বিচলিত হইয়া উঠিল।

গয়ানাথ উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ভট্‌চাজ মশায়, যোগবল ও সবিতা বাটিতে আছে, আপনি ফিরিয়া চলুন। আপনি এক রাস্তা হ'য়ে বেরিয়েছেন, আর তারাও অপর একটি রাস্তা দিয়ে বাটির ভিতর ঢুকেছে।" ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মন শান্ত হইল—প্রাণ বড় চমকিয়া গিয়াছিল। "ভগবন্! তোমারই মহিমা" বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন,—গয়ানাথও তাঁহার অনুসরণ করিল।

এস্থলে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, গয়ানাথ বাড়ী আসিলে, তাহার গৃহিণীকে যোগবল ও সবিতা সম্বন্ধে কথা বলিয়াছিল। কিন্তু যখন গৃহিণী বলিল, সে দুধ দিতে গিয়ে যোগবল ও সবিতাকে দেখিয়া আসিয়াছে, তখন ভট্‌চাজ মশায় বৃথা কষ্ট পাবেন ভাবিয়া, গয়ানাথ তাঁহাকে অন্বেষণে প্রতিনিবৃত্তি করিবার জন্য পিছু পিছু ছুটিয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ত্রিপুরেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় গম্ভীর গলায় গাহিয়া উঠিলেন,—

"মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং।

অমনি দুটি ললিত কণ্ঠ সমস্বরে তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া গাহিয়া উঠিল,—

"মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং।
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং,
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং।"

পিতা ভক্তিভরে প্রণিপাত করিল, বালক ও বালিকাটি গলবস্ত্র দিয়া পিতার অনুসরণ করিল।

বিশুদ্ধ সরল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হৃদয় দুটি ভক্তিরস পরিপ্লুত হইয়া উঠিয়াছিল সেই সময়ের সেই পবিত্রতাময় ভক্তি—মুখমণ্ডলের ভাব ও স্বচ্ছ নয়ন কটির

দৃষ্টি মনোযোগ সহকারে দেখিলে, পাষণ্ড কঠিন অভক্তের হৃদয়েও করুণার বারি বহিয়া যায়।

পিতা বলিলেন, "মা সবিতা! চল তোমার অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে কি আছে এইবার দেখিগে।" সবিতার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল - পূজার কোশা-কুশি প্রভৃতি জিনিষগুলি ধীরে ধীরে গোছাইয়া লইয়া চলিল। যোগবলও পিতার কালো পুঁথিখানি হাতে লইয়া পিতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় শিব শিব বলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং পূজার বস্ত্র উত্তরীয়খানি পরিত্যাগ করিয়া একখানি গেরুয়া পরিধান করিলেন।

সবিতা, প্রকৃতই সবিতা। ইতিমধ্যে আহারের স্থান ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে। দুটি আসন, দুটি পাত্রে জল, ছোট একখানি পাতে একটু লবণ। সবিতা তাহার পাকশালে প্রবেশ করিয়াছে, ক্ষুদ্র বালিকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুখানি হাত দিয়া, ক্ষুদ্র দেহখানি লইয়া সে অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিয়া পরিবেশন করিতেছে, দেখিতে কত সুন্দর, কত মনোহর।

দুটি থালায় অন্ন ব্যঞ্জন পূর্ণ করিয়া পিতা ও ভ্রাতার সম্মুখে ধরিয়া দিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও যোগবল ভগবানকে নিবেদন করিয়া আহারে বসিলেন। আহার করিবার পূর্ব্বেই একবার সবিতার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, সবিতা উৎসুক নয়নে দাঁড়াইয়া আছে। আর ভট্টাচার্য্যের দৃষ্টিটুকু বড়ই মর্ম্মবিদারক। এই দৃষ্টি স্নেহরসপূর্ণ, দুঃখ বিমিশ্রিত, কোন্ অতীতের বিষাদ স্মৃতি মণ্ডিত—ভট্টাচার্য্যের একদিন এমন দিন ছিল, যে দিন সবিতার মত একখানি বড় স্বর্ণপ্রতিমা, এমনি করে, তাঁহাকে যত্ন করে খাওয়াইত, এমনি করে কত উৎসুক নয়নে চেয়ে থাকত, আজ সে দিন নাই, আজ কিনা এক খানি ছোট অপরিণত বয়স্ক, অতি স্নেহার্দ্রময় প্রতিমা দাঁড়ায়ে, এ যেন তাহারই প্রতিমূর্ত্তি।

সে কোথায়? ননীর পুতুলি সংসারের কঠিন কাজে দেহ ঢালিয়া দিয়াছে, আর আমি কিনা সেই ক্ষুদ্রশক্তি প্রসূত ফল ব্যবহার করছি? না—না কর্ম্মানুযায়ী ফল, কর্ম্মই মূল, আমাদের কর্ম্মময় জীবন। সুখ দুঃখ কিছুই নাই—শুধু কর্ম্ম—কর্ম্ম—কর্ম্ম!

এমনি করিয়া ভট্টাচার্য্য ভাবিত—আর মনের মধ্যে অসহনীয় যন্ত্রণায় স্রোত বহে নিয়ে যেত।

সবিতা পিতার পাতে প্রসাদ পাইল এবং অতি তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া

উঠিল; ভট্টাচার্য্য ইতিমধ্যে কন্যাটির অপর একটি কাজ সারিয়া ফেলিলেন। নিকটবর্ত্তী একটি কূপ হইতে দুই চারি কল্‌সী জল উঠাইয়া আনিলেন।

সবিতা আহারান্তে সমস্ত বাসন প্রভৃতি ধুইয়া গৃহকর্ম্ম সারিয়া লইল, এবং নিজে গাত্রধৌত করিয়া একখানি শুষ্ক শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া, পিতার পাঠাগারে প্রবেশ করিল, যখন সবিতা গৃহে প্রবেশ করিতেছিল। যোগবলকে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বুঝাইতে ছিলেন,—"সুখ দুঃখ একই জিনিষ—মনের অবস্থানের মাত্র, সুতরাং উভয়কেই একই ভাবে গ্রহণ করিবে। লাভে অলাভে, ভয়ে, ক্রোধে—মনকে সর্ব্বদা স্থির রাখিবে।"

ক্রমশঃ

কোষ্ঠী-শিক্ষা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত পশুপতি সরকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শনি।

জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ যদিও শনিকে অশুভ গ্রহ বলেন, তথাপি শনি যদি উচ্চ, স্বক্ষেত্র মূলত্রিকোণ প্রভৃতি স্থানে থাকিয়া বলবান হয়েন, তবে এই দশায় জাতকের গ্রামাধিপতি, কীর্ত্তি, নৃপতি বা তৎসদৃশ মান; পুত্র কলত্রাদি ধনভূষণ ইত্যাদি লাভ হয়। আর শনি বলহীন হইয়া থাকিলে, জাতকের পিতৃ-মাতৃ বিয়োগ, বিষ, শত্রু, অগ্নিভয়, অঙ্গবৈকল্য অপবাদ, পুত্র কলত্রাদি হইতে তিরস্কার, অপমান ইত্যাদি অশুভ ফল হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি।

বৃহস্পতি উচ্চ, ত্রিকোণ প্রভৃতি স্থানে থাকিয়া বলবান হইলে তাঁহার দশায় জাতকের রাজ্যলাভ, পুত্র, ধন, বিলাস উপযোগী বস্তুভোগ, অতিশয় স্বচ্ছন্দ বিদ্যা, সুখ্যাতি, শুভকার্য্য সিদ্ধি এবং লক্ষ্মী লাভ হইয়া থাকে, আর বৃহস্পতি শত্রুক্ষেত্রে ক্রূর গ্রহের সহিত দৃষ্ট হইয়া বলহীন হইলে তাহার দশায় জাতকের স্ত্রী পুত্র নাশ অপমান বিবাদ প্রভৃতি অশুভ ফল হয়।

রাহু।

রাহু সিংহ, বৃষ, কন্যা, কর্কট, কিম্বা মিথুন রাশিতে থাকিয়া বলবান হইলে উহার দশায় জাতকের লক্ষফল লাভ হইয়া থাকে সুখ, ধনধান্যাদি, বাহন প্রাপ্তি পুত্র সন্ততি এবং রাজ সম্মান প্রভৃতি লাভ হয়। রাহু বিরুদ্ধ গ্রহের সহিত যুক্ত বা দৃষ্ট হন, অশুভ ফল দিয়া থাকেন। রাহু হীনবল হইলে উহার দশায় জাতকের পত্নীর অপর স্ত্রীর নিমিত্ত বিবাদ, বন্ধনভয়, অস্ত্রাদির আঘাত, বলহীন অত্যন্ত কষ্ট, ধন ও কাঞ্চন বিহীন দেহ হয়।

শুক্র।

শুক্র জন্ম কুণ্ডলী চক্রে বলবান থাকিলে উহার দশায় জাতকের মন্ত্রসিদ্ধি প্রমদা সঙ্গাভিলাষ পূর্ণ, সম্মানে রাজপূজা, হস্তী অশ্ব, প্রভৃতি যানারোহণ গমন মনোরথ সিদ্ধি নৃত্যগীত বাদ্যাদির দ্বারা সুখ, স্ত্রীদ্বারা ধনলাভ, গন্ধপুষ্প, অলঙ্কার স্বর্ণ, রজত, যশঃ প্রভৃতি শুভফল লাভ হইয়া থাকে। আর সদি শুক্র জন্ম কুণ্ডলী চক্রে ষষ্ঠ, দ্বাদশ কিম্বা নীচরাশি গত হইয়া পাপ গ্রহের সহিত সংযুক্ত বা নিরীক্ষিত হন। তবে জাতকের স্ত্রী কলহ, মনস্তাপ, দুর্ভাগ্য স্ত্রীবিয়োগ, শুক্রপীড়া ইত্যাদি অশুভফল হইয়া থাকে।

গ্রহ ও তাহার কারকতা।

মহা জ্ঞানী জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, গ্রহ নয়টি যথা রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি রাহু ও কেতু। এই নবগ্রহ মেষাদি দ্বাদশ রাশিতে বিকলা, কলা ও অংশক্রমে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে চক্রপথে ভ্রমণ করিতেছেন। এই চক্রপথে গ্রহগণের অনুক্ষণ ভ্রমণেই মানবের ভাগ্যসূত্র গ্রথিত। উহাই অদৃষ্ট নামে প্রতিভাত।

রক্ত জবার ন্যায় কান্তি বিশিষ্ট কশ্যপ পুত্র মহা জ্যোতির্ম্ময় অন্ধকার ও পাপ নাশক সূর্য্য গ্রহই নবগ্রহের মধ্যে আদি গ্রহ। সূর্য্য মেষাদি দ্বাদশ রাশিতে দ্বাদশ মাস অবস্থান করেন। অর্থাৎ বৈশাখ মাসে মেষ রাশিতে জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ রাশিতে, আষাঢ় মাসে মিথুন রাশিতে, আর আশ্বিন মাসে কন্যা রাশিতে, কার্ত্তিক মাসে তুলা রাশিতে, অগ্রহায়ণ মাসে বৃশ্চিক রাশিতে, পৌষ মাসে ধনু রাশিতে, মাঘ মাসে মকর রাশিতে, ফাল্গুন মাসে কুম্ভ রাশিতে ও চৈত্র মাসে মীন রাশিতে অবস্থান করেন। আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদগণের মতে ইনিই

প্রতাপবান রবিগ্রহ। আমাদের এই ধনধান্য জীব পরিপূর্ণ পৃথিবীর সহিত ইহার বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। যেহেতু সূর্য্যালোকই জীবের প্রাণ স্বরূপ। সূর্য্যালোক না পাইলে পৃথিবী নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন, প্রস্তর সম কঠিন, হিমময় ও নির্জ্জীব হইয়া থাকিত। এই পৃথিবীর মনোহর বর্ণবৈচিত্র ফল পুষ্প সুশোভিত তরুলতা, পশুপক্ষী মানব প্রভৃতি জীব প্রবাহ, নদী হ্রদ সাগর সকলের মধ্যেই সূর্য্যরশ্মি প্রভাববান। এই নিমিত্তই হিন্দুর ঋগ্বেদ অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণাদি বহুনামে সূর্য্যদেবের প্রভাব কীর্ত্তন তৎপর। ইহার অনুকূলে মানব তেজস্বী ধার্ম্মিক ও পিতৃভক্ত হইয়া থাকে। প্রতিকূল হইলে অহঙ্কারী নিষ্ঠুর সম্পত্তি-হীন ও পিতৃ-দ্বেষী হয়।

ক্ষীরোদ সমুদ্র সমুদ্ভূত দধি, শঙ্খ, ও হিমসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট দেবাদিদেব মহাদেবের মুকুট ভূষণ চন্দ্র আমাদের দ্বিতীয় দৃশ্যমান গ্রহ। আধুনিক পণ্ডিত-গণের মতে চন্দ্র উপগ্রহ। চন্দ্র নিজে জ্যোতির্ম্ময় নহেন, সূর্য্যের আলোক সম্পাতেই আলোকিত চন্দ্রের যে অংশে যখন সূর্য্যকিরণ পতিত হয় সেই অংশ তখন আলোকিত হইয়া থাকে। ইহাই চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি অর্থাৎ প্রতিপদ দ্বিতীয়া তৃতীয়া ইত্যাদি তিথির কারণ। যখন সম্পূর্ণ আলোক পড়ে তখনই পূর্ণচন্দ্র অর্থাৎ পূর্ণিমা। যখন কোন অংশেই আলোক পড়ে না, তখন চন্দ্র অদৃশ্য, ইহাই অমাবস্যা। চন্দ্র প্রায় ৩০ দিনে দ্বাদশ রাশি ভ্রমণ করেন। সওয়া দুইদিন করিয়া এক এক রাশিতে অবস্থান করেন। চন্দ্রের প্রভাবে জাতক মাতৃভক্ত, স্থূলকায় ও শ্লেষ্মাপূর্ণ ধাতু বিশিষ্ট হয়। যেহেতু রস ধাতুর উপর চন্দ্রের আধিপত্য অধিক। ইহার প্রতিকূলে জাতক অলস, ভীরু, মদ্যপায়ী ও মাতৃদ্বেষী হইয়া থাকে।

ধরণীপুত্র লোহিতাঙ্গ বিদ্যুৎসম প্রভাবিশিষ্ট কুমার মঙ্গল নবগ্রহের মধ্যে তৃতীয় গ্রহ। ইদানিং বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ মঙ্গল সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইহারা বলেন, মঙ্গলগ্রহে পৃথিবীর ন্যায় লোক-বাস করেন। এবং উক্ত গ্রহতে অনেক গহ্বর ও পর্ব্বতাদি আছে। যাহা হউক, মঙ্গলগ্রহ যে মানবের শুভাশুভ পক্ষে বিশেষ শক্তিশালী গ্রহ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই গ্রহ ৪৫ দিন অর্থাৎ ৩ পক্ষ করিয়া এক এক রাশিতে অবস্থান করেন ইহার প্রভাবে জাতক পিত্ত প্রধান ধাতু বিশিষ্ট, অগ্রজের প্রতি ভক্তিমান, কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহশীল ও সাহসী হয়। প্রতিকূল হইলে জাতক নিষ্ঠুর, রাজদ্রোহি, ভ্রাতৃ মৃত্যু চিন্তক ও মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে।

প্রিয়ঙ্গু পুষ্প সম অনুপম সুন্দর সর্ব্বগুণযুক্ত চন্দ্রপুত্র বুধ নবগ্রহের মধ্যে চতুর্থ গ্রহ। এই গ্রহপৃথিবী অপেক্ষা অনেক ছোট। এবং সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবংএত নিকটে অবস্থিত যে, সূর্য্যের ভ্রমণ জ্যোতির রশ্মি বুধ গ্রহকে ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করা যায়না। তবে বর্ষাকালে সূর্য্যাস্তের পর এবং শরৎকালে সূর্য্যোদয়ের সামান্য পূর্ব্বে কিছুক্ষণের জন্য দেখা যায়। বুধগ্রহ এক এক রাশিতে প্রায় ১৮ দিন করিয়া অবস্থান করেন, ইহার প্রভাবে জাতক জ্ঞানী, জ্যোতির্ব্বিদ, বাগ্মী, বালস্বভাব সম্পন্ন ও অনিন্দনীয় হয়। প্রতিকূলে মূর্খ, মুখে দুর্গন্ধযুক্ত, কদাকার ও তোতলা প্রভৃতি হইয়া থাকে।

দেবতা ও ঋষির গুরু স্বর্ণসম কান্তি বিশিষ্ট স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতালের অধিপতি বৃহস্পতি নবগ্রহের মধ্যে পঞ্চম গ্রহ। এই গ্রহ সূর্য্য অপেক্ষা ছোট অন্য অন্য গ্রহ অপেক্ষা বৃহৎ ইহার ব্যাস পৃথিবীর ব্যাস অপেক্ষা ১১ গুণ বড়। বৃহস্পতি শুভগ্রহ। এই গ্রহ জন্ম সময়ে শুভ স্থানে অবস্থান করিলে মানব বেদজ্ঞ, ধার্ম্মিক, ব্যবস্থাপক, বিচারপতি, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া জাতক এমন কি মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রতিকূলে জাতক আত্মম্ভরী, ভক্ত ও অল্প বুদ্ধিযুক্ত বৃহস্পতি অতিচারী বা বক্রগতি সম্পন্ন না হইলে প্রায় ১ বৎসর করিয়া এক এক রাশিতে অবস্থান করেন।

তুষার, কুন্দ পুষ্প অথবা মৃণাল সম শ্বেত আভা যুক্ত সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ দৈত্যগুরু শুক্র নবগ্রহের মধ্যে ষষ্ঠ গ্রহ। ইহা সূর্য্যের খুব নিকটবর্ত্তী এবং দেখিতে অতি সুন্দর। আকারে প্রায় আমাদের এই পৃথিবীর মত। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ভোরের সময় শুক্রকে দেখিতে পাওয়া যায়। এই জগৎ লোকে শুক্রকে শুক্র তারা বলে। শুক্র প্রায় ১ দিন করিয়া এক এক রাশিতে অবস্থান করেন। শুক্রের দশায় জাতক বিলাস ভোগ সুখ শান্তি ও উৎকৃষ্ট পত্নী লাভ করিয়া থাকে। প্রতিকূলে ইন্দ্রিয় স্বভাব, কুৎসিৎ ও লম্পট প্রভৃতি হয়।

সুনীল কান্তি বিশিষ্ট সূর্য্যপুত্র মহাগ্রহ শনি আমাদের নবগ্রহের নধ্যে সপ্তম গ্রহ। এই গ্রহ পৃথিবী হইতে বহুদূরে অবস্থিত। শনি অনুকুল থাকিলে জাতক নৃপতি বা তৎতুল্য ফল লাভ করে। এবং প্রতিকূল হইলে জাতককে মহাকষ্ট ভোগ করিতে হয়। শনির অধীন মানব প্রায় তমগুণ প্রধান ও চিন্তা শীল হয়। শনি গ্রহ এক এক রাশিতে ন্যূনাধিক ২ বৎসর ৬ মাস করিয়া অবস্থান করেন।

অর্দ্ধাঙ্গ বিশিষ্ট মহা বীর্য্যবান সিংহিকা সুত রাহু—ও পলাস ধূম সম ভীষণ মূর্ত্তি ক্রূর গ্রহ কেতু প্রকৃত গ্রহ না হইলেও মহাজ্ঞানী জ্যোতিষী দিগের মতে মানব অদৃষ্টের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। পৃথিবী ও চন্দ্রের ভ্রমণ পথের উত্তর ভাগ সংলগ্ন স্থানকে রাহু এবং দক্ষিণ ভাগ সংলগ্ন স্থানকে কেতু বলা যায়। চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিবার সময়ে ঐ ঐ স্থানে উপনীত হইলে পৃথিবীর উপর উহাদের যথেষ্ট শক্তি প্রকাশিত হইয়া থাকে। রবি, চন্দ্র, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহের ন্যায় গুণ থাকাতে ইহারা গ্রহ পদবাচ্য। ইহাদের অনুকুলে জাতক লক্ষ ফল লাভ করিয়া থাকে। রাহু ও কেতু সমসূত্রে অবস্থান করিয়া প্রায় দেড় বৎসর এক এক রাশিতে অবস্থান করেন।

ক্রমশঃ

সখ।

সখে দেশ উচ্ছন্ন গেল। সৌখিন লোকের সংখ্যা খুবই অধিক। সৌখিন মেয়ের ত কথাই নাই। গরীব দুঃখীর মেয়েরা পর্য্যন্ত আতর গোলাপ চায়। গোলাপী সৌরভী ত চাইবেই কেন না, তাহাদের পোষা অনেক ছেলে আছে, তাহারা ঐ সব যোগাইতেই ব্যস্ত। কিন্তু গৃহস্থের মেয়ে ছেলের এত সখ যে কেন, তাহা ত আমরা বুঝিতে পারি না।

সখ কি এক রকমে। এই ত দুর্দ্দিন অন্নকষ্ট চারিদিকে হাহাকার। অপঘাত মৃত্যু। শত সহস্র লোক দিনের পর দিন উপবাসী। শুধু অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, জলপ্লাবনও ভয়ানক, তবু কি দেশের লোকের সখ কমে? সখে দুপয়সা হাতে করিয়া গরীব দুঃখীকে দান করা আছে? আমরা এই পূজা থেকে যত সখের ফর্দ্দ পাইয়াছি, তাহার কিছু কিছু নমুনা দিতেছি। পাঠকগণ দেখুন, সখের বাজারের খরিদ্দার কত—রায় পাড়ার বিনোদিনীর বয়স কিছু কম নয়। চল্লিশ পার হইয়াছে, ছেলে, মেয়ে, নাতি, পুতিও না হইয়াছে এমত নহে। তবু কিন্তু শ্রীমতী এখনও বিনোদিনী। বিনোদিনীর বিনোদ বাবু সওদাগর আপিসে এখনও ত্রিশ টাকা বেতন পান, দুবার বাড়িবার কথা হয়, কিন্তু

কপাল ক্রমে বাড়িল না। এবার পূজার বাজারে বিনোদিনী যে ফর্দ্দ দিয়াছেন, তাহার তালিকা পাইয়াছি। মাথার জরি, গায়ের জ্যাকেট, কাঁচুলি এক ডজন, (কাঁচুলিরই বেশী দরকার) জরি দেওয়া ঢাকাই, সাবান এক বাক্স, পাইভারের অডিকলম, রিমেলের ল্যাভেণ্ডার, গোলাপী আতর এক শিশি, স্বর্গীয় পরিমল এক ডজন, নারলি একাউন্স, পমেটম এক কৌটা, কাল, সবুজ ফিতা এক এক বাণ্ডিল, তোয়ালে টার্কি চারি খানি, পাউডার এক বাক্স, ভারজেন্স বুলুম এক কৌটা, বসন্ত মালতী এক শিশি, মায় নবাবী তাম্বুল বাহার এক দফা, চেরি টুথ পেষ্ট এক কৌটা, বাকচির টুথ পাউডার এক কৌটা, সুবাসিনী তৈল এক শিশি, সিল্কের রুমাল এক ডজন, লাল সবুজ, সাদা দিয়াশলাই এক দফা, হোয়াইট রোজ, জিম রোজ, এসেন্স অব ঢামেলি, ডেমাস্ক এক এক শিশি, আরশি, চিরুণী, ব্রুস এক দফা, মেহাগ্নী, কাঠের বাক্স একটী চন্দন কাঠের হাত পাখা একখানি, অদৃশ্য কালী, ম্যাজিক পেন, "মনে রেখ ভুলনা আমায়" চিঠির কাগজ এক দফা, সচিত্র প্রেম-পত্রাবলী একখানি, ফ্রেন্স কার্ড একজোড়া, কদম্বকেলি তাস একজোড়া, হাতির দাঁতের কৌটা একটী, মেদিনীপুরের মাদুর দুটী, ছোট ভগিনীপতির জন্য সিমলার কালাপেড়ে ধুতি চাদর ও রিপণ সার্ট, "সয়ের বয়ের বকুল ফুলের ভাই ঝি জামাই" তার জন্য গন্ধ দ্রব্য ইত্যাদি কিছু কিছু ও পাড়ার মালতী মাসীর ফুট ফুটে বোনপো-টীর জন্য মিহি ফরাশডাঙ্গার ধুতি এক জোড়া, বিন্দে দিদির মেজ নাতিটীর কাঁচা বয়স, ঢল ঢলে রূপ, বাড়ী আসে যায় কিছু না দিলেই নয়, তার জন্য কাপড় এক জোড়া, সিমলার কালাপেড়ে মানায় ভাল, কাজেই তাই ইত্যাদি ইত্যাদি। খানিকটা ফর্দ্দ ছিঁড়িয়া গিয়াছে, কাজেই সব দিতে পারিলাম না, টুক্‌রাগুলি জোড় দিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাও বলিতেছি, কয়েকখানি নূতন উপন্যাস প্রিংয়ের গদি আঁটা দোদুল্যমান ইজি চেয়ার একখানি, নন্দলাল কানন্দের ছবি এক ডজন, মোম বাতি এক ডজন, আর পার যদি তোমায় আমায় যখন থাকিব তখনকার জন্য হাওয়ার সাটী একখানি, ফুলদার সিল্কের মোজা এক জোড়া আর কার্পেটের উপর জরি বসান জুতা এক জোড়া।

পাঠক দেখিলেন, বিনোদিনীর ফর্দ্দটা কতটুকু, বিনোদবাবু বাস্তু ভিটা বন্ধক দিয়াও, আমরা শুনিয়াছি, বিনোদিনীর ফর্দ্দ মতাফিক জিনিষ পত্র ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। আমরা আরো জানি, বিনোদ বাবুর বুড় মা বড় দিদি পরের বাড়ী রাঁধিয়া পেট পূর্ত্তি করিয়া থাকেন, আজ যদি বিনোদবাবু বিনো-

দিনীর ফর্দ্দ মোতাবেক জিনিস না কিনিয়া, যদি কিয়দংশের দ্বারা কষ্ট নিবারণ করিতেন; তাহা হইলে বোধ হয়, তাঁহার বাস্তু ভিটা খানি বিক্রয় হইত না, বুড়া মা বা বড়দিদিকেও আত্মীয়ের বাড়ী ভাত রাধিয়া খাইতে হইত না, কিন্তু এ সখের বাজারে সৌখিন দেশে ক-জন দুঃখী কাঙ্গালের উপর দয়া করিয়া থাকেন, তাহা করিলে বোধ হয় আজ অনাহারে এত লোককে মরিতে হইত না।

আমরা একা বিনোদিনীর ফরমাইসের তালিকা দিয়াছি। এমন কত বিনোদিনী, কমলিনী, সুহাসিনী, নবনলিনী, ননদিনী, চিত্তহারিণী, চমৎকারিণীর কত হুকুম যে, আধুনিক নব্য সভ্য বাবু মহাশয়দিগকে তামিল করিতে হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা আমাদের সাধ্যাতীত, এই সব মহাপ্রভুর আর প্রভুর অধিশ্বরীবর্গ যদি এই দুর্দ্দিনে তিল তিল করিয়া কিছু বাঁচাইতেন, তাহা হইলেও আজ অনেক দুঃখীর উপকার হইত, অনেক প্রাণ বাঁচিয়া যাইত, কিন্তু সে ভাবনা ক-জন লোকে ভাবিয়া থাকে, ভাবিতে বলিলেই বা ভাবে কই, ইহাই হইতেছে আলোচ্য অথবা "কিমাশ্চর্য্য মতঃপরম্।"

তারপর দেশের আর একদল আছেন, রেল কোম্পানীর অনুগ্রহে পূজার সময় ঘরে আর মন টিকে না। কেহ বা সিমলায় কেহ বা দার্জ্জিলিঙ্গে, কেহ বা সাগরে, কেহ বা ভূধরে, কেহ বা অতলে, কেহ বা রসাতলে, কেহ বা হোটেলে, কেহ বা ডাক বাঙ্গালায়, কেহ বা শুধুই বাড়ী, কেহ বা শ্বশুর বাড়ী পূজার ছুটিতে যাইতেছেন, যে দেশে মহামায়ার শ্রীমূর্ত্তি একেবারে দর্শন ঘটে না, বাবুদের সেই সব দেশে পূজার সময় না গেলে যেন মুখে অন্ন উঠে না। আবার এমনও অনেক আছে, বিজয়ার পরদিনই আবার ফিরিয়া আসিবেন তবু সে তিন দিন ঘরে, থাকিবেন না; এই মহাত্মা মহাপ্রভুদের যাতায়াতে রেল কোম্পানীরই লাভ। এই সব বাবুর দল যদি এ দুর্দ্দিনে সখের ভ্রমণটা বন্ধ করিয়া যদি দু-জন গরীব দুঃখীকে ঐ পয়সা দিতেন, তাহা হইলে তাহারা কতক দিন খাইয়া বাঁচিতে পারিত। কিন্তু সে বুদ্ধি তাহাদের হইবে কেন? "আমি পূজার ছুটিতে নানা দেশে বেড়াইয়া থাকি, লোকে বলিবে বাবু বড় লোক, হাওয়া পরিবর্ত্তন করিতে পাহাড়ে জঙ্গলে নানা প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, এসব দেশের কি মঙ্গল আছে না এ সব দেশের আর কখন সামাজিক উন্নতি হইবে?

দেশের অবস্থা যাহা হইয়াছে, তাহা কি কেহ ভাবিতেছেন? গবর্ণমেণ্ট ব্যয় সংক্ষেপ করিবার চেষ্টাও করিতেছেন; আমাদের বাবু মহাশয়েরা রাশি রাশি টাকা ব্যয় করিতেছেন! প্রতি বৎসর দুর্গা পূজার সময় মহামায়ার

আগমনে, যত দীন-দুঃখী মনে মনে আশা করে, পূজা বাড়ীতে গেলেই, দু-দিন খুব পেট ভরিয়া খাইতে পাইব; কিন্তু তাদের জন্য তাহা মিলিবে কি? কোন বাড়ীতে সখের থিয়েটার হয়, কোন বাড়ীতে বাইজীর ঢিমে তেতালা নাচ হয়। কাহারও গৃহে বিদ্যাসুন্দরের মালিনীর সুনীতি পুরবাসী মহিলা-দিগকে শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যাসুন্দরের দলে বায়না করা হয়। আর কত বলিব? সখের দলের বাবুদের পদে মস্তক নত করিয়া তাহাদের উপাসনা করিতে হইবে। তাহাদিগকে তোয়াজ করিবার জন্য চা, সোডা, লিমনেড, পান মুখে ধরিতে হইবে। সকলকে পবন নন্দনের মত হাত জোড় করিয়া সখের সৌখিন বাবু মহোদয়-গণের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে! দুই পাঁচ শত টাকা দিয়া ক্লাবের মেম্বর হইলে আরও ভাল হয়, সখের দলের তাহা হইলে বোধ হয় মন উঠিতে পারে। আমরা সখের দলের বাবুদের বলিয়া দিতেছি, তাঁহারা গৃহস্থের সহিত, ক্লাবের টাকার বন্দোবস্ত করুন, তাহাতেও গৃহস্থ পশ্চাৎপদ হইবে না; ইহাতে গৃহস্থ মহল মুক্ত হস্ত, কিন্তু ভিখারী আসিলে হয়ত কাহারও ভাগ্যে মুষ্টিভিক্ষা মিলিবে, নয়ত ধমক ধামক কখনও বা অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া হইবে। তাই বলিতেছি, যে দেশে এ দুর্দ্দিনে এসব খেয়াল কমে না, সে দেশের মঙ্গল আর কোথায়?

বিজয়া।

লেখক,—সাহিত্য-রত্ন শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যাবিনোদ।

(১)

(আজ), বিজয়া-দশমীর পুণ্য পরশে
জাগরে হৃদয় বিপুল হরষে
মায়ের আশিষ ধরিয়া শিরে
হয়েছ তুমি বলীয়ান্।
জাগ বঙ্গবাসী নবীন উল্লাসে
প্রবাসী সে জোনা আপন আবাসে
তিন দিন ধরি পূজেছ শক্তি
মহা মহিমার মহীয়ান্॥

(২)

বিজয় আশিষ ধরিয়া মাথে,
মেতে উঠ বঙ্গ মাতো একসাথে
ভুলিয়া দৈন্য ভুলিয়া দুখ
প্রাণে প্রাণে যাও মিলিয়া।
বেজে উঠুক প্রাণে শঙ্খ মৃদঙ্গ
নেচে উঠুক হিয়ায় নবীন রঙ্গ
ছুটুক প্রাণে নবীন পুলক
হিংসা দ্বেষ যাক্ টুটিয়া॥

(৩)

তেত্রিশ কোটি ভারতবাসী
উত্তর-বঙ্গ আছে উদাসী
পরণে নাই বাস, উদরে অন্ন;
অথচ তারা মায়ের ভক্ত।
এ রহস্য আর থাকে কেন ভাই
আলস্য-উদাস্য দূর কর ছাই
জাগাও সংযম ত্যাগের মহিমা
প্রাণে প্রাণে হও রে অনুরক্ত॥

(৪)

ত্রেতা-যুগ থেকে যে বঙ্গবাসী
মহা শক্তির পূজা করিয়া আসি
শক্তিহীন হয়ে যদি থাক ঘরে
ধিক্ সে জীবনে কাজ কি আর?
চেয়ে লও মায়ের আশীর্ব্বাদ বুলি
দাড়াও জগতে উচ্চে শির তুলি
দশ দিকে ছোট আপনা প্রসারী
দেখাও জগতে মহিমা তার॥

(৫)

সিদ্ধি হবে ভাই, পূজি গণপতি
শক্তিধরে পূজি জাগিবে শকতি
জ্ঞান-দাত্রী মোদের সরোজ-বাসিনী
ঐশ্বর্য্য দিবেন লক্ষ্মী।

শোকে তাপে সদা অন্তরে জননী
আবির্ভূতা হবেন আসিয়া আপনি
পেছনে ত্রিশূলী অমনি হাসিয়া
দাঁড়াবেন মোদের রক্ষি ॥

(৬)

তাই বলি ভাই যেতে ওঠ রঙ্গে
ভাই ভাই সবে মেলো একসঙ্গে
উঁচু নীচু যত হিসাব নিকাশ
ঝাঁটিয়ে দাও এখনি।

একই সুরে হৃদয়-তন্ত্রী
বাজিয়ে তোলো সকল মন্ত্রী
একই রাগিনী বাজে যেন প্রাণে
বাজাতে চাহিবে যখনি ॥

(৭)

তবে ত বুঝিব সার্থক বিজয়া
তবে ত বুঝিব চেয়েছেন অভয়া
সাধনার পথে সেইটীই কাজ।
সেইটীই মোদের লক্ষ্য।

নচেৎ থাকিলে তুচ্ছ হিংসা দ্বেষ
ঘুচিবে না কখনো শোক তাপ ক্লেশ
কল্প—কল্পান্তও করিলে পূজা
মা লবেন না পক্ষ ॥

(৮)

(তাই), পুণ্য বিজয়ার পুণ্য পরশে
নেচে ওঠ প্রাণ নবীন হরষে
ভক্তির সাধনা জাগুক্ প্রাণে
প্রাণে উঠুক নবীন তান।

সার্থক হউক বিজয়া-পালন
হয়ে যাক্ মোদের পাপের ক্ষালন
যত অপবাদ হউক দূর
দুর্গা দুর্গা বলে জুড়াক্ প্রাণ ॥

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

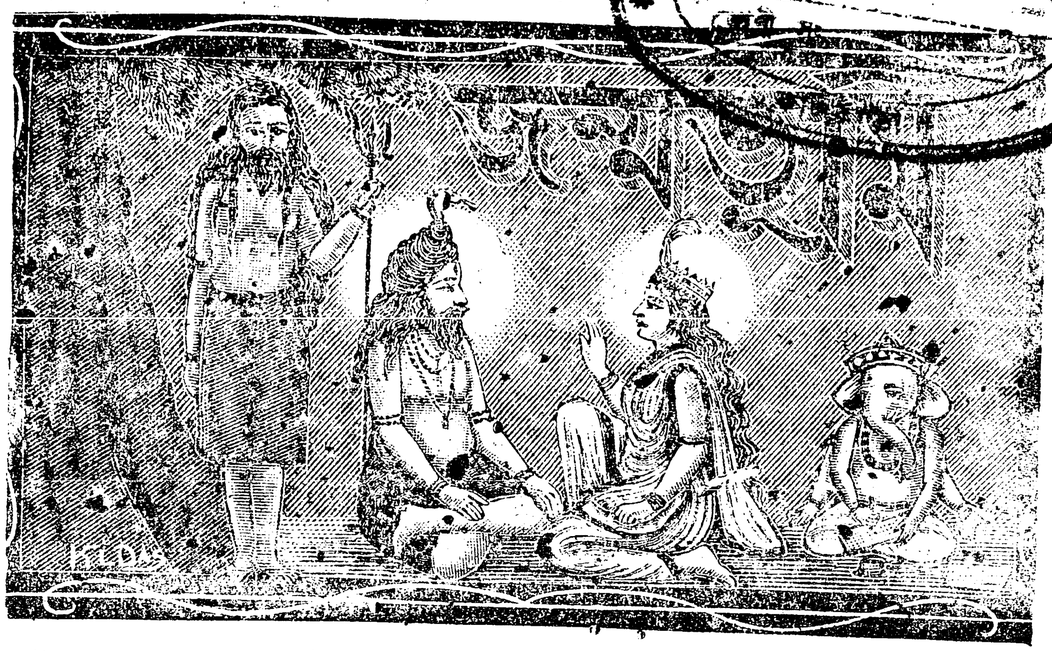

২৮শ, বর্ষ। { ১৩২৯ সাল, অগ্রহায়ণ। } ৮ম, সংখ্যা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

বর্ণ দেবতার অমর্য্যাদা।

লেখক,—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ।

সনাতন ধর্ম্মবিশ্বাসী হিন্দু আমরা, জলে, স্থলে, শূন্যে, যে দিকে আমাদের চক্ষু ধাবিত হয়, সেই দিকেই আমরা দেবতার অধিষ্ঠান স্বীকার করিয়া থাকি; সামান্য জলবিন্দু হইতে কি ধূলিকণা, কি মৃত্তিকাস্তূপ, কি ভস্ম, কি তরুলতা, কি চতুষ্পাদ জন্তু, এমন কি আকাশের পাখীটী পর্য্যন্ত আমাদের শাস্ত্রে উপাস্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য প্রহ্লাদের ন্যায় ভক্তের নিকট স্ফটিক স্তম্ভে শ্রীভগবানের অস্তিত্ব স্বীকারের ন্যায় অথবা মহামূল্যবান্ মুক্তাহারের অমর্য্যাদাকারী ভক্তকুল চূড়ামণি শ্রীরামসর্ব্বস্ব হনুমানের ন্যায় "বাসুদেব সর্ব্বম্" এই সর্ব্বোচ্চ সামর্থ্যের অধিকারী না হইতে পারি, তবে একটা উঁচু ঢিপি বা সিঁদুরাক্ত গাছ, বল্মীক ঢিপ, অথবা গোক্ষুরা সর্প দেখিলে হিন্দু আমাদের মস্তক যে তাহার

সম্মুখে দেবতা বোধে অবনত হয় ইহা অতিরঞ্জিত কথা নহে। জল স্থল শূন্য ব্যতীত আমাদের ভাষা এবং তাহার উচ্চারণ স্থল বর্ণগুলিকেও আমরা দেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি। শাস্ত্র প্রমাণেও অনুস্বার বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দুর সহিত অকারাদি ক্ষকার পর্য্যন্ত সমস্ত বর্ণগুলিও আমাদের নিকট দেবতা স্বরূপ। উক্ত বর্ণমালার উপর আমাদের এতটা বিশ্বাস ও ভক্তি যে, উক্ত বর্ণ যোজনায় নিষ্পন্ন পদসকল শাস্ত্রমত বাক্যবিন্যাসে কবচ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহার পূজন ও হৃদয়ে ধারণ করতঃ ইষ্ট দেবতার তুষ্টিসাধন হইল ভাবিয়া কৃতার্থ হই। এমন কি, মৃত্যুকালে যদি কাহারও ইষ্ট নাম স্মরণ বা উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা না থাকে তাহা হইলে তাহার বক্ষে ইষ্ট নাম লিখিয়া দিয়া, তাহার পরামুক্তি লাভের কারণ হইল ভাবিয়া একান্ত বিশ্বাসের সহিত প্রাণের শান্তি অনুভব করি। আবার জ্ঞানসম্পন্ন মুমূর্ষু ব্যক্তিও সেই আসন্নকালে তাঁহার হৃদয়ে শ্রীভগবানের পবিত্র নাম লিখিয়া দেহত্যাগ করিতে পারিলে কৃতার্থতা অনুভব করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ কোন ধর্ম্মকার্য্য করিবার সময়েও আমরা শ্রীভগবানের নামাঙ্কিত বস্ত্রে গাত্রাবরণ করিয়া পবিত্র হই। প্রাতরুত্থানের পর লেখনী ধারণ করিয়া অগ্রে ভগবানের নাম লিখিয়া মঙ্গলাচরণানুষ্ঠানে চরিতার্থ হই। বর্ণ মাত্রেই যে, আমাদের পরমানন্দলাভের মূল কারণ তাহা নিঃসন্দেহ। বর্ণগুলিতে যদি কোনরূপ পবিত্রতা বা দেবাধিষ্ঠান না থাকিত, তাহা হইলে দূরদর্শী মহামান্য শাস্ত্রকারগণ বর্ণগুলির প্রতি এরূপ সার্ব্বজনীন শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেন না। বর্ণ যোজনাতেই পুস্তকের সৃষ্টি, তদনুসারে শালগ্রামশিলা, লিঙ্গ বা প্রতিমাদির ন্যায় পুস্তকও পূজাধার রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

"লিঙ্গস্থাং পূজয়েদ্দেবীং পুস্তকস্থাং তথৈবচ।
স্থণ্ডিলস্থাং মহাদেবীং পাথুকে প্রতিমাসু চ॥"

ভদ্ভিন্ন বর্ণমাত্রই যে দেবতার প্রতিরূপ তাহা হিন্দুমাত্রই সেই স্মরণাতীত সত্যযুগ হইতে অবিসম্বাদরূপে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন।

"সত্যেঽক্ষরে স্থিতঃ শম্ভুঃ শূলপাণিস্ত্রিলোচনঃ।
প্রজাপতির্দ্বাপরেচ ত্রেতায়াং সূর্য্য এব চ।
কৃতে যুগে পিনাকী চ কলৌ লিপ্যক্ষরে হরিঃ।"

বর্ত্তমান কলিযুগে বর্ণমালায় শ্রীহরি অধিষ্ঠিত আছেন। লেখনী ও পুস্তকের পূজা হিন্দুর ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; স্মৃতির বিধানে বিদ্যারম্ভে হিন্দু

বালককে অগ্রেই বর্ণমালা লিখিতে হয়। অগ্রে বর্ণমালার পূজা না করিয়া দেবার্চ্চনা করিলে তাহাতে অঙ্গহানি হইয়া থাকে। কালিকাকুল সর্ব্বস্বে "সর্ব্ববর্ণময়ী বর্ণজপমালা বিধায়িনী" ইত্যাদি বচনে বর্ণমাত্রই জগন্মাতার প্রতিরূপ বলিয়া স্বীকার করেন। সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,—"পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।" হিন্দুর সূতিকাগারে বস্ত্রে দ্বাদশ গোপালের নাম লিখিয়া বালকের শিরোদেশে রাখিয়া ষষ্ঠীপূজার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত। অধিক কি, বর্ণের উপরেই ইষ্টমন্ত্র বীজাদির সংস্থাপন করিয়া আস্তিক হিন্দু ইহপারলৌকিক সর্ব্বার্থসাধনে কৃতার্থ হয়। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক বর্ণের সহিত দেবশক্তি কি ভাবে সংশ্লিষ্ট, এক্ষেত্রে আমরা তাহারও একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।—মনে করুন, ক একটী বর্ণ, ইহার লিখন—প্রণালী বামে দক্ষিণে ও অধোভাগে তিনটী রেখা, উপরে মাত্রা, দক্ষিণে অঙ্কুশ। শাস্ত্রপ্রমাণেই এই 'ক' বর্ণের লিখন প্রণালীতে দেখা যায় যে "বামরেখা ভবেদ্ ব্রহ্মা, বিষ্ণুর্দ্দক্ষিণ—রেখিকা। অধোরেখা ভবেদ্ রুদ্রঃ, মাত্রা সাক্ষাৎ সরস্বতী। কুণ্ডলী অঙ্কুশাকারা, মধ্যশূন্যং সদাশিবঃ।" অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সরস্বতী ও দেবজননী কুণ্ডলী সদাশিব "ক" বর্ণে অধিষ্ঠিত আছেন। যিনি যে ভাবেই "ক" বর্ণ ব্যবহার করুন না কেন, "ক" বর্ণ যে এই সকল দেবতার প্রতিরূপ, হিন্দু তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। শুধু "ক" বলিয়া নহে বর্ণ মাত্রই এইরূপ দৈবশক্তি সম্পন্ন। এবং সেই কারণেই বর্ণ মাত্রেই হিন্দুসন্তান আমাদের নিকট দেববৎ শ্রদ্ধেয়, মাননীয় ও পূজনীয়। অন্য দেশের—অন্য জাতির কথা ছাড়িয়া দিই, হিন্দু আমরা চিরদিনই বর্ণমালার নিকট অবনত মস্তক। বর্ণ সম্বন্ধে এতদ্ভিন্ন যথেষ্ট শাস্ত্র প্রমাণ সত্ত্বে আপাততঃ তৎপ্রকাশে নিবৃত্ত হইয়া কর্ত্তব্যানুরোধে প্রকাশ করিতেছি যে, বর্ণের এবম্বিধ মর্য্যাদা রক্ষক হিন্দু আমাদের দ্বারাই যদি এই বর্ণ দেবতার অমর্য্যাদাকরণ প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? বলিতে কি, হিন্দু দ্বারাই এই বর্ণ দেবতার অমর্য্যাদা হইতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াই, আজ আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। হিন্দুর তীর্থক্ষেত্রে,—হিন্দুর দেবালয়ে,—হিন্দুর মঠমন্দিরে এই বর্ণ দেবতার যেরূপ অমর্য্যাদা হইয়া থাকে, তাহাতে হিন্দু হৃদয় স্বতঃই ব্যথিত হয়। এই সকল ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অনেক ধনী, মানী, গুণী, জ্ঞানী, ভদ্রসন্তান, তাঁহার নিজের অথবা তাঁহার স্বর্গীয় পূর্ব্বপুরুষগণের কিম্বা তাঁহার মৃত স্ত্রীপুত্রাদির স্মৃতিরক্ষার জন্য মর্ম্মর প্রস্তরে তাঁহাদের নাম

খোদিত করিয়া সাধারণের গতিবিধির পথে তাহা সংলগ্ন করিয়া কৃতার্থ হন। ইহাতে তাঁহাদের মনের ভাব যাহাই থাকুক না কেন,—যে কোন পবিত্র উদ্দেশ্য লইয়াই তাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী হউন না কেন, প্রকৃতপক্ষে সাধারণের দ্বারা তাঁহারা ধর্ম্মক্ষেত্রে বর্ণ দেবতাকে পদদলিত করাইতেছেন, তাহা কি, তাঁহারাই অস্বীকার করিতে পারেন? অথচ ইহাতে কি তাঁহাদের পবিত্র উদ্দেশ্য সুসমাহিত হইতেছে বলিয়া মনে করেন? হইতে পারে,—পবিত্র দেবালয়ে এইরূপে নামের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহারা চরিতার্থতা লাভ করিতে পারেন কিন্তু প্রথমতঃ তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, ধর্ম্মক্ষেত্রে সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ বর্ণদেবতার মর্য্যাদাহানি করিয়া ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য সম্পাদিত হয় কিনা, দ্বিতীয়তঃ বিবেচ্য বিষয় এই যে, শ্রীভগবানের নামানুসারে হিন্দুমাত্রেরই নামকরণ প্রথা হিন্দুসমাজে আবহমানকাল প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। হিন্দুর বিশ্বাস যে,—শ্রীভগবানের নামানুসারে পুত্রকন্যার নামকরণ হইলে মরণকালে যদি ইষ্ট স্মরণ না হয়, তবে মায়াবসে পুত্র কন্যাকে ডাকিলেও শ্রীভগবানের নাম উচ্চারিত হইবে, ঈশ্বরের নাম মাহাত্ম্যেও হিন্দু মুক্তিপথের পথিক হইতে সমর্থ হইবে। এমন ভগবদ্ভক্ত হিন্দুর সন্তান যদি এমন পবিত্রতাপূর্ণ নামের এইরূপ অপব্যবহার করেন, তাহা হইলে তদপেক্ষা দুঃখের কারণ আর কি হইতে পারে? তীর্থ বিশেষে ইহাও দেখা যায় যে, সাধারণের গতিবিধির পথে মর্ম্মরে খোদিত এইরূপ স্মৃতিচিহ্নের উপর স্বয়ং ভগবানের নাম ও প্রণাম মন্ত্রাদিও লিখিত রহিয়াছে। ইহাতে প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মক্ষেত্রে কি ধর্ম্মের গৌরব রক্ষিত হয়? জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ভক্ত যাত্রীগণকেও বাধ্য হইয়া এই বর্ণ-দেবতাকে পদদলিত করিতে হয়, তাহাতে উভয় পক্ষেরই কি পাপাশঙ্কা সম্ভব পর নহে?

একের সদনুষ্ঠানের উপলক্ষে যদি তাঁহার নিজের দ্বারা বা সাধারণের দ্বারা কোন অসদনুষ্ঠান সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে নিবৃত্ত হইয়া—সাধারণের গমনাগমন পথে এইরূপ নাম প্রতিষ্ঠা না করিয়া মন্দিরগাত্রে বা কোন উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠা করিলে কি সকল দিক্ রক্ষা হয় না? পুণ্যক্ষেত্রে এইরূপ স্মৃতিরক্ষক ভক্তবৃন্দের সৎকার্য্যে বাধা দেওয়া অবশ্য আমাদের উদ্দেশ্য নহে, তবে বর্ণদেবতা যাহাতে পদদলিত না হন, সে সম্বন্ধে অন্য কোন সদ্ব্যবস্থা করিলে কোন প্রতিবাদের কারণ হয় না। পক্ষান্তরে আমাদের ইহাও বক্তব্য যে, উক্ত দেবালয় সমূহের কর্তৃপক্ষের এবিষয়ে লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন। বস্তুতঃ

তীর্থগুরুগণের আদেশ বা উপদেশ ব্যতীত অন্যের সে স্থলে উক্তরূপ নাম লিখিত প্রস্তরাদি সংলগ্ন করিবার কোনরূপ ক্ষমতা থাকা সম্ভবপর নহে। এক্ষেত্রে বর্ণদেবতার অমর্য্যাদায় যেমন স্মৃতিরক্ষকের তথা সাধারণ যাত্রীবর্গের পাপাশঙ্কা হয়, তেমনিও উহা সংস্থাপনের আদেশদাতা বা তৎ স্থানাধিকারপ্রাপ্ত অনুমোদনকারীগণের পক্ষেও পাপাশঙ্কা অসম্ভব বা অশাস্ত্রীয় নহে। শাস্ত্র বলেন,—

"যস্যোপদেশতঃ পুণ্যং পাপং বা কুরুতে জনঃ।
স তদ্ভাগী ভবেন্মর্ত্ত্য ইতি শাস্ত্রেষু নিশ্চয়ঃ॥"

সুতরাং এ সম্বন্ধে তীর্থগুরু, বা মঠ-মন্দিরাদির পরিচালক বা মোহান্তগণের কর্ত্তব্যদৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে ধর্ম্মের পবিত্র গৌরব সংরক্ষিত হয়। আশা করি, অতঃপর তাঁহারা দেবালয়ে স্থাপিত এইরূপ বর্ণদেবতাযুক্ত প্রস্তরগুলির স্থানান্তর ও ভবিষ্যতে ইহার শৃঙ্খলা সম্পাদনে মনোযোগী হইবেন।

—o—

সাধক-কমলাকান্ত।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মহাত্মা কমলাকান্ত অম্বিকায় গমন করিয়া শিষ্যবর্গ দ্বারা পূজিত হইয়া সর্ব্বদুঃখ বিনাশিনী পুণ্যসলিলা জাহ্নবীর সেবায় স্বর্গসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। বিশুর সহিত সাক্ষাতের বৃত্তান্ত প্রায় সকল স্থানেই প্রচারিত হইল। সাধকের ন্যায় বিশুও অনেকের দর্শনীয় হইল। অম্বিকা কালনার সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে সাধক এখন বিশিষ্টরূপে পরিচিত ও পূজিত। এই সময় ঘটনাক্রমে মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর কালনায় উপস্থিত হয়েন। কালনা সুরতরঙ্গিনীর তীরবর্ত্তী, বর্দ্ধমানাধিপতিগণের অধিকার মধ্যে পুণ্যক্ষেত্র, সেই জন্য ধর্ম্মপ্রাণ রাজগণ মধ্যে মধ্যে কালনায় গিয়া অবস্থান করেন। কালনায় বর্দ্ধমানাধিপতিগণের কীর্ত্তি কলাপ দর্শনীয়। এক শত শিবালয়, বিস্তর দেব মন্দির, সমাজ বাটী প্রশংসার যোগ্য। মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর উদার

চিত্ত, গুণগ্রাহী ও স্বজনানুরক্ত ছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তিও বিস্তর। বর্দ্ধমান অঞ্চলে অনেক পুরাতন ব্রাহ্মণ গৃহে তাঁহার স্বাক্ষরিত নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি প্রদানের পত্রিকা এখনও বিদ্যমান আছে। তিনি বদান্য ও সৎকর্ম্মপ্রিয় ছিলেন। কথিত আছে, বর্দ্ধমান রাজবাটির মোক্তার হুগলী কালেক্টারিতে দেয় রাজস্ব হইতে একলক্ষ টাকা চুরী করিয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত হন। মোক্তার বাবুকে বর্দ্ধমানে বন্দী করিয়া আনিয়া মহারাজ বাহাদুরের নিকট উপস্থিত করা হইল। মহারাজ বাহাদুর মোক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি একলক্ষ টাকা লইয়া কি করিয়াছ।" মোক্তার অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ আমি আপনার টাকা সৎকর্ম্মেই ব্যয় করিয়াছি। আমাদের গ্রামে ভাল জলাশয় নাই, আপনার প্রজাগণ ভীষণ জলকষ্ট ভোগ করে, আমি আপনার অর্থে একটি জলাশয় খনন করাইয়া মহারাণীর নামে প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। যে সকল লোক আমাকে বন্দী করিয়া আনিতে গিয়াছিল তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, আপনার পুণ্যে পুষ্করিণীর জল কিরূপ সুন্দর হইয়াছে। আমাদের গ্রামে শিবমন্দির নাই, সন্ধ্যার সময় কুমারীরা দীপ দান করিতে পান না, শিব রাত্রির দিন ও অন্যান্য পার্ব্বণে আপনার প্রজাগণ মহাদেবের পূজা করিতে পান না, আমি আপনার টাকায় একটি শিব মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া শিব লিঙ্গ স্থাপন করাইয়াছি। আমাদের গ্রামটি বর্দ্ধমান হইতে পুরী যাইবার পথে অবস্থিত, কিন্তু আমাদের গ্রামে কি কোন নিকটবর্ত্তী গ্রামে পান্থশালা নাই। আমি আপনার ব্যয়ে একটি পান্থশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছি, যে সকল লোক আমাকে আনিতে গিয়াছিল, তাহারা সেই পান্থশালায় বিশ্রাম করিয়াছিল। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন পান্থশালাটি কিরূপ বাসের উপযুক্ত হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া মহারাজা বাহাদুর কহিলেন, "দেখিতেছি এ ব্যক্তি আমার টাকা অতি সৎকর্ম্মে ব্যয় করিয়াছে।" এই কথা বলিয়া মোক্তারকে কহিলেন, "সমুদয় কাজ তোমার মনের মত হইয়াছে?" মোক্তার অতি প্রফুল্ল বদনে কহিলেন, "মহারাজ, সমুদয় কর্ম্ম আমার ইচ্ছামত সম্পূর্ণ হইয়াছে, কেবল শিবলিঙ্গটির প্রতিষ্ঠা এখনও বাকী আছে, আর এক হাজার টাকা হইলে সমারোহের সহিত আপনার নামে শিবলিঙ্গটি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব বলিয়া আশা করিতেছি।" মহারাজ বাহাদুর মোক্তারের এই কথা শুনিয়া তাহাকে এক হাজার টাকা দিয়া বিদায় দিবার আদেশ দিলেন। বসন্তপুর নামক গ্রামে মোক্তারের নিবাস ছিল। বসন্তপুর একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। কবিকুল চূড়ামণি রায় গুণাকর

ভারত চন্দ্রের জন্ম স্থান পাণ্ডুয়া নামক গ্রামের অতি সন্নিকট, হাবড়া জেলায় মুনশীর হাট রেলষ্টেশন হইতে দুই তিন ক্রোশ। পুষ্করিণী ও শিব মন্দিরটী এখনও বিদ্যমান আছে। পুষ্করিণীটির নাম "রাণীর সায়ের" ও শিবলিঙ্গটির নাম "চণ্ডেশ্বর" কালের প্রভায় পুষ্করিণীটি দীর্ঘ জলজ জালে পরিপূর্ণ। শিব মন্দিরটী ঘাটের উপর অবস্থিত সংস্কার বিহান। দেব সেবার জন্য মহারাজা কর্ত্তৃক অনেক ভূ-সম্পত্তি দেওয়া আছে, পূর্ব্বে বসন্তপুর গ্রামখানির নাম চন্দ্রালপুর ছিল। মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুরের শেষ রাণী বসন্ত কুমারীর নাম অনুসারে শুনিতে পাওয়া যায় গ্রামটির নাম বসন্তপুর হইয়াছে। প্রবাদ আছে মহারাণী বসন্তকুমারী কুমারী অবস্থায় নিজ পিতার সহিত শ্রীক্ষেত্র গমন করেন। পথমধ্যে ঐ বসন্তপুর গ্রামে একদিন অবস্থান করেন। পাণ্ডুয়া বসন্তপুর প্রভৃতি গ্রাম মহারাজা বাহাদুরের অধিকার ভুক্ত ছিল। মহারাণীর পিতা মহারাজার স্বজন জানিয়া উক্ত মোক্তার প্রমুখ গ্রামবাসীরা তাঁহাদের গ্রামে ভাল জলাশয়, শিব মন্দির ও অতিথিশালা নাই বলিয়া তাঁহার নিকট আবেদন করেন। মহারাণীর পিতা গ্রামবাসীদিগের অভাব মহারাজা বাহাদুরের কর্ণগোচর করিয়া অভাব দূরীকরণ করিবার চেষ্টা করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। শ্রীক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত হইলে মহারাজা বাহাদুর বসন্ত কুমারীর পাণি গ্রহণ করেন। মোক্তার বাবু এক্ষণে উৎসাহিত হইয়া মহারাণীর পিতা ও মহারাণীর নিকট পুনর্ব্বার আবেদন করেন ও শীঘ্র অর্থ সাহায্য পাইবেন বলিয়া আশা প্রাপ্ত হন, কিন্তু মোক্তার বাবু মহারাণী কি মহারাজা বাহাদুরের আদেশের অপেক্ষা না করিয়া বর্দ্ধমান রাজস্বের এক লক্ষ টাকা লইয়া বাটি গিয়া ঐ সকল সৎকর্ম্মে ব্যয় করিতে থাকেন। যাহা হউক মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুরের বদান্যতার আরও অনেক ইতিহাস পাওয়া যায়, সেই সকল যথাস্থলে বর্ণিত হইবে।

সাধক কমলাকান্তের সুখ্যাতি ক্রমে ক্রমে মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুরের কর্ণগোচর হইল। তিনি সাধকের সঙ্গীত শ্রবণের অভিলাষী হইলেন। মহাত্মার অধিকার ধনবান শিষ্য মহারাজা বাহাদুরের পরিচিত ছিলেন। মহারাজা বাহাদুর সেই ধনাঢ্য শিষ্যকে আহ্বান করাইয়া তাঁহার গুরুপুত্রের সঙ্গীত দ্বারা লোক বিমোহনের অসাধারণ শক্তির কথা উল্লেখ পূর্ব্বক সঙ্গীত শ্রবণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। শিষ্য অতিমাত্র প্রফুল্ল হইয়া সেই দিনই গুরুপুত্রের সহিত মহারাজার সমীপে উপস্থিত হইবেন নিবেদন করিয়া

গুরুপুত্রের নিকট আগমন পূর্ব্বক মহারাজা বাহাদুরের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সাধক হর্ষ বা বিমর্ষ প্রকাশ না করিয়া শিষ্যকে কহিলেন, "নদী পর্ব্বত, রাজগণের নিকটে সর্ব্বদা বাস ভাল নয়, কিঞ্চিৎ দূরে থাকিলেই ভাল। যখন আমরা তাঁহার অধিকারে বাস করিতেছি, যখন তিনি আমাদের পুণ্যের অংশ গ্রহণের অধিকারী, তখন তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, আমি অদ্যই সন্ধ্যার পর আপনার সহিত রাজ দরবারে গমন করিব। শিষ্য সাধকের এই কথা শুনিয়া কার্য্যান্তরে গমন করিলেন। সাধক মহামায়াকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া কহিলেন, "মা! সে দিন নির্জ্জন প্রান্তরে দস্যু মধ্যে আমাকে লইয়া কত রঙ্গ করিয়াছ রঙ্গিণী! না জানি রাজ দরবারে আমাকে লইয়া আবার কি অভিনয় করিবার ইচ্ছা আছে।"

"আজ সন্ধ্যার পর আপনার সহিত রাজ দরবারে গমন করিব।" শিষ্য কার্য্যান্তরে গমন করিলেন। কিন্তু কহিল, "রাজ দরবার! যেখানে পাপী দিগের শাস্তি হয়। মহারাজ আমার পাপের শাস্তি দিতে পার্ব্বে না?" সাধক কহিলেন, "বিশু! তুমি কি মানুষের দরবারে তোমার বিচার প্রার্থনা কর? বিশ্বেশ্বরীর দরবার আছে, সেখানে সকল লোকের বিচার হয়, তুমি বলিতেছ, তুমি পাপ করিয়াছ, তুমি পুণ্য উপার্জ্জন কর, পুণ্য কার্য্যে পাপের ক্ষয় হয়, তুমি পুণ্য কর্ম্মে পাপের ক্ষয় করিয়া সেখানে যাইতে চেষ্টা কর, দেখিবে তোমার শাস্তি হইবে না, তুমি পুরস্কার পাইবে।" বিশু করযোড়ে কাতর হইয়া কহিল, "ঠাকুর! তোমাকে সেই কাজ কর্ত্তে হবে যাতে আমি মায়ের দরবারে গেলে আমার শাস্তি না হয়, আমার পুরস্কার হয়।" বিশুর এই কথা শুনিয়া সাধক হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "বিশু! তোমার এ অন্যায় আবদার কখন বলিতেছ, ঠাকুর! আমার এ পাপের বোঝাটী নাও, কখনও বলিতেছ, ঠাকুর! আমাকে ধরে তোল, আমি পাপের গর্ত্তে পড়িয়াছি।' তুমি এত বড় বলবান পুরুষ, তুমি নিজে কিছু করিতে পারিবে না। শোন বিশু! নিজের পায়ে দাঁড়াইতে চেষ্টা কর, সর্ব্বদা পাপ পাপ করিও না কর্ম্মী হও, পৃথিবীর সকল বস্তুকে জগদম্বার আবির্ভাব জানিয়া সকলকেই আপনার পরমাত্মীয় বিবেচনা কর। ঈশ্বরীর ধ্যান, ধারণা, গুণানুকীর্ত্তন, জীবের মঙ্গল বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিও না, প্রেমের পাগল হও, প্রেম পরম বস্তু, প্রেম পরম বিদ্যা। তুমি যখন পুত্র পরিবার সত্বেও সংসার ত্যাগ করিয়া প্রকৃত বৈরাগ্য পথ অবলম্বন করিতে সক্ষম হইয়াছ, তখন তোমার

শীঘ্র শ্রেয়োলাভ হইবে।" ইহা কহিয়া সাধক বিশুকে বিষয়ান্তরে লইবার জন্য পুনশ্চ কহিলেন, "দেখ বিশু! আমি তোমার মত কেবল পাপ ভাবিতেছি না, আমি এখন ভাবিতেছি, আমাদের মনের অবস্থা অন্যরূপ, আমাদের বিষয়ী লোকের সহিত বেশী ঘনিষ্ঠতা ভাল নয়। মানুষ কখনও সর্ব্বগুণ সম্পন্ন হয় না, কেবল মাত্র আমার পরমা প্রকৃতি সর্ব্বগুণ সম্পন্না, তাঁহার উপাসনাতেও তোষামদ নাই, কারণ যাহা তাঁহার আছে তাহা মানুষ বাক্যে প্রকাশ করিতে পারে না। মানুষ মাত্রেই তোষামদ প্রিয়, বিশেষতঃ রাজগণের ও বিষয়ী লোকের সর্ব্বদা তোষামদ শ্রবণ অতি সুলভ। কোন কোন স্থলে অযথা গুণানুবাদ শ্রবণে ধনাঢ্য ব্যক্তি আনন্দ প্রকাশ না করিলেও শিষ্টতার অনুরোধে তাঁহাকে তোষামদ বাক্য শ্রবণ করিতে হয়। নিজ স্তুতি শুনিয়া মনে মনে আনন্দ প্রকাশ না করে, এরূপ মানুষ অতি বিরল। আমাদের কালীর গুণানুকীর্ত্তন ভিন্ন মানুষের স্তুতিবাদ শ্রবণে প্রবৃত্তি হয় না, তাহাতে আত্মার পরমানন্দের বিঘ্ন হয়! আরও দেখ, বিশু, বিলাস ও বিষয় এই উভয়ের পরস্পরের প্রতি ভারী সন্তোষ ভাব, তাহারা দুই সহোদর, বিষয়ী লোকের সহবাসে থাকিয়া পাছে তাহাদের বশীভূত হইতে হয়, ইহাও ভাবনার কথা। সংসারী লোকের বিশেষতঃ বিষয়ী লোকের পরমার্থ ভিন্ন অন্য অর্থ চিন্তায় অনেক সময় অতিবাহিত হয়। তাঁহাদের সহিত সর্ব্বদা সহবাস বন্ধুতা ও সজ্জনতার অনুরোধে তাঁহাদের বিষয় চিন্তার সামান্য অংশ গ্রহণ করিতে হইলে আমাদিগকে আবদ্ধ প্রাণের যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। আমরা বনস্পতির পাদদেশে বসিয়া তাহাদের প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা, পত্রাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিশ্ব রচয়ত্রীর বিচিত্র রচনা দর্শন করিয়া সুখী হইব। আমরা কখন খরতর বাহিনী তটিনীর কূলে দাঁড়াইয়া প্রত্যেক সলিল বিক্ষেপে চঞ্চলার নৃত্য দেখিয়া নৃত্য করিব। আমরা কখনও কণ্টক কাননে কণ্টকাকীর্ণ কুসুম সকলের বিকাশ দর্শনে আমাদিগের আত্মার বিকাশ কতদিনে হইবে এই ভাবিয়া চিন্ময়ীর চিন্তা করিব। আমরা কখনও বা তৃণ শস্য রহিত নির্জ্জন প্রান্তরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া চারিদিকে নবজলধর বরণীর অবস্থান অবলোকন করিয়া সুখী হইব। কখন পর্ব্বত প্রান্তে উপস্থিত হইয়া স্তরে স্তরে শিলারাশির অবস্থান ও তদুপরি মহীরুহগণের পর্য্যায় বিন্যাস দেখিয়া আনরা লীলাময়ীর লীলা দর্শন করিব। আমরা কখন নগরে, কখন জনপদে ও জনাকীর্ণ স্থানে গমন করিয়া লোক সকলের সুখে দুঃখে সমভাগী হইয়া ভবভাবিনীর

সংসার ভাবের পর্য্যালোচনা করিব। আমরা কখনও বা শশ্মান কোলে বসিয়া সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক জগতের অনিত্যতা সন্দর্শনে নিত্যানন্দময়ীর ধ্যানে বিভোর হইব।" বিশু কহিল, "ঠাকুর! আমারও তাই ইচ্ছে। কিন্তু ভয় হচ্ছে মহারাজা বাহাদুর তোমাকে ছাড়্‌বে না, কাছে রেখে সর্ব্বদা গান শুন্‌বে, দেখো ঠাকুর! আমাকে ছেড়ে যেও না।" সাধক কহিলেন, "বিশু! যদি মহারাজা বাহাদুর বলেন, "তোমাদের এ প্রকার রুক্ষ কেশ, মৃত্তিকারঞ্জিত মলিন বস্ত্র, পাদুকা বিহীন পদ আমার প্রিয় নহে। তোমাদিগকে আমার এজলাসে থাকিতে হইবে, চাপকান পরিতে হইবে, আতর গোলাপ ব্যবহার করিতে হইবে, জরী দেওয়া জুতা পায়ে রাখিতে হইবে, দেখ বিশু! এ সাজ ত্যাগ করিয়া সে সাজ পরিতে পারিবে ত?" বিশু ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "হাঁ ঠাকুর! তবে কি সে সাহেব সাজ্‌তে হবে নাকি? তা হলে যে আমার চাষ করা ভাল ছিল। আর মানুষ মার্‌তাম না। কোন স্থানে কুড়ে ঘর করে জগদম্বার মূর্ত্তি রেখে তাঁর চরণে মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে পড়ে থাক্‌তাম। সেইখানেই ফল মুল আজ্ঞাতাম, মাকে দিতাম, আমি ও খেয়ে প্রাণ ধারণ কর্‌তাম। বিশুর এই কথা শুনিয়া ঠাকুর কহিলেন, "যাও বিশু, তুমি তাই কর, তোমার ভাল হইবে। যদি আমি রাজার ঘরে যাই আমার মনের অবস্থা কিরূপ হইবে বলিতে পারি না।" বিশু কহিল, "ঠাকুর! তোমাকে না দেখে এক তিলও থাক্‌তে পার্ব্বোনা। ঠাকুর! আমি ভোলালে তুলবো না, আমি বেশ বুঝেছি, পাহাড় ভেঙ্গে যেতে পারে পৃথিবী উল্‌টাতে পারে, পূর্ব্বের সূজ্জি পশ্চিমে উদয় হতে পারে, কিন্তু আপনার মন উল্‌টাবে না। বনের পাখীকে সোণার খাঁচায় পূরে ফল মাকড় খেতে দিলে খায়না, সোণার নুপুর পায়ে দিয়ে দিলে সে নুপুর কাট্‌বারই চেষ্টা করে, নুপুর পরে নাচে না। মহারাজা বাহাদুর যতই চেষ্টা করুক, তোমার এ বেশ ছাড়াতে পার্ব্বেনা, রাজ সভাতেও ধরে রাখ্‌তে পার্ব্বেনা। সাধক মৃদু স্বরে গাহিলেন,—

অভয়ে হেদি শরণং করুণাময়ী!
কাতর অনুগত জন প্রতিপালিনী গো।
ত্রাসিত মম তনু বিষয় নিবন্ধে, ত্রাহি ত্রিতাপ বিনাশিনী গো।
ত্রিভুবন সৃজন পালন লয় কারিণী গো।
কমলাকান্ত প্রমোদ দায়িনী চন্দ্রচুড় হৃদয় বিহারিণী গো॥

বোঝা পড়া।

(গল্প)

লেখক,—শ্রীযুক্ত জীবঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(১)

তাড়াতাড়ি বইগুলো লইয়া কলেজ যাইবার সময় টেবিলের উপর লজিকের নোটবুকখানা দেখিতে না পাইয়া মনীন্দ্র চীৎকার করিয়া ডাকিল, "মা, ও মা!"

রান্নাঘর হইতে মা সারদাসুন্দরী উত্তর দিলেন, "কেন রে? এখন কলেজ যাস্‌নি যে?"

"চুলোয় যাব; টেবিলের, ওপর থেকে আমার লজিকের নোটখানা কোথায় গেল?"

"তা আমি কি জানি বাছা? আমি ত আর তোমার বয়ে হাত দিতে যাইনি।"

"তা হ'লে কি সেটা হাত পা হয়ে চলে গেল, না হাওয়ায় উবে গেল? নাঃ—তোমরা দেখ্‌ছি আমায় পাগল না করে ছাড়্‌বে না।"

"দেখ্‌ ওরকম চেঁচামেচী করিস্‌ নে, ভাল করে খুঁজে দেখ্‌। তোর ত বাপু একটা না একটা কিছু নিত্যিই হারায়, আবার নিত্যিই তা খুঁজে পাস্‌।"

মনীন্দ্র গোঁজ গোঁজ করিতে করিতে টেবিলের এটা ওটা সেটা হাঁতড়াইয়া নোটখানা খুঁজিতে লাগিল। ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল, সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছে। আজ প্রথম ঘণ্টাতেই তাহাদের ইংরাজী ছিল। অনর্থক সে ঘণ্টাটা নষ্ট হওয়ায় বিরক্তিতে তাহার চিত্তটা ভরিয়া গিয়াছিল। নিস্ফল আক্রোশে সে টেবিলের দ্রব্যাদি সে ঘরময় ছড়াইতে লাগিল। সহসা পিছন দিকে চাহিয়া দেখিল, দ্বারের অন্তরালে একটী কিশোরী দাঁড়াইয়া ফিক্‌ ফিক্‌ করিয়া হাসিতেছে। মনীন্দ্র চটীয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাসছিস্‌ কেন রে পোড়ারমুখী? মার খাবার ইচ্ছে হয়েছে?"

কিশোরী তেম্‌নি হাসিয়াই উত্তর দিল, "কাজে কাজেই; নিজের জিনিষ অন্যমনস্কে কোথাও ফেল্লে অপরকে মাল্লে বুঝি সেটা ছুটে এসে হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা দেয়?"

মনীন্দ্র পূর্ব্ববৎ রাগতস্বরে উত্তর দিল, "বেশ হয়েছে, আমার বই হারিয়েছে ; তুই ফোড়ন দেবার কে ?"

কিশোরী পুনরায় হাসিয়া উত্তর দিল, "না, আমার আর কি—তবে ওই ওপাড়ার ময়রাদের ছেলের আজ কলেজ যেতে বড্ড দেরী হচ্ছে তাই বল্‌ছিলুম।"

একখানা বই কিশোরীকে লক্ষ্য করিয়া, ছুঁড়িয়া বলিল, "মন্দা, মুখপুড়ী, বেরো ঘর থেকে।" এই বলিয়া সে কিশোরীর দিকে পিছন করিয়া পুনরায় বই খুঁজিতে লাগিল। সহসা পিছনে কাহার পদশব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখিল মন্দা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার ড্যাবডেবে চোখ দুটো জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। ধরাগলায় সে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার ওপর রাগ করেছ ?"

"আ মলো, কে বল্লে যে আমি তোর ওপর রাগ করেছি ?"

"তবে আমায় মাল্লে কেন—আমার সঙ্গে কথাই বা কচ্ছ না কেন ?"

"আমি বই হারিয়ে সমস্ত ঘরটাকে"—

"গরু খোঁজা করেছ ত ? আচ্ছা আমি তোমায় সাহায্য কচ্ছি।"

এই বলিয়া মন্দা মনীন্দ্রের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার সহিত পুস্তকান্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। সে হেঁট হইয়া টেবিলের তলাটা দেখিতে লাগিল। তাহার সযত্নস্নান একরাশ এলোন চুল সাপের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। মনীন্দ্র চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সহসা মন্দা অব্যবহার্য্য কাগজ ফেলা পাত্রটার ভিতর হইতে ধূলাধূসরিত লজিকের নোটটা বাহির করিয়া বলিল, "দেখ দেখি মণিদা, এটা কি ?"

মনীন্দ্র তাড়াতাড়ি বইখানি লইয়া বলিল, "এই যে, এই যে আমার নোট ওখানে কি করে গেল ?"

"কি করে গেল তা তুমিই জান। চেঁচিয়ে ত বাড়ী মাথায় কচ্ছিলে ; একটু যদি ক্ষমতা থাকে তোমার। দেখ দেখি আমিও এলুম, তোমার বইও বেরিয়ে গেল।"

"হ্যাঁ, তোর ক্ষমতা আছে স্বীকার করি।"

"তবে আমার বখ্‌শিশ্‌।"

"এখন বাকী রইল," বলিয়া মনীন্দ্র আর একবার ঘড়ীর দিকে চাহিয়া কলেজ চলিয়া গেল।

(২)

মণির পিতা যতীন মুখুজ্যে কৃষ্ণনগরের একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক। লক্ষ্মী-সরস্বতীর একত্রে অবস্থিতি হইলেও যতীন বাবুর গৃহে তাহার ব্যত্যয় লক্ষিত হইত। বিদ্যা ও বিভব তাঁহার প্রচুর ছিল, ছিল না কেবল ঘর মুখরিত করিবার জন্য শিশুর সরল কলহাস্য। অধিক বয়সে পত্নী সারদাসুন্দরী যখন একটী পুত্র প্রসব করিলেন, তখন যতীন বাবু নিজেকে সর্ব্বাংশে সুখী মনে করিলেন। সেই শিশুই আমাদের মণীন্দ্রনাথ। অত্যন্ত আদরের সহিত বর্দ্ধিত হইলেও যে সব দোষ বড়লোকের ছেলেকে নষ্ট করিয়া দেয়, তাহার একটাও মনীন্দ্রকে স্পর্শ করে নাই। লেখা পড়ায় তাহার অখণ্ড মনোযোগ ছিল। বাহিরের কাহারও সহিত সে বড় একটা মিশিত না। তাহার একমাত্র খেলার সাথী ছিল; পাশের বাড়ীর বিন্দুমাধব চক্রবর্ত্তীর কন্যা মন্দা। বিন্দুমাধব দরিদ্র হইলেও তাঁহার সহিত ধনী যতীন্দ্রের অবাধ মেলা-মেশা ছিল। মণি যখন চারি বৎসরের বালক বিন্দুমাধবের তখন একটী কন্যা হয়। বাল সুলভ হাস্য কলহের মধ্যে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিয়া মন্দা যখন পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইল, নবম বর্ষীয় বালক মণি তখন জ্যেষ্ঠের দাবী লইয়া শিক্ষকের আসন গ্রহণ করিল। একদিন যদি পড়ার একটু ভুল হইত, মণি মন্দার চুলের মুঠি ধরিয়া অমনি এক গাঁট্টা মারিয়া বলিত, "যা বাদরী তোর কিচ্ছু হবে না। তোর মত একটা গাধীকে পড়িয়ে আমি সময় নষ্ট করতে পারি না ; যা—আর আমি আস্‌ব না।" তারপর দু এক দিন সে আর তাহাদের বাটী যাইত না। শেষে আবার তোষামোদ করিয়া, কখনও বা একটা অর্দ্ধদষ্ট পেয়ারার ভাগ দিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিত। তাহাদের এই মান অভিমানের খেলা দেখিয়া সময় সময়ে বিন্দুমাধবের মনে একটা দুরাশা জাগিয়া উঠিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিজের দারিদ্রতা ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কথা তাঁহার বুকটাকে আঁধারে ভরিয়া দিত। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন।

আলো আঁধারের লুকোচুরির মধ্যে আরও আট নয় বৎসর অতীত হইল। মণীন্দ্রনাথ এখন গুম্ফ শ্মশ্রু শোভিত যুবক। স্থানীয় বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে সে কৃষ্ণনগর কলেজে পড়াশুনা করিতেছিল। কলেজে পড়িলেও তাহার বালসুলভ চাঞ্চল্য এখনও যায় নাই। কলেজ হইতে ফিরিয়া জলযোগান্তে সেই বাল্যের ন্যায় এখনও মন্দাদের বাড়ী গিয়া হৈ চৈ

করিত। মন্দার স্বভাবের কিন্তু বেশ একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। সে আর পূর্ব্বের ন্যায় মণির সহিত কলহ করিত না বা ডানহাতে অদ্ধদষ্ট পেয়ারা লইয়া বাঁ-হাতে মণির গলা জড়াইয়া তাহাকে খাওয়াইবার চেষ্টা করিত না। দরিদ্র বলিয়া প্রকৃতি তাহার কার্য্য সাধনে বিরত থাকিবে কেন? যথা সময়ে যৌবন তাহার সৌন্দর্য্য সম্ভার মন্দার দেহ খানাকে সাজাইতে বসিয়া গেল। হঠাৎ প্রতিবাসীরা বুঝিতে পারিল, মন্দার গলার আওয়াজটা একটু বেশী রকমের মিঠে হইয়াছে, চোখ দুখানা যেন ফিসের নেশায় ঢুলু ঢুলু করিতেছে। মন্দাও আশ্চর্য্য হইয়া গেল; মণীদার সঙ্গে দেখা হইলে কেন সে আগেকার মত মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারে না, মণীদার সঙ্গে দেখা হইলে কেন তাহার সারাদেহে একটা শিহরণ খেলিয়া যায়। অনেক ভাবিয়াও সে কিছু ঠিক করিতে পারিল না। তবে বুঝিল, একটা যেন কিছু হইয়াছে—কেন মণীর সঙ্গে এতটা মেশামেশি তাহার আর সাজে না; তাই সে সর্ব্বদাই মণির নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিত!

কন্যার এই পরিবর্ত্তন মাতা ব্রজসুন্দরীর নিকট ধরা পড়িয়া গেল। তিনি মন্দার বিবাহের জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। স্বামী বিন্দুমাধব ত নেহাইৎ গো বেচারা। বাড়ীতে হুক্কাদেবী ও বাহিরে দাসুদত্তর দাবার আড্ডা ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কিছুর সহিত তিনি বড় একটা সম্বন্ধ রাখিতেন না। ব্রজসুন্দরী ভাবিয়াই ঠিক করিতে পারেন না যে এরূপ লোক বিবাহই বা করে কেন, আর তাহার কন্যাই বা হয় কেন? যখনই তিনি স্বামীকে কন্যার বিবাহের জন্য তাগিদ করিতেন, তখনই একই উত্তর পাইতেন, যে যথা সময়ে ভগবান তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। নিতান্তই যখন পত্নীর তাগিদে ত্যক্ত হইতেন, তখন বিন্দুমাধব উঠিয়া একবার কলিকাটী বদলাইতেন মাত্র। এরূপ ব্যক্তির নিকট সকলেই পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য, সুতরাং ব্রজসুন্দরীকেও হার মানিতে হইয়াছিল।

একদিন সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিয়া প্রাত্যহিক দাবার আড্ডায় যাইবার পূর্ব্বে বিন্দুমাধব গৃহ চত্বরে বসিয়া তাম্রকুট সেবন করিতেছিলেন। পত্নী ব্রজসুন্দরী নিকটে বসিয়া কুট্‌না কুটিতে ছিলেন; মন্দা দালানঘরে ময়দা মাখিতেছিল। সহসা ব্রজসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওগো, শুনছ?"

ধূমপানপত্ত বিন্দুমাধব অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলেন, "উঁ।"

"মেয়ে যে তের পেরিয়ে চোদ্দয় পড়িল।"

বিন্দুমাধব তদ্রূপ ভাবেই উত্তর দিলেন,—"হুঁ।"

ব্রজসুন্দরী বুঝিতে পারিলেন, স্বামীর কর্ণে কিছুই প্রবেশ করে নাই। রাগতস্বরে তিনি বলিলেন, "হুঁ কি গো? আমার মাথা! না, বাপু এমন লোকের সঙ্গে যদি একটা কথা কয়েও সুখ আছে।"

ব্রজসুন্দরীর উচ্চৈঃস্বরে বিন্দুমাধব বুঝিতে পারিলেন যে, গৃহিণী এমন কিছু একটা প্রয়োজনীয় কথা বলিতেছিলেন যাহা না শোনা তাঁহার পক্ষে দোষের হইয়াছে। তাড়াতাড়ি হুঁকাটী নামাইয়া অপ্রতিভস্বরে বলিলেন, "কি বল্‌ছিলে গিন্নী, শুন্‌তে পাই নি; একটু অন্যমনস্ক ছিলুম।"

"তা আমি জানি। বলি মেয়ের বিয়ের কচ্ছ কি? মেয়ে যে চোদ্দয় পড়ল দেখতে পাচ্ছ?"

"তা ত পাচ্ছি, কিন্তু পাত্র কোথা পাই।"

"ঘরে বেস বলছ পাত্র কোথা পাই, কোন্ দিন কি খুঁজেছ?"

"কি জান গিন্নি, খুঁজে কি কর্ব্ব। ভগবান যে দিন মেয়ের বর জুটিয়ে দেবেন"——

"আবার ঐ কথা! দেখ, ফের যদি ও কথা বল তা হলে আমি অনর্থ কাণ্ড কর্ব্ব বল্‌ছি।"

"তা হলে আমায় কি কর্ত্তে বল?"

"আর পাঁচটা বাপ তাদের মেয়ের জন্যে যা কচ্ছে তুমিও তাই কর, মেয়ের বের জন্যে পাত্র খোঁজ।"

"পাত্র ত খুঁজব কিন্তু টাকা কোথায়?"

"যোগাড় কর।"

"কি করে যোগাড় কর্ব্ব?"

"তা আমি কি জানি? টাকার জন্যে কি মেয়ের বিয়ে হবে না?"

বিন্দুমাধব আবার হুঁকাটী তুলিয়া লইয়া গোটা দুই টান দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা গিন্নি, একবার যতীনদাকে বলব?"

ব্রজসুন্দরী বিশেষ বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "কি বল্‌বে, টাকা চাইবে?"

"না গো না, আমাদের মন্দার সঙ্গে মণির বিয়ের"—

"তুমি পাগল হলে নাকি? ও বাড়ীর বড়ঠাকুর সেয়া রাঢ়ী হয়ে বৈদিকের মেয়ে ঘরে নিয়ে যাবেন? এত অর্থ সমস্যা নয়, সামাজিক সমস্যা। সমাজ যদিও মত দেয়—কিন্তু তিনি কিছুতেই মত দেবেন না।"

বিন্দুমাধব পুনরায় কিয়ৎক্ষণ ধূমপান করিয়া কহিলেন, "কিন্তু আজকালকার ছেলেরা ত সেই প্রাচীন মত গুলো"—

তীব্রস্বরে ব্রজসুন্দরী কহিলেন, "মানে না, তা জানি। কিন্তু যে ছেলে বাপের কথা, সমাজের শাসন অগ্রাহ্য করে—আমার মেয়েকে বিয়ে কর্ত্তে চাইবে, সে বড় ভীষণ ছেলে। তা ছাড়া বাপের অভিসম্পাত মাথায় করে আমি মণিকে আমার মেয়েকে বিয়ে কর্ত্তে দেব না। যা হবার নয় তা ছেড়ে দিয়ে স্বঘরে নিজের অবস্থা মত একটা পাত্রের সন্ধান কর।"

রান্নাঘর হইতে মন্দা ডাকিল, "মা, উনুন ধরে গিয়েছে।"

"যাই মা," বলিয়া ব্রজসুন্দরী কুটনার থালা হস্তে রান্নাঘরের দিকে প্রস্থান করিলেন। বিন্দুমাধবও একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হুঁকাটীকে এক কোণে রাখিয়া লাঠিটী লইয়া দামুদত্তের দাবার আড্ডার উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন।

(৩)

"মন্দা—মন্দা—ওরে মন্দা"—

কলেজ হইতে ফিরিয়া জলযোগান্তে মণীন্দ্র মন্দাদের বাটী গিয়া মন্দাকে ডাকিতেছিল। মন্দা তখন ঘরদ্বার পরিষ্কার করিয়া শয্যা পাতিতেছিল। মণীন্দ্রের ডাক শুনিয়া বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মণিদা, এই যে আমি।"

"মাসী মা (মন্দার মা) কোথায় রে ?"

"মা পুকুরঘাটে গা'ধুতে গেছে। এক্ষুণি আস্‌বে'খন। তুমি বস না।" এই বলিয়া সে চত্বরে একটা আসন পাতিয়া দিল।

মণীন্দ্র আসনে বসিয়া পাঞ্জাবীর পকেটে হাত পুরিয়া একটা কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া বলিল, "বল দেখি এটা কি ?"

দুটো কৌতূহল ভরা কাল চোখের দৃষ্টি সেই মোড়কের উপর স্থাপন করিয়া মন্দা বলিল, "তুমি না বল্লে কেমন করে জানব।"

"আচ্ছা, তা হলে আগে দুটো পান নিয়ে আয় তারপর দেখ্‌তে পাবি।"

মন্দা পান লইয়া আসিলে সে পান দুটো গালে পুরিয়া তাহাকে পাশে বসিতে বলিল। মন্দা হাঁটু গাড়িয়া তাহার সম্মুখে বসিয়া পড়িল। মণি তখন মোড়কটী খুলিয়া এক টুক্‌রা অক্ষর তুলিবার বস্ত্র ও কয়েকটি গুলিসূতা সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এই নে তোর বখ্‌শিস্‌।"

"এ নিয়ে কি কর্ব্ব ?"

"এইটে বুনবিরে মুখপুড়ী—বুনবি।" এই বলিয়া সে এক টুক্‌রা কাগজ মন্দার হস্তে দিল। তাহাতে লেখাছিল,—

"আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি,
তুমি অবসর মত বাসিও।"

মন্দা কাগজটা পড়িয়া হাসিয়া বলিল, "তুমি বুঝি কাউকে ভালবাস মণিদা।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ব্রজসুন্দরী পুকুর ঘাট হইতে ফিরিতে ছিলেন। মন্দার মুখে এই প্রশ্ন শুনিয়া সহসা তিনি অন্তরালে দাঁড়াইলেন। ইচ্ছাটা, উহাদের কথাগুলো সব শোনেন।

মণি হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "বাসি বৈ কিরে, বড্ড ভালবাসি।"

"কাকে ?"

অসঙ্কোচে মণীন্দ্র বলিয়া ফেলিল, "কেন, তোকে ?"

"দুঃ—যাও," বলিয়া মন্দা মুখ নীচু করিল। লজ্জায় তাহার সারামুখখানা অস্তগামী সূর্য্যের মত লাল হইয়া উঠিল। মণিও কেমন [illegible] মন্দার অত লজ্জা হল কেন ? তাকে ভালবাসায় লজ্জা হবার কারণ কি ? তবে কি যে সেই—আরে ছি—ছি—ছি—। লজ্জায় মণীন্দ্রের মাথাকাটা যাইতে লাগিল। উভয়েই নীরব, কেহই কথা কহিতে পারিতেছিল না। অন্তরাল হইতে ব্রজসুন্দরী ব্যাপার বুঝিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "এই যে মণি ! কতক্ষণ এসেছ বাবা ?"

"এই খানিকক্ষণ আস্‌ছি মাসীমা। মন্দাকে একটা বুনতে দিতে এসেছিলাম।"

"তা বুনবে বই কি বাবা, বুন্‌বে বই কি ; বোস, আমি কাপড়টা ছেড়ে আসি।"

"না মাসী মা, আর বোস্‌ব না। আমাদের কলেজে আজ একটা খেলা আছে।" (এটী তাহার সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।)

"আচ্ছা তবে এস। ওরে মন্দা, তোর মণিদাকে দুটো পান দে।"

"পান খেয়েছি মাসীমা, আর দরকার নেই"—এই বলিয়া সে বাটীর বাহির হইয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

মণীন্দ্রনাথ চলিয়া গেলে ব্রজসুন্দরী ক্রুদ্ধস্বরে ডাকিলেন, "মন্দা।"

মাতার ক্রুদ্ধস্বর শুনিয়া চমকিত হইয়া মন্দা উত্তর দিল, "কি মা ?"

"দিন দিন কি কচি খুকী হচ্ছিস ? মণির সঙ্গে ও রকম করে মিশতে লজ্জা করে না ?"

"বা রে ! আমায় ডাকলে আমি কি কর্ব্ব ! কথা কব না ?"

"কথা কইবিনি কেন, দুচারটে কথা কয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাবি। বুঝ্‌লি ?"

"আচ্ছা।"

ব্রজসুন্দরী চলিয়া গেলেন। কন্যাকে এই আঘাত করিতে তাঁহার প্রাণেও বেশ একটু আঘাত লাগিল। কিন্তু কি করিবেন। এখন হইতে সাবধান না হইলে ব্যাপার যে অনেকদূর গড়াইবে। কাজেই তাঁহাকে এই আঘাতটুকু লইতে হইল ও দিতে হইল।

মন্দা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যাপারটা যে কি ঘটিয়া গেল, তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারিল না। সে ত আপনা হইতেই মণিদার সঙ্গে ঠিক আর বাল্যকালের মত মেশেনা। তাহার অন্তরেচ্ছাই যে কি এক অজ্ঞাত কারণে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। মণিদা বলিল, সে তাহাকে ভালবাসে, সেও ত মণিদাকে ভালবাসে। মা কি তাহাদের ভালবাসা দেখ্‌তে পারেন না বলেই এ কথা বল্লেন ? কিন্তু এতে মার স্বার্থ কি ? সে কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া মণীন্দ্রের দেওয়া সূতা প্রভৃতি লইয়া অক্ষর তুলিতে বসিয়া গেল।

(৪)

মন্দাদের বাড়ী হইতে পলাইয়া মণীন্দ্র একেবারে নিজের ঘরে চেয়ারটীতে বসিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বুককেশ হইতে একখানা বই টানিয়া লইয়া পড়িলে বসিল বটে, কিন্তু সেটা লোক দেখান মাত্র ; কারণ অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইয়া গেলেও সে পুস্তকের একখানি পাতাও উল্‌টায় নাই। সে তখন মনে মনে আজকের কাযটা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেছিল। মন্দা কেন তাহাকে ওরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল ? সে কি তাহাকে ভালবাসে ?... নিশ্চয়ই, নচেৎ প্রশ্নকরার সঙ্গে সঙ্গে কেন তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিবে ? মন্দার পক্ষে কি তাহাকে ভালবাসা অসম্ভব ? কখনই নয়। শৈশবের ক্রীড়া, বাল্যের সৌখ্য কি শৈশবের প্রেমে পরিণত হয় না ? বাল্যের শত খুঁটীনাটী ঘটনা বায়স্কোপের ছবির মত একে একে তাহার মনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল

মনে পড়িল, কতবার তাহার কাছে মার খাইয়া মন্দা নীরবে সহ্য করিয়াছে—তাহার উপর রাগ করিয়া সে তাহাদের বাটী না গেলে কতবার মন্দা তাহাকে সাধিয়া লইয়া গিয়াছে ; তারপর মনে পড়িল, তাহার উপর মন্দার কর্ত্রীত্ব। একদিন কালবৈশাখীর ঝড় মাথায় করিয়া সে কি প্রয়োজনে গঙ্গাপার হইয়া নবদ্বীপ গিয়াছিল, সেই দিন—শুধু সেই দিন মন্দা তাহার সহিত কলহ করিয়াছিল—তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিল। তারপর ভবিষ্যতে যাহাতে ওরূপ গোয়ার্ত্তমী সে আর না করে তজ্জন্য তাহাকে মন্দার অঙ্গস্পর্শ করিয়া শপথ করিতে হইয়াছিল। এ সকল কি তাহার ভালবাসার চিহ্ন নয় ? তারপর সে নিজের দিক দিয়া দেখিতে লাগিল, যে, সে মন্দাকে ভালবাসে কিনা ? দেখিল, মন্দা তাহার দৈনন্দিন প্রত্যেক খুঁটিনাটির সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে। সে যে নিজে কত বড় অগোছান, তাহা সে বেশ বুঝিত। মা সারদাসুন্দরী তাহার ঘরে শৃঙ্খলা স্থাপনে অসমর্থা হইয়া হতাশ হইয়া চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কেবল এই অশেষ ধৈর্য্যশালিনী কিশোরী অক্লান্ত পরিশ্রমে সেই দুরূহ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিল। একদিন মন্দা না আসিলে তাহার ঘরের অবস্থা এমন হইত যে, সে মন্দার প্রয়োজনীয়তা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিত। মনে পড়িল, গত বৎসর মন্দার যখন টাইফয়েড হইয়াছিল, তখন সে কলেজ কামাই করিয়া কতদিন তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কাটাইয়াছে, গভীর রাত্রে কতবার চিকিৎসকের বাটী ছুটিয়াছে ; সে সকলই কি দরিদ্র প্রতিবাসীর প্রতি নিঃস্বার্থ প্রণোদিত উপকার ? না—না—না, মন্দার জীবনে যে মণীন্দ্রের প্রয়োজন ছিল। অন্যলোক সেটাকে পরোপকার প্রবৃত্তি আখ্যা দিতে পারে কিন্তু মণীন্দ্র ত পারে না ; ভাবের ঘরে এত বড় চুরিটা সে কি করিয়া করিবে ? সেই সন্ধ্যার স্তিমিতালোকে ধ্রুবতারাটার দিকে চাহিয়া মণীন্দ্র বুঝিতে পারিল যে, জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, মন্দাকে যে তাহার জীবনের ধ্রুবতারা করিয়া ফেলিয়াছে। তাই বুঝি জীবনের এই মাহেন্দ্রক্ষণে তাহার মুখ দিয়া ভালবাসার কথা বাহির হইয়া গেল ও মন্দার ভাবও সে বুঝিতে পারিল। এইবার সে নিশ্চিন্তমনে মাতৃদেবীর কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিতে পারিবে। ক্ষতস্থানে আচম্বিতে হাত লাগিলে দারুণ ব্যথায় মানুষ যেমন করিয়া চমকিত হইয়া উঠে, বিবাহের কথা পড়িতে মণিও তেমনি করিয়া চমকাইয়া উঠিল। সে ত সমাজের কথা ভাবে নাই। নিষ্ঠুর সমাজ যে তাহাদের মধ্যে এক দুর্লঙ্ঘ্য [illegible] করিয়া রাখিয়াছে। রাঢ়ী বৈদিকের মধ্যে

বিবাহের প্রস্তাবেই যে সে অট্টহাস্য করিয়া উঠিবে। কিন্তু কেন যে এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ, কোথায় যে তাহার বিষবীজ লুক্কায়িত তাহা সে তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সমাজ তত্ত্বের যতগুলো পুস্তক সে পড়িয়াছিল তাহার মধ্যে কোনটাই এই বিরোধী ভাবের হেতু নিদর্শন করিতে পারিল না। আচ্ছা সে কি পিতা মাতার মত পাইতে পারে না? মা'টী তো একেবারে মাটীর মানুষ; তাঁহাকে সে যাহাই বুঝাইবে তিনি তাহাই বুঝিবেন। সুতরাং তাঁহাকে সম্মত করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। আর পিতার মত? সে ভার মার উপর দেওয়া হউক. তাহার উদার হৃদয়—পিতৃদেবের মত সে নিশ্চয়ই পাইবে। সহসা সে ভাবিল, মন্দাদের কথা তো ভাবে নাই; তাহাদের দিক দিয়াও যে বাধা, মন্দাদের দিক দিয়াও যে সেই বাধা। বিন্দুমাধব কি এতবড় অসামাজিক কাজ করিতে সাহস করিবেন? মণীন্দ্র অনেক ভাবিয়া শেষে ঠিক করিল যে, বিন্দুমাধবের অভিপ্রায় বুঝিয়া তবে মাতৃদেবীর নিকট কথাটা ভাঙ্গিবে। সে বিন্দুমাধবের নিকট কথাটা পাড়িবার জন্য সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অদৃষ্ট কিন্তু তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া হাস্য করিতেছিল। এমন একটা চটনা ঘটিল যাহাতে মণীন্দ্রের সমস্ত মতলব উল্টাইয়া গেল। প্রাগুক্ত সংকল্পের পরদিন মণীন্দ্রের মামার বাটী হইতে সংবাদ আসিল, মাসীমা সাংঘাতিক পীড়িতা; জীবনের আশা একেবারেই নাই। মণীন্দ্র সেই দিনই তাড়াতাড়ি করিয়া মাসীমাকে দেখিবার জন্য নবদ্বীপ চলিয়া গেল। পীড়িতা মাসীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া মাসাবধি কাল যমের সহিত সংগ্রাম করিয়াও সে তাহার মাসীটিকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। ক্লিষ্টচিত্তে সে কৃষ্ণনগরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সেখানেও তাহার মরণ বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে। নবদ্বীপ হইতে প্রত্যাগমন করার পরদিন প্রত্যুষে শয্যায় আধসুপ্তি আধ জাগরিত অবস্থায় শুইয়া শুনিতে পাইল, বিন্দুমাধব সারদাসুন্দরীকে বলিতেছেন, "আজই গায়ে হলুদ ও বিয়ে।"

বিস্মিত হইয়া সারদাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেকি ঠাকুর পো? মন্দার বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে আর আমরা এতদিন জান্তে পারিনি? কি ব্যাপারটা বল দেখি?"

"জান্তে আর পার্ব্বে কোথা থেকে? কাল সকালেও ত আমি জান্তে পারিনি। বৈকালে কথাবার্ত্তা হয়ে গিয়েছে, আর সন্ধ্যায় আমি পাত্র আশীর্ব্বাদ

করে এসেছি। তারপর সঙ্গে সঙ্গেই এসে ওরা পাত্রী আশীর্ব্বাদ সেরে গিয়েছে।

মণীন্দ্রনাথ বিছানায় উঠিয়া বসিল। নিজের কর্ণকে তাহার বিশ্বাস হইতেছিল না। মন্দার বিয়ে! এযে অসম্ভব! তাহার হাতে গড়া মন্দাকে অন্যে লইয়া যাইবে? বৃদ্ধ বিন্দুমাধব এ কি বলিতেছেন? সে রুদ্ধশ্বাসে তাহার মাতা ও বিন্দুমাধবের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিল। সারদাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাত্রটী কোথাকার?"

"বোসপাড়ার গোবর্দ্ধন ভট্টাচার্য্য।"

"কোন্ গোবর্দ্ধন ভটচায্যি? সেই সুদখোর বুড়োটা?"

নতমস্তকে বিন্দুমাধব বলিলেন, "হ্যাঁ।"

"তুমি বাপ হয়ে এই সোনার প্রতিমা মেয়েকে কেমন করে সেই ঘাটের মড়াটার হাতে তুলে দিচ্ছ ঠাকুরপো?"

ধরাগলায় ছল ছল চক্ষে বিন্দুমাধব উত্তর করিলেন, "কি কর্ব্ব বল বৌঠাকরুন, দরিদ্রের আবার পাত্রাপাত্র বিচার কি? তা ছাড়া আমাদের বৈদিকের ঘরে পাত্র কি সচরাচর মেলে? আমারও কি বাপের প্রাণে আর মেয়ের এই—" কথাটা আর তিনি শেষ করিতে পারিলেন না। একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় প্রাণটা কাঁপিয়া উঠিল। কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকার পর কোঁচার খুটে চক্ষু মুছিয় বলিলেন, "তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, মায়ের যদি আমার আয়তীর জোর থাকে তাহলে সে পাকামাথায় সিঁদুর পরে এই ঘাটের মড়া স্বামীর ঘরই কর্ব্বে।"

নিজের কথায় অপ্রস্তুত হইয়া সারদাসুন্দরী তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলেন, "নিশ্চয়ই, সে আর বল্‌তে, মা আমাদের মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী। তা হ্যাঁ ঠাকুরপো, দিতে থুতে কি রকম হবে?"

"আনন্দে একগাল হাসিয়া ফেলিয়া বিন্দুমাধব বলিলেন, "কিছু না বৌঠাকরুন একটী হর্ত্তুকী মাত্র। আমার ঘর খরচের টাকাও ওঁরা দিচ্ছে। তা দেবে নাই বা কেন, মা লক্ষ্মীর কৃপায় ত আর অভাব নেই। মন্দা আমাদের একেবারে টাকার বস্তার ওপর বসে থাকবে। জামাই বলেছে আগেকার তিনজনের সমস্ত পহনা বিয়ের রাত্রেই মন্দাকে দেবে।"

কতকটা রহস্য করিবার উদ্দেশ্যে কতকটা খোঁচা দিবার জন্য সারদাসুন্দরী হাসিয়া বলিলেন, "জামাই বাবাজীর এটী তাহলে চতুর্থ পক্ষ? তাহলে মন্দার জামাদের আদর যত্ন খুব হবে!"

বিন্দুমাধব হাসিয়া বলিলেন, "যেমন যতীনদা তোমায় আদর করে।"

"আমি ত আর ভাই নই, সে বরং ব্রজ। পোষা মেনীটির মত দিনরাত্তির তার আঁচল ধরেই বেড়াচ্চ।"

হাসিতে হাসিতে বিন্দুমাধব বলিলেন, "ওসব ঝগড়া পরে হবে এখন ; তুমি যাচ্চ কখন, বল ? এক্ষুণি গায়ে হলুদ এসে পড়বে, তার সব বন্দোবস্ত কর্ত্তে হবে। তা ছাড়া সমস্ত ভারই ত তোমার ওপর ; মন্দার মাটা কোনও কাজের নয় কেবল বকাবকি কর্ত্তে পারে।"

"তুমি এগোও আমি মণীর চা টা করে দিয়েই যাচ্ছি। সে আবার আমার তৈরী চা না হলে খায় না।"

"তার বাপও বোধ হয় খায় না ?"

কৃত্রিম কোপভরে সারদাসুন্দরী কহিলেন, "আচ্ছা চল না, তোমার ভিরকুটী ভাঙ্গছি। ব্রজর নামে তুমি আমার কাছে লাগিয়েছ বলে দিয়ে তার পায়ের তলায় তোমায় যদি নাকেখৎ না দেওয়াই ত কি বলেছি।"

বিন্দুমাধব হাসিতে হাসিতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

বিন্দুমাধব চলিয়া গেলে মণীন্দ্রনাথ শয়নকক্ষ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল ; দালানে সারদাসুন্দরী বসিয়া চা তৈয়ারী করিতেছিলেন। মণীন্দ্রের পদশব্দ পাইয়া তিনি কাজ করিতে করিতে মণীর দিকে না চাহিয়াই বলিলেন, "যা বাবা, শীগ্‌গির করে মুখ ধুয়ে এসে চা খাবারটা খেয়ে ফেল্ ; আমার আবার আজ অনেক কাজ আছে।"

সহসা তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি পড়ায় চমকিত হইয়া ভীতকণ্ঠে সারদাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কিরে মনে, তোর চোখমুখ ওমন বসে গেল কেন ? কোনও অসুখ বিসুখ করে নি ত ?"

শুষ্কহাস্যে মণীন্দ্র উত্তর দিল, "তুমিও যেমন মা, অসুখ করবে কেন ? একমাস মাসীর জন্যে রাত জেগে কি চোখ মুখের বাহার খুলবে ?" এই বলিয়া সে মুখ ধুইতে চলিয়া গেল।

মুখ ধুইয়া আসিয়া সে চা ও খাবার খাইতে বসিল। সারদাসুন্দরী পান সাজিতে সাজিতে বলিলেন, "আজ যে মন্দার বিয়ে রে ?"

"ভালই ত আমি চন্দন কাঠ কিনে আন্‌তে যাচ্ছি।"

"সারদাসুন্দরী বিস্মিত হইয়া পুত্রের মুখের দিকে চাহিলেন। অর্থটা বিশেষ বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "কেন ?"

"মন্দাকে আইবুড়ো ভাতের তত্ত্ব কর্ব্ব।"

"তুই তা হলে সব শুনেছিস নাকি ?"

"হুঁ।" বলিয়া মণীন্দ্রনাথ চায়ের পেয়ালায় মনোনিবেশ করিল।

সারদাসুন্দরী কি বলা উচিত বুঝিতে না পারিয়া কতকটা যেন আপন মনেই বলিয়া উঠিলেন, "কি কর্ব্বে বল বাপু, একে বৈদিক তায় দরিদ্র, মনের মতন পাত্র আর কোথায় পায় ?"

"কোনদিন ভাল করে খুজেছিল ? বেশ বৈদিকের ঘরে ভাল পাত্র না পাওয়া যায়, সাহস করে একবার কোনও রাঢ়ীকে বলে দেখেছিল ? বাড়ীর পাশেই——"

মণীন্দ্রনাথ চুপ করিয়া গেল। এতক্ষণ পরে সারদাসুন্দরীর চক্ষুর সম্মুখ হইতে একখানা কালো পর্দ্দা সরিয়া গেল। এখন তিনি বুঝিলেন, পুত্রের ব্যথা কোথায়। কিন্তু বড় দেরী যে! আগে জানিতে পারিলে বরং একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতেন, কিন্তু এখন বড় দেরী যে। আর ত কোনও উপায় নেই। ব্যথিত চিত্তে তিনি পুত্রের মুখের দিকে চাহিলেন। মণি তখন চা খাইয়া ডিবা হইতে দুটো পান লইয়া গালে পুরিতেছিল। সারদাসুন্দরী ধীরে ধীরে পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ একবার রাত্রে ওদের বাড়ী যাস্ বাবা! হাতে করে তুই মন্দাকে মানুষ করেছিস, না গেলে দেখ্‌তেও খারাপ হবে সেও বড় দুঃখিত হবে।"

"সে যা হয় হবে এখন।" বলিয়া মণীন্দ্র ডিবাটী হস্তে লইয়া পাঠ গৃহের দিকে চলিয়া গেল।

সারাটী দিন মণীন্দ্র তাহার পাঠগৃহটীর ভিতর বসিয়াই কাটাইল, কেবল মায়ের তাড়নায় একবার স্নানাহার করিয়া আবার সেই ঘরটীতে গিয়া ঢুকিয়াছে। এ বিবাহটা কিছুতেই সে বুঝিতে পারিতেছে না। এ কি অঘটন ঘটিয়া গেল! ইহার জন্য সেত আদৌ প্রস্তুত ছিল না। ভাগ্য নিয়ন্তার একি নিষ্ঠুর চক্রান্ত! হৃদয়ের নিভৃত কোণে এতদিন আশার যে জালখানি সে সযত্নে বুনিতেছিল, কাহার হস্তের নির্ম্মম স্পর্শে সেটী ছিঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া পড়িয়া গেল। হৃদয় শোণিত পুষ্ট যে দীপটি তাহার সারা অন্তর আলো করিয়া জ্বলিতেছিল, কাহার ফুৎকারে সেটী নিভিয়া গেল! প্রাণ লইয়া তোমার একি খেলা দয়াময়! যাহাকে পাইব বলিয়া কখনও আশা করি নাই, কেন তাহাকে পাইবার দুরাশা আমার মনে জাগাইয়া দিলে ? জাগাইয়া দিলে ত

ভাষা এবং জীবন্ত ভাবময়। ভাষা এবং ভাব উভয়ই তাহার নিজস্ব। তবে এটা ইংরাজি ছাঁচের ভাব।

এই যে জীবন্ত ভাষা বা কবিতা, তাহার নিকট কৃত্রিম ভাষা বা কৃত্রিম কবিতা ঘেঁসিতে পারে না। একত্র স্বাভাবিক এবং অন্যত্র অস্বাভাবিক। একজন পুত্র শোকার্ত্ত যেরূপ আর্ত্তনাদ করিবে, একজন থিয়েটারের প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা, কি সেইরূপ শোক প্রকাশ করিতে পারিবে? অনুকরণ কখনও স্বভাবকে ছাড়াইয়া যাইতে পারিবে না। Truth is stronger than fectom, কাজেই চন্দ্রশেখরের বিরহের কান্না, জগতের মত কবির, কৃত্রিম বিরহের কান্নাকে অতিক্রম করিয়াছে। ইহা জ্ঞানরাজ্যে একটি নূতন ও বিচিত্র জিনিষ।

বাঙ্গালার জন মণ্ডলী অতিরিক্ত কল্পনা প্রিয়, সত্যের দিকে তাহাদের অনুরাগ বড় কম। যদি তাহাদের সত্যানুযোগিতা আসে, তখন এই উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম আরও আদরের সহিত পঠিত হইবে। তবে তখন কবি আর দেখিতে আসিবেন না। এবং এখন গ্রন্থসত্ব গুরুদাস বাবুর, কাজেই তাহাতে চন্দ্রশেখর বাবুর দারিদ্র আর ঘুচিবে না।

এ গ্রন্থের বাঙ্গালা দেশে কিছু আদর হইয়াছে,—ইহা ইংরাজীতেও অনুবাদ হইয়াছে, বহুদিন পূর্ব্বে রাঁচির দ্বিজেন্দ্র নাথ সিংহ একদিন আমায় বলিলেন, —তিনি উদভ্রান্ত প্রেমের ইংরাজী করিতেছেন। ক্রমশঃ এ পুস্তক বিশ্ব সাহিত্যে স্থান পাইবে। বাঙ্গালা ভাষায় গুরুদাস বাবু ইহার অন্ততঃ কুড়িটা সংস্করণ দিয়াছেন।

বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের সময় পর্য্যন্ত, কয়েকটি জীবন্ত ভাষার নমুনা তুলি, তাহা দেখিলেই, আপনারা বুঝিতে পারিবেন, স্বভাবজ শোক প্রকাশ কেমন, এবং কৃত্রিম শোক প্রকাশ কেমন। যতক্ষণ প্রাণের স্বভাবজ আবেগ জিনিষটা যে কি তাহা না বুঝান হইতেছে, ততক্ষণ উদভ্রান্ত প্রেম যে কি, ইহার সাধারণ কবির কৃত্রিম ভাষা ও ভাবপূর্ণ গ্রন্থ হইতে বিশেষত্ব কি, বুঝান হইতেছে না। কাজেই কতকগুলি স্বভাবজ উচ্ছাস হইতে ভাষা ও ভাবের চমৎকারিতা দেখাইব।

ক্রমশঃ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

২৮শ, বর্ষ। ১৩২৯ সাল, মাঘ। ১০ম, সংখ্যা

"গুরু-শিষ্য সংবাদ।"

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

লেখক, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন।

(ন্যায়দর্শনের অন্তর্গত কুসুমাঞ্জলী গ্রন্থের অনুবাদ।)

গুরু। শরীর যদি চৈতন্যশালী হয়, তাহা হইলে, বাল শরীর ধ্বংস হইয়া যখন যৌবন শরীর উৎপন্ন হয়, তখন যৌবন কালীন শরীরে শৈশবানুষ্ঠিত কর্ম্মের স্মরণ হইতে পারে না। স্মরণ কর্ত্তার অভাবে কে তখন স্মরণ করিবে বল?

শিষ্য। বাল্য শরীরোৎপন্ন সংস্কার যৌবনান্বিত শরীরে সংক্রমিত হইয়া তৎকালে জ্ঞান জন্মাইতে পারে, তাহাতে দোষ কি?

গুরু। বাসনা অর্থাৎ সংস্কারের সংক্রমণ নাই, তাহা থাকিলে গর্ভস্থ সন্তানে জননীর সংস্কারের সংক্রমণে দৃষ্ট হইত। কিন্তু জননীর অনুভূত বস্তু

'উলু নয় রোদনধ্বনি প্রাণ কাঁদে শাঁখের ডাকে।
বাপ মা যেচে পেটের মেয়ে বলী দিতে দেয় যাকে তাকে।"

(৫)

মন্দাকিনীর বিবাহের পর চারিমাস অতীত হইয়া গিয়াছে। এই চারিমাসের মধ্যেই সংসারের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। মণীন্দ্রনাথ বি, এ, পরীক্ষা দিয়া ঘরে বসিয়া রহিয়াছে; বিবাহের একমাসের মধ্যেই মন্দা তাহার স্বমুখোচ্চারিত ভীষণ ভবিষ্যৎ বাণী সফল করিয়া পিত্রালয়ে স্থায়ীভাবে বাস করিতে আসিয়াছে। কন্যার এই দারুণ বৈধব্য সহ্য করিতে না পারিয়া পাঁচদিনের জ্বরেই বিন্দুমাধব মহাপ্রস্থান করিলেন। সাধ্বী ব্রজসুন্দরী পতি-বিয়োগের তিনদিনের মধ্যেই বিসূচিকা রোগে স্বামীর অনুগামিনী হইলেন। এইবার সংসারে মন্দা সম্পূর্ণ একাকিনী। মণীন্দ্র তাহাকে স্থায়ী গৃহ-বাসিনী করাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই সে সপত্নী নন্দিনীর সহিত বাস করিতে সম্মতা হইল না। তখন সে সেইখানেই তাহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিল। স্থির হইল মন্দা সেইখানেই বাস করিবে আর রাত্রি-কালে হারু বাগদীর মা তাহার নিকট আসিয়া শয়ন করিবে।

এইরূপ বন্দোবস্তে কয়েক মাস অতীত হইল। তারপর একটী ঘটনায় সমস্ত বিপর্য্যয় হইয়া গেল। একদিন ভোর বেলায় নিদ্রা হইতে উঠিয়া মণীন্দ্র-নাথ তাহাদের বাটী সংলগ্ন উদ্যান মধ্যে বেড়াইয়া বেড়াইতেছিল। সহসা হারুর মা ছুটিয়া আসিয়া শুষ্ককণ্ঠে হাপাইতে হাপাইতে বলিল, "দাদাবাবু গো, সর্ব্বনাশ হয়েচে।"

তাহার শুষ্কমুখ ও ভীতি বিহ্বল আকৃতি দেখিয়া মণীন্দ্রও ভীত হইল; তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েচে গা হারুর মা?"

"দাদাবাবু গো, সকাল বেলায় উঠে দিদিমণিকে আর খুঁজে পাচ্চি না।" বলিয়াই হারুর মা কাঁদিয়া ফেলিল।

"সে কি ব্যাপার হারুর মা? কি হয়েচে সব খুলে বল দেখি।"

হারুর মা কাঁদিতে কাঁদিতে অনুনাসিক সুরে যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম এইরূপ:—গতকল্য রাত্রিতে সে আহারাদি করিয়া যথা নিয়মে মন্দাদের বাটীতে শয়ন করিতে গিয়াছিল। শুইবার সময় দ্বারে অর্গলবদ্ধ করিয়া সে মেঝেতে মাদুর পাতিয়া ও মন্দা পালঙ্কের উপর শয়ন করিয়াছিল।

উঠিয়া সে দেখে যে দ্বার অর্গলমুক্ত, মন্দা শয্যায় নাই। চলিয়া যাইবার সময় মন্দাকে বলিয়া যাইবার জন্য সে তাহাকে খোঁজাখুঁজী করিতে লাগিল। পুকুর ঘাট প্রভৃতি চারিদিকে অন্বেষণ করিয়া কোথাও তাহাকে খুজিয়া না পাইয়া শেষে মণীন্দ্রকে সংবাদ দিতে আসিয়াছে।

বিশুষ্ক বদনে মণীন্দ্র হারুরমার সহিত খুঁজিতে গেল। সমস্ত পাড়াটা অন্বেষণ করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া সে বাড়ী চলিয়া আসিল। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা নানাবিধ রসাল সংযোগে গ্রামময় ছড়াইয়া পড়িল। লোকে চাপা হাসির সঙ্গে সঙ্গে মণীন্দ্রের দিকে লক্ষ্য করিয়া একটা বিশ্রী ইঙ্গিত করিতেও ছাড়িল না। মণীন্দ্রনাথ সমস্ত বুঝিল, সকলই নীরবে সহ্য করিল, তারপর কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া কোথায় চলিয়া গেল।

* * * * * *

রাত্রি তখন নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। কলিকাতার এক পল্লির রাস্তায় কিন্তু এক্ষণেও ভয়ানক ভীড়। বিলাসী বাবুগণের গাড়ী মটরের হুড়াহুড়িতে ট্রামের শব্দে রাস্তাটী গম্ গম্ করিতেছে। মাঝে মাঝে বেলফুলওয়ালারা বেলফুল হাকিয়া যাইতেছে। পথের দুইধারের বাড়ীগুলির বারান্দায় ও রোয়াকে সহরের পতিতা রমণীরা দণ্ডায়মান।

এই পথের একটা ফুটপাথের উপর দিয়া ঠিক এই সময়ে একটা মাতাল টলিতে টলিতে চলিতেছিল। কিয়ৎদূর যাইবার পর রাস্তার ধারের একখানি বাড়ী হইতে একটী কঙ্কালসার যুবতী তাহাকে ডাকিল,—"ওগো এই বাড়ীতে"——

মাতালটা থমকাইয়া দাঁড়াইল। যুবতীর দিকে ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত করিয়া হো—হো—করিয়া অট্টহাস্য করিয়া বলিয়া উঠিল,—"তুমি মন্দা? বাঃ—বাঃ—বেশ দশা হয়েছে তোমার!"

সর্পদষ্ট ব্যক্তি যেমন করিয়া চমকাইয়া উঠে যুবতীও ঠিক তেমনি ভাবে চমকাইয়া উঠিল। অস্পষ্ট স্বরে মুখ নীচু করিয়া বলিল,—"মণিদা, তোমার এই দশা।"

মণীন্দ্রনাথ বলিল,—"হা আমার এই দশা, কিন্তু করেছে কে জান? তুমি শয়তানী! তুমি আমার প্রাণভরা ভালবাসাকে পায়ে ঠেলে চলে এসে আমায় পাগল করে দিয়েছ। কেন পায়ে ঠেলেচ তা তুমি মনে জানো। ইন্দ্রিয় কি এতই প্রবল যে তুমি তার তাড়নায়, প্রাণঢালা ভালবাসা, সমাজের বন্ধন সব

ছিন্ন করে অধঃপতনের শেষ সীমায় এসে দাড়িয়েছ ? বল, আজ আমি তোমার সঙ্গে একটা 'বোঝাপড়া' কর্ত্তে চাই।"

ততোধিক উত্তেজিত কণ্ঠে মন্দা উত্তর দিল,—"হাঁ বোঝাপড়া কর্ব্বার বিষয় আমারও আছে। আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করি যে, দুর্ব্বলা রমণীর একটী মাত্র ভ্রমের কি মার্জ্জনা নাই ? পুরুষ সমাজের বুকে বসে তার দাড়ী উপড়াতে পারে, সমাজ নীরবে তা সহ্য কর্ব্বে। কিন্তু নারীর একটী মাত্র দোষও সমাজ ক্ষমা কর্ত্তে প্রস্তুত নয়। যে আমার সর্ব্বনাশ করেছে সে ত আজও সমাজের দশজনের একজন, কিন্তু আমি ফিরে যেতে চাইলে সমাজ কি আমায় তার বুকে তুলে নিত ?"

"না নিত না। তার কারণ, তোমার দোষের যে মার্জ্জনা নাই। তুমি যে সন্তানের জননী হবে। জননী যদি ব্যভিচারিণী হয় তাহলে বিশ্বে পবিত্র বলে আর কোনও জিনিষ থাকবে না। মাতৃনামের মহিমা যে ধরা পৃষ্ঠ হতে মুছে যাবে।"

মন্দা নীরবে দাড়াইয়া রহিল। হাসিতে হাসিতে মণীন্দ্রনাথ অগ্রসর হইল।

সহসা মন্দা তাহাকে ডাকিয়া বলিল,—"ওগো একটু বসে যাও।"

ঘাড় ফিরাইয়া মণীন্দ্র উত্তর দিল,—"তোমার ঘরে আর না!!!"

মণীন্দ্রনাথ তখন ঘোর উন্মাদ।

প্রসার।

লেখক,—ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,

রিক্ত মুক্ত হস্তে আজি দাঁড়ায়েছি আমি—
উদার উন্মুক্ত স্থির গগনের তলে।
সঙ্কীর্ণ সংসার গণ্ডি ; বিনিময়ে তার
সবারে লয়েছি বরি আপনার বলে॥

পৃথিবীর যত লোক, সবে মোর ভাই
সমস্ত রমণী কুল, জননী সমান।
স্বার্থোদ্ভুত হেয় প্রেম, আপনি মাজিয়া—
বিশ্বপ্রেমে মজায়েছে, এ হীন পরাণ॥
আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র দুঃখ দৈন্য
ত্যাগ-যজ্ঞ-বেদি পরে করি বলিদান।
পরদুঃখ বিমোচনে, পরার্থ সাধিতে
লভিয়াছি প্রাণে মোর প্রেরণা নূতন॥
দুঃখ দৈন্য ক্ষুব্ধ প্রাণ, আজি নব পথে
লভিয়াছে চিরশান্তি, শান্ত স্নিগ্ধ স্থল।
নাহি তাহে দুঃখোচ্ছ্বাস, চিত্তক্ষুব্ধকারী
আছে শুধু চিত্ত স্থৈর্য্য, শান্তি অনুপম॥
ঘুচে যাক্ হৃদয়ের শত দুর্ব্বলতা
লভিয়াছি যেই জ্ঞান বহু পুণ্য ফলে
সে নব আদর্শে সদা লক্ষ্য রাখি স্থির
অমর নির্ব্বাণ যেন লভি অন্তকালে॥

ভ্রান্তি।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ বেদান্তশাস্ত্রী।

পুরাতন ভারতের
ঋষি একদিন,
কহিলেন শিষ্যগণে
গল্প সমীচীন।
দৈব বশে সিংহ শিশু
মিশি মেষপালে
শিখিয়া মেষের রীতি
রহে মেষপালে॥

জানে না আপনা তাই
তৃণ ভোজী হ'য়ে
পালাত মানবে হেরি
পরাণের ভয়ে!
তারপর একদিন
শ্রীগুরুর দয়া
দেখাল সলিল পাশে
তার মুখ ছায়া।
বুঝিয়া স্বরূপ নিজ
মেষ সঙ্গ ত্যজি
সিংহদলে গেল শিশু
বীর সাজে সাজি
সেইরূপ আপনারে
জানিবে যেদিন
মানব, তোমার ভ্রান্তি
ঘুচিবে সে দিন
হেরিবে এ বিশ্বস্রষ্টা
তুমিই মানব
এ মর সংসারে ভ্রম
তোমার উদ্ভব।

সত্য-জ্ঞান।

কবিরাজ—শ্রীযুক্ত নীলকান্ত রায় সিংহ তর্করত্ন।

বটে বটে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম পর উপকার;
তবু দেশ-কাল-পাত্র করিবে বিচার।

খল উপকারে শুধু খলতারি বৃদ্ধি;
ভুজঙ্গ পালনে যথা বিষের সমৃদ্ধি।
'মহতের উপকার
শঠে শাঠ্য সুবিচার।
দানে ধর্ম্ম, দানে স্বর্গ,
দানে হেতু চতুর্বর্গ,
ছুষ্টে দিলে দান কিন্তু নরক নিশ্চিত;
'সাধু দরিদ্রকে দান শাস্ত্রানুমোদিত।'
'নিরোগে ঔষধ দিলে সৃষ্টি হয় রোগ,
রোগীর ঔষধে হয় নিরাময় ভোগ।'
'কাল কুটিলতা হেন,
নিত্য মনে থাকে যেন।'
হিংসা বটে অপকর্ম্ম,
'হিন্তুক হিংসার ধর্ম্ম।'
মিথ্যায় পাপের বৃদ্ধি সত্যে-সত্য পুণ্য;
'অনিষ্ট সত্যে যে পাপ ইষ্ট মিথ্যা গুণ্য।'
'ভাব অবস্তুতে বস্তু, বস্তু মাঝে শূন্য।'
'দোষে গুণ, গুণে দোষ, হিংসায় করুণ্য।'
'তবে হবে বুদ্ধি মান,
পাবে শুদ্ধ সত্য জ্ঞান॥'

সমালোচনা।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম হিন্দুয়ানী।—শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর লিখিত, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শর্ম্মা দ্বারা প্রকাশিত; মূল্য চারি আনা মাত্র।

রাজা বাহাদুর স্বধর্ম্মানুরাগী, বর্ত্তমান দেশ কাল পাত্র ও সময়োপযোগী এই পুস্তকখানি প্রচার করিয়া ব্রাহ্মণ্য ও হিন্দুধর্ম্মের অধঃপতনের আলোচনা করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের শোচনীয় দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য অনেক

মহানুভব ব্যক্তি অনেক রকম উপদেশ দিয়াছেন, এবং এখনও দিতেছেন। দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকায় ও পুস্তকাকারে এ সম্বন্ধে অসংখ্য সন্দর্ভ মতামত ও উপদেশ জন সমাজে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু পরামর্শ দেওয়া এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া সমাজাধীন ব্যক্তিগণকে দেখাইয়া দেওয়া আর এক বস্তু। রাজা বাহাদুর তাঁহার সুলিখিত "ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুয়ানী" পুস্তকে ব্রাহ্মণ ও হিন্দুধর্ম্ম সাধন তত্ত্বের হিতকল্পে যে সকল পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে গুলি Practical বলিয়া মনে হয়; সুতরাং রাজা বাহাদুরের আলোচনা তত্ত্বের অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিলে ব্রাহ্মণের ও হিন্দুধর্ম্ম সংসারের যথার্থই কতকটা মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা আছে। হিন্দুধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ সমাজের মঙ্গল কামনায় যাহা কিছু প্রয়োজন, সে সকল কথার কোনটাই রাজা বাহাদুর বাকী রাখেন নাই। ব্রাহ্মণ ও হিন্দু ধর্ম্মানুরাগীদিগের পাঠ করা কর্ত্তব্য। আমরা এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

ধাতু-পরিচয়।—আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ নাগ প্রণীত ও গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এই পুস্তকে বঙ্গভাষায় প্রচলিত যাবতীয় সংস্কৃত ধাতু, তাহাদের অর্থের সহিত অকারাদি ক্রমে এই পুস্তকে তালিকাকারে প্রদত্ত হইয়াছে। এই পুস্তকখানিকে বঙ্গভাষা শিক্ষার্থী বালকগণের প্রয়োজনীয় করিবার অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন; ছাত্রদিগের নিকটে "ধাতু-পরিচয়" সুপরিচিত হইলে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হইবে এ কথা বলাই বাহুল্য।

জ্যোতিষের কথা।—বর্ত্তমানকালে সামুদ্রিক জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা আমাদের দেশে লুপ্ত প্রায়, আমরা কলিকাতা ২৫নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ জ্যোতিষাচার্য্য ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ জ্যোতিষালঙ্কার মহাশয়দ্বয়ের গণনার প্রত্যক্ষ ফল দৃষ্টে বস্তুতই মুগ্ধ হইয়াছি। বিশেষতঃ পণ্ডিত ফণীন্দ্রনাথের হস্তরেখা দৃষ্টে নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার, কোষ্ঠীবিচার প্রভৃতি দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। উপরোক্ত ঠিকানায় পণ্ডিত মহাশয়দ্বয় অবস্থান করেন, গ্রহপ্রপীড়িত ব্যক্তিগণ একবার পরীক্ষা করিলে বস্তুতঃই শান্তি লাভ করিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

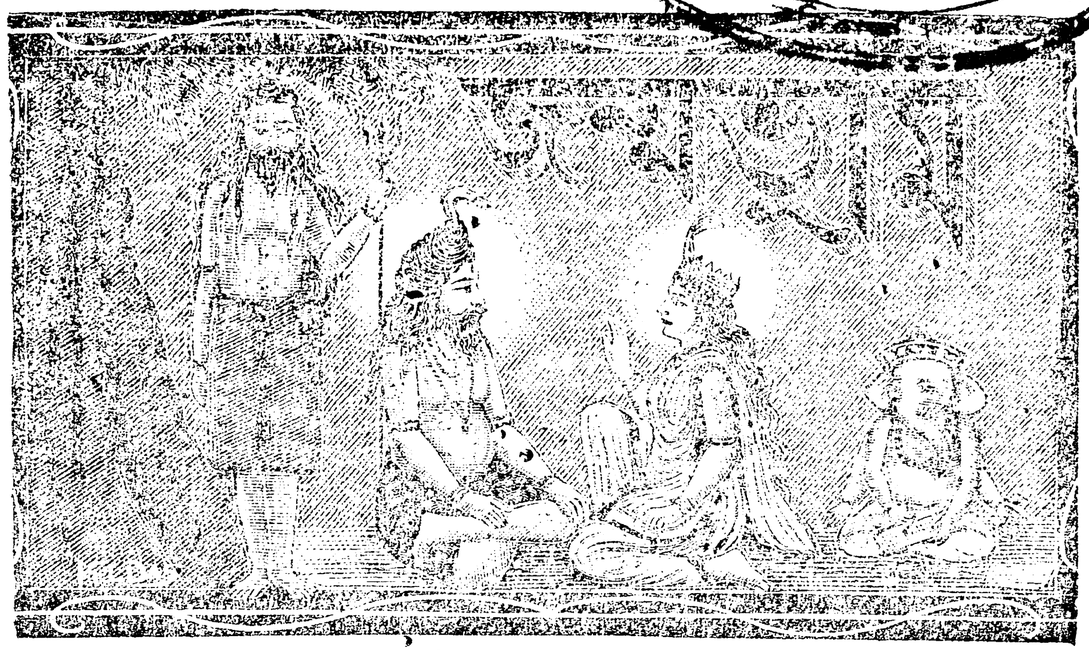

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

২৮শ, বর্ষ। { ১৩২৯ সাল, পৌষ। } ৯ম, সংখ্যা।

"গুরু-শিষ্য সংবাদ।"

লেখক, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন।

(ন্যায়দর্শনের অন্তর্গত কুসুমাঞ্জলী গ্রন্থের অনুবাদ।)

শিষ্য। গুরুদেব! এ চিরসেবকের জীবন মন ভবদীয় শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। এ অধম সেবক জনের আপনার শ্রীচরণই একমাত্র সর্ব্বস্ব। আপনি এ অধমকে অপত্য নির্ব্বিশেষে স্নেহ করেন, সেই সাহসে সাহসী হইয়া বহুদিনের সঞ্চিত চিত্তের সন্দেহ দূর করিবার জন্য আজ শ্রীপাদ মূলে উপনীত, করুণা-প্রকাশে দাসের সন্দেহ ভঞ্জন করিলে এ দাস চিরকৃতার্থ হইবে।

গুরু। বৎস! তোমার শিষ্টাচার, বিনয় নম্রতা আমার একান্ত প্রীত করিয়াছে, তুমি অসঙ্কোচে আমার নিকট স্বীয় সন্দেহ প্রকাশ করিতে পার। তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও দ্বিধা করিবার প্রয়োজন নাই।

শিষ্য। জগদীশ্বরের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব বিষয়ক দুইটী মত জগতে প্রচলিত আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকেই কোন না কোনরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাই আমাকে বলুন।

গুরু। বৎস! তুমি অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, তোমার প্রতি আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। কিরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এক্ষণে তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুবর্গ কামনায় উপনিষদ মতাবলম্বীরা বিশুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ বলিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করেন। অনিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব বশিত্ব, কামাব সায়িত্ব এই অষ্টসিদ্ধি সম্পন্ন আদি বিদ্বান অর্থাৎ জ্ঞানবান বলিয়া সাংখ্য মতাবলম্বীগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক আশয় শূন্য এবং শরীর পরিগ্রহ পূর্ব্বক জগৎ সৃষ্টি কর্ত্তা, বেদ প্রকাশক ঘটাদিবস্তুর সেই সেই সংজ্ঞান ব্যবহারের শিক্ষাদাতা রূপে (ঈশ্বরের অস্তিত্ব) স্বীকার করেন। অবিদ্যা অস্মিতা, রাগ দ্বেষ, অভিনিবেশ শুচি বোধ, দুঃখে সুখ বোধ, আত্মভিন্ন দেহাদিতে আত্ম জ্ঞান অবিদ্যা পদবাচ্য। আমি ও আমার এই প্রকার জ্ঞান অস্মিতা, বিষয়ে আসক্তিকে রাগ অর্থাৎ অনুরাগ কহে। অপ্রিয় বস্তুতে অনিষ্ট বোধকে দ্বেষ কহে। মরণ ভীতি জনক অজ্ঞান বিশেষকে অভিনিবেশ কহে।

ধর্ম্মাধর্ম্মের হেতু যাগ ও হিংসাদি কর্ম্মপদ বাচ্য। জাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, চাণ্ডালাদি আয়ুঃ জীবন কাল, ভোগ অর্থাৎ সুখ দুঃখ সাক্ষাৎকার প্রভৃতিকে বিপাক কহে। আশয়, ধর্ম্মাধর্ম্ম স্বরূপ। ঈশ্বরের ঐ সকলের সম্বন্ধ নাই। মহাও পত দর্শন মতবলম্বীরা দৃষ্ট ও অদৃষ্টদোষ শূন্য স্বাধীন ইচ্ছা বিশিষ্ট বলিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। যে দোষ দেখা যায়, তাহাকে দৃষ্ট দোষ কহে, যথা—বিষ ভক্ষণাদি। বিষ ভক্ষণে মৃত্যু প্রত্যক্ষ ফল। অদৃষ্ট দোষ ব্রহ্মহত্যাদি, উহার ফল ইহ জন্মেও ফলিতে পারে পর জন্মেও ফলিতে পারে, সুতরাং উহার ফল অদৃষ্ট। শৈবেরা যাহাকে শিব অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত। পৌরাণিকেরা যাহাকে পিতামহ অর্থাৎ কারণের কারণ, যাজ্ঞিকেরা যাহাকে যজ্ঞ পুরুষ, বুদ্ধেরা সর্ব্বজ্ঞ, দিগম্বর মতানুবর্ত্তীরা যাহাকে নিরাবরণ অর্থাৎ অবিদ্যাদি আবরণ শূন্য, উপনিষদ যাহাকে উপপাদ্য অর্থাৎ মন্ত্রাদি স্বরূপ, নাস্তিকেরা যাহাকে লোক ব্যবহার সিদ্ধি রাজাদি তুল্য বলেন, তাঁহাকেই তার্কিকেরা সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া ঈশ্বর রূপে স্বীকার করেন।

এমন কি শিল্পীরাও বিশ্বকর্ম্মা বলিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান ও অনুমিতি প্রমাণ বলে তাঁহার চিন্তা প্রভাবে অস্তিত্ব নিরূপিত হয়।

শিষ্য। জাতি গোত্র প্রবর কুল ধর্ম্ম বেদের শাখা প্রভৃতির ন্যায় জগতে চিরদিন যাহার অনুভব সুপ্রসিদ্ধ, সেই সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরের প্রতি সন্দেহ হইবার কারণ কি? সে বিষয় নিরূপণ করাইবা আবশ্যক কি?

গুরু। বৎস! তুমি সরল বিশ্বাসী ও ভক্তিমান বলিয়া এরূপ বলিতেছ, কিন্তু এ জগতে সবাই তোমার ন্যায় নহে। অধিকাংশই উপযুক্ত যুক্তি ও কারণ প্রদর্শন ব্যতীত ঈশ্বরের অপ্রামাণ্য পক্ষে পাঁচটী আপত্য উত্থাপন করেন। সেই পাঁচটী আপত্য বলিতেছি শুন!

প্রথম আপত্য এই যে, যদি পরলোক থাকে তবে তাহার উৎপাদক কোন কারণ থাকা আবশ্যক। সেই কারণ অদৃষ্ট বা কর্ম্মফল, উহাকেই প্রাক্তন কর্ম্ম কহে। উক্ত অদৃষ্ট চেতন আত্মার আশ্রিত হইয়া পরজন্মে কর্ম্মানুযায়ী সুখ দুঃখাদি বিধান করে।

শিষ্য। এইরূপ যে যুক্তি সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে। অলৌকিক পরলোক সাধন অসিদ্ধ অর্থাৎ সপ্রমাণ্য বিধায়, তাহা স্বীকার করা যায় না।

দ্বিতীয় আপত্য এই যে, যদি কেহ বলেন যাগাদি পুণ্য কর্ম্ম, পরলোক সাধন হইলেও প্রথম উপদেষ্টার অভাবে যাগাদি অনুষ্ঠান হওয়াই অসম্ভব। অতএব প্রলয়ান্তে প্রথম উপদেশা বলিয়া অবশ্যই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

শিষ্য। ঐ রূপ আপত্যও সঙ্গত নহে। কারণ—উপদেষ্টার অভাবেও যাগাদি অনুষ্ঠান হইতে পারে—সুতরাং ঈশ্বর স্বীকারের প্রয়োজন নাই।

তৃতীয় আপত্য যথা—এই জগৎ কার্য্য অর্থাৎ জন্ম বলিয়া ইহা স কর্ত্তৃক, জগতের সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব, মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব, অতএব জগৎ কর্ত্তা বলিয়া অবশ্যই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

শিষ্য। এরূপ যুক্ত সঙ্গত নহে। কারণ—একটী কারণ ভ্রমপূর্ণ হইলে, নির্ণেয় পদার্থও অনিশ্চিত হইবে। বিশেষতঃ যাহার অস্তিত্ব থাকে, তাহারই স্থান বিশেষে বা কাল বিশেষে জ্ঞানের অভাব হয়। যাহার একবারেই অস্তিত্ব নাই, যথা "শশশৃঙ্গাদি" তাহার আর জ্ঞানাভাব কিরূপে প্রত্যক্ষ হইবে? অতএব বিদ্যমান রূপে জ্ঞান না থাকায়, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বতই অপ্রমাণ হইতেছে।

চতুর্থ আপত্য যথা। প্রমাণই যাথার্থ জ্ঞানের সাধন, যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহার বলে ঈশ্বর সপ্রমাণ নহে বিধায়, ঈশ্বরের প্রমাণ্য স্বীকার্য্য নহে। প্রবল প্রমাণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, প্রত্যক্ষ মূলক, যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে প্রথমে জ্ঞাত না হয়,—পশ্চাৎ তাঁহা অনুমান বলেও সিদ্ধি হয় না; যেহেতু অনুমান প্রত্যক্ষ জন্য ব্যাপ্তি জ্ঞান বলেই সপ্রমাণিত হয়।

পঞ্চম আপত্য যথা। ঈশ্বরের প্রমাণ্য পক্ষে কোনই কারণ নাই, সুতরাং প্রমাণাভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিব কেন? যাহারা জগৎ সৃষ্টির কর্ত্তা বলিয়া ঈশ্বরের প্রামাণ্য সপ্রমাণ করিতে চাহেন তাঁহাদিগের জানা উচিৎ, যে অশরীরী কর্ত্তা কদাচ সম্ভব নহে। সুতরাং জগতের সৃজন কর্ত্তৃত্ব লইয়া তর্ক বলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

গুরু। এ জগতের কেহ ধনী কেহ নির্ধন কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ রোগী, কেহ নীরোগ এমন কি যমজ সন্তানেও পার্থক্য বৈষম্য ইত্যাদি কোনই কারণ মূলক নহে, ইহা মনে করিলেও কেমন একটা অসন্তোষ ভাব চিত্তে স্বতই উদিত হয়। জাগতিক বৈষম্য আপনিই সম্পন্ন হয় ইহা বলিলে অকারণ কার্য্যোৎপত্তি দোষ ঘটে, সুতরাং ঐরূপ উক্তি কারণ নির্দ্দেশে অক্ষমতার নামান্তর মাত্র। অপরন্তু কর্ম্ম জন্য ফল অবশ্যম্ভাবী, যদি কর্ম্মফল ভোগ একই জীবনে শেষ না হয়, তবে উহার কোন এক স্থানে অবশ্যই হইবে। সেই স্থানই পরকাল বা পরজন্ম।

বর্ত্তমান থাকিলে, অতীত ভবিষ্যৎও অবশ্যই থাকিবে। বর্ত্তমানের পূর্ব্বে যেমন ভবিষ্যৎ ছিল, তেমনি আবার বর্ত্তমানের পর অতীতও আসিবে। সেই ভাবী জন্মে অচেতন কর্ম্ম বা অদৃষ্ট স্বয়ং কালোৎপাদন করিতে অসমর্থ বিধায়, উহার সহকারী চেতন আত্মা অবশ্যই স্বীকার না করিবে কেন? সচেতন পুরুষেরা হস্ত ধৃত কুঠারাদি যেমন চেতন পুরুষের প্রযত্ন বলে কার্য্য সম্পাদন করে। অদৃষ্টও তদ্রূপ চেতন আত্মার সহকারিতায় কার্য্য সম্পাদন করিতে কেন না সমর্থ হইবে? আরও দেখা যায়, কার্য্য কারণের পরম্পরা প্যোক্ষিত্ব কার্য্য কারণের অনাদিত্ব বিশ্বের বৈচিত্র্য পরকামীর যাগাদিতে প্রবৃত্তি প্রত্যেক ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ ভোগাদি বিনা কারণে হয় না।

অতএব ঐ সমস্তের সকারণত্ব মানিতে হইবে। নচেৎ অকারণ কার্য্যোৎপত্তি দোষ ঘটে। কার্য্যও কারণের সম্বন্ধ অবচ্ছিন্ন ইহা কেন। স্বীকার করিবে?

শিষ্য। সমস্ত পদার্থের কার্য্য কারণ ভাব মানিয়া লইয়া সকারণত্ব প্রতিপন্ন

হইলেও নিখিল কার্য্যের একটা মাত্র কারণ প্রকৃতি বা ব্রহ্ম স্বীকার করাই কর্ত্তব্য। ব্রহ্ম বা প্রকৃতি কারণ হইলে, কার্য্য নাশে নিত্য সম্বন্ধ বিধায় কারণও নষ্ট হইতে পারে।

গুরু। কারণ নাশে সর্ব্বত্রই কার্য্য নষ্ট হয় না। দেখ কোন শিল্পী কোন একটি বস্তু নির্ম্মাণ করিয়া মরিয়া গেল, শিল্পী ঐ বস্তুর কারণ শিল্পী মরিয়া গেল বলিয়া কি তাহার নির্ম্মিত বস্তুও নষ্ট হইয়া যাইবে? অতএব বিশ্বনাশে বিশ্বপতির নাশ হইবে পারে না!

শিষ্য। কোন সময় অনুষ্ঠিত যাগাদি সমাপ্ত হইবার পর কালান্তরে কিরূপে স্বর্গাদি প্রাপ্তি সাধন করে বুঝি না—অনুগ্রহ পূর্ব্বক বুঝাইয়া দিন।

গুরু। যাগাদি অনুষ্ঠান জন্য শুভাদৃষ্ট উৎপন্ন হয়। ঐ অদৃষ্ট আত্মাশ্রিত হইয়া কালান্তরে স্বর্গাদি ফল উৎপাদন করে।

শিষ্য। অদৃষ্ট, সুখ দুঃখাদি তুল্য দেশবৃত্তি না বলিয়া অদৃষ্ট ভোগ্য বস্তু আশ্রয় করিয়া থাকে, ইহা বলিলে কি ক্ষতি হয়?

গুরু। তাহা হইলে কার্য্য কারণের ভিন্ন দেশ বর্ত্তিত দোষ ঘটে এবং অদৃষ্ট যদি ভোগ্য বস্তুগত হয় তাহা হইলে ভোগজনক কারণ বিদ্যমান থাকায় একের ভোগ্য বস্তুতে অন্যেরও ভোগ জন্মিতে পারে। অতএব প্রত্যেক পুরুষের অদৃষ্ট ও সুখ দুঃখাদি একদেশ বর্ত্তী অর্থাৎ একই ব্যক্তি সঙ্গত হওয়াই যুক্তি সঙ্গত। অদৃষ্ট স্বীকার করিতে উহার আশ্রয় আত্মাও স্বীকার করা কর্ত্তব্য। যেহেতু অদৃষ্ট সচেতনের সহায়তা ব্যতীত কালোৎপাদনে অসমর্থ।

শিষ্য। ক্ষণিক উৎপন্ন বস্তু মাত্রেই যে কারণ মূলক—তাহার প্রমাণ কি? বিনা কারণেও ভাব পদার্থ উৎপন্ন হইতে দেখা যায় গগন ও কণ্টকের তীক্ষ্ণতা বিনা কারণেই উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

গুরু। পদার্থ মাত্রেই অকস্মাৎ উৎপন্ন হয়। ইহা যদি বল, তাহা হইলে অকস্মাৎ শব্দের অভাব অর্থ ধরিলে, পদার্থ সৃষ্ট নহে—এই অর্থ করিতে হয়। আর অকস্মাৎ শব্দের অহেতুক অর্থ ধরিলে পদার্থ কারণ জন্য নহে, এই অর্থ করিতে হয়, কিন্তু অকারণ বস্তুর উৎপত্তি অসম্ভব। অকস্মাৎ শব্দের স্বভাব অর্থ ধরিলেও সকারণত্বই প্রতিপন্ন হয়। যেহেতু স্বভাবই কারণ স্থলাভিষিক্ত হয়। তাহা হইলে কার্য্য কারণ ভাবই কল্পিত হইয়া উঠে। তাহাতে কোনই আপত্য নাই।

শিষ্য। কার্য্যের প্রতি কার্য্যই কারণ হউক না কেন? অন্য কারণ কল্পনার প্রয়োজন কি?

শাস্ত্রের প্রামাণ্য বিধায় বেদেরও প্রামাণ্য স্থিরীকৃত হইয়াছে। সেই বেদ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন। অতএব ঈশ্বর অপ্রামাণ্য নহে।

শিষ্য। কার্য্য কারণ ভাব স্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু কর্ত্তারূপে ঈশ্বরের বিশ্বকারণত্ব স্বীকার করা যুক্তি বহির্ভূত। বেদ পৌরুষেয়, সুতরাং বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না। বেদে মন্ত্র স্রষ্টা ঋষিদিগের উল্লেখ আছে, সুতরাং তাহা পৌরুষেয়, প্রমাণ মূলক নহে, এ কারণ ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান নহে। নিশ্চয় জ্ঞানের বিষয় নহে বলিয়া ঈশ্বর প্রমাতা বা প্রামাণ্য নহে।

গুরু। সকল কালে সকল বিষয়ে ঈশ্বরের নিশ্চয় জ্ঞান আছে, উহাই ঈশ্বর জ্ঞানের উপযুক্ত কারণ। অতীন্দ্রিয় পদার্থ অনুভব ব্যতীত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বলে প্রমাণিত হয় না। সুতরাং বাক্য মনের অতীত জগদীশ্বর কিরূপে অমীস বুদ্ধিশালী মানবের কলিপত প্রমাণ বলে স্থিরীকৃত হইবে? সুতরাং প্রমাণের অতীত হইলেই বস্তু অসিদ্ধ হয় না।

শিষ্য। যোগ্য অর্থাৎ উপযুক্ত কারণ ব্যতীত অনুভবও হয় না, যোগ্য কারণের অভাবে ঈশ্বরের অনুভব অসিদ্ধ।

গুরু। আদি বিশ্বোৎপত্তি কালে মনুষ্যাভাবে তদুৎপাদকরূপে অবশ্যই ঈশ্বরের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

শিষ্য। কারণ কদাচ বিলয় হয় না, সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের বিকাশ হয়। সুতরাং মহাপ্রলয়াভাবে জগৎ কর্ত্তারূপে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে পারি না। বিশেষ বদ্ধ বা মুক্তের একতরের দ্বারা সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব বিধায়, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে পারি না।

গুরু। জড়ের অন্তরে যে ক্রিয়া দৃষ্ট হয়, উহা চৈতন্যেরই শক্তি। ব্রহ্ম স্বয়ং বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াছেন। ইহা কি বিশ্বাস করিতে পার?

শিষ্য। তাহাও অসম্ভব, যেহেতু অবিকারী ব্রহ্মের পরিণামে জগৎ সৃষ্ট হইতে পারে না। দ্বিতীয়ত নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিরাকার ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব।

গুরু। জন্মান্তর স্বীকার করিলে অদৃষ্টাশ্রয় আত্মাও স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে আত্মা ঈশ্বরাংশ বলিয়া ঈশ্বরও স্বীকার করিতে হয়।

শিষ্য। জন্মান্তর একটা প্রমাণ বলে প্রমাণীকৃত নহে, সুতরাং তাহা অস্বীকার্য্য। সুতরাং তদাশ্রয় আত্মাও অস্বীকার্য্য।

গুরু। জন্মান্তর না থাকিলে মানব মণ্ডলী মধ্যে ঘোর বৈষম্যের কারণ কি?

শিষ্য। জন্ম, শিক্ষা, বংশ, সঙ্গ, পিতা মাতার মনোবৃত্তির অবস্থা ভেদ, বিবিধ স্থূল সূক্ষ্ম কারণে মানব মণ্ডলীর মধ্যে বৈষম্য লক্ষিত হয়। তজ্জন্যজন্মান্তর স্বীকারের প্রয়োজন দেখি না।

গুরু। বাল্য দেহোৎপন্ন সংস্কার যৌবনে লক্ষিত হয়, আত্মা বলিয়া যদি স্বতন্ত্র কিছু না থাকে, তবে বাসনা সংক্রম অস্বীকৃত বিধায় কিরূপে তাদৃশ সংস্কার জন্য জ্ঞান সিদ্ধায়?

শিষ্য। বাল্যদেহের পরমাণু যুঞ্জ যৌবন দেহে সংস্কার উৎপাদন করিয়া দিয়া বিনষ্ট হয়। তাহা হইলে বাল্য সংস্কার জন্য জ্ঞানের কোনই বাধা হইতে পারে না।

গুরু। দেখা যায় তিরস্কার বা প্রহার বশতঃ স্থূল দেহের কোনরূপ বিকৃতি ঘটে না, চিত্তেরই বিকৃতি ঘটে। তবে দেহাতিরিক্ত আর একটা কিছু স্বীকার করিবে না কেন? সেই আর কিছুই আত্মাপদ বাচ্য।

শিষ্য। দেহ ভিন্ন জ্ঞান আছে, মনও আছে, মন সূক্ষ্ম বায়বীয় ইন্দ্রিয় তিরস্কারাদি জন্য বিকৃতি মনেরই ঘটে, দেহ অবিকৃতই থাকে। তাহাতে আত্মা স্বীকৃত হইল কিরূপে?

গুরু। আত্মা ও মনের সংযোগ ব্যতীত জ্ঞান জন্মে না। জ্ঞান মানিতে হইলে অবশ্যই আত্মা স্বীকার করিতে হইবে।

শিষ্য। মন, অন্তঃকরণ ও বুদ্ধি এই তিন অংশে বিভক্ত, বুদ্ধ্যংশ হইতে ইন্দ্রিয় সাহায্যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। স্বতন্ত্র আত্মার প্রয়োজন কি?

গুরু। কোন বস্তুর অভাব ধারতে হইলে, যাহার অভাব ধরা যায়, তাহার অস্তিত্ব থাকা আবশ্যক। নচেৎ অলীক বস্তুর অভাব গৃহীত হয় না। আকাশ কুসুম নাই এমত অভাব কেহই গ্রহণ করেন না। যেহেতু উহা স্বতই অলীক পদার্থ। নাই, নাই এমত কদাচ প্রয়োগ হয় না। যাহা আছে তাহাই নাই হইতে পারে। ঈশ্বর যদি বস্তুত অলীক পদার্থ হন, তবে তাহার অভাব অর্থাৎ "ঈশ্বরোনাস্তি" ইত্যাদি কিরূপে বলা যায়? অতএব ঈশ্বর নাই বলিলেই, তাহার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়া উঠিতেছে।

শিষ্য। শিল্পাগণ বিশ্বকর্ম্মাকে ঈশ্বর বলে, ভূপতি ঈশ্বর পদবাচ্য, জীবন্মুক্ত পুরুষ বা সিদ্ধ ব্যক্তি ঈশ্বর পদবাচ্য। তাদৃশ ঈশ্বর লইয়া ঈশ্বরাভাব সিদ্ধ হইতে পারে। ঈশ্বরাভাব অসঙ্গত হইবে কেন?

ভক্ত ও ভগবান।

লেখক,—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস।

(গত বৎরের "জন্মভূমি"তে প্রকাশিত
"ভক্তিপ্রিয় মাধব" গল্পের পরবর্ত্তী ঘটনা।)

গুরুদেবের সহিত ভক্ত নিত্যানন্দ রায় শ্রীধাম বৃন্দাবনে বাস করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ এখন সংসার মুক্ত, সংসারের জন্য তাঁহার আর কোন চিন্তা নাই, তাঁহার যে পুত্র-পৌত্রাদি আছে, তাহাও তাঁহার মনে নাই। তিনি কেবল ভাববিহ্বল চিত্তে শ্রীরাধাগোবিন্দ নাম জপ করিতে করিতে তাঁহাদের লীলাস্থান সমূহ দর্শন করিয়া বেড়ান, প্রসাদ পান; সকল স্থানেই তাঁহার অবারিত দ্বার, সকল স্থানেই তাঁহার সমান আদর।

গুরুদেবও নিত্যানন্দের সঙ্গেই ঘুরিয়া বেড়ান, তিনিও নিত্যানন্দের মত কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভগবানকে ডাকিতে থাকেন বটে, কিন্তু উভয়েরই হৃদয়ের ভাব স্বতন্ত্র। নিত্যানন্দ কাঁদেন—ভগবানকে দেখিতে দেখিতে প্রেমবিহ্বল হইয়া; আর গুরুদেব কাঁদেন—তীব্র মর্ম্মান্তিক যাতনায়। গুরুদেব মন্দির মধ্যে ভগবানকে দর্শন করিতে গেলেই দেখেন, মন্দির শূন্য—অন্ধকার! এ আবার লীলাময়ের কি লীলা? ভক্তের নিকট একি কম মনস্তাপ? একি কম যাতনা? গুরুদেব দিবানিশি আকুল হৃদয়ে, মনের জ্বালায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভগবানের উদ্দেশে বলিতে থাকেন,—"হে যশোদানন্দন, হে রাধাকান্ত, হে শ্যামসুন্দর, হে বৃন্দাবন চাঁদ, দয়া কোরে একটি বার এ মহাপাপীকে দর্শন দাও। দয়াল হরি, আর কতদিন এ অধমকে এরূপ ভাবে উপেক্ষা করবে।"

সুতরাং নিত্যানন্দ নিত্য প্রিয় দর্শন জন্য প্রেমানন্দে বিহ্বল, আর গুরুদেব প্রিয় অদর্শন জন্য বেদনাক্লিষ্ট; বিরহানলে জর জর। দুইটি ভাবই বড় সুন্দর—অত্যন্ত মধুর।

এই ভাবে এক বৎসর কাটিয়া গেল। আবার ভক্তের প্রাণানন্দকর শ্রীশ্রীদোল পূর্ণিমা আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু গুরুদেবের ভাগ্যে রাধাশ্যাম দর্শন ঘটিল না! সুদীর্ঘ বর্ষ ব্যাপিয়া গুরুদেব কত কাঁদিলেন, কত মনের ব্যথা জানাইলেন, কিন্তু বৃথাই, বৃন্দাবন চাঁদ তো গুরুদেবকে দর্শন দিলেন না, তিনি

যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিলেন। গুরুদেব মনে মনে ভাবিলেন,—"হায়! আমি না কতই অপরাধী।" আবার পর ক্ষণেই সঙ্কল্প করিলেন,—

"মরিব মরিব আমি নিশ্চয় মরিব"
কৃষ্ণ উপেক্ষিত প্রাণ আর না রাখিব।
রাধাকৃষ্ণ নামে যদি নাহি পাই সুধা,
হলাহল পান করি নিটাইব ক্ষুধা।

পূর্ণিমার পূর্ব্বরাত্রে গুরুদেব স্বপ্ন দেখিলেন যে, এক রক্তাম্বরা ভুবনমোহিনী রমণী মূর্ত্তি তাঁহার শিরোদেশে দাঁড়াইয়া মৃদু মধুর স্বরে বলিলেন,—"বৎস! তুমি একজন ভগবদ্ভক্ত পুরুষ, কিন্তু তুমি ভক্তদ্রোহী অপরাধে অপরাধী বলিয়া এ পর্য্যন্ত তোমার বাসনা অপূর্ণ রহিয়াছে। তোমার সুযোগ্য শিষ্য নিত্যানন্দ একান্ত গুরুভক্ত ও কৃষ্ণভক্ত। গত বৎসরের ঘটনা স্মরণ করিয়া দেখ, তুমি তাহাকে কিরূপ বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিলে। সুতরাং যে পর্য্যন্ত তুমি ভক্ত নিত্যানন্দের নিকট ক্ষমা না পাও, সে পর্য্যন্ত তোমার বাসনা অপূর্ণ থাকিবে, তুমি বৃন্দাবন চাঁদের দর্শন পাইবে না। ভগবান নিজের অপমান সহ্য করতে পারেন, কিন্তু ভক্তের অপমান সহ্য করতে পারেন না।"

রমণী মূর্ত্তি অদৃশ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেবেরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ভাবিলেন,—"সত্যই তো আমি ভক্তদ্রোহী—আমার শিষ্য নিত্যানন্দের নিকট অপরাধী, তবে কি এখনও নিত্যানন্দ আমাকে ক্ষমা করে নাই?

গুরুদেবের শয্যার নিকটে নিত্যানন্দও নিদ্রা যাইতে ছিলেন। গুরুদেব শয্যা ত্যাগ করিয়া সরোদনে নিত্যানন্দের পাদযুগল ধরিয়া "নিত্যানন্দ ক্ষমা কর" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ উঠিয়া দেখেন, গুরুদেব তাঁহার পাদযুগল ধরিয়া রোদন করিতেছেন, অমনি তিনি গুরুদেবের চরণে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"হা! হা! গুরুদেব করেন কি? বলুন প্রভো, আমার গতি কি হবে?" গুরুদেবও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"বল নিত্যানন্দ! আমায় ক্ষমা করলে?" করজোড়ে নিত্যানন্দ বলিলেন,—"এ ভৃত্যের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কেন প্রভো?" গুরুদেব গত বৎসর নিত্যানন্দের কাছে যে অপরাধ করিয়াছেন, সমস্ত খুলিয়া বলিলেন এবং সেই জন্যই যে তাঁহার এ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীভগবানের দর্শন লাভ হয় নাই, তাহাও বলিলেন।

নিত্যানন্দ বলিলেন,—"প্রভো! প্রভো! দয়াল প্রভো! আপনি

যাকে অপরাধ বলছেন, আমি দেখ্‌ছি সেটা আপনার এ হতভাগার প্রতি পরম অনুগ্রহ। সে অনুগ্রহের জন্যই এ হতভাগা এক্ষণে শ্রীধাম বৃন্দাবন বাসী। যদি আমার চিত্তের মালনতা কিছুমাত্রও বিদূরিত হইয়া থাকে, যদি আমি শ্যামচাঁদের সামান্য কৃপাও লাভ করিয়া থাকি, তবে কেবল আপনার সেই অনুগ্রহেরই ফলে। প্রভো, আমি আপনার শ্রীচরণের ভৃত্য, আপনার ন্যায় ইষ্টদেবের অপরাধ ধরিয়া আমায় ক্ষমা করবার শক্তি নাই প্রভো। আমায় মার্জ্জনা করুন।

গুরুদেব আর কিছুই বলিলেন না, বিষণ্ণচিত্তে শয্যায় গিয়া শুইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—

ভক্তদ্রোহী প্রাণে বল কিবা কাজ আর,
বিষপানে ত্যেয়াগব জীবন আমার।
হা রাধাগোবিন্দ! মনে রৈল বড় দুঃখ,
বৃন্দাবনে না দেখিনু দোঁহাকার মুখ।
পতিত পাবন হ'য়ে দয়া না করিলে,
অকলঙ্ক নামে প্রভু কলঙ্ক লইলে।

দোল পূর্ণিমার দিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই গুরুদেব নিত্যানন্দকে বলিলেন,—"দেখ নিত্যানন্দ আজ দোল পূর্ণিমা ভাল করে যুগলরূপ সাজাতে হবে, তুমি সাজী পূর্ণ করিয়া নানা রকম পুষ্প লইয়া আইস।"

গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া নিত্যানন্দ পুষ্প চয়নে গমন করিলেন। যথা সময়ে পুষ্প চয়ন করিয়া নিত্যানন্দ বাসায় প্রত্যাগমন করিলে দেখিতে পাইলেন যে গুরুদেবের দেহ ভূমি বিলুণ্ঠিত! তিনি আকুল কণ্ঠে ডাকিলেন,—"গুরুদেব! গুরুদেব! কোন উত্তর নাই—সাড়াশব্দ কিছুই নাই! গুরুদেবের শরীরে হস্ত দিয়া দেখিলেন—নিস্পন্দ শীতল! নাসিকার নিকট হস্ত দিয়া দেখিলেন—শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুই নাই! মেজের উপর একখানি কাগজ দেখিয়া তাহা তুলিয়া দেখিলেন, উহা গুরুদেবেরই লিখিত একখানি পত্র। নিত্যানন্দ আকুল হৃদয়ে পত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। পত্রের মর্ম্ম এইরূপ :—

"নিত্যানন্দ! আমি জানি আত্মহত্যা মহাপাপ; কিন্তু তথাপি বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করিলাম—নিরুপায়! যে জীবন শ্রীকৃষ্ণের সেবায় ও দর্শন লাভে বঞ্চিত যে জীবন ভক্তদ্রোহী বলিয়া কলঙ্কিত, বল দেখি, নিত্যানন্দ সে ঘৃণিত জীবন রাখার প্রয়োজন কি? সুদীর্ঘ এক বৎসর কাল তোমার সঙ্গে—তোমার মত ভক্তের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিলাম কিন্তু ভগবান আমায় দর্শন দিলেন না, তুমিও আমায় ক্ষমা করিলে না! বল দেখি নিত্যানন্দ ইহাপেক্ষা আমার দুঃখের ও আক্ষেপের কারণ কি আছে? তাই আজ আত্মহত্যা করিয়া আমার নরকের দ্বার আরও পরিষ্কার করিলাম। এই উদ্দেশ্যেই তোমাকে পুষ্প চয়নে পাঠাইয়া আমি বাসায় ছিলাম। কয়েকদিন হইতেই বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া ছিলাম, আজ শ্রীকৃষ্ণের দোললীলা—আনন্দের দিন ভাবিয়া মনের বাসনা পূর্ণ করিলাম। তোমার শ্যামচাঁদকে বলিও যে, এখন আর আমি কেবল ভক্তদ্রোহী নই—এখন ভক্তদ্রোহী, আত্মঘাতী। আমার মন্ত্রশিষ্য, পুত্রাধিক প্রিয় নিত্যানন্দ! তুমি শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত, সেই জন্য তোমাকে বলি, আমার আর একটি অনুরোধ রেখো বাবা! তোমার কৃষ্ণকে বলিও যে, "ঠাকুর তোমার দর্শন না পেয়ে আমার গুরুদেব বিষপানে আত্মহত্যা করেছেন, তাঁহার গতি করিও।' আশীর্ব্বাদ করি যেন সদা সর্ব্বদা তোমার কৃষ্ণপদে মতি থাকে।"

পত্রপাঠ করিয়া নিত্যানন্দ উচ্ছ্বাসভরে বলিয়া উঠিলেন,—"কি? শ্রীকৃষ্ণ অদর্শনে এবং আমি ক্ষমা না করায় গুরুদেব আত্মহত্যা করিলেন! যে গুরুদেবের কৃপায় আমি সংসার বন্ধন মুক্ত হ'য়ে বৃন্দাবন বাসী, সেই গুরুদেব আমার জন্যও আত্মহত্যা করিলেন! হায়! হায়! আমার এ মহাপাতকের যে প্রায়শ্চিত্ত নাই। ক্ষমা—ক্ষমা! গুরুদেবকে ক্ষমা! কীটাদপি কীট আমি গুরুদেবকে ক্ষমা করবার শক্তি আমার কোথায়? বরং শত সহস্রবার গুরুদেবের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করতে পারি। আর গুরুদেবের অপরাধই বা কি? সে যে গুরুদেবের অপার করুণা? বৃন্দাবনচাঁদ হরি! তুমি যে কর্ম্মের জন্য গুরুদেবকে অপরাধী বলিয়া উপেক্ষিত করিয়াছ, সে যে আমার চক্ষে গুরুদেবের অপার করুণা! হায়! হায়! গুরুদেব বুঝি আমার উপর অভিমান করিয়াই বিষপান করিয়াছেন। আমার এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত? আছে প্রায়শ্চিত্ত আমার হাতেই আছে। আমি শ্যাম চাই না—বৃন্দাবন চাই না; চাই—কেবল গুরুদেবকে। গুরুদেব হ'তেই আবার আমি সমস্ত পাব—নিশ্চয় পাব। যাই—গুরুদেব তোমার সঙ্গেই যাই; জীবনে মরণে তুমিই আমার একমাত্র গতি।

বিষের পাত্রটি মেঝের উপরেই পড়িয়াছিল তাহাতে একটু বিষও ছিল। নিত্যানন্দ উন্মাদের মত, পাত্রটি তুলিয়া বিষপানে উদ্যত হইলেন। এমন সময় একটি বালক আসিয়া নিত্যানন্দের হাত ধরিয়া বলিল,—"কর কি? ঐ দেখ কি বটে।"

নিত্যানন্দের হস্ত হইতে বিল্ব পাত্রটি ভূমিতে পড়িয়া গেল। বালকের নির্দ্দেশ মত নিত্যানন্দ চাহিয়া দেখিলেন যে, বাড়ীর মধ্যে যুগল মূর্ত্তির আবির্ভাব।

বালকটি পুনরায় বলিল,—"ওদের চরণামৃত তোমার গুরুদেবের মুখে দাও, এখনই বাঁচবেন।" বালক দৌড়িয়া পলাইল।

বালকের অনুসরণ না করিয়া নিত্যানন্দ যুগল মূর্ত্তি পানে চাহিয়া বলিলেন—"তোমরা এলে? পরীক্ষা শেষ হ'ল না আরও বাকী আছে! তোমরা এ সময়ে এসেছ ভালই হয়েছে। এখন যদি গুরুদেব বাঁচেন ত ভালই নতুবা তোমরা গুরুদেবের মত আমারও অবস্থা দেখ।" নিত্যানন্দ তাড়াতাড়ি যমুনার জলে যুগল-মূর্ত্তির শ্রীপাদপদ্ম প্রক্ষালন করিয়া সেই অমৃতোপম মৃত সঞ্জীবনী বারি গুরুদেবের মুখে দিলেন! গুরুদেবের শরীরে প্রাণ সঞ্চারিত হইল, তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। পরে নিত্যানন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আমাকে কেন বাঁচাইলে নিত্যানন্দ? আমি বেশ সুখে ছিলাম?"

করযোড়ে নিত্যানন্দ বলিলেন,—"প্রভো আমার কি সাধ্য? যাঁরা আপনার প্রাণদান করিয়াছেন, ঐ দেখুন তাঁরা ভুবনমোহন সাজে দাঁড়িয়ে।"

গুরুদেব চাহিলেন—দেখিলেন,—বিস্ময়ে চক্ষু মুদিলেন। হৃদয় মধ্যেও তাই ঐ ভুবনমোহন যুগলরূপ। আবার চক্ষু মেলিলেন এবারে ভিতরে বাহিরে যুগপৎ যুগলমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। গুরুদেব মনে মনে ভাবিলেন,—"আর সন্দেহ নাই, মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী তিনিই বটেন। তা' হলে আমার অপরাধ খণ্ডিত হয়েছে নিত্যানন্দ আমাকে ক্ষমা করেছে। আহা! ধন্য হলেম, জীবন-জন্ম সার্থক হলো। দয়াময় হরি আজ নিজ গুণে আমাকে ধন্য করলে। দেখো ঠাকুর জন্মে জন্মে আমাকে এই ভাবে ধন্য করো আমার মন যেন ঐ শ্রীপাদপদ্ম হতে বিচ্যুত না হয়।

গুরুদেবের প্রাণ প্রেমানন্দে নাচিয়া উঠিল, হৃদয়ে নব বলের সঞ্চার হইল। তনি উঠিয়া যুগল মূর্ত্তির শ্রীপাদপদ্মে গড়াগড়ি দিলেন পরে নিত্যানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া, দুই বাহু তুলিয়া নাচিতে নাচিতে ভাব বিহ্বল চিত্তে গাহিতে লাগিলেন :—

জয় জয় রাধা শ্যাম সুন্দর, রাধা রাধা শ্যাম মুরারী।
সহিত শ্রীমতী জয় হে শ্রীপতি, জয় মাধব জয় প্যারী॥

নব ঘন পাশে, চপলা প্রকাশে, আহা মরি কিবা মাধুরী।
(এযে) ভক্তের ধন, জগত জীবন, বৃন্দাবন-বন বিহারী॥
শ্রীগোলক ইন্দু, করুণার সিন্ধু, ভবসিন্ধু মাঝে কাণ্ডারী।
কেন কর ভয়, রাধাশ্যাম জয়, বল বল নভঃ বিদারি॥
রাধা পরবেদা, রাধা পরক্ষরা, পরামুক্তি রাধা সুন্দরী।
রাধা পরাগতি, রাধা ভগবতী, ভগবান ব্রজ বিহারী॥
অনুজ সুরেন্দ্র, সহ মহানন্দ, যুগল পদে সদা ভিখারী।
(যেন) জীবনে মরণে, নিঃস্বরে বদনে, রাধা রাধা শ্যাম মুরারী॥

গুরুদেব নাচিতে নাচিতে দেখিতে পাইলেন যে, নিত্যানন্দের আনীত পুষ্প-পূর্ণ সাজী সেখানে রহিয়াছে। আর মনে মানে কি? তিনি অঞ্জলি অঞ্জলি পুষ্প লইয়া, রাধাকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে দিতে দিতে নাচিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ কিছুক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় এই মধুর দৃশ্য দেখিয়া অবশেষে গুরুদেবের সঙ্গে নৃত্যে যোগদান করিলেন।

এ'দিকে ব্রজবাসিগণ মন্দির মধ্যে যুগল মূর্ত্তি দেখিতে না পাইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। চারিদিকেই "খোঁজ খোজ" সাড়া পরিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে সকলেই জানিতে পারিলেন যে সগুরু নিত্যানন্দ যেখানে আছেন, সেই খানে যুগল মূর্ত্তি প্রকট হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই সেদিকে দৌড়িলেন। সকলেই যাইয়া দেখেন—যুগল-মূর্ত্তি পুষ্প সম্ভারে সুশোভিত, গুরুদেব ও নিত্যানন্দ প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছেন। মধুর ভাব, মধুর দৃশ্য। এ দৃশ্য দেখিয়া সকলেই "জয় রাধা রাণী কি জয়" "জয় বৃন্দাবন চাঁদ কি জয়" বলিয়া সেখানে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

দোলযাত্রার সময় হইলে ব্রজবাসিগণ গুরুদেবও নিত্যানন্দকে যুগল মূর্ত্তি বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। সশিষ্য গুরুদেব মনের আনন্দে যুগল মূর্ত্তি লইয়া গিয়া দোলমঞ্চে স্থাপন করিলেন। শ্যামচাঁদের দোললীলা আরম্ভ হইল, রঙ্গের খেলা চলিতে লাগিল। সকলে "জয় রাধা রাণী" "জয় নন্দদুলাল" রবে বৃন্দাবন মুখরিত করিয়া ফেলিলেন।

আমার পরমারাধ্য ভগবানের প্রিয় ভক্তগণ! আজ হৃদয় দোলমঞ্চে যুগল-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া বৃন্দাবনের মধুর লীলার আস্বাদন গ্রহণ কর। এবং প্রণত শিরে বল :—

"নমঃ ব্রহ্মণ্যেদেবায় গো ব্রাহ্মণায় হিতায়চ,
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ।

চুণ ও স্বাস্থ্য।

ভারতবর্ষে পান খাওয়ার প্রচুর প্রচলন আছে। পানের চুণ শরীরের পক্ষে কতটা উপকারী তাহা সকলেই যে জানেন এমন নহে। শরীর পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের জন্য শরীরে উপযুক্ত পরিমাণ খনিজ দ্রব্য বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন। উহা না থাকিলে শরীর পুষ্টির অভাবে রোগ এবং মৃত্যু নিশ্চয়।

খনিজ দ্রব্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় চুণ বা তাহার লবণ, উহার অভাবে পুষ্টি হয় না। বর্ত্তমান সময়ে লোকে শরীরে চুণের প্রয়োজন সবে মাত্র বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। অনেক সময় দেখা যায় যে, শরীরে চুণের অভাবে রোগ হইয়াছে। চুণ বেশী পরিমাণ না থাকায় শরীরের সকল যন্ত্রের পুষ্টির অভাব ঘটিয়া এরূপ রোগ হয়।

রিকেট রোগ হয় শরীরে চুণের অভাব। অস্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিয়া, সূর্য্যালোকের অভাবে প্রভৃতি যে কোন কারণেই হউক না কেন চুণের অভাব হয়। কতকগুলি যক্ষ্মারোগের যে কারণে চুণের অভাব তাহা নিশ্চিত স্থির হইয়াছে।

প্যারা থাইরয়েড (para thyroid) নামে এক গ্রন্থি আছে, উহার কার্য্য থাইরয়েড (thyroid) গ্রন্থির ঠিক বিপরীত এবং পেশী সকলে চুণ সমাবেশ করা প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির একটী বিশেষ কার্য্য, সেই জন্য চুণের অভাবে ঐ গ্রন্থি যদি ভাল করিয়া কার্য্য করিতে না পারে তবে মানুষের স্নায়ু উত্তেজিত হয় ও নানারূপ স্নায়ু সম্বন্ধীয় রোগ হইতে পারে। একজন রোগীর স্নায়ুরোগের অতিবৃদ্ধি হইলে পর তাহাকে বৃষের ঐ গ্রন্থি চুর্ণ করিয়া সেবন করাইবার ফলে তাহার ঐ রোগ আরাম হইয়াছিল।

শরীরে বিষোৎপাদন হইলে দেখা গিয়াছে যে ঐ রোগীর রক্তে চুণের ভাগ কম হইয়াছে। চুণ সেবন করিলে রক্ত সঞ্চালন ভাল করিয়া হয় এবং সেইজন্য হজম শক্তিও বাড়ে। চুণ সেবন করিলে যক্ষ্মা রোগীর রাত্রের ঘাম বন্ধ হয়। চুণের অভাবে যেমন স্নায়ু উত্তেজিত হয় তেমনি চুণ সেবনে উত্তেজিত স্নায়ু সকল স্থির হয়। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, যাহার শরীরে চুণের অভাব

আছে তাহারা চুণ সেবন করিলে পুষ্টিলাভ করে। শরীরে চুণের অভাব থাকিলে খাদ্যের পরিবর্ত্তন করিলেই রোগ আরাম হইবে না। চুণও সেবন করিতে হইবে। সকল রোগেই শরীর হইতে চুণ বাহির হইয়া যায়। যখন পুষ্টি কম হয়, স্নায়ুর রোগ হইয়া থাকে, তখন শরীরে চুণের ভাগ কম থাকিলে পরিপাক ভাল হয় না তজ্জন্য পুষ্টিও হয় না। স্বাভাবিক অবস্থায় শরীরে প্রচুর পরিমাণে চুণের প্রয়োজন রহিয়াছে।

সূর্য্যের আরোগ্যকারী শক্তি।

স্বভাবতঃ মানুষের বাস মুক্তস্থানে। গ্রীষ্ম প্রধান স্থানে মানুষের আদি বাসস্থান ছিল। শীত প্রধান দেশে মানুষ বাস করিতে তাহার অনেক পরিশ্রম করিতে হয়। যাহাদিগের গৃহের ভিতর বসিয়া থাকা অভ্যাস তাহারা মুক্ত বায়ুতে থাকার সুখ ভাল করিয়া বুঝে। যখনই সুবিধা হয় তখনই তাহারা কয়েক দিনের জন্য মুক্ত বায়ুতে বাস করে। সেই সকল লোককে বেশীদিন ধরিয়া মুক্ত বায়ুতে থাকার উপকারিতা সম্বন্ধে আর বুঝান প্রয়োজন নাই। মুক্ত বায়ুতে বাস করায় যে উপকার হয়, তাহা বিশুদ্ধ বায়ু বা ব্যায়ামের জন্য হয় কেবল তাহাই নহে; শরীর সঞ্চালনের সময়ে বায়ুর যে শীতলকারী গুণ এবং বিশেষতঃ সূর্য্যালোকের যে জীবনীশক্তি প্রদানকারী শক্তি আছে তাহার জন্যই এই উপকার বোধ করিতে পারা যায়।

সূর্য্যালোকে যে উত্তাপ ও আলোক রশ্মি আছে তাহার ন্যায় রাসায়নিক রশ্মিও আছে। উত্তাপ মানুষের গ্রন্থি ও ত্বকের উপর বিশেষভাবে কার্য্য করে, রাসায়নিক রশ্মি স্নায়ুমণ্ডলীর উপর আশ্চর্য্যজনক রূপে কার্য্য করে, এই রাসায়নিক রশ্মির জন্যই সূর্য্যালোকে মানুষের মুখ কাল হইয়া যায়।

গাছ গাছড়ার যে বাড়িবার অপূর্ব্ব শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল উহার সবুজ বর্ণের উপর সূর্য্যের আলোকের প্রভাবের ফলে। সূর্য্যালোক মাটি ও বায়ু হইতে পুষ্টিকারক পদার্থ সংগ্রহ করিয়া গাছের জীবন রক্ষা করে ও উহা বাড়াইয়া তোলে। প্রাণী জীবনেও সূর্য্যালোকের সেই শক্তির প্রয়োজন।

সূর্য্যালোক শরীরে লাগাইয়া যাহারা উপকার পাইতে চান তাঁহারা অনাবৃত শরীরে সূর্য্যালোক লাগাইবেন। যাহাদিগের সূর্য্যালোকে থাকা অভ্যাস নাই কিম্বা যাহাদিগের চামড়া নরম তাঁহারা প্রথম প্রথম অল্পক্ষণ যথা দশ বা পনর মিনিট সূর্য্যালোকে থাকিলে তাঁহাদিগের কষ্ট হইবে না। সূর্য্যা-

লোকে থাকিয়া রণ কাল হইলে কোন রোগ হয় না, আলোকে থাকার ফলে ঘোরবর্ণ হইলে আর অধিক সূর্য্যালোক লাগায় কোন অনিষ্ট হইবে না কারণ ঐ বর্ণ সকল প্রকার অনিষ্ট হইতে চামড়া রক্ষা করে।

মুক্ত বায়ুতে কিম্বা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া শরীরে সূর্য্যালোক লাগান যাইতে পারে। যখন সূর্য্যালোকের তাপে কষ্ট বোধ হয় তখন সূর্য্য ও রোগীর মধ্যে নীল বর্ণের পাতলা কাপড়ের পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিছু বালি সংগ্রহ করিয়া, তাহার মধ্যে সুবিধামত বন্দোবস্ত করিয়া আরামে বসিয়া থাকিবার উপায় করিতে হইবে। ঐ বালির সাহায্যে ইচ্ছামত শরীর হইতে ঘর্ম্ম নির্গত করান যাইতে পারে।

সহরে প্রত্যেক গৃহেই একটু উন্মুক্ত স্থান থাকা আবশ্যক, যেখানে বসিয়া সূর্য্যালোক গাত্রে লাগান যাইতে পারে। সভ্যতা প্রাপ্ত মানুষ অধুনাকালের ব্যবস্থায় ও জীবন যাপনের জন্য সূর্য্যালোক বেশী পায় না। যাহারা সহরে বাস করে পুরাকালের গুহাবাসী মানবের ন্যায় তাহারা যে স্থানে থাকে তথায় সূর্য্যালোক প্রবেশ করে না, তাহাদের গৃহের জানালাতে পর্য্যন্ত পর্দ্দা দেওয়া থাকে। ইহাদের ফলে বৃদ্ধ ও যুবা সকলেরই মুখের চেহারা রক্তহীন, শিশুগণের রিকেট রোগ হয়, সহরে দিনদিনই যক্ষ্মা ও অন্যান্য রোগের বিস্তার হয়, মানুষ বিকলাঙ্গ হইতেছে, নিস্তেজ সন্তান জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং নানারূপ অবনতি ঘটিতেছে। মুক্ত বায়ুতে বাস এবং আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় সাদাসিদা ভাবে জীবনযাপন করাই একমাত্র উপায়, যদ্দ্বারা এই যে লোকক্ষয় হইয়া বাঙ্গালী জাতি উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে তাহা সম্ভবতঃ বন্ধ হইবে।

প্রাণীগণ বাদ্য পছন্দ করে কিনা ?

সকলেরই একরকম বিশ্বাস আছে যে বন্য জন্তু বাদ্য শুনিলে আশ্চর্য্যরূপে মোহিত হইয়া পড়ে। কবিগণ সঙ্গীতের দ্বারা পশুচিত্ত মোহিত হইয়া পড়ে; বলিয়া কত ব্যাখ্যাই করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলেই একমতে বলিয়াছেন যে এই বিশ্বাস ভুল।

অনেক সময় দেখা যায় যে কুকুর বাদ্য শুনিয়া একরকম শব্দ করিয়া বাদ্য যে ভাল লাগিতেছে তাহা প্রকাশ করে। অপর দিকে বিড়াল সুর তাল প্রভৃতি বিশেষতঃ সঙ্গীত অত্যন্ত অপছন্দ করে এবং দূরে সরিয়া যায়।

যে সকল পক্ষী শিষ দিতে পারে তাহারা বাদ্য শুনিয়া বিমোহিত হয় এবং

এত জোরে আনন্দে শিষ দিতে থাকে যে মনে হয় তাহারা বাদকের বা গায়ককে পরাজিত করিবার চেষ্টায় নিজের বুক ভাঙ্গিয়া ফেলিবে।

হায়না, গঙ্গার, শূকর, হরিণ, ব্যাঘ্র, সিংহ ও চিতা প্রভৃতি জন্তু বাদ্য বা সঙ্গীত শুনিয়া আকৃষ্ট হয় না, তবে কখন কখন তাহাদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়। ছোট ইন্দুর তাল মান মিশ্রিত সকল প্রকার বাদ্য শুনিতে অত্যন্ত ভালবাসে, এমন কি দেখা গিয়াছে যে, কেহ শিষ দিলে উহারা গর্ত্ত হইতে বাহিরে আসিয়া মনোযোগ দিয়া উহা শুনে। আমাদিগের দেশে কথা আছে যে জঙ্গলে ব্যাধগণ বংশী বাদন করিত, তাহা শুনিতে হরিণ উহাদের নিকটে আসিলে উহারা জাল দিয়া হরিণ ধরিত।

গরু কখন বাদ্য পছন্দ করে না। অথচ হাতী ও ঘোড়াকে বাদ্য উপভোগ করিতে দেখা গিয়াছে, এমন কি, শোভাযাত্রায় যাইবার সময়ে বাদ্যের সঙ্গে তালে তালে পা ফেলিতেও দেখা গিয়াছে।

সঞ্জীবনী, বৃহস্পতিবার, ২৪শে ফাল্গুন, ১৩২৯ সাল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

বৃদ্ধের অভিযোগ।

লেখক,—ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এ, বি,

উহুহু আমার কল্‌জে বুঝি ফাট্‌লো।
গিন্নি বুঝি রাগের ভরে নিমতলাতে চল্‌লো॥
(ওগো) আমার পরাণ বুঝি খাঁচা ছেড়ে যায়—
গিন্নির বুঝি কাঁচা বয়সে বিধবা হতে হয়॥
কিন্তু কি করা যাবে বুঝ্‌লো না যে তায়।
মিষ্টি কথায় দেখ্‌ছি এখন চিঁড়ে ভিজানো দায়॥
পায়ে তার মাথা ঠুকে বল্লেম আমি—
ওগো একটা কথাই শোন না হয় তুমি॥
(মাইরি বল্‌ছি) ঘাট হয়েছে এমনটা আর হবে না!
(ওগো) ধনি আঁচলে রাখ পায়ে ফেলে দিও না॥

এবার থেকে যা বল্‌বে তাই আমি করবো।
আগুণে পুড়বো কিম্বা জলে ডুবে মর্‌বো ॥
কিন্তু আমার করুণ কথায় চিড়ে নাহি ভিজ্‌লো।
গিন্নির তায় রাগের মাত্রা চতুর্গুণ বাড়লো ॥
পিছন পানে পিঠের উপর এলিয়ে দিয়ে কেশ—
বল্লে গিন্নি ঠিক যেন দিগ্বিজয়ী বেশ ॥
তার পরে তার বুকের পাটা ফুল্‌লো দশগুণ।
তা দেখে তো শর্ম্মারামের আক্কেল গুড়ুম ॥
তার পরে না বা হাত খানি উঠিয়ে মাজার পর।
ছুটালো গিন্নি শ্রীমুখ দিয়ে কাত্তিক মেসে ঝড় ॥
বা পা টা আগে দিয়ে ডান পা দিয়ে পিছু।
বল্লে আমায় আরে মিন্‌সে হতচ্ছাড়ার যাদু ॥
অমন করে ন্যাকামি কল্লে আজ আর চল্‌বে না।
স্পষ্ট কথা বিনে তুমি খালাস আজ পাবে না ॥
মাগ্‌রে যদি পুষ্‌তে নার (তবে) বে করেছ কেন।
বে'র রেতের চুক্তির কথা ভুলে গেছেন যেন ॥
বল তোমার কষ্ট হয় বাপের বাড়ী যাই—
জানি আমি শ্বশুর বাড়ী আমার স্থান নাই ॥
তাদের তো আর টাকা কড়ির অভাব কিছু নাই।
তবে কেন তোমার দ্বারে ভিক্ষা মেগে খাই ॥
রইলো তোমার সংসার পড়ে বল্লেম কিন্তু আমি।
ঘর কন্না নিয়ে তোমার সংসার কর তুমি ॥
এক শিশি "কুন্তলীন" তারি জন্য এত।
এর বেশী হলে না জানি আরো হ'ত কত ॥
এত বলি গিন্নি আমার বাপের বাড়া যায়—
কি আর করি তখন আমি পল্লুম গিন্নির পায় ॥
বল্লেম গিন্নি রাগ করোনা এই আমি যাচ্ছি।
এখনি তোমার কুন্তলীন কিনে এনে দিচ্ছি ॥
এই বলে চাবি নিয়ে বাক্স যেই খুল্লুম।
অমনি তো শর্ম্মারামের আক্কেল হল গুড়ুম ॥

খুলে দেখলাম তার ভিতর একটীও নাই টাকা।
অন্তঃসার শূন্য সে পড়ে আছে ফাঁকা ॥
কি আর করি তখনি এক নূতন ফন্দি আটলুম।
রেশমী চাদর ঘাড়ে করে বাজার পানে হাটলুম ॥
পথে যেয়ে মনে হল করেছি কি দিকদারি।
বুড়ো বয়সে বে করে ব্যাকুবী করেছি ভারি ॥
তখনি আমি জীব কাটলুম, বুড়োত আমি নয়।
আমার মত বলিষ্ঠ যুবক কয়জন পাওয়া যায় ॥
বুড়ো আমি এই কথা গিন্নি শুন্‌তে পেলে।
এক রাত্তির রাখবে আমায় ঘরের বাইরে ফেলে ॥
আমি হলেম বলিষ্ঠ যুবক গিন্নি আমার যুবতী।
তানা হলে তার সনে মোর সজ্‌বে কেন পিরীতি ॥
আমাদের এই কাঁচা প্রণয় ভাঙ্গাটা কিছু নয়।
ভাঙ্গলে পরে যুড়বে না আর ঠেকবো বিষম দায় ॥
তারপরে না আমার সেই চাদর বন্ধক রেখে।
আন্‌লেম একটা কুন্তলীন বেশ ভাল দেখে ॥
বাড়া যেয়ে দেখি গিন্নি মনের আগুণ ভরে।
পড়ে আছে মেজের উপর আঁচল'খানি পেড়ে ॥
ভাদরের ভাঙ্গ যেমন কুলে কুলে ভরে।
তেমনি গিন্নির যৌবন নদী উঠেছিলো পুরে ॥
ঘুমের ঘোরে গিন্নির তখন সরম গেছে টুটে।
তাইতেই গিন্নির খোলারূপ দেখা ভাগ্যে ঘটে ॥
গিন্নির তখন নাসারন্ধে কাত্তিকমেসে ঝড়।
বইতেছিলো শনৈঃ শনৈঃ শুন্‌তে ভয়ঙ্কর ॥
বিড়াল ভায়া ভয়ে আড়ষ্ট গৃহের এক কোণে।
পড়ে ছিল মৃতপ্রায় সশঙ্কিত প্রাণে ॥
তা দেখে মোর আত্মারাম খাঁচা বুঝি ছাড়ে।
আমি তখন কাঁপতেছিলাম থর থর থরে ॥
গিন্নির তখন অধর কোণে ঈষৎ হাসির রেখা।
প্রভাত সূর্য্যের রেখার মত যেতেছিলো দেখা ॥

তা দেখে মোর ধড়ের মধ্যে ফিরে এলো প্রাণ।
হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম আমি পেয়ে দিব্য জ্ঞান॥
ঘর খানি জ্বলতেছিলো গিন্নির রূপের চোটে।
মনে ভাব্‌লেম গিন্নি আমার রূপবতী বটে॥
হাত ধরে বল্লেম ওগো ঘুমটা এখন রাখ।
তোমার জন্য কি এনেছি একবারটি দেখ।
তখন গিন্নি বিছানা থেকে উঠে তাড়াতাড়ি।
বল্লে প্রাণ, আমি কি আর অন্য কারো হতে পারি?
এত বলি গিন্নি আমার গলায় দিয়ে হাত।
বলে আমি দিন যামিনী রইব তোমার সাথ॥
তুমি আমার আমি তোমার অন্য কারো হবো না।
তুমি মলে আমি কিন্তু একদিনও আর বাঁচবো না॥
এই কথা শুনে আমি আহ্লাদে আটখান।
বল্লেম গিন্নি ও গিন্নি! তুমিই আমার প্রাণ॥

চৈতন্য লাইব্রেরি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ।*

সমবেত ভদ্রমণ্ডলী!

গোবর্দ্ধন সঙ্গীত-সমাজের সম্পাদক মহাশয়ের আদেশ পালনার্থ, চৈতন্য লাইব্রেরির উৎপত্তি ও লাইব্রেরি চালান সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা নিবেদন করিতেছি। কিয়দধিক দুই বৎসর পূর্ব্বে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় ঐ সম্বন্ধে কিছু লিখিবার জন্য আমাকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন।

কম্বুলেটোলা লাইব্রেরির অনুকরণে, ৺গঙ্গানারায়ণ দত্ত মহাশয়ের আনুকূল্যে, পাদরি টমরি সাহেবের নেতৃত্বে, বিডন ষ্ট্রীটের ৮৩ নং বাটীতে, ১৮৮৯ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি, চৈতন্য লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়।

পঁয়াত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কম্বুলেটোলা লাইব্রেরির খুব নামডাক ছিল। কেশব একাডেমির ছাত্র ৺গুরুচরণ চৌধুরী ও তাঁহার দাদা ৺তীর্থনাথ ঐ লাইব্রেরির

* গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজের অধিবেশনে পঠিত।

প্রধান পাণ্ডা ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল ঐ লাইব্রেরি বাগবাজার লাইব্রেরির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কম্বুলেটোলা লাইব্রেরির রিপোর্ট পড়িয়া এবং গুরুচরণের সহিত মেলামেশা করিয়া আমার লাইব্রেরির নেশা ধরে। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে আমি কম্বুলেটোলা লাইব্রেরির সভ্য ছিলাম। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ৺কুঞ্জবিহারী দত্তকে ঐ লাইব্রেরিতে ভর্ত্তি করাই। কুঞ্জর তখন গাড়িঘোড়া ছিল না। বর্ষাকালে কম্বুলেটোলা যাইতে কষ্ট হওয়াতে, তাহার বিডন ষ্ট্রীট অঞ্চলে একটা লাইব্রেরি করিতে সাধ হয়। কুঞ্জর দ্বিতীয় ভ্রাতা ৺নিতাই চাঁদ খুব উৎসাহী ছিল। আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া, তাহারও লাইব্রেরি সম্বন্ধে বাতিক জন্মে। দুই এক দিনের মধ্যে নিতাইএর গৃহ-শিক্ষক ৺হরলাল শেঠ ও আমাদের প্রতিবেশী ৺রঙ্গলাল বসাক আমাদের দলভুক্ত হইলেন।

কিন্তু টাকা কোথা? ঘর কই? হরলাল বাবু মাষ্টার, রঙ্গ সামান্য মাহিনার কেরাণী, নিতাই হেয়ার স্কুলে পড়ে, কুঞ্জ এফ-এ ক্লাশের ছাত্র, আমি এফ-এ পরীক্ষায় ফেল হইয়া টো টো কোম্পানীর কার্য্য করি। কুঞ্জ ও নিতাইএর পিতামহ ৺গঙ্গানারণ দত্ত মহাশয়ের ইংরাজী চিঠিপত্র লিখিয়া, আমি তাঁহার স্নেহ ও বিশ্বাস ভাজন হইয়াছিলাম। কুঞ্জ ও নিতাইএর পরামর্শে তাঁহার নিকট লাইব্রেরির কথা পাড়িলাম। অল্প দিনের মধ্যেই বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়িল। তিনি বলিলেন,—"তোমাদের কিছু টাকা আর এই ঘরটা দোব।" এই ঘরটা মানে বিডন ষ্ট্রীটের ৮৩ নং বাড়ীতে ঢুকিয়া বাঁ ধারের ঘর। ঐ ঘরে দত্ত মহাশয় হরিনাম করিতেন, হিসাব লিখিতেন ও ঘুমাইতেন। লাইব্রেরি ঐ ঘরে বিনা ভাড়ায় কিয়দধিক চার বৎসর ছিল।

নিতাই তাহার দাদার, মাষ্টারের, রঙ্গর ও আমার খান কতক বই লইয়া একটা আলমারিতে পুরিল। প্রথম মাসে দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত টাকায় খান কতক বাঙ্গলা পুস্তক কেনা হইল। একদিন ভূপেন (এখন বহুড়াঙ্গা নিবাসী) আসিলে, তাহার নিকট খান ছয় সাত বই পাওয়া গেল। কিন্তু দুই মাসের চেষ্টায় কিছুতেই একটা আলমারি ভরিল না। কুঞ্জর শ্বশুর মহাশয় প্রত্যহ "Indian Mirror" পাঠাইয়া দিতেন। প্রতি সপ্তাহে "বঙ্গবাসী" ও "সঞ্জীবনী" কেনা হইত।

পাদরি টমরি সাহেব তখন বিডন ষ্ট্রীটের ৩২।৬ নং বাটীতে থাকিতেন। তাঁহাকে একদিন পাকড়াও করিয়া আনিলাম। তিনি পৌনে এক আলমারী পুস্তক, তিনখানি কাগজ ও আধ ডজনের কম সভ্য দেখিয়া খুব হাসিলেন। আমি

অপ্রস্তুত হইলাম, বলিলাম,—"Rome was not built in a day"। অল্প দিনের মধ্যে টমরি সাহেব লাইব্রেরির সভাপতি ও স্থায়ী সভ্য হইতে স্বীকৃত হইলেন। তখন স্থায়ী সভ্যের ফী ছিল দশ টাকা এবং সাধারণ সভ্যের মাসিক চাঁদা ছিল দুই আনা। গোড়ার তিন বৎসর টমরি সাহেব কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রত্যেক সভায় উপস্থিত হইতেন, কেহ এক মিনিট বিলম্ব করিলে বিরক্ত হইতেন। ১৮৯১ সাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক চিঠি, প্রত্যেক বাৎসরিক রিপোর্টের গোড়া হইতে শেষ লাইন তিনি দেখিয়া দিতেন। সাহেবের ইচ্ছা ছিল যে একটী Reading Circle গঠিত হউক, যথায় সভ্যগণ মিলিত হইয়া নূতন নূতন পুস্তক পাঠ ও আলোচনা করিবেন। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে চলি নাই বলিয়া আমি এখন অনুতপ্ত। Circulating Library সম্বন্ধে তাঁহার বেশী ঝোঁক ছিল না, এবং বড় বড় সভা করিতাম বলিয়া, তিনি আমাকে আড্ডালে হুজুগে বলিয়া ভৎর্সনা করিতেন।

আমি নাম দিয়াছিলাম Beadon Square Literary Club। দত্ত মহাশয় বলিলেন,—"অ্যাঁ, ঠাকুরদের নাম দাও নি!" অনেক তর্কাতর্কির পর Chaitanya Library and Beadon Square Literary Club এই নাম স্থির হইল। আমরা ১৮৮৯ সালের ১লা জানুয়ারি সাইন-বোর্ড লাগাইব স্থির করিয়াছিলাম। দত্ত মহাশয় পাঁজি দেখিয়া বলিলেন, দিনটা খারাপ। সুতরাং সরস্বতী পূজা (৫ই ফেব্রুয়ারি) পর্য্যন্ত দিন পিছাইতে হইল। চৈতন্য নাম শুনিয়া কেহ কেহ টিকি লাইব্রেরি বলিয়া ঠাট্টা করিত। ছেলেদের কাণ্ড বলিয়া পাড়ার বয়স্থ লোকেরা প্রথম প্রথম আমল দিতেন না। একদিন রাত তিনটায় উঠিয়া, নিতাই, রঙ্গ ও আমি, বিডন ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ও কলেজ ষ্ট্রীটের দুই ধারে লাইব্রেরির prospectus মারিয়া দিলাম।

দশ টাকায় স্থায়ী সভ্য এবং দুই আনা চাঁদায় সাধারণ সভ্য জোগাড় করিতেও প্রথম প্রথম বেগ পাইতে হইত। বুঝিলাম, একটু হৈ চৈ না করিলে চলিবে না। ব্যারিষ্টার এ. চৌধুরী মহাশয় (এখন সার আশুতোষ চৌধুরী) তখন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দক্ষিণে থাকিতেন। তাঁহার কাছে যাওয়া আসা করিয়া, ১৮৯০ সালের প্রারম্ভে, লাইব্রেরির প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের জন্য, "Literature and the Calcutta University" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ আদায় করিলাম। আমার সহাধ্যায়ী পাথুরেঘাটার ৺নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, হাইকোর্টের জজ নারস সাহেবকে সভাপতি জোগাড় করিল। কলিকাতার দৈনিক ও

সাপ্তাহিক পত্রে, চৌধুরী সাহেবের প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা বাহির হইল। চৈতন্য লাইব্রেরির নাম দেশময় ছাইয়া পড়িল।

১৮৯১ সালে ৺রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের ব্যয়ে লাইব্রেরি রেজিষ্টারি করা হয়। ১৮৯০ হইতে ১৮৯৪ সালের মধ্যে, ৺টমরি সাহেব, ৺নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ৺উপেন্দ্রনাথ বসু এবং ৺নগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী, এই চার জনের চেষ্টায়, যথেষ্ট পরিমাণে স্থায়ী সভ্যের ফী ও এককালীন চাঁদা সংগৃহীত হয়। কুঞ্জর আন্তরিক যত্নে ও ৺রাধাকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের ব্যয়ে, ১৮৯৩ সালের শেষভাগে, ৪।১ নং বিডন ষ্ট্রীটে, লাইব্রেরির জন্য দ্বিতল বাটী তৈয়ারী হয়। ভাড়া সস্তা, বৎসরে দুই শত টাকা।

লাইব্রেরির গোড়ার কথা সমাপ্ত হইল।

গত উনিশ বৎসরে, লাইব্রেরির সর্ব্ব-প্রধান মুরুব্বি কলিকাতা মিউনিসিপালিটি। ইঁহাদের নিকট প্রায় নয় হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে। ৩ নং ওয়ার্ডের কমিশানার ৺কালীচরণ পালিত মহাশয় আমাকে Municipal Grant সম্বন্ধে প্রথম সন্ধান দেন।

চৌত্রিশ বৎসর লাইব্রেরি চালাইয়া যথেষ্ট আনন্দ ও হাড়ে হাড়ে আক্কেল পাইয়াছি। বঙ্গদেশের গভর্ণর, লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর, চিফ জাষ্টিস প্রমুখ উচ্চ পদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যিক দিক্‌পাল, সার রাজেন্দ্রনাথ, সার কৈলাস, সার দেবপ্রসাদ, সার আশুতোষ চৌধুরী প্রমুখ দেশের জননায়কগণ—সকলেই আমার আহ্বানে চৈতন্য লাইব্রেরির অধিবেশনে সভাপতি বা বক্তা হিসাবে যোগদান করিয়াছেন। চৌত্রিশ বৎসরে যাহা কিছু ছাপা হইয়াছে—পুস্তকের তালিকা, বাৎসরিক বিবরণী, লভার চিঠি, নিয়মাবলী—সমস্তই আমার লেখা। এই সকল কার্য্যে খাটুনি আছে, দায়িত্ব আছে, আনন্দও আছে। মিউনিসিপাল কমিশানারদের কাছে হাঁটা-হাঁটি করিয়া গ্রাণ্টকে বাৎসরিক আড়াই শত হইতে ক্রমে ক্রমে সাড়ে ছয় শত টাকায় তুলিয়া মনটা বেশ প্রফুল্ল হইত।

১৯১২ হইতে ১৯১৫ সালের মধ্যে হাড়ে হাড়ে আক্কেল পাইয়াছিলাম। সে সকল কারণে কম্বুলেটোলা লাইব্রেরি, সাবিত্রী লাইব্রেরি, ক্যালকাটা রিডিং রুমস, সিকদারবাগান বান্ধব লাইব্রেরি, মিনার্ভা লাইব্রেরি প্রভৃতি পাঠাগারগুলি লোপ পাইয়াছে, চৈতন্য লাইব্রেরিতে ঐ চার বৎসরে তাহার সব চিহ্ন দেখা দিয়াছিল। লাইব্রেরিয়ান পুস্তক ক্রয়, তালিকা প্রস্তুত, পুস্তক আদান প্রদানের হিসাব সব বিষয়েই উদাসীন; ট্রেজারার তিন মাসে এক দিনও আসিয়া

জমা-খরচের সন্ধান লইতেন না; সেক্রেটারিকে চিঠিপত্র লিখিতে বা সভা-সমিতি করিতে বলিলে তাঁহার চক্ষু আকাশে উঠিত। পাছে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গে তাহা চাপা দিবার জন্য আমাকে তখন চারগুণ খাটিতে হইত। বেহারা না আসিলে ঝাঁট দিতে ও আলো জ্বালিতে হইত। চার বৎসর পরে এই ভাষায় বন্ধুদের নিকট ধন্যবাদ পাইয়াছিলাম,—"ওর আফিস নেই, দোকান নেই, পরিবার নেই, ছেলেমেয়ে নেই, হুঁঃ ও খাটবে না ত কি? হুঁঃ ওর ভাত হজম হবে কি করে?"

আক্কেল পাইয়া ১৯১৬ সালের প্রারম্ভে কমিটির খোল-নলিচা ও লাইব্রেরির নিয়মাবলী বদলাইয়া ছিলাম। ঐ দুঃসময়ে বর্ত্তমান ধন-রক্ষক শ্রীমান শ্যামসুন্দর দত্ত আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। বেতনভুক কর্ম্মচারীর মাথায় দায়িত্বের কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া কমিটির পাণ্ডারা মুড়ুলি ও দলাদলি করিতেছেন, এই দৃশ্য চৈতন্য লাইব্রেরীতে অদৃশ্য হইয়াছে।

স্কুল কলেজে যেমন বিস্তর ছাত্র পড়ার সময় গল্প করেন, লাইব্রেরিগুলির তেমনি বিস্তর সভ্য কেবলমাত্র গল্পের বই পড়েন। ইহা তাঁহাদের দুর্ভাগ্য। ক্রমাগত উপন্যাস পড়িয়া দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞানের রস হইতে নিজেকে বঞ্চিত করা যে মানসিক হিসাবে আত্মহত্যা, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ইহাও বলি যে নাটক নভেল ছুঁইব না এই গোঁ বোকামির নামান্তর।

যৌবনের প্রারম্ভে যে প্রকাণ্ড ভুল করিয়া প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বয়সে নিজের নিকট হেয় হইয়াছি, অনুতাপের দংশনে ছট্‌ফট্‌ করিতেছি, আমার শ্রোতৃ-মণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা তরুণ-বয়স্ক তাঁহারা যেন সেই ভুল না করেন। কুড়ি বৎসর বয়সে কলেজের লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়া যখন বাজে বই পড়া আরম্ভ করিলাম, দুই চার লাইন ইংরাজী লিখিতে শিখিয়া যখন ল্যাজ ফুলিল, তখন মনকে আঁখি ঠারিয়া ছিলাম—কেশব সেন, কৃষ্ণদাস পাল কটা পাশ করেছেন? বি-এ এম-এ হবার এতই কি দরকার? লাইব্রেরির হিড়িকে Publie man সাজিয়া পিতৃদেবের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ যখন বিধবা কন্যার ন্যায় ভোগ করিতে আরম্ভ করিলাম, আধলা পয়সা রোজগার করিবার সামর্থ্য জন্মিল না,—তখন মনকে আঁখি ঠারিয়াছিলাম—পয়সা কি সবাই রোজগার করে? তৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ, স্বামী কটা পয়সা রোজগার করেছেন? ছাত্র হিসাবে পল্লবগ্রাহী ফক্কড়চন্দ্র, গৃহী হিসাবে খেয়াল-সর্ব্বস্ব জড়ভরত—যৌবনে আত্মবঞ্চনা করিয়া এই দশা ঘটিয়াছে।

শ্রীগৌরহরি সেন।

সভাপতির মন্তব্য।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

মাননীয় ভদ্র মহোদয়গণ!

আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে:—

"ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ গেল শল্য হল রথী।
চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল জোনাকী জ্বালে বাতি॥"

ইতিপূর্ব্বে গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজের অধিবেশনে যে সকল মহানুভব মহোদয়গণ, সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত তুলনায় আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির অবস্থা সত্য সত্যই এইরূপ।

অদ্যকার এই অধিবেশনে সভাপতির উচ্চ আসন প্রদান করিয়া আপনারা আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন,—তজ্জন্য আমি আপনাদের নিকটে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

অদ্যকার অধিবেশনে চৈতন্য লাইব্রেরির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মহাশয়ের সুলিখিত "চৈতন্য লাইব্রেরি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ" নামক যে ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি পঠিত হইল; এই প্রবন্ধের জন্য লেখক মহাশয়কে আমি যে, কি ভাষায় ধন্যবাদ প্রদান করিব, তাহা বলিতে পারি না। বর্ত্তমান কালে সকল বিভাগেরই ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সংগৃহীত হইতেছে;—ভবিষ্যতে যাঁহারা বঙ্গদেশের গ্রন্থাগারের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবেন, এরূপ প্রবন্ধ তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিবে। প্রবন্ধটি ক্ষুদ্র হইলেও অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য পূর্ণ।

"চৈতন্য লাইব্রেরি" আমাদের দেশের একটি জাতীয় গৌরবের অনুষ্ঠান। এই লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সম্পাদক মহাশয় এবং তাঁহার সহকর্ম্মী স্বর্গীয় কুঞ্জবিহারী দত্ত নিতাইচাঁদ দত্ত উপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি কিরূপ কঠোর পরিশ্রম পূর্ব্বক ও অদ্ভুত সহিষ্ণুতা সহকারে স্বর্গীয় গঙ্গানারায়ণ দত্ত মহাশয়ের বদান্যতায় চৈতন্য লাইব্রেরি স্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন; সাধারণ সভাসমিতি ও সদনুষ্ঠান ব্যাপারে ইহাঁদের আদর্শ দেশের মঙ্গল প্রসূ হইবে।

সম্পাদক মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে একটি বিষয়ের ত্রুটি করিয়াছেন; সে ত্রুটি অমার্জ্জনীয়, সাহিত্য-সেবিদিগের উৎসাহিত করিবার জন্য বাঙ্গালা ইংরাজী সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও উন্নতি সাধন কল্পে চৈতন্য লাইব্রেরি হইতে উৎকৃষ্ট নির্ব্বাচিত প্রবন্ধের জন্য পদক ও অর্থাদি পুরস্কার প্রদানের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা কোন সময় হইতে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। আশা করি এ অপ্রকাশিত বৃত্তান্তটি প্রবন্ধান্তরে প্রকাশ করিবেন।

চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তব্যানুরোধে লাইব্রেরির উন্নতির জন্য কিরূপ কঠোর পরিশ্রম করেন, তাহা তাঁহার প্রবন্ধেই প্রকাশ পাইয়াছে। কি প্রণালীতে কার্য্য করিলে লাইব্রেরি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সংকল্পিত প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান গুলি অতি সহজে সত্বর এবং অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে সম্পাদন করা যাইতে পারে, তাহার উদাহরণ স্থল স্বরূপে চৈতন্য লাইব্রেরি আমাদের চক্ষুর সম্মুখে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। সম্পাদক মহাশয়ের সৌজন্য শিষ্টাচারে সকলেই মুগ্ধ ও আপ্যায়িত হইয়া থাকেন।

অদ্যকার প্রবন্ধ অপেক্ষা প্রবন্ধের আলোচনা কিছু দীর্ঘ হইয়াছে,—তজ্জন্য আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি অবশ্যম্ভাবি। সুতরাং আমি আপনাদের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনাদের প্রীতি ও সৌজন্যের জন্য কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি, এবং ভগবানের নিকট গোবৰ্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ও উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি। আপনারা আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

জিজ্ঞাসা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত পশুপতি সরকার।

বিষয় ধূলায় সদা হইয়া গো অন্ধ
পন্থহারা, মোর হয়েছে বচন বন্ধ,
তোমারে ডাকিতে প্রভু নাহি আর শক্তি
ত্রিতাপ জ্বালায় শুষ্ক হৃদে নাহি ভক্তি।
উপায় বিহীন, তব দয়াটুকু চেয়ে,
যা কিছু তোমারে দিয়ে আজি শুধু জিয়ে,
মৃত্যুর কঠিন কর যাহা বজ্র সম শক্ত
করিবে শীতল যবে মোর দেহ রক্ত;
করুণা করিয়ে ওগো দীন জন-সখা
বারেক সেদিন তুমি দিবে নাকি দেখা?

স্বর্গীয় আনন্দ গোপাল চক্রবর্ত্তী কণ্ঠাভরণ।

...সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থ...
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

জন্ম—১২৬৭ সাল ২৭শে শ্রাবণ।
মৃত্যু—১৩২৯ সাল ১৬ই কার্ত্তিক।
বয়ঃ—৬২।২।১৯।

ইনি বঙ্গ-সাহিত্যের একজন সুহৃদ ছিলেন। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের যাবতীয় সাহিত্য সভা ও পুস্তকালয়ের ইনি সদস্য ও বার্ষিক উৎসবের সঙ্গীত সমূহের রচয়িতা ও সুর যোজয়িতা ছিলেন। পুরাতত্ত্বানুশীলনে ইহার বড়ই উৎসাহ ছিল। ইনি বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ছিলেন। রামায়ণ ও মহাভারতাদির ঘটনার সময় নির্ণয় হইয়া, রাম ও যুধিষ্ঠির যাহাতে ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে গণ্য হইয়া আমাদের বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক সমূহে গৃহীত ও পঠিত হয়, এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি একজন অসাধারণ মৃদঙ্গী—পাথওয়াজী ছিলেন ও সর্ব্ববিধ যন্ত্র বাজাইতে পারিতেন। তাঁহার ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, কীর্ত্তন, যাত্রা বাউল, ঢপ, সারিগান ও

সর্ব্ববিধ অঙ্গের গানে অধিকার ছিল। তিনি এদঞ্চলের যাবতীয় ধর্ম্মসভা সমূহের সম্মানিত গায়ক ছিলেন, যাবতীয় ঐকতান সমিতির পরামর্শ দাতা ছিলেন ও "কসবা ঐক্যতান সমিতি"র সভাপতি ছিলেন। সাহিত্য ও সঙ্গীতের সেবা করিয়া, গত ১৬ই কাত্তিক ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার শ্রাদ্ধদিনে, "কসবা ঐক্যতান সমিতি" একটি শোক সভার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাহাতে "চতুষ্টেদের" ব্যাথাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়, সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বহু-সাহিত্য সভা, পুস্তকালয়, বিদ্যালয়, ধর্ম্মসভা, সঙ্গীতসভা প্রভৃতির প্রতিনিধিগণ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মন্মথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ, দাশরথী স্মৃতিতীর্থ, গোপেন্দু ভূষণ সাংখ্যতীর্থ, রাখালদাস কাব্যানন্দ, চণ্ডীচরণ স্মৃতিরত্ন, অহিভূষণ স্মৃতিরত্ন প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাতে "Nearer to the O God i" শীর্ষক ইংরাজী গৎ, বেদগান, স্তোত্রগান গীতা, জয়দেব শোকসঙ্গীত, ধ্রুপদ, খেয়াল, কীর্ত্তন, ধর্ম্মসঙ্গীত তৈলের চিত্র প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্য্য হইয়াছিল। এই শোকানুষ্ঠান সম্পূর্ণ হইতে ছয় ঘণ্টা কাল লাগিয়াছিল। তাঁহার নামে ছয়টি শোকসঙ্গীত রচিত হইয়া ঐ সভায় গীত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে একটি নিম্নে দেওয়া গেল——

—•—

আনন্দ বিহীন।*

ছিল বঙ্গ আনন্দ কানন চারিদিক করিয়া রঞ্জন
হ'ত ফুল বিচিত্র বরন
শ্বেত রক্ত নীল হরিন্তন।
তাতে ছিল মধুর জনন যার তরে ভ্রমর গুঞ্জন
গন্ধে তার অন্ধ জন গণ
কোকিলেতে করিত কুজন ॥১

* কসবা ঐক্যতান সমিতির সভাপতি আনন্দ গোপাল চক্রবর্ত্তী কণ্ঠাভরণ মহাশয়ের বিয়োগে সমিতির নিমিত্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মন্মথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ বিরচিত শোক সঙ্গীত।

এ আনন্দ তার একজন জন্মেছিল আলোকিয়া বন
ছোট বড় মেজ সে জন
সকলের সম প্রিয় হন।
নানা কলা তাঁর আলোচন নিত্যানন্দ ছিল তাঁর মন
গাহিতেন হেথা কত গান
যাহা শুনি জুড়াত পরান ॥২
হৃদি ছিল—প্রেমপ্রীতি ভক্তি দয়া মায়া স্নেহ সৌখ্য মৈত্রী
করুণায় ভরা আঁখি পাঁতি
ভালবাসা যেন মূর্ত্তিমান ॥
নাহি ছিল—কামনা খলতা অহঙ্কার ঘৃণা কপটতা
পর সুখে ঈর্ষা কুটিলতা
হিংসা দ্বেষ জুগুপ্সা রঞ্জন ॥৩
স্বার্থে যিনি দিলা জলাঞ্জলি পরতরে দিল প্রাণ ঢালি
কর্ত্তব্যেতে যিনি ভীম বলি
উৎসাহেতে না ছিল তুলন।
আজি তাঁর অভাবে এ স্থলী শূন্য প্রাণে আকুলি ব্যাকুলি
স্মৃতি তাঁর পড়িয়াছে ঢলি
তরে তাঁর করিছে ক্রন্দন ॥

—•—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম ও স্ত্রী চরিত্র।

লেখক,—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ।

মুখবন্ধ।

কাব্য বুঝিতে হইলে, অগ্রে কবিকে বুঝিতে হয়। কবি কোন দেশে জন্মিয়াছিলেন, তখনকার সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তিনি কিরূপে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার কিরূপ বন্ধু বান্ধব ছিল ইত্যাদি পারি-পার্শ্বিক অবস্থা জানা আবশ্যক। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত কাব্যের অনেক ভাবার্থ নির্ভর করে।

কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী।

অদ্য হইতে পঁছাত্তর বর্ষ পূর্ব্বে "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের" গ্রন্থকার ৺চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় B. A. B. L মহাশয়, মুরশিদাবাদ জেলার সদর ষ্টেশন বহরমপুরের অন্তর্গত, খাগড়া পল্লীতে জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার ২৫শ বর্ষের সময়, তাঁহার প্রথমা পত্নীর বিয়োগ হয়। তদবস্থায় সেই শোকোন্মত্তাবস্থায়, তিনি তাঁহার খাতায়, যে প্রাণের দুঃখ জ্বালা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু অমর বঙ্কিম তাহা দেখিতে যাইয়া, তাঁহার "বঙ্গদর্শনে" তাহা প্রকাশ করিয়া দেন। সেই প্রাণের জ্বালাটাই "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের" প্রথম উচ্ছ্বাস "সেই মুখখানি।" তাহার পর তিনি যখন কলিকাতায় থাকেন, তখন কলিকাতায় বসিয়া যে উচ্ছ্বাসটি লেখেন, তাহাই উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের দ্বিতীয় প্রস্তাব—'জাহ্নবী তীরে।" পূর্ব্বে তিনি বহরম পুরের কলেজিয়েট স্কুলের মাষ্টারি করিতেন। পুটে (রাজসাহী)তে মাষ্টারি করিতে গিয়া, তিনি উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের বক্রী পাঁচটি প্রস্তাব লেখেন। সেখানে প্রাণের ব্যবসায়, পূর্ণিমার শশী, শ্মশানে, নব বসন্ত সমাগমে এবং বহুপরে শয়ন মন্দিরে এই পাঁচটি উচ্ছ্বাস লিখিয়া ছিলেন।

বঙ্কিম বাবু যখন বহরম পুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সেই সময়ে চন্দ্রশেখর বাবু বহরম পুরের কলেজিয়েট স্কুলের মাষ্টার ছিলেন। তৎকালে তাঁহার সহিত বঙ্কিম বাবুর পরিচয় হয়। চন্দ্রশেখর বাবু "বঙ্গদর্শনের" নিয়মিত লেখক ছিলেন। বঙ্কিম বাবু অন্য সকলের লেখা সংশোধন করিয়া, তবে প্রকাশ করিতেন, কেবল চন্দ্রশেখর বাবুর লেখা বিনা সংশোধনেই প্রকাশিত করিতেন। তাহা ব্যতীত তিনি তৎকালের বিখ্যাত মাসিকপত্র "জ্ঞানাঙ্কুরে"ও লিখিতেন। এই সকল সাহিত্য সেবার ফলে মালক্ষ্মী তাঁহার উপর হাড়ে চটিয়া গেলেন। তিনি পরবর্ত্তী কালে বহরমপুরে আসিয়া B. A, B. L উকিল হইলেও তাঁহার আর অন্ন জুটিল না। তিনি 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" ব্যতীত "স্ত্রী চরিত্র" কয়েকখানি নভেল এবং টপ্পা গান রচনা করিয়া ও স্বয়ং গান করিয়া বঙ্গ জননীর সেবা করিয়াছেন। তিনি আবার দার পরিগ্রহ করিয়া ছিলেন। প্রথম পক্ষেও তাঁহার কোনও সন্তান ছিল না। দ্বিতীয় পক্ষেও তাঁহার কোনও পুত্র বা কন্যা জন্মে নাই। তাঁহার ৫৫ বর্ষ বয়সে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

তখন তিনি একজন দীন হীন ব্যক্তি। উকালতিতে দিন চলে না জানিয়া, কাশিম বাজারের মহারাজা দয়া করিয়া তাঁহাকে "উপাসনা" নামক এক

মাসিক পাত্রিকা বাহির করিয়া, তাহার সম্পাদন ভার অর্পণ করিয়া, প্রতিপালন করিতে ছিলেন। শেষ বয়সে তাঁহার সে পরিশ্রমও অসামর্থ্য হওয়ায়, মহারাজা তাহাকে মাসহারা দিয়াও প্রতিপালন করিতে ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি শয্যাসায়ী ছিলেন। প্রায় তিন বর্ষ হইল তাহার দ্বিতীয়া স্ত্রীটিও গতাসু হইলেন। তিনি আরও কষ্ট পাইয়া, হাঁসপাতালে, বর্ত্তমান বর্ষে দুর্গা পূজার সময় ভগবানের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম সমালোচনার মুখবন্ধ।

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম কাব্য নহে। কাব্যের লক্ষণ ইহাতে খাটে না। কাব্য জিনিষটা কল্পনা কলা মাত্র। "প্রবন্ধ কল্পনা কলা"—অমর। কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম কল্পনা নহে। মহাত্মা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছিল, তিনি তাহার শোকে কাগজের উপর কালি কলম দিয়া কাঁদিয়াছেন। ইহা সত্য কথা—কল্পনা কথা নহে। It is a fact and not a faction, সত্য কথা কাব্য নহে; কল্পিত কথাটাই কাব্য।

ইহা একজন প্রিয়া বিরহিতের শোকোচ্ছাস। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছিল। তিনি তাহার সেই প্রিয়া বিরহে উন্মাদাবস্থিত প্রাণের যে ফটোগ্রাফী, কালি কলমের দ্বারা ধরিয়া রাখিয়াছিলেন তাহারই নাম—"উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম।" ইহা কৃত্রিমভাষা নহে ইহা জীবন্ত ভাষা। জীবন্ত ভাষা বা জীবন্ত কাব্য বড় দেখা যায় না, কদাচিৎ দেখা যায়।

ভীশোক ক্রোধ হর্ষাদির আধিক্য সময়ে, প্রাণে এক প্রকার স্পন্দন উপস্থিত হয়। ভাবের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত স্পন্দনের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। স্পন্দনের বৃদ্ধি কালীন যে ভাষা প্রয়োগ বা যে বর্ণ বিন্যাস করা যায়, ভাবের বাত্যয় হইলে, আর সে শব্দ প্রয়োগ করা যায় না। একজন পুত্র শোকার্ত্ত ব্যক্তি, পুত্রশোক হইলে কিরূপ জ্ঞাত না হয়, তাহা যেমন লিখিবেন, যাহার পুত্র মরে নাই সে তেমন লিখিতে পারিবে না। যুদ্ধ প্রত্যাগত ব্যক্তি যেমন যুদ্ধের বর্ণনা করিবে, যে যুদ্ধ দেখে নাই সে পুস্তক পড়িয়া তেমন বর্ণনা লিখিতে পারিবে না। নবীন সেনের যুদ্ধ বর্ণনা সেই জন্য ফুটে নাই। এই যে ভাষার স্বভাবজ অভিব্যক্তি ইহারই নাম জীবন্ত ভাষা। একই ব্যক্তি ভাবের আধিক্যে যেরূপ ভাষা প্রয়োগ করিবে, ভাবের ন্যূনতা অবস্থায়, আর সেরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতে পারিবে না। চন্দ্রশেখরের লেখা একাধারে জীবন্ত

ভাষা এবং ভাব উভয়ই তাহার নিজস্ব। তবে এটা ইংরাজি ছাঁচের ভাব।

এই যে জীবন্ত ভাষা বা কবিতা, তাহার নিকট কৃত্রিম ভাষা বা কৃত্রিম কবিতা ঘেঁসিতে পারে না। একত্র স্বাভাবিক এবং অন্যত্র অস্বাভাবিক। একজন পুত্র শোকার্ত্ত যেরূপ আর্ত্তনাদ করিবে, একজন থিয়েটারের প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা, কি সেইরূপ শোক প্রকাশ করিতে পারিবে? অনুকরণ কখনও স্বভাবকে ছাড়াইয়া যাইতে পারিবে না। Truth is stronger than fectom, কাজেই চন্দ্রশেখরের বিরহের কান্না, জগতের মত কবির, কৃত্রিম বিরহের কান্নাকে অতিক্রম করিয়াছে। ইহা জ্ঞানরাজ্যে একটি নূতন ও বিচিত্র জিনিষ।

বাঙ্গালার জন মণ্ডলী অতিরিক্ত কল্পনা প্রিয়, সত্যের দিকে তাহাদের অনুরাগ বড় কম। যদি তাহাদের সত্যানুযোগিতা আসে, তখন এই উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম আরও অদেরের সহিত পঠিত হইবে। তবে তখন কবি আর দেখিতে আসিবেন না। এবং এখন গ্রন্থসত্ব গুরুদাস বাবুর, কাজেই তাহাতে চন্দ্রশেখর বাবুর দারিদ্র আর ঘুচিবে না।

এ গ্রন্থের বাঙ্গালা দেশে কিছু আদর হইয়াছে,—ইহা ইংরাজীতেও অনুবাদ হইয়াছে, বহুদিন পূর্ব্বে রাঁচির দ্বিজেন্দ্র নাথ সিংহ একদিন আমায় বলিলেন, —তিনি উদভ্রান্ত প্রেমের ইংরাজী করিতেছেন। ক্রমশঃ এ পুস্তক বিশ্ব সাহিত্যে স্থান পাইবে। বাঙ্গালা ভাষায় গুরুদাস বাবু ইহার অন্ততঃ কুড়িটা সংস্করণ দিয়াছেন।

বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের সময় পর্য্যন্ত, কয়েকটি জীবন্ত ভাষার নমুনা তুলি. তাহা দেখিলেই, আপনারা বুঝিতে পারিবেন, স্বভাবজ শোক প্রকাশ কেমন, এবং কৃত্রিম শোক প্রকাশ কেমন। যতক্ষণ প্রাণের স্বভাবজ আবেগ জিনিষটা যে কি তাহা না বুঝান হইতেছে, ততক্ষণ উদভ্রান্ত প্রেম যে কি, ইহার সাধারণ কবির কৃত্রিম ভাষা ও ভাবপূর্ণ গ্রন্থ হইতে বিশেষত্ব কি, বুঝান হইতেছে না। কাজেই কতকগুলি স্বভাবজ উচ্ছাস হইতে ভাষা ও ভাবের চমৎকারিতা দেখাইব।

ক্রমশঃ

বঙ্গসাহিত্য পরিষৎ মন্দির
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

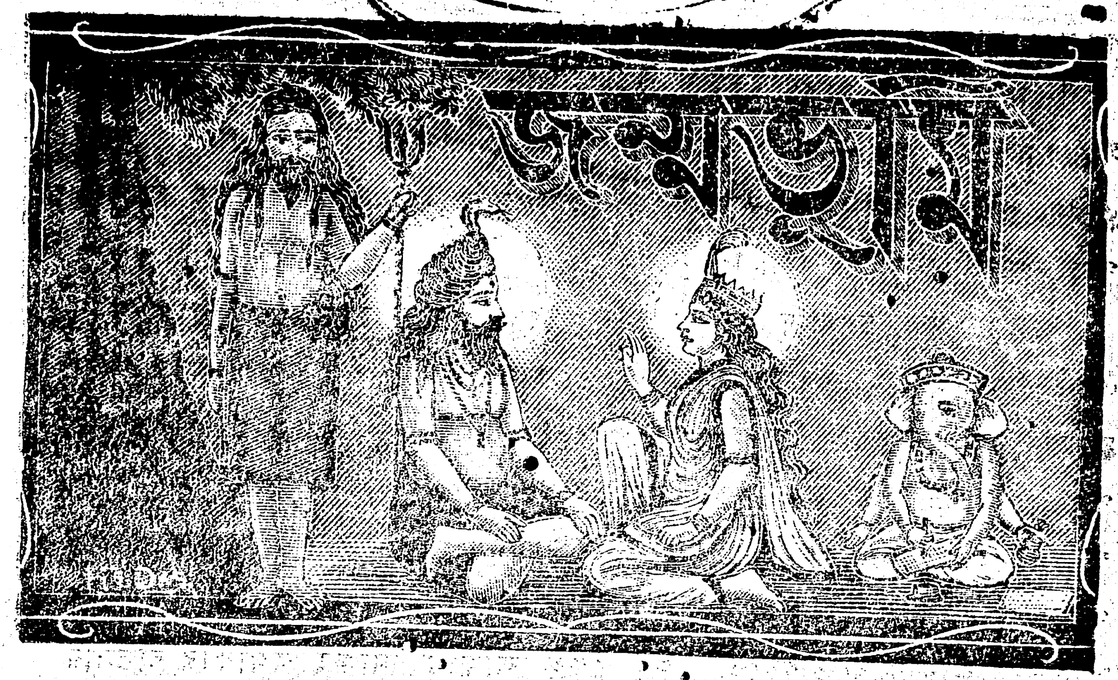

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

২৮শ, বর্ষ। ১৩২৯ সাল, মাঘ। ১০ম, সংখ্যা।

"গুরু-শিষ্য সংবাদ।"

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

লেখক, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন।

(ন্যায়দর্শনের অন্তর্গত কুসুমাঞ্জলী গ্রন্থের অনুবাদ।)

গুরু। শরীর যদি চৈতন্যশালী হয়, তাহা হইলে, বাল শরীর ধ্বংস হইয়া যখন যৌবন শরীর উৎপন্ন হয়, তখন যৌবন কালীন শরীরে শৈশবানুষ্ঠিত কর্ম্মের স্মরণ হইতে পারে না। স্মরণ কর্ত্তার অভাবে কে তখন স্মরণ করিবে বল?

শিষ্য। বাল্য শরীরোৎপন্ন সংস্কার যৌবনান্বিত শরীরে সংক্রমিত হইয়া তৎকালে জ্ঞান জন্মাইতে পারে, তাহাতে দোষ কি?

গুরু। বাসনা অর্থাৎ সংস্কারের সংক্রমণ নাই, তাহা থাকিলে গর্ভস্থ সন্তানে জননীর সংস্কারের সংক্রমণে দৃষ্ট হইত। কিন্তু জননীর অনুভূত বস্তু

কখনও পুত্রকে স্মরণ করিতে দেখা যায় না।

শিষ্য। পিতা মাতা পুত্রের নিমিত্ত কারণ, নিমিত্ত কারণের গুণ পুত্রে সংক্রামিত না হয়,—না হউক কিন্তু শরীরের উপাদান কারণ পরমাণু পুঞ্জ, প্রথম শরীরারম্ভক পরমাণু পুঞ্জ জনিত সংস্কার যৌবন শরীরারম্ভক পরমাণু পুঞ্জে সংক্রামিত হইতে বাধা কি?

গুরু। কর চরণাদি অবয়ব যদি পরমাণু পুঞ্জ হয়, তবে উহার কোন একটী ছিন্ন হইলে, তদ্বারা পূর্ব্বানুভূত কোন একটী বস্তু পশ্চাৎ স্মরণ হওয়া অসম্ভব, স্মরণ কর্ত্তার অভাবে স্মরণ হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ স্মৃতি যদি পরমাণু আশ্রিত স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পরমাণু অতীন্দ্রিয় বিধায় স্মৃতি ও ইন্দ্রিয়াতীত হইয়া পড়ে। অতএব সংস্কার, উপাদান কারণ পরমাণু পুঞ্জ-গত, ইহা বলা যায় না। সুতরাং সংস্কারাশ্রয়রূপে অবশ্যই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে, কেহ কেহ আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার বাসনায় বীজ ও অবয়বাদিতে শক্তি বা জাতি প্রমাণ করিতে বহুল আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর পরমেশ্বরই মায়া বা প্রকৃতির সহায়তায় এই বিশ্ব প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়াছেন, জীব, তাঁহারই অংশভূত। জীবাত্মাই অদৃষ্টের আশ্রয়। অদৃষ্টাকৃষ্ট হইয়া জীবাত্মাই পুনর্জ্জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে।

শিষ্য। মহাজন কর্ত্তৃক সমায়ুত, অপৌরুষের নিত্য বেদের আদেশ প্রভাবেই যাগাদি নিষ্পন্ন হইতে পারে, যজ্ঞাদির উপদেষ্টারূপে স্বতন্ত্র ঈশ্বর স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি?

গুরু। বেদ পৌরুষের কি অপৌরুষের তাহাই অগ্রে সপ্রমাণ হউক, পরে উপদেষ্টার সন্ধান লওয়া যাইবে।

বেদ যদি কোন পুরুষ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপসা প্রভৃতি দোষ থাকাও সম্ভব। এমন কোন পুরুষ নাই যে, একেবারেই ভ্রম প্রমাদাদি শূন্য। পুরুষ কর্ত্তৃক যদি বেদ রচিত হয়, তাহা হইলে বেদও ভ্রম প্রমাদ শূন্য হইতে পারে না। তাহা হইলে বেদের স্বত প্রমাণ্যও থাকে না। কিন্তু মহাজন কর্ত্তৃক বেদের স্বতই প্রমাণ্য স্বীকৃত হওয়ায় উহা ভ্রম প্রমাদাদি দোষ শূন্য ও অপৌরুষেরই প্রমাণিত হয়।

শিষ্য। বাঙ্ময় বলিয়া অন্নদাদির বাক্যের ন্যায় বেদ সকর্ত্তৃক এমত বলিলে ক্ষতি কি?

নিত্য বলিয়া বেদ অপৌরুষেয়, ইহাও উহার প্রতিকূলে বলা যাইতে পারে,

আর যদি বেদ সকর্ত্তৃক বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যায়, তবে সিদ্ধ কপিলাদি মুনিকে উহার কর্ত্তা রূপে মানিয়া লইলেই হয়, স্বতন্ত্র বেদ কর্ত্তা বলিয়া ঈশ্বর স্বীকারের প্রয়োজন কি?

গুরু। আমাদিগের জ্ঞান, কারণান্তর সাপেক্ষ, অর্থাৎ কোন একটী কারণ অপেক্ষা করিয়াই আমাদিগের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, শব্দার্থ জন্য যথার্থ জ্ঞান জন্মিতে হইলেও কিছু একটা কারণ অপেক্ষা করে। ঐ কারণ বক্তার যথার্থ বাক্যার্থ জ্ঞান। বক্তা যথার্থ বাক্যে বলিলে তজ্জন্য তাহার বাক্যের অর্থ জ্ঞান হয়, নচেৎ অসঙ্গত বাক্য জন্য জ্ঞান যথার্থরূপে উৎপন্ন হয় না। বাক্যের অর্থ বুঝিতে হইলে জ্ঞানের আবশ্যক—জ্ঞান সমবায় সম্বন্ধে আত্মায় থাকে। জ্ঞান মানিতে হইলে আত্মাও মানিতে হয়, আত্মা স্বীকার করিলে অবশ্যই ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয়।

শিষ্য। নির্দ্দোষ বলিয়া ও মহাজন সমাদৃত বলিয়া প্রামাণ্য ইহা বলায় দোষ কি?

গুরু। বেদ নির্দ্দোষ ইহা স্বীকার করি। কিন্তু প্রলয় কালে সমস্তই বিলয় হয়; তখন মহাজন ব্যক্তির অস্তিত্ব অসম্ভব, সুতরাং প্রলয়ান্তে সৃষ্টির প্রারম্ভে মহাজন সমাদৃত বোধ না হওয়ায় কিরূপে বেদের প্রামাণ্য গ্রাহ্য হইবে? অপরন্তু এই "ক" উৎপন্ন এই "খ" বিনষ্ট ইত্যাদি প্রতীতিবলে শব্দের অনিত্যত্ব সার্ব্বভৌমিক অনুভব সিদ্ধ, শব্দ যদি অনিত্য হয়, তবে শব্দ প্রাণ বেদও নিশ্চয়ই অনিত্য হইবে। প্রলয়ের পর পুনরায় বেদের সৃষ্টি আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং তৎকর্ত্তৃত্ব রূপে অবশ্যই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

শিষ্য। কপিলাদি সিদ্ধ ঋষিগণ যোগবলে পূর্ব্ব সংস্কার বলে পরবর্ত্তী সৃষ্টিকালে বেদ প্রকাশ করিতে পারেন—সুতরাং স্বতন্ত্র ঈশ্বর স্বীকারের প্রয়োজন করে না।

গুরু। বেদ প্রকাশের এক কর্ত্তা, সৃষ্টির অপর কর্ত্তা, অন্য কার্য্যের অন্য কর্ত্তা ইত্যাদি। নানা কর্ত্তা স্বীকার না করিয়া ঈশ্বরকেই একমাত্র কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিলেই ত সকল গোল মিটিয়া যায়।

শিষ্য। আপনি প্রলয়ের কথা বলিতেছেন, প্রলয়ের অস্তিত্বে প্রমাণ কি? প্রলয় হইবার পূর্ব্বে যেমন দিবারাত্রি হইত,—প্রলয়কালেও যদি সেইরূপই হয়, তবে তাহা প্রলয় বলি কিরূপে? দ্বিতীয়তঃ প্রতিক্ষণ ফলোৎপাদন করাই

কর্ম্মের স্বভাব, কর্ম্মজনিত অদৃষ্ট ভোগ্যদ্রব্যাশ্রিত হইয়া বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ফল উৎপাদন করা অসম্ভব নহে। তৃতীয়তঃ ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হওয়াই নিয়ম। প্রলয়ে যদি একবারে ব্রাহ্মণত্ব ব্যবহার অসিদ্ধ হইয়া উঠে। চতুর্থতঃ প্রলয়কালে সর্ব্ব বিলোপ হয়, ইহা বলিলে পরবর্ত্তী সৃষ্টিকালে উপদেষ্টার অভাব নিবন্ধন ঘট পটাদি শব্দে সেই সেই বস্তু জ্ঞান অসম্ভব হয়। পঞ্চম, প্রলয়কালে যদি সর্ব্ব বিলোপ হয়, তবে পরবর্ত্তী সৃষ্টিকালে পূর্ব্ব সৃষ্টিকালীন বস্তুগত নৈপুণ্য বোধ কিরূপে হয়? পর সৃষ্টিতেও যখন বস্তুতঃ গত নৈপুণ্য দেখা যায়—তখন সর্ব্ব বিলোপকালে প্রলয় স্বীকার করা অসঙ্গত বোধ করি।

গুরু। তোমার আপত্য নিরর্থপক্ষে যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। অহোরাত্রের প্রতি যেমন অহোরাত্রেরই কারণত্ব দেখা যায়, সেইরূপ পূর্ব্ব সৃষ্টিই পরসৃষ্টির কারণ ইহা বলা যায় সুষুপ্ত কালীন যেমন কতিপয় ব্যক্তির সুখ দুঃখ প্রভৃতি ভোগ জনক অদৃষ্ট নিরুদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ কাল বিশেষে সমস্ত আত্মার সমস্ত অদৃষ্ট নিরুদ্ধ না হইবে কেন? গাঢ় নিদ্রাকালে সুখ দুঃখের স্ফুরণ দেখা যায় না, তখন এই উভয়ের কারণ নিরুদ্ধ থাকে ইহা নিশ্চিতই বলিতে হইবে। কোন মনুষ্যের কোন সময় ভোগাদৃষ্ট নিরোধ হওয়া যদি সম্ভব হয়, তবে কোন সময় সমগ্র মনুষ্যের ভোগাদৃষ্ট নিরুদ্ধ হইবে না তাহার প্রমাণ কি? গোময় হইতে যেমন বৃশ্চিকাদি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ কাল বিশেষে বা অদৃষ্ট বশে ব্রাহ্মণ হইতে ইদানীন্তন ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইতে পারে। পরবৃত্তি সৃষ্টিকালে প্রযোজ্য প্রয়োজক শরীরদ্বয় পরিগ্রহ করতঃ তদানীন্তন ব্যক্তির ঘট পটাদি ব্যবহার জন্মাইতে পারে—ঘটাদি গত নৈপুণ্য ও ভগবান বিধান করিয়া থাকেন, জন্ম সংস্কার স্বাধ্যায়, বিদ্যাদি, শক্তি, কর্ম্ম প্রভৃতির কাল সহকারে হ্রাস দেখা যায়। ঐ সমুদয়ের ক্রমিক ক্ষীণতা দর্শন করিয়া স্পষ্টই বোধ হয় যে, কালে একদিন বেদাদি শাস্ত্রের গুরু পরম্পরা গত উপদেশ বিলুপ্ত হইবে। প্রদীপ যেমন ক্রমশঃ ক্ষীণপ্রভ হইয়া নিভিয়া যায়। সেইরূপ ক্রমিক হ্রাস দর্শনে কালে বেদাদি শাস্ত্রের ও বিলোপ অনুমান করা যায়।

জন্ম হ্রাস যথা প্রাচীনকালে মানস পুত্র উৎপন্ন হইত, তৎপরে পুত্র কামনায় মাত্র মৈথুনজ সন্তান উৎপন্ন হইত। এক্ষণে প্রবৃত্তি কিঙ্কর পুরুষের সম্ভোগ জাত পুত্র উৎপন্ন হইতেছে। পুত্রাদি কামনায় পূর্ব্বে যজ্ঞ করিলে যজ্ঞীয় চরু সংস্কারেই গর্ভস্থ জীবের সংস্কার সিদ্ধ হইত। তৎপর গর্ভ সংস্কারে সংস্কার

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

সিদ্ধি হইত। তৎপর জননান্তর সংস্কার, এক্ষণে যথা কথঞ্চিৎ সংস্কার সিদ্ধ হয়, সুতরাং সংস্কার হ্রাস হইয়াছে বলিতে হইবে। পূর্ব্বে লোকে সহস্র শাখান্বিত চারি বেদ অধ্যয়ন করিত। তৎপর তিনটী, তৎপর দুইটী তৎপর একটী এইরূপে ক্রমশঃ বেদাদিরও জ্ঞানের হ্রাস হইয়াছে বলিতে হয়। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি জাতি ক্ষেত্র পতিত ধান্যাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। তৎপর অযাচিত দ্রব্যাদি দ্বারা, তৎপর ভূমি কর্ষণাদি দ্বারা, তৎপর সেবা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। সুতরাং বৃত্তি হ্রাস হইয়াছে, ইহাও মানিয়া লইতে হইবে, সত্যযুগে তপস্যা, জ্ঞান, যজ্ঞ, দান এই চতুষ্টয়াত্মক ধর্ম্ম বিরাজমান ছিল। ক্রমশঃ যুগে যুগে হ্রাস হইয়া এক্ষণে কলিযুগে একমাত্র দানে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সুতরাং ধর্ম্ম হ্রাস হইয়াছে। ইহা অবশ্যই মানিতে হইবে, এক্ষণে মনুষ্যের পূর্ব্বের ন্যায় বেদাদি অধ্যয়ন শক্তি নাই। পূর্ব্বে ধর্ম্মে শক্তি নাই, ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, কর্ম্মাদি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়াছে। সুতরাং কোন সময় হ্রাস রীতিক্রমে ব্রহ্মাণ্ড বিলয় হইবে ইহা স্পষ্টই প্রতীতি হয়, অতএব প্রলয় অসিদ্ধ, ইহা বলা যায় না। প্রলয় স্বীকার করিলে তৎপরবর্ত্তী সৃষ্টিকালে ব্যবহার শিক্ষাদাতা, বেদোক্ত কর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়া এবং দ্ব্যণুকাদি সৃজন কর্ত্তা ঈশ্বর আছেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

শিষ্য। প্রত্যয়াভাব, অভাব প্রতিপাদক কিনা? যদি প্রত্যক্ষের অভাব প্রতিপাদক হয়, তবে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষাভাব নিবন্ধন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিব কেন?

গুরু। গগনের অভাব প্রত্যক্ষ সত্ত্বেও যেমন গগনের অস্তিত্ব ব্যাঘাত হয় না তদ্রূপ ঈশ্বরাভাব প্রত্যক্ষ হইলেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব ব্যাঘাত হয় না।

শিষ্য। ক্ষিত্যাদি যদি ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইত, তাহা হইলে, ক্ষিত্যাদি সম্পর্কে ঈশ্বরের ও প্রত্যক্ষ হইত। যখন তাহা হয় না তখন ক্ষিত্যাদি কর্ত্তৃক জন্য নহে ইহাই প্রমাণীকৃত হয়।

গুরু। যাহার অনুভব হয় না, তাহাই যদি অলীক হয়, তাহা হইলে অতীন্দ্রিয় অপ্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় নিচয়েরও অভাব প্রতিপন্ন হইতে পারে। অতএব যাহার অনুভব সম্ভব তাহারই অভাব প্রত্যক্ষ হয়, আকাশ কুসুমের অলীকত্ব নিবন্ধন উহার কখনও অভাব প্রত্যক্ষ হয় না।

শিষ্য। যাহার কর্ত্তৃত্ব থাকে—তাহার শরীর ও প্রয়োজন অনুসন্ধান থাকে ঈশ্বরের তদুভয় কিছুই নাই। তখন তাঁহার কর্ত্তৃত্বও নাই। ইহাই

বলা সঙ্গত। নির্ণেয় পদার্থই যদি অনির্ণীত হয়, তবে তাহার অনুমানইবা কিরূপ?

কোন বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতে হইলে, সেই বস্তুর কোন একটি গুণ অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতে হয়, যে গুণটি অবলম্বন পূর্ব্বক অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে হয়, সেটি প্রত্যক্ষ মূলক হওয়া আবশ্যক, নচেৎ ব্যাপ্তি জ্ঞান অর্থাৎ গুণ গুণীর একত্রাবস্থান জ্ঞান হয় না। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সম্পাদক কোনও গুণ নাই। সুতরাং কিরূপে তাঁহার নির্ণয় করা যাইবে? অস্তিত্বরূপে ঈশ্বরের জ্ঞান হইতে দেখা যায় না অতএব ঈশ্বর নাই ইহা স্বতই প্রমাণীকৃত হইতেছে।

গুরু। অভাবটি বস্তুর বিশেষণ, ভাব বিশেষ্য যাহার অভাব ধরা যায় সেই বস্তুই, সেই অভাবের বিশেষণ, যথা ঘটাভাব বলিলে ঘটীয় অর্থাৎ ঘট সম্বন্ধীয় অভাব ইহাই বুঝা যায়। বিশেষ্য হীন বিশেষণ কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। কাল অখণ্ডিত্ব, ইহা কখনও কেহ বলে না। অলীক বস্তু নাই বলিয়াই প্রসিদ্ধ, তাহার অভাব কেহই গ্রহণ করেন না। আছে বস্তু নিয়ে বিচার যাহা নাই, তাহা চিরদিনই নাই বলিয়াই—প্রসিদ্ধি আছে। তাহার অভাব স্বতই বিশ্রুত, সুতরাং তাহার অভাব কেহই ধারতে চেষ্টা করেন না, ভাববস্তুর ঘটাদির অভাবই লোকে অনুভবাভাবে গ্রহণ করে। অতএব ঈশ্বরাভাব ধরিলে সেই বিশেষণ ভূত অভাবের অভাব ভাব স্বরূপ হয় ইহা প্রতিপন্ন আছে। যেমন ঘটের অভাব বলিলে ঘটের অনস্তিত্ব বুঝা যায়। আবার তাহার অভাব অর্থাৎ ঘটাভাবের যে অভাব সে ঘটের স্বরূপ হয়, ইহা অনুভব সিদ্ধ। সেই রূপ ঈশ্বর যদি অভাব তুল্য হন, পুনরায় তাহার অভাব ধরিলে ঐ অভাব ঈশ্বরাভাবাভাব অর্থাৎ ঈশ্বর স্বরূপ হইবে। সুতরাং "ঈশ্বরোনাস্তি" এই বাক্যে বলিলেই অভাবমুখে ভাব প্রতিপাদিত হইয়া ঈশ্বর প্রতিপন্ন হইতেছে। কদাচ অলীকের আশ্রয় হইতে পারে না। অতএব অবশ্যই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীসরস্বতী বন্দনা গীতি।

পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত।

(ললিত—সুর ফাঁক তাল।)

বিরাজে সরোজে গীর্ব্বাণ বাণী।
অপরূপ রূপ ছন্দ, জিনি' কোটী চন্দ্র উজল বরণী॥
বিধাতা শ্রীমুরহর, চন্দ্র শেখর,
সেবে পদকমল দুখানি॥
পূত প্রণব ত্রিতাপ পাপ হর বেদ সুন্দর,—
নিরন্তর শুভ সম্পদ পদ শোভিনী॥
রে চিত! কি চিন্ত সতত, পিও দেবীপদ অমৃত ধারা,—
হ'বি রে মূঢ় অমৃত আপনি॥
দেহি শ্রীচরণ দীনে কৃপাকরি, করুণা করি!
নমে পদে দ্বিজ শ্রীপদ, বুধ জননী॥

—•—

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম ও স্ত্রী চরিত্র।

লেখক,—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ।

বৈদিক কাল্পা।

জগতের আদি কবি ব্রহ্মার প্রাণের আবেগ।

অজীবর্ত্ত ঋষির পুত্র শুনঃশেককে যজ্ঞে বলিদানের যূপকাষ্ঠে বন্ধন করিলে তিনি নিম্নের মন্ত্রে ভগবানকে স্তব করিয়াছিলেন,—

মন্ত্র।—দর্শংনু বিশ্বদর্শতং দর্শায়ন মধিক্ষমি এতা জুষত মে গিরঃ
ইমং মে বরুণ প্রুধি হবম্যাচ মৃড়য় ত্বামবস্যু রাচকে॥

ত্বং বিশ্বস্য মেধিরঃ দ্বিশ্চ গ্মশ্চ রাজসি সযামনি প্রতিশ্রুধি।
উচ্ছত্তমং মুমুগ্ধিনো বিপাপং মধ্যমংচৃত অবাধমানি জীবসে ॥

অনুবাদ।—দেখিয়াছি বিশ্বদর্শী তাঁর রথ আমি এই ক্ষমাতলে
শুনিতে এ স্তবন আমার।
এই মোর আজিকে আহ্বান হে বরুন করহ সুখিত
পরাণের তরে ডাকি তোমা ॥
হে মেধির রাজা তুমি আজ বিশ্বের দ্যুলোক ভূলোকে লক্ষ্য;
করহ মঙ্গল আমাদের।
উত্তম মধ্যমে নাশ করি অধমে বিনাশ কর আর
এবার রাখহ মোর প্রাণ ॥

(পণ্ডিত শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ীর বেদ ব্যাখ্যা হইতে সংগৃহিত।)

"একোভূৎ নলিনাৎ ততশ্চ পুলিনাৎ বল্মীকত-শ্চাপরে।
তেসর্ব্বে কবয়ঃ ত্রিলোক গুরবঃ তেভ্যোনমস্কুর্ম্ম হে॥"*

সেই জগতের তৃতীয় কবি পুত্র শোকার্ত্ত বাল্মীক—সংস্কৃত ভাষা ও মানব জগতের কবি গুরু। তিনি অন্ধ মুনির ব্যপদেশে যে নিজের প্রাণের ছবি দিয়াছেন, তাহরে কতকাংশ—

রামায়ণ অযোধ্যা কাণ্ড।

অন্ধ মুনির বিলাপ।

নাভি বাদসে মাদ্য, ন চ মা মভি ভাষসে।
কিঞ্চ শেশে তু ভূমৌ ত্বং, বৎস! কিং কুপিতোদ্যানি?

কেন অভিবাদন করনা আমারে মুখে নাহি সরে ভাষ,
কেন শুয়ে তুমি ভূমিতে আজিকে বাছা কি হয়েছ কুপিত?

নত্বহংতেহপ্রিয়ঃ পুত্র: মাতরং পস্যধর্ম্মিকীং।
কিঞ্চ নালিঙ্গসে পুত্র! সুকুমার বচোবদং॥

আমি ত তোমার অপ্রিয়ত নই দেখ মাতা তব আছেন ধার্ম্মিকা,
কেন আলিঙ্গন নাহি দেহ পুত্র! সুকুমার কথা বল গো এবে ॥

* অনুবাদ—আদি কবি জন্মিলা নলিনে, পরে কবি জাতিলা পুলিনে, বল্মীকেতে হইলা অপরে। তাঁরা কবি বর, গুরু ত্রিলোকের, করি নমস্কার সাদরে॥ কার্ণট মাহবী।

যান্‌লোকান বেদ বেদাঙ্গ পারগা মুনয়োগতাঃ
যাংশ্চ ব্রহ্মর্ষয়ো জাতা যযাতি নহুষাদয়।
যাংশ্চাভয় প্রদাতারং তথা যান সত্য বাদিনঃ
তান লোকান মদনুধ্যাতো যদি পুত্রক শাশ্বতং ॥

যে লোকে বেদ বেদাঙ্গ পারগ মুনিরা গেছে,
যে লোকে ব্রহ্মর্ষি যত যযাতি নহুষ আছে।
যেথানে অভয়দাতা আর সত্যবাদী মিলি
সে লোকে আমার ধ্যায়ী হে পুত্র যাও চলি ॥

নহীদৃশে কুলে জন্ম প্রাপ্য যাস্যধমাং গতিং
তস্মাদিত শ্চ তু স্থানাৎ যাহি লোকান মধুদ্রুহঃ।
ঈদৃশে কুলেতে জন্ম পেয়ে না অধমে যায়
তাই হেথা চ্যুত হয়ে মধুদ্রুহ লোকে যাও ॥

তিষ্ঠ মা মাগমঃ পুত্র যমস্য সদনংপ্রতি
বৈবশ্বত মহং যত্নাৎ ভিক্ষিষ্যে কৃপনঃ সুতং ॥
রহ পুত্র নাহি যাও যমের সদন মুখে
বৈবশ্বত কাছে চলি ভিক্ষিব করুণা আমি ॥*

সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অধিকার না থাকিলে, কোনটা স্বভাবজ আর কোনটা কৃত্রিম তাহা বুঝা যায় না, একটি বাঙ্গালা উচ্ছ্বাস তুলি, তাহা হইলে আপনাদের স্বভাবজ বা কৃত্রিম বুঝিবার সামর্থ সহজ হইবে। কাজেই—

এইবার একজন বাঙ্গালীর পুত্র শোকোচ্ছ্বাস শুনাই, এই গানটি পড়িলেই

* আদি কবি ব্রহ্মার কাব্য বুঝা বড় কঠিন। ভাষা বড় কঠোর। কিন্তু কবিগুরু বাল্মীকির ভাষা বুঝিতে আর কোন কষ্টই নাই। অনুবাদ না করিলেও বাল্মীকির প্রাঞ্জল ভাষা সকলেরই মর্ম্মস্পর্শী। অলঙ্কার শাস্ত্রের, এই শ্লোকটি কবি গুরুর সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে প্রজুজ্য—

"অবিদিত গুণাপি সৎ কবি ভণিতি, রমতি কর্ণেষু মধুধারাং।
অনধিগত পরিমলাপি হরতি দৃশং মালতী মালা ॥

অনুবাদ—সৎ কবির ভনিতি যদি হয়, গুণ যদি নাহি বুঝা যায়।
ভাষাতার বমন করে কর্ণে মধুধারা সম মিষ্ট বর্ণে ॥
পরিমল নাগেলেও নাসিকায়, হরে দৃষ্টি মালতী মালায় ॥

আপনারা বুঝিতে পারিবেন—যাহার শোক হইয়াছে, তাহার সেই ব্যথা ভেদ করিবার যে ধ্বনি উত্থিত হইবে, যাহার পুত্র মরে নাই,—সে বড় কবি হইলেও কৃত্রিম শোক প্রকাশ করিতে গেলে, সেই প্রাণভেদী—মর্ম্মভেদী ভাষা হইবে না।

রায় সাহেব ৺ বিহারীলাল সরকার সাহিত্য সুধাকরের পুত্র শোকোচ্ছ্বাস।

ধামার।

ব্যথাহারী বলে হরি! ভালবাস কি ব্যথা দিতে?
ব্যথা দিয়ে তাই কিহে চাহ ব্যথা ঘুচাইতে?

দশকুশী।

মরণের পথে শুয়ে,—মরণের কোলে, (হরি হে)
তৃষিত জড়িত কণ্ঠে, ডাকি হরি হরি বলে,
ভাসি নয়ন জলে, যাতনায় জ্বলে;
তখন তুমি থাকতে নার, কাছে এস,
আপন ব্যথাহারী নাম রাখিতে।

একতালা।

তখন পাইহে সুধা মথিয়ে গরল।
আঁধার ছাঁকিয়ে পাইহে আলোক বিমল।
হয় কত অমঙ্গলে কতই মঙ্গল
সুধা ঝরে নিঝর হে,
চিতানল ঘন চিতে।

দোলন।

কেন তোমার হাঁসা চাঁদ আঁধারে মিশায়?
কেন, তোমার ফোটা কমল নিশিথে শুখায়?
কেন,—সন্ধ্যাছায়া পড়ে গোধুলি গগন গায়?
লীলাময়! তোমার এ সব লীলা না পারি বুঝিতে!

খয়রা।

আমার এসব বুঝে কাজ নাই;
আমি বুঝিতে না চাই।

যদি ব্যথা না পেলে তোমায় নাহি পাই,—
যদি ব্যথা না পেলে তোমায় ভুলে যাই,—
তবে ব্যথা দিও, ব্যথা দিও,
দিওনা তোমার নাম ভুলিতে।

আমি আমার পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের দৃষ্টান্ত স্থলে বেদ বাল্মীকিকে প্রধান রূপে না ধরিয়া ৺বিহারীলাল সরকারের এই শোক গাথা সকলকেই প্রধান দৃষ্টান্ত রূপে উপস্থাপিত করিলাম। কারণ বিহারী এই সভার প্রত্যক্ষ। আপনারা তাঁহার পুত্র শোকের সংবাদ অনেকেই জানেন, এবং এই গান যে তিনি তাহার মৃতপুত্র সম্মুখে দেখিয়া রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও আপনারা বিশেষ ভাবে জানেন। তিনি নিজেও পরবর্ত্তী কালের তাঁহার পুস্তকে সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। আপনারা বিহারীর ভাষা ও চন্দ্রশেখরের ভাষা অপর কবির ভাষার সহিত তুলনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন—শোকোচ্ছ্বার ও কৃত্রিমকবিতার কি তারতম্য।

তৎপরেই কন্যা নবদুর্গার মৃত্যুতে বিহারীর আবেগ—

একতালা।

হরি হে! এ সংসারে ভাবি যারে তারে
আপন বলিয়ে—কি জানি কি টানে!
চাহি মুগ্ধ নয়নে আকুল পরাণে
ভাবি মনে হেন সুধা আশে যেন
চেয়ে রই সুধাকর পানে।
সে যে দেখিতে দেখিতে, আঁখি পালটিতে
চকিতে মিলায় কোথায়॥

ঝাঁপতাল।

তবুও পিয়াসা, তবুও যে আশা
তবু ভালবাসা, মিটে না আমার।
দূরে মরু পারে, বালুকা বিথারে
রবিকর ধারে, রচিত অমিয় সায়র।
দূরে নয়নে হেরে বুঝিতে না পেরে
কি জানি কিমোহ ঘোরে
উন্মাদ মানস ধায়॥

ঠুংরি।

সুধার ঝরণা খুলিয়ে দিয়ে
আছ তুমি হরি! কাছে দাঁড়াইয়ে,
কত স্নেহ ভরে কতই আদরে,
ডাকিছ আমায় আয় আয় বলিয়ে;
সেতো জানিনা—সেতো বুঝিনা,—
সেত দেখিনা—সেত শুনিনা
মরি মোহ মরীচিকায়॥

বিহারী বাবু শোকার্ত্তিব্যক্তি কতটা তীব্র হইয়াছে, তাহা বিচার করিতে হইলে যত আশু মৃতপুত্র পিতার সাক্ষ্য আবশ্যক হইবে। কারণ—

"কি জ্বালা যে বিষে জানিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

কাজেই পুত্র শোকার্ত্তের বিলাপের স্বাভাবিকতা, পুত্র শোকার্ত্ত ভিন্ন আর কে বলিবে?

একজন কন্যা শোকার্ত্ত নিমতলার শ্মশান ঘাটে কন্যার নাভিকুণ্ড গঙ্গায় সমর্পণ করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন—

দেব বিশ্বম্ভুক! স্নেহময়ী গঙ্গে!
এ প্রাণ প্রতিমা দিনু তোর সঙ্গে
দিও মা ফিরায়ে যে দিন অবশ অঙ্গে
এ দেহ ভাসিবে তব তরঙ্গে॥

একজন অপ্রাপ্ত পুত্র শোক এইরূপে পুত্র শোকের বর্ণনা করিয়াছেন—

হৃদয় বৃন্তে ফুটে যে কুসুম
তাহারে ছিঁড়িলে কাল
ডুবে শোক সাগরে
মৃণাল যথা জলে।

এই ভাব, আমার মনে হয়, এইরূপে ব্যক্ত হইলে সুষ্ঠু অভিব্যক্তি হইত—

হৃদয় পিণ্ডে ফুটে যে কুসুম
বজ্রাঘাত যদি তথা হয়
ফাটে বুক শতধা বিদারী
ছত্রাকার হয় যথা বুকে (Bount)॥

একটি উদ্ভট কবিতা, যাহা বহু শোকার্ত্তের প্রাণে শান্তি দিয়াছে, যাহা বহু মর্ম্ম ব্যথিতের প্রাণের ঘাটে ঘাটে বসিয়াছে, যাহা বহু ভগ্নাবা ব্যক্তি প্রায়শঃ আবৃত্তি করিয়া থাকেন, সেই হতাশের আক্ষেপ শুনাইতেছি,—

যৎ চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রযাতি
যৎ চেতসা ন গণিতং তদি হাভ্যুপৈতি।
প্রাতর্ভবামি বসুধাধিপ চক্রবর্ত্তী
সোহং ব্রজামি বিপিনে জটিলঃ তপস্বী॥
চিন্তে থাকে যাহা দূরে যায় তাহা
গলে নাক যাহা হয়ে পড়ে তাহা॥
প্রাতেঃ হব আমি বসুধার স্বামী
হইনেবাসী জটিল তপস্বী॥

চন্দ্রশেখরের স্বদেশে প্রচলিত একটি সাধারণ শোক গাথা এইরূপ—

পলাশীর কান্না।

(ওরে) কি হলোরে জান।
পলাশী ময়দানে নবাব হারালে প্রাণ। ধুয়া।
ছোট ছোট তেলঙ্গা গুলি লাল কূর্ত্তি গায়,
হাঁটু গেড়ে মারলে তীর মীর মদনের গায়।
তীর পড়ে ঝাঁখে ঝাঁখে গুলি পড়ে লাখে,
একলা মীর মদন সাহেব কত আর রাখে॥
কি হলোয়ে জান, পলাশীর ময়দানে নবাব হারাল প্রাণ॥ ধুয়া।
নবাব কাঁদে সিপুই কাঁদে আর কাঁদে হাতি,
ঘোড়াশালে ঘোড়া কাঁদে
কলকাতাতে বসে কাঁদে মোহন লালের বেটী॥
কি হলোরে জান, পলাশী ময়দানে উড়ে কোম্পানী নিশান॥ ধুয়া।
মিরজাফরের দাগাবাজি নবাব বুঝলে মনে,
ফৌজ সমস্ত মারা গেল পলাশী ময়দানে।
ফুলবাগে নবাব মল খোস বাগে মাটি
চাঁদোয়া টানায়ে কাঁদে মোহন লালের বেটী॥
কি হলোরে জান, পলাশী ময়দানে উড়ে কোম্পানী নিশান॥ ধুয়া।

এইবার চন্দ্রশেখরের সহিত সমদুঃখ সম্পন্ন, বিশ্বের মহাকবি কালিদাসের

অমর "অজ বিলাপ" তুলি। আপনাদের দেখাই পত্নী শোকার্ত্ত কালিদাস অজের ব্যবদেশে, নিজের প্রাণের যাতনা কিরূপে প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার শোকোন্মত্ত ভাষার অভিব্যক্তি, আপনারা লক্ষ্য করুন। দুই জন বিপত্নীক পত্নী শোকার্ত্ত পাশা পাশি দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছেন, আপনারা তাহার স্বাভাবিকতা লক্ষ্য করুন।

"স্ত্রিগিয়ং যদি জীবিতা পজা, হৃদয়ে কিং নিহিতা বাহন্তি মাং।
বিষমপ্যামৃতং ক্বচিৎ ভবেৎ অমৃতং বা বিষ মীস্যবেস্থয়া॥ রঘু।

এ মালা গলে প রে পরাণ যদি হরে ?
এ মালা হৃদে ধরে কেননা হানে মোরে ?
বিষ অমৃত হয় কখনও দেখা যায়
অমৃত কি বিষ হয় ঈশ্বর ইচ্ছায়॥ রঘু ৮।৪৬

ইদ মুচ্ছসিতা লকং মুখং তব বিশ্রান্ত কথং দুনোতি মাম।
নিশি সুপ্ত মিবৈক পঙ্কজং বিরতাভ্যন্তর ষট্‌পদ স্বনং॥

এই উচ্ছসিত অলকিত মুখ।
কথা হীন তব দেয় মোরে দুখ!
নিশিযোগে সুপ্ত অন্তরে বিরত
ষষ্ঠ পদ স্বনিন পঙ্কিজের মত॥ রঘু ৮।৫৫

সম দুঃখ সুখঃ সখী জনঃ
প্রতিপৎ চন্দ্র মিবোয় মাত্মজঃ।
অহমেক রণ স্তথাপিতে
ব্যবসায়ঃ প্রতিপত্তি নিষ্ঠুরঃ॥
সম দুঃখ সুখ সখীজন তব
প্রতিপদ চন্দ্রসম এ তব আত্মজ
আমি এক রস তোমাতে তথাপি
এই ব্যবসায় দেখায় সিষ্ঠক॥ রঘু ৮।৬৫

ক্রমশঃ

নব বধুর দাবী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেন এম, এ,

নববধু প্রথমতঃ স্বামীগৃহে আসিয়া কিরূপ সঙ্কটের মধ্যে পড়েন তাহা হিন্দু সমাজের বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের প্রত্যেকেই অবগত আছেন। তাঁহাকে এক অপরিচিত গৃহে আসিয়া সহস্র অপরিচিতের মন যোগাইয়া চলিতে হয়। তাহাতে কতদূর বুদ্ধি, কতদূর বিবেচনাশক্তি, কতদূর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের আবশ্যক তাহা বাল্য বিবাহ প্রচলিত হিন্দু সমাজের বা হিন্দু পরিবারের শ্বশ্রূ কিংবা অন্য কোনও বয়স্থা নারীপরিজন তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। নববধুর প্রতি তাঁহাদের যথেষ্ট দয়া ও স্নেহ থাকা বাঞ্ছনীয়।

নববধু যেমন একদিকে, সতত আপনার কর্ত্তব্য পালনে নিযুক্ত থাকা আপন কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিবেন, জ্ঞান ও বয়োবৃদ্ধ এবং সংসারধর্ম্মাভিজ্ঞগণ তাঁহাকে কর্ত্তব্যের নির্দেশ করতঃ উপদেশাদিদানে তাঁহাকে আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, প্রত্যেক নববধুই মনে মনে এরূপ দাবী অনায়াসে করিতে পারেন। জগতের প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের একটা দাবীও কর্ত্তব্য আছে তাহা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে। রাজা প্রজায়, ধনী নির্ধনে, মুর্খ বিদ্বানে প্রত্যেকের সহিত এই দাবীর কর্ত্তব্যের সম্বন্ধ আছে, তাহা সম্পাদন না করিলে পাপ সঞ্চয় হয়।

অন্যের উপর যতদূর কম দাবী করা যায় এবং পর মুখাপেক্ষিতা হইতে সাধ্যানুযায়ী বিরত হইয়া যতদূর আপন আপন কর্ত্তব্যের অগ্রসর হওয়া যায়,—তাহাতেই গৌরব। সাধ্যানুসারে পরমুখাপেক্ষী না হইয়া নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করা প্রত্যেক নর নারীর ধর্ম্ম।

বিবাহিতার কার্য্যের গণ্ডী।

বিবাহিত জীবনে নারীজীবনের গণ্ডীর বিষয় এক্ষণে উক্ত হইবে। জীবনের গণ্ডী যতদূর বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র ততদূরই প্রসারিত হইতে পারে। প্রথমতঃ সাধারণ কর্ত্তব্যের কথা উল্লেখ করিয়া, সেই গুলির সাহায্যকারী ক্ষুদ্রতর কর্ত্তব্য সমূহ নির্দ্দিষ্ট হইবে।

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে স্ত্রী জাতিকে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করা উচিত নহে। ইহাতে অনেকে স্ত্রী জাতির প্রতি চরম অপমানের নিদর্শন দেখিতে পান। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহাতে কোথায় অসম্মান করা হইয়াছে, তাহা সাধারণ চক্ষে আমরা দেখিতে পাই না। শাস্ত্রকারগণ বলেন,—

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রস্তু স্থবিরে ভাবে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥"

ইহাতে স্পষ্টতঃ পুরুষের উপর নির্দ্দেশ করা হইতেছে। পুরুষের পক্ষে স্ত্রীগণকে স্বাতন্ত্র্য প্রদান দুষনীয় এই অর্থই দেখিতে হইতেছে। স্বাতন্ত্র্য অর্থ 'অ-পরতন্ত্রতা।' পরতন্ত্রে শব্দে "পরতন্ত্র পরাধীনঃ পরবান্ নাথবাননি।" এইরূপই বুঝি। অবলাজাতি (Weaker sex) নাথ শূন্যা হওয়া কি তাঁহার পক্ষে সম্মানের বিষয়? না, পিতা ভর্ত্তা বা পুত্রের পক্ষে ইহা গৌরব বর্দ্ধন? 'স্ত্রীজাতি স্বাতয়ন্ত্রর উপযুক্ত নহে' ইহা দ্বারা ইহাই বুঝি যে স্ত্রীজাতিকে সর্ব্বদা সনাথা রাখিতে হইবে ইহাই পুরুষের কর্ত্তব্যকর্ম্ম পবিত্রধর্ম্ম। Chivabrous spirit এর চরম নিদর্শন।

যাহা হউক, এ সমস্ত অপ্রাসাঙ্গিক আলোচনা বর্ত্তমানে পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা করা যাউক। স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্য বিহিত না হওয়াই কর্ত্তব্য। সমাজের বন্ধন দৃঢ় রাখিবার জন্যই এইরূপ বিধি হইয়া থাকিবে। সমাজের বন্ধন দৃঢ় রাখিবার জন্য সমাজ যাহাতে উশৃঙ্খলতার দিকে প্রধাবিত না হয়, সেই কল্যাণ চিন্তায়ই প্রাচীন ত্রিকালজ্ঞ আর্য্যঋষিগণ এইরূপ বিধান দিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মচারী বিদ্যার্থী যেরূপ সতত গুরুর আজ্ঞাবহ থাকিবেন, নিজের কোনও কাজ করিতে হইলে গুরুর অনুমতিক্রমে কদাপি তাহা সম্পাদন করিতে প্রয়াসী হইবেন না, গৃহস্থ যেরূপ মাতা পিতার অননুজ্ঞাত হইয়া কোনও ধর্ম্ম সম্পাদনে অধিকারী নহেন, সেইরূপ নিয়ম রক্ষার জন্যই স্ত্রীজাতির অস্বাতন্ত্র্য বিহিত হইয়াছে ইহাই বোধ হয়।

মনু অন্য আরও একস্থানে বলিয়াছেন.—

"বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্ ॥ মনু ৫।১৪৮

বিষ্ণু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সকলেই ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। সমগ্র জগতের সৃষ্টিস্থিতি কারী ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মাঙ্গ দেবাদিদেব ভগবান বিষ্ণু পৃথিবী দেবীকে মানবধর্ম্ম বর্ণন কালে নারী জাতির ধর্ম্ম কথন প্রসঙ্গে তাহাদের

তাঁহাদের সর্ব্বকার্য্যের অসতন্ত্রা এবং বাল্যে পিতার অধীনতা, যৌবনে ভর্ত্তার এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীনতা যুক্তিযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"সর্ব্ব কর্ম্মসু অস্বতন্ত্রতা ॥ ১২ ॥
বাল্যযৌবনে বার্দ্ধকেষ্বাপি পিতৃভর্ত্তৃ পুত্রাধীনতা ॥ ১৩ ॥

যাজ্ঞ্যবল্ক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

রক্ষেৎ কন্যাং পিতা বিন্নাৎ পতিঃ পুত্রাস্তু বার্দ্ধক্যে।
অভাবে জ্ঞাতয় স্তেষাং স্বাতন্ত্র্যং ন ক্বচিৎ স্ত্রিয়ঃ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য, ১।৮৫

স্ত্রী সর্ব্বদা ভর্ত্তার বাধ্য থাকিয়া অর্থের সংগ্রহে ও তাহার ব্যয় সাধনে নিযুক্তা থাকিবেন। যাহাতে নিজের ও শরীরের যথোচিত শুদ্ধি রক্ষিত হয় তদ্বিষয়ে যত্ন করিবেন; পাকাদি কার্য্যে সর্ব্বদা অগ্রসর থাকিবেন এবং গৃহের আসবাব পত্র সাজ সরঞ্জাম প্রতি সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিবেন। এই সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মে নারীকে নিয়োজিত রাখাই বিধি।

অর্থস্য সংগ্রহে চৈনাং ব্যয়ে চৈব নিয়োজয়েৎ।
শৌচে ধর্ম্মেহন্নপাকেচ পরিণাহাস্য বেক্ষণে। মনু ৯।১১

এই সমস্ত কার্য্যেই প্রকৃত গৃহিণীপনা। দক্ষতার সহিত এই সমস্ত কার্য্যাদি সম্পাদিত হইলে নারীর গৃহিণী নামের সার্থকতা সম্পাদিত হইতে পারে।

প্রকৃত গৃহিণী কখনও মুক্তহস্ত হইবেন না। যে কার্য্যে যতটুকু দ্রব্য প্রয়োজন কেবল তাহাই ব্যয় করিবেন। ব্যয় বিষয়ে এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন যেন কার্পণ্য দোষ তাহাতে না স্পর্শে। মিত ব্যয়িতাই গৃহিণীর প্রধান গুণ স্ত্রীধর্ম্ম প্রসঙ্গে ভগবান বিষ্ণু অমুক্ত হস্ততা (২৫।৫) অন্যতম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ও সংজতোপস্করা দক্ষা, হৃষ্টা ব্যয় পরাঙ্মুখী নারীকে আদর্শ গৃহিণী পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। (১।৮৩)

এক্ষণে দৈনিক কার্য্য উল্লেখ করা যাইবে। গৃহিণীর গৃহিণীপনা সুন্দর রূপে সম্পাদন করিতে হইলে যাহা যাহা দৈনিক কর্ত্তব্য এক্ষণে তাহাই আলোচ্য। তবে অবশ্য কার্য্য ও ক্ষেত্র ও সময় বিশেষে ইহার অন্যথাও সম্ভব হইতে পারে।

গৃহস্থ মাত্রেই নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য এই তিন প্রকার কর্ম্ম আছে।

ক্রমশঃ

বিবাহে।

লেখক,—ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,

(১)

আয় উমা আয় কাছে,
সাজায়ে দি' ফুল সাজে
নবনীত তোর অই কচি অঙ্গ খানি ;
সোণা রূপা গয়নায়
ব্যথা পাছে লাগে গায়
(তাই) আজ সাধ মোর সাজাইতে ফুলরাণী।

(২)

হৃদয়ের সোহাগিনী
আয় আয় আদরিণী
আয় তোর মুখে আজ কোটী চুমো দেই ;
তুই মোর হাত গড়া
তাই তোর বুক ভরা
মুখ দেখে আজ আমি হেসে মরে যাই।

(৩)

আজ এই শুভ দিনে
শ্রীমান হরের সনে
মিলন হইবে তোর বিধির বিধানে ;
এ মিলন চিরতরে
পবিত্রতা লক্ষ্য করে
ছুটাবেক দোঁহাকারে অনন্তের পানে।

(৪)

পুরবাসী সবে মেলি
দেবে আজ হুলাহুলি
পাপিয়া গাহিবে সুখে মধুমাখা সুরে ;

আকাশে সুন্দর শশী
হাসিয়া পড়িবে খসি
হাসিবেক কুমুদিনী নীল সরোবরে ॥

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং,
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

(৫)

হরি !
আদরের ধন মম
দিনু আজ করে তব
সদা তুমি মুখপানে দৃষ্টি রেখে তার
উপযুক্ত শিক্ষা দিও
মনোমত ক'রে নিও
যেমনটী হলে পরে মানাবে তোমার।

(৬)

উমা !
যার নামে নাম তব
তারি কথা সদা ভেব
সতীর আদর্শ সেই "উমা" নাম তার।
পতি সোহাগিনী হয়ো
পতি পদে মতি রেখো
পতি বিনা রমণীর কেবা আছে আর ?

(৭)

দুঃখিনী জনম-ভূমি
যাঁহার তনয় তুমি
তাঁরি মূর্ত্তি সদা তব চিত্তে যেন জাগে ;
ঘুচাতে মায়ের দুঃখ
পেতে দিও নিজ বুক
সহিও সকল ক্লেশ হাসি নিয়ে মুখে।

(৮)

বিভো !
নতজানু জোড় করে
ভিক্ষা মাগি তব দ্বারে
এ নব দম্পতী যেন কাটে হবে সুখে ;

যদি কভু ভ্রান্তি বশে
সুপথ হারিয়ে বসে
স্থাপিত করিও পুন ধর্ম্ম অভিমুখে ॥

ঈশানী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(১)

ঈশানীর বয়স ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হইয়া চতুর্দ্দশ বর্ষে পড়িয়াছে। পিতা নকড়ি সেন গুপ্ত কন্যার বিবাহের জন্য বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। কোথাও একটী সুপাত্র মিলিতেছে না। পাত্র মিলিতেছে না, তাহার প্রধান কারণ অর্থাভাব। তিনি তাঁহার বাসস্থান হরনাথ পুর হইতে চারি ক্রোশ দূরে গঙ্গা-তীরবর্ত্তী কমলেশ্বর গ্রামের মাইনর স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য্য করেন। বেতন ১৮৲ আঠার টাকা। প্রাতঃকাল হইতে বেলা ৮টা এবং বৈকালে ৫টার সময় হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত প্রাইভেট্ পড়াইয়া আর ও পনের টাকা উপার্জ্জন করেন। ইহাতে অতি কষ্টে তাঁহার সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয়।

(২)

একদিন শনিবারে নকড়ি বাবু কর্ম্মস্থান হইতে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র রামচন্দ্র সেন গুপ্তের সহিত বাটী আসিলেন। রামবাবু ঐ স্কুলের প্রথম শিক্ষক।

রামবাবুই ঐ স্কুলে নকড়ি বাবুর চাকরি করিয়া দিয়াছেন। দুই ভায়ে এক বাসায় থাকেন। দুইজনে একসঙ্গে রন্ধন করেন। সে যাহা হউক নকড়ি বাবু বাড়ী আসিলে, পত্নী সৌদামিনী তাঁহাকে হাত পা ধুইবার জল দিলেন। নকড়ি বাবু হাত পা ও মুখ ধুইলে, কয়েক খানি বাতাসা ও একটু পানীয় জল দিলেন। পরে তামাকু সাজিয়া স্বামীর হাতে হুকা কলিকা প্রদান করিলেন। নকড়ি বাবু উক্ত বাতাসা রাখে ফেলিয়া একটু জল পান করতঃ ধূমপান করিতে লাগিলেন।

তখন সৌদামিনী তাঁহার নিকটে বসিয়া, বলিতে লাগিলেন ঈশানীর কোন পাত্রের সন্ধান করিতে পারিয়াছ কি ?

নকড়ি। না।

সৌদা। তাইত, তুমি কি করিয়া মুখে ভাত দাও? আমার ত চিন্তায় আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে।

নকড়ি। কি করিব? পাঁচ ছয় হাজার টাকার কম ভাল পাত্র পাওয়া যায় না। দুই একটা ইটেভিটেনাই মুর্খ পাত্র জুটিয়াছে; তাহাদের বাপেরাও আড়াই হাজার তিন হাজার টাকার ফর্দ্দ দিয়াছে।

সৌদা। তারা কি কিছুই নয়? তারা কি করে?

নকড়ি। করবে আর কি? আমার মাথা আর মুণ্ডু করে।

সৌদা। কথার শ্রী দেখ? তারা কি কোন একটা কাজ কর্ম্ম করে না?

নকড়ি। কেউ মামার বাড়ী বসিয়া আছে। কেউ কাজ কর্ম্মের চেষ্টা দেখছে। কেউ সবে মাত্র কবিরাজি শিক্ষা করছে। বলিতে বলিতে নকড়িবাবুর নয়নদ্বয় হইতে জলধারা প্রবাহিত হইয়া দুইটী গণ্ড বহিয়া পড়িল। সৌদামিনী স্বামীর এরূপ অবস্থা দেখিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। তাঁহারও চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তবে কি ঈশানির অদৃষ্টে বর নাই? ওকি চিরকাল আইবুড়ী থাকিবে?" পত্নীর বাক্য শ্রবণ করিয়া নকড়ি বাবু বলিলেন, "ঐ সব পাত্রে কন্যাদান করা অপেক্ষা কন্যার হাত পা বাঁধিয়া, জলে ফেলিয়া দেওয়া ভাল।"

নকড়ীবাবু ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "দেখ আমি একটী সঙ্কল্প স্থির করিয়াছি; তোমায় বলিতেছি, তোমার মতামত কি বল?"

সৌদা। কি?

নকড়ি। আমরা যদি খৃষ্টান হই, তাহা হইলে আমাদের এ জ্বালা পোহাইতে হয় না!

সৌদা। মহাভারত? জাতি ভ্রষ্ট? তাহা হইতে পারে না।

নকড়ি। আচ্ছা, খৃষ্টান না হইয়া, ব্রাহ্ম হইলেও ত হয়?

সৌদা। ও সব সংকল্প ছাড়িয়া দাও। আমাদের ভগবান ভরসা। তাঁহার উপরই সমস্ত নির্ভর, তিনি যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। তিনি দীন দয়াল। প্রত্যহ পুজার সময়ে তাঁহাকে একমনে ডাকি। দেখি, তাঁহার দয়া হয় কি না? এই কথা বলিয়া সৌদামিনী রন্ধন করিতে চলিলেন। নকড়ি বাবুও রাম দাদার সহিত কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে চলিলেন।

যে ঘরে নকড়ি বাবু পত্নীর সহিত কথা কহিতে ছিলেন ঈশানী পিতার জন্য একটী পান সাজিয়া সেই ঘরে আসিতেছিল। আসিবার কালে, তাহার

মাতা পিতা তাহার বিবাহের জন্য কথাবার্ত্তা করিতেছেন, শুনিতে পাইয়া চুপ করিয়া দ্বারের একপার্শ্বে গোপন ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এবং মাতা পিতার সমস্ত কথা শুনিল। তাহার নয়ন দুটী অশ্রু ভারাক্রান্ত হইল। মাতা চলিয়া গেলে পিতাও চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া, তাড়াতাড়ি নয়ন জল মুছিয়া ঈশানী ঘরের মধ্যে আসিয়া বলিল, "বাবা! পান নিন।" নকড়ি বাবু কন্যার হস্ত হইতে পান লইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন; কন্যার প্রফুল্ল কমলবৎ মুখখানি অশ্রুভারাক্রান্ত। নকড়ি বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঈশানী! হ্যাঁ মা! তোমার কি কোন অসুখ করিয়াছে।" ঈশানী "না বাবা" বলিয়া চলিয়া গেল। নকড়ি বাবুও পান লইয়া চিবাইতে চিবাইতে চলিয়া গেলেন।

ঈশানী আপনার ঘরে গিয়া কাঁদিল, তাহার পর চিন্তা করিতে লাগিল, হায়! কেন আমার জন্ম হইয়াছে? পৃথিবীতে আসিয়া, মাতা পিতার দুঃখের কারণ হইলাম। আমার জন্য পিতার চক্ষে নিয়ত জল পড়িতেছে। মাতাও এক প্রকার আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন; হা ভগবন্! তোমার মনে কি আছে বলিতে পারি না, আমার বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই মঙ্গল। এমন সময়ে তাহার মাতা রন্ধনশালা হইতে ডাকিলেন, "ঈশানি! একবার রান্নাঘরে আয় মা! আমি যে একা আর পারি না।" তখন ঈশানী "যাই মা!" বলিয়া রন্ধনশালায় মাতার নিকট গমন করিল।

(৩)

সোমবারে নকড়ি বাবু কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলেন এবং সপ্তাহ কাল কাজ করিয়া শনিবার বাটী আসিলেন।

সৌদামিনী কন্যার বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন। ঈশানীও তাঁহাদের উভয়ের কথোপকথন শুনিতে লাগিল। সৌদামনী নকড়ি বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাগা! পাত্র টাত্র পেলে কি?"

নকড়ি। কই পাচ্চি?

সৌদা। তবে কি হবে?

নকড়ি। ভগবানের মনে যাহা আছে তাই হবে। যার পয়সা নাই, তার মরণই ভাল।

সৌদা। বড়ঠাকুর মহাশয় এই অল্প টাকায় কেমন গুছাইয়া সংসার

করিতেছেন। মেয়েটীর বিবাহ কেমন পাত্রে দিয়াছেন। ছেলেটী কেমন সৎ। আমাকে কাকীমা বলিতে অজ্ঞান হয়। অমন একটী পাত্র যোগাড় কত্তে পার না?

এইবার নকড়ি বাবুর একটু ক্রোধ হইল। বলিলেন, "রামদাদার শ্বশুর এক দফা মোটা টাকা দিয়াছেন। সম্বন্ধীরা প্রত্যেকে যথেষ্ট টাকা দিয়াছেন। শাশুড়ী দিয়াছেন। আমার মেয়ের বিবাহে কে সাহায্য করিবে? তোমার মা বাপকে মাসে মাসে সাহায্য করিতে পারিলে ভাল হয়। যখন আমার হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিলেন, তখন কত কথা বলিয়া ছিলেন!"

সৌদা। কি বলিয়াছিলেন?

নকড়ি। কেন, তুমি কি কিছু জাননা?

সৌদা। আমার মনে নাই।

নকড়ি। সেকি! যেন কিছুই জানেন না? তোমার বাপ বলিয়া ছিলেন, আমি যতদূর লেখাপড়া শিখিতে পারি ততদূর শিখাইবেন, বিবাহের পর তাহার কিছুই করেন নাই। সোণার আংটি, ঘাড় চেন দিবেন বলিয়া ছিলেন, সেটা কি দিয়াছেন?

বৌদিদি ছেলে পুলে নিয়ে বছরের পাঁচ ছয় মাস বাপের বাড়ী কাটাইয়া আসেন। তখন রামদাদার মাহিনার টাকা সবই বাঁচিয়া যায়। এই কারণে রামদাদার হাতে দু পয়সা জমিয়া গিয়াছে। তুমি বাপের বাড়ী গেলে, আমাকে তোমাদের খরচ দিতে হয়। আমরা যে কষ্টে পয়সা আনি,—তা ভগবানই জানেন। একবেলা আহার করি। একাদশী অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে কিছুই খাই না। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলি, এই গুলা পালন করিলে শরীর ভাল থাকে।

সৌদা। আচ্ছা একবেলা খাও, আর একবেলা কি খাও?

নকড়ি। কোন দিন দুই এক পয়সার মুড়ি খাই, আর যে দিন পয়সা না থাকে, গঙ্গার ঘাটে বসে হাওয়া খাই।

সৌদা। বড়ঠাকুর মহাশয়ও এই রকম করেন নাকি?

নকড়ি। তা আর একবার বল্‌তে! এই সব তো ওরই পরামর্শ, এই সকল কথা শুনিয়া, সৌদামিনীর কমল নয়ন হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। নকড়ি বাবু বলিলেন, "আহা! কাঁদ কেন? তুমি কাঁদিবে জানিলে আমি বলিতাম না।"

সৌদামিনী নয়ন জল মার্জ্জন করিয়া বলিলেন, "ও! বুঝেছি, রবিবার রাত্রে তোমরা দুই ভায়ে কেন আহার কর না! লোকে বলে, স্ত্রীভাগ্যে ধন। আমার ভাগ্য অতি মন্দ। সেই জন্য আমাদের এত কষ্ট।"

নকড়ি বাবু স্ত্রীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "এই কথা এতদিন কাহারও কাছে বলি নাই; আজ তোমার কাছে বলিলাম। তুমি বৌদিদির নিকট একথা বলিও না। কারণ রামদাদা শুনিলে, আমার উপর অতিশয় ক্রোধ করিবেন।"

সৌদা। আমি কাহাকেও বলিব না।

নকড়ি। যাও, রন্ধন করগে। ও বেলা আদৌ খাওয়া হয় নাই।

(৪)

ঈশানী মাতা পিতার কথোপকথন শুনিয়াছিল। পিতা বাটী আসিলেই পিতার কথাবার্ত্তা শুনবার বড় একটা আগ্রহ হইত। মেয়েটী লক্ষ্মী, শুধু রূপে নয়। তাহার গুণ ও প্রচুর পরিমাণে আছে।

ঈশানী মাতা পিতার কথা শুনিয়া পূর্ব্ব দিনের মত নয়নজলে ভাসিয়া আপনার ঘরে গিয়া, শয্যাশায়িনী হইয়া রোদন করিতে লাগিল। মনে মনে ভাবিল হা ভগবান! আমি পূর্ব্ব জন্মে কত পাপ করিয়াছি, তাই এজন্মে আমার এত দুঃখ। বাবার কথা শুনিলে, হৃদয় ফাটিয়া যায়। পূর্ব্বে বাবার মুখে সদাই আনন্দ দেখিতাম। এখন তাহার শতাংশের এক অংশও নাই। আমি আর এ সংসারে থাকিব না। আমার জন্য আমাদের ক্ষুদ্র সংসারে অশান্তি আনিব না আমি মরিলে, মাতা পিতার মনে কতিপয় দিবসের জন্য শোক হইবে বটে, কিন্তু পরে সে শোকাগ্নি নির্ব্বাণ হইবে ও তাঁহারা চিরশান্তি পাইবেন। আর যদি আমি অপাত্রে পড়ি, তাহা হইলেও তাঁহাদের শোকাগ্নি রাবণের চুল্লির মত তাঁহাদের হৃদয়ে যাবজ্জীবন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিবে। এইরূপ অনেকক্ষণ মনে মনে আন্দোলন করিয়া, মরণই স্থির সংকল্প করিল। দোয়াত কলম ও কাগজ লইয়া একখানি পত্র লিখিল।

শ্রীশ্রীদুর্গা—

শ্রীচরণ কমলেষু—

মাগো! বাবাগো!

আমি আপনাদের চরণে বিদায় লইয়া, এ জন্মের মত চলিলাম। কোথায়

যে যাইব, তাহার স্থিরতা নাই। আমার কোন সদ্গতি হউক বা না হউক, আপনারা চিরশান্তি পাইবেন। আমাকে পাত্রস্থ করিবার জন্য আপনাদের উভয়ের আহার নিদ্রা নাই ও চিন্তায় দগ্ধ হইয়া জীর্ণ শীর্ণ হইতেছেন। বাবা যাহা যে বেতন পান, তাহাতে সংসারই সুচারুরূপে চলেনা। তাহার উপর আমার বিবাহে পাঁচ ছয় হাজার টাকা কোথায় পাইবেন? আমি মরিলে, আপনারা শোক করিবেন না। কারণ মনুষ্য জন্মাইলেই তাহার মৃত্যু আছে। আমি আত্মহত্যা করিব, বিধাতার এইরূপ ইচ্ছা। বাবা! মা! আমি চলিলাম, শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—

আপনাদের স্নেহাশ্রিতা—

শ্রীমতী ঈশানী দেবী।

রাম বাবুর পুত্র অমরনাথ কলিকাতায় কলেজে এম, এ, পড়ে। সরোজবন্ধু রায় নামক একটী বালক অমরনাথের সহাধ্যায়ী এবং স্বজাতি। অমরনাথদের কাশ্যপগোত্র, আর সরোজদের গোত্র শাণ্ডিল্য। সরোজের পিতা সীতাপতি বাবু সবজজ ছিলেন। এখন চারিশত টাকা পেন্সান পান। পূর্ব্বে তাঁহার নিবাস কাঁচড়াপাড়ায় ছিল। এখন কলিকাতায় বাড়ী করিয়াছেন। তিনি অতি অমায়িক ও সহৃদয় লোক। সরোজবন্ধু তাঁহার একমাত্র পুত্র। সরোজবন্ধু অতি সুসন্তান। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সরোজ অমরনাথের সঙ্গে এম, এ, ক্লাসে পড়ে। তাহার স্বভাব অতি নির্ম্মল। অমরনাথের প্রায়ই সরোজদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হয়। অমরনাথ সরোজদের বাড়ীতে সর্ব্বদাই যায়। সরোজ অমরনাথের বাসায় আসে। সরোজের মাছ ধরিবার খুব সখ। প্রায়ই এখান ওখান থেকে মাছ ধরিয়া অমরনাথকে নিমন্ত্রণ করে।

একদিন অমর সরোজকে বলিল, "সরোজ! আগামী শনিবারে তুমি আমাদের বাড়ী চল। তুমি প্রায়ই বল যাইবে, কিন্তু কই? যাও না ত?

সরোজ। তোমাদের ওখানে বড় মাছ আছে কি?

অমর। তুমি কত বড় মাছ ধরিতে পারিবে?

সরোজ। যত বড় মাছ হউক না কেন, আমি ধরিব।

অমর। পাঁচ সের?

সরোজ। ওত ফাউ।

অমর। দশ সের?

সরোজ। ওত সামান্য কথা!

অমর পনর সের?

সরোজ। খুব পারিব।

এই কথা শুনিয়া, অমরনাথ বলিল, "আমার নকড়ি কাকার পুকুরে আধমণ ত্রিশসের পর্য্যন্ত মাছ আছে।

সরোজ। সত্য নাকি ?

অমর। হাঁ।

সরোজ। তবে নিশ্চয়ই আগামী শনিবারে তোমাদের বাড়ীতে যাইব।

অমর। দেখিও, যেন ভুল না হয় ?

সরোজ। না, তাহা হইবে না।

এইরূপ কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া উভয়ে নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল।

(৬)

অন্য রবিবার সরোজবন্ধু অমরনাথের বাটী আসিয়া, আহারাদির পর নকড়ি বাবুর পুষ্করিণীতে মাছ ধরিতে বসিয়াছে। সরোজবন্ধু দেখিতে সুন্দর গৌরবর্ণ। মনুষ্যের মুখের গঠন ভাল হইলে, কৃষ্ণবর্ণ পুরুষও সুশ্রী বলিয়া বিবেচিত হয়। সরোজবন্ধুর মুখ ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুগঠিত। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। বয়স তেইশ কি চব্বিশ বৎসর। ঐ দিনই ঈশানী পত্রখানি বালিশের নিম্নে রাখিয়া গোয়াল হইতে গরুর দড়ি লইয়া তাহাদের পুষ্করিণীর উত্তরে একটা আমগাছে টাঙ্গাইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যতা হইয়াছে। বাগানের উত্তর ভাগটায় জঙ্গল হইয়াছে। মানুষ কি গরু বাছুর থাকিলে দৃষ্টিগোচর হয় না। ঈশানী যাইবার পর সরোজবন্ধু মাছ ধরিতে বসিয়াছে। সরোজ মাছ ধরিতে বসিলেই ঈশানীর ভ্রাতা শরৎ আসিয়া সরোজের নিকটে বসিয়া মাছধরা দেখিতে লাগিল। সরোজবন্ধু তাহাকে তাহার নাম, তাহার বাপের নাম ও সে কি পড়ে, ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহার সহিত কথা কহিতে কহিতে মাছ ধরিতে লাগিল। এমন সময় ফাতনা ডুবিল; সঙ্গে সঙ্গেই টান। মাছ গাঁথিল। কিছুক্ষণ খেলাইয়া তাহাকে তুলিল। মাছটা পাঁচ সের দেখিয়া তাহাকে একটা দড়া দিয়া বাঁধিয়া রাখিল। পরে বঁড়শীতে টোপ গাঁথিয়া ছিপ ফেলিয়া বসিয়া রহিল।

এমন সময়ে পুষ্করিণীর উত্তর অংশে অস্ফুট রোদন ধ্বনি শুনিতে পাইল। সরোজবন্ধুর এখন আর ফাতনার দিকে লক্ষ্য নাই। রোদনই এখন তাহার প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে।

শরৎ ও সরোজ যেমন তীরে উঠিল এবং দেখিল, ঈশানী আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সরোজ ঈশানীকে দেখিতে পাইয়াছিল, কিন্তু ঈশানী সরোজকে দেখিতে পায় সাই।

ঈশানী যাই ঝুলিয়া পড়িল, অমনিই সরোজ দৌড়িয়া গিয়া আমডালের দড়ি কাটিয়া দিল। ঈশানী গাছ তলায় পড়িয়া গেল। পড়িবামাত্র সরোজ ছুরি দিয়া তাহার গলার দড়ি কাটিয়া দিল। ঈশানী জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিল। ঈশানী একজন অপরিচিত যুবককে দেখিয়া মুখে কাপড় চাপা দিল।

সরোজ ঈশানীকে বলিল, "তুমি গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা কর্‌ছিলে কেন ? আত্মহত্যা মহাপাপ, তাকি তুমি জাননা ?" সরোজের কথা শুনিয়া ঈশানী নিরুত্তর রহিল। কেবল কাঁদিতে লাগিল।

সরোজ ঈশানীর গোলাপ ফুলের ন্যায় বর্ণ, পদ্ম পত্রের ন্যায় আয়ত লোচন, দেখিয়া মুগ্ধ হইয়ছিল। সরোজ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি ?"

ঈশানী সরোজের কথার কোন উত্তর না দিয়া, ধীরে ধীরে উঠিয়া, অন্য দিক দিয়া বাড়ীতে গমন করিল। যাইবার সময় তাহার ভ্রাতা শরৎকে বলিল, "আমার বালিশের নীচে একখানা পত্র আছে, আমি কেন গলায় দড়ি দিয়াছিলাম, তাহাতে সব আছে।"

সরোজ শরৎকে বলিল, "শরৎ যাও ত ভাই। শীঘ্র চিঠিখানা আনত ?

এমন সময়ে শরৎ পত্রখানা আনিয়া হাজির করিল। সরোজ মাছ তুলিতে ব্যস্ত থাকায়, অমর পত্রখানা পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। সরোজ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ভাই! তুমি কাঁদ কেন ?"

অমর। কেন কাঁদি, তোমায় কি বলিব ?

সরোজ। অমর তাহলে তুমি আমায় পর ভাব

অমর। তা কেন ?

সরোজ। তবে আমাকে বলিতেছ কেন ?

অমর। আচ্ছা, আগে মাছটা তোল, তাহার পরে পত্রখানা পড়িলেই বুঝিতে পারিবে।

সরোজ আচ্ছা, বলিয়া মাছ তুলিতে মনোযোগ দিল। খুড়ীমা! খুড়ীমা! বলিয়া অমর ডাকিতে লাগিল।

সৌদামিনী আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিতে ছিলেন, অমরের ডাকে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন, "কেন বাবা!"

অমর বলিল, একবার এই ঘাটে আসুন।

সৌদামিনী ঘাটে আসিলেন। অমনি শরৎ বলিল; "মা! মা! দিদি গলায় দড়ি দিয়াছিল। সরোজ বাবু না থাকিলে দিদি মরিয়া যাইত।

সৌদামিনী শুনিয়া বলিল, "বলিস কিরে?" বলিয়া গালে হাত দিলেন।

অমর বলিল, "শরৎ যা, মা, বাবা ও কাকাবাবুকে ডাকিয়া আন।" শরৎ অমরের আজ্ঞা পাইয়া ছুটিয়া ডাকিতে গেল।

যথা সময়ে রামবাবু, নকড়ি ও রামবাবুর স্ত্রী গিরিবালা দেবী আগমন করিলেন। দেখিলেন, সৌদামিনী নয়ন জলে ভাসিতেছেন।

এই সময়ে সরোজ একটা মাছ ডাঙ্গায় তুলিয়া সে ঘাটের রাণায় বসিল। তখন রামবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা সরোজ! বলত কি হয়ে ছিল?" সরোজ আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বলিল। নকড়ি বাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রামবাবু অমরকে বলিলেন, "চিঠিখানা পড়, রাক্ষসী কি লিখিয়াছে শুনি। এমন সময়ে গিরিবালা ঈশানীর হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া সকলকে দেখাইল, "দেখগো দেখ, হতভাগীর গলার দাগটা দেখ।" সকলে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

অমরনাথ পত্রখানি পড়িল। শুনিয়া রামবাবু কাঁদিয়া ফেলিলেন, নকড়ি বাবু বক্ষে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।

এই সকল ব্যাপার দেখিয়া সরোজের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। সরোজ অমরকে বলিল, "আমি তোমার ভগ্নীর বিবাহের সুব্যবস্থা করিয়া দিব। আগামী রবিবারে আমি মাকে সঙ্গে লইয়া তোমাদের বাটীতে আসিব। আসিয়া সমস্ত ঠিক্ করিব।"

তাহার পর নকড়ি বাবুর স্ত্রীকে বলিল, "মা আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি আপনার কন্যার বিবাহের সুব্যবস্থা করিয়া দিব।"

সরোজ বাড়ী যাইবার সময় বড় মৎস্যটি লইয়া গেল, ছোটটি রাখিয়া গেল। নকড়ি বাবু অমরের মাকে বলিলেন, "বৌদিদি মাছটা কুটিয়া ফেল। কুটিয়া, তোমরা অর্দ্ধেক লইয়া যাও, আর আমাদের অর্দ্ধেক থাক। অমরের মাতা তাহাই করিলেন। সরোজ চলিয়া গেল।

(৭)

সরোজ মাছ লইয়া বাটী আসিল। সরোজের কনিষ্ঠা ভগিনী সুহাসিনী

মৎস দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইল। যথা সময়ে আহারোপযোগী খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত হইল। আহার করিবার জন্য সকলেই নিজ নিজ আসনে উপবেশন করিলেন। গণপতি বাবু সরোজ! সরোজ! করিয়া পুত্রকে ডাকিতে লাগিলেন। সরোজ আসিল না, সরোজের ভগিনী সুহাসিনী ডাকিতে গেল। দেখিল, সরোজ বিছানায় শয়ন করিয়া আছে। সুহাসিনী দাদার কোন উত্তর না পাইয়া, মাতাকে গিয়া সংবাদ দিল, "দাদাকে আমি এত ডাকিলাম উত্তর দিল না।" শুনিবামাত্র মাতা দ্রুত আসিয়া, পুত্রের নয়নে জল দেখিয়া তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল।

সরোজ ঈশানী সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা মাতার নিকট বলিল। মাতা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, 'এ জন্য চিন্তা কি? এখন খাইবে চল। সরোজ উঠিয়া মাতার সঙ্গে আহার করিতে গেল।

আহারান্তে গৃহিণী উমাসুন্দরী স্বামীকে সকল কথা নিবেদন করিলেন। গণপতি বাবু সমস্ত শ্রবণ করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কারণ দুই তিন যায়গা হইতে সরোজের বিবাহের কথা হইতেছে। প্রকাশ্যে বলিলেন, "দেখ, ছেলে লেখাপড়া শিখিয়াছে, উপযুক্ত ছেলে; ওর যদি সেই মেয়েকেই বিবাহ করা মত হইয়া থাকে ত করুক। আমি এক পয়সাও গ্রহণ করিব না। মেয়েটি সুশ্রী কিনা তুমি নিজে দেখিও, কুল মর্য্যাদা বংশ পরিচয় আমি লইব।"

সরোজবন্ধুর মাতা ও ভগিনী সুহাসিনী অমরনাথের বাড়ীতে গমন করিলেন। ঈশানীকে দেখিয়া, সরোজের মাতা মুগ্ধ হইলেন। সরোজের মাতা ও সুহাসিনী জলযোগ করিয়া আপন বাটীতে রওনা হইবার সময় সৌদামিনী ও অমরের মাতা গিরিবালাকে বলিয়া গেলেন যে, এ কন্যা আমি গ্রহণ করিবই করিব। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। তোমাদের কিছুই দিতে হইবে না। যথা সময়ে তাহারা বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

এই ঘটনার চারি পাঁচ দিন পরে, গণপতি বাবু নিজ পুরোহিত ও কতিপয় বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে নকড়ি বাবুর বাড়ীতে আগমন করিলেন। সেই দিন তাঁহারা নকড়ি বাবুর বাড়ীতে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর কন্যা দেখিয়া অতিশয় পুলকিত হইলেন। রামবাবুর পত্নী গিরিবালা অতিশয় যত্নের সহিত রন্ধন করিয়াছিলেন। রামবাবুর বাড়ীশুদ্ধ সকলের নকড়ি বাবুর বাড়ীতে ভোজনের নিমন্ত্রণ হইয়া ছিল। বাটী ফিরিবার সময়ে গণপতি বাবু শুভদিন স্থির করিয়া নকড়ি ও রামবাবুকে পাত্র আশীর্ব্বাদ করিবার আজ্ঞা প্রদান করিয়া গেলেন।

গণপতি বাবুর নির্দ্ধারিত দিবসে নকড়ি ও রামবাবু অমরনাথের মেসে গমন করিলেন। তাঁহারা অমরনাথকে সঙ্গে লইয়া. গণপতি বাবুর বাড়ীতে গমন করতঃ শুভক্ষণে সরোজবন্ধুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। নকড়ি বাবু গণপতি বাবুর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। গণপতি বাবু নকড়িবাবুর হাত ধরিয়া প্রবোধ দিতে লাগিলেন। তাহার পর আহারাদি করিয়া নকড়ি ও রামবাবু উভয় ভ্রাতায় পদব্রজে নিজ নিজ কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলেন। অমরনাথ বাটীতে সংবাদ পাঠাইলেন যে পাত্র আশীর্ব্বাদ হইয়া গিয়াছে। ইহার পর আগামী রবিবারে গণপতি বাবু সবান্ধবে নকড়ি বাবুর বাড়াতে আগমন করিয়া কন্যা আশীর্ব্বাদ ও বিবাহের দিন স্থির করিয়া গেলেন।

(৮)

শুভদিনে শুভক্ষণে ঈশানীর সহিত সরোজের শুভ বিবাহ হইয়া গেল। গণপতি বাবু বেশী লোকজন লইয়া আইসেন নাই। কয়েকজন সরোজের সমবয়স্ক কলেজের বন্ধু, আর গণপতির বাবুর নিতান্ত আত্মীয় বান্ধব কয়েকজন লইয়া গিয়াছিলেন। কারণ বেহাই দরিদ্র, বেশী লোকজনের আহারের সংগ্রহ করিতে পারিবেন কেন? বিবাহের পরদিন গণপতি বাবু পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া বাড়ীতে গমন করিলেন।

সকলে বৌ দেখিয়া শতমুখে প্রশংসা করিতে লাগিল। গণপতি বাবুর পরমাসুন্দরী পুত্রবধু হইয়াছে, কোনরূপ পণ গ্রহণ করেন নাই, এ কথা শ্রবণ করিয়া সকলে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। ধন্য গণপতি বাবু; তোমার মত সহৃদয় উদার চরিত্রের লোক কয়জন আছে? বর্ত্তমান সময়ে কে এরূপ স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারে? প্রত্যেকেই ছেলের বিবাহে টাকার প্রত্যাশা করে, অতএব সকলেই গণপতি বাবুর দৃষ্টান্ত অনুকরণ করুন।

বিবাহের পর ক্রমশঃ এক বৎসর গত হইয়া গেল। ঈশানী শ্বশুর বাটী গমন করিল। তাহার গুণে গণপতি বাবু এত মুগ্ধ হইলেন যে, বৌমা বলিতে অজ্ঞান হইতেন। প্রাতঃকালে ঈশানী শয্যা হইতে উঠিয়াই গণপতি বাবুর হুঁকায় ছিঁচকা দিয়া, জল ফিরাইয়া তামাকু সাজিয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে ডাকিতেন, "বাবা! উঠুন তামাক সাজা হইয়াছে।" গণপতি বাবু শয্যা হইয়া উঠিয়া, চোক মুখ ধুইয়া ধূমপান করিতে বসেন। ধূমপান হইলেই ঈশানীর রক্ষিত জলভরা গাড় লইয়া পাইখানায় গমন করিতেন। পায়খানা

হইতে আসিলেই, ঈশানী তাঁহার হাত মুখ ধুইবার জল দিত। তিনি হাত পা ও মুখ ধুইয়াই, পুনরায় ঈশানী প্রদত্ত হুঁকা লইয়া, ধূমপান করিতে করিতে বৈঠকখানায় যাইতেন। এইরূপ ঈশানী শ্বশুরের বহুবিধ সেবা করিত। ঈশানির গুণে তাহার শ্বশুর শাশুড়ী অতিশয় বশীভূত হইলেন। এমন কি বাটীর দাস দাসী পর্য্যন্ত "বৌমা" বলিতে অজ্ঞান হইত। ফুলকথা, গণপতি বাবু সর্ব্বদা স্ত্রীকে বলিতেন, "দেখ ছেলের বিবাহে টাকা লইলে এমন গুণময়ী বৌ পেতাম না।" গৃহিণী বলিলেন, "শুধু গুণময়ী, রূপময়ী নয়?"

ইতোমধ্যে সরোজবন্ধু এম, এ, পাশ করিল। সেই সঙ্গে অমরও পাশ হইল। অমর সর্ব্বদা সরোজদের বাটী যাইত। ঈশানীর সহিত সরোজের বিবাহ হওয়ায় যাতায়াতটা এখন বেশী রকমের হইয়াছে। সুহাসিনী অমরকে অমর দাদা বলিত। অমরও সুহাসিনীকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত। সুহাসিনী মনে মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিত, "হে ভগবান! অমর দাদা যেন আমার বর হয়?" হইলও তাহাই। রামবাবুও এক পয়সা গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। তবে গণপতি বাবুর যথেষ্ট পয়সা আছে। তিনি মেয়েকে প্রায় তিন হাজার টাকার গয়না এবং জামাইকে সোণার ঘড়ী ও চেন, আর হীরক অঙ্গুরীয় দিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত পিতল কাঁসার দান সামগ্রী রীতিমত দিয়াছিলেন। গণপতি বাবুর মত লোক সংসারে বিরল। তাঁহার মত সচ্চরিত্র বিনয়ী, মিষ্টভাষী ও উদার প্রকৃতির লোক প্রায়ই দেখা যায় না। রামবাবু ত তাহার নিকট এক পয়সা দাবী করেন নাই। কিন্তু গণপতি বাবু মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, রামবাবু আমার মেয়েকে দুই একখানি গহনার বেশী দিতে পারিবেন না। আমার মেয়ে নিরাভরণা থাকিবে, তাহা আমি দেখিতে পারিব না। বৈবাহিক নকড়ি বাবু গরীব ছিলেন, আমার ছেলেকে কিছুই দিতে পারেন নাই। সেই জন্য তিনি আমার কাছে কত অবনত আছেন। রামবাবুও তাই। যাঁহার ক্ষমতা আছে, তিনি মনের মত খরচ করুন, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি নাই। যাঁহার ক্ষমতা নাই, তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করা অনুচিত।

চতুর্থ আপত্য যথা। প্রমাণই যাথার্থ জ্ঞানের সাধন, যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহার বলে ঈশ্বর সপ্রমাণ নহে বিধায়, ঈশ্বরের প্রমাণ্য স্বীকার্য্য নহে। প্রবল প্রমাণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, প্রত্যক্ষ মূলক, যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে প্রথমে জ্ঞাত না হয়,—পশ্চাৎ তাঁহা অনুমান বলেও সিদ্ধি হয় না ; যেহেতু অনুমান প্রত্যক্ষ জন্য ব্যাপ্তি জ্ঞান বলেই সপ্রমাণিত হয়।

পঞ্চম আপত্য যথা। ঈশ্বরের প্রমাণ্য পক্ষে কোনই কারণ নাই, সুতরাং প্রমাণাভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিব কেন? যাহারা জগৎ সৃষ্টির কর্ত্তা বলিয়া ঈশ্বরের প্রামাণ্য সপ্রমাণ করিতে চাহেন তাঁহাদিগের জানা উচিৎ, যে অশরীরী কর্ত্তা কদাচ সম্ভব নহে। সুতরাং জগতের সৃজন কর্তৃত্ব লইয়া তর্ক বলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

গুরু। এ জগতের কেহ ধনী কেহ নির্ধন কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ রোগী, কেহ নীরোগ এমন কি যমজ সন্তানেও পার্থক্য বৈষম্য ইত্যাদি কোনই কারণ মূলক নহে, ইহা মনে করিলেও কেমন একটা অসন্তোষ ভাব চিত্তে স্বতই উদিত হয়। জাগতিক বৈষম্য আপনিই সম্পন্ন হয় ইহা বলিলে অকারণ কার্য্যোৎপত্তি দোষ ঘটে, সুতরাং ঐরূপ উক্তি কারণ নির্দ্দেশে অক্ষমতার নামান্তর মাত্র। অপরন্তু কর্ম্ম জন্য ফল অবশ্যম্ভাবী, যদি কর্ম্মফল ভোগ একই জীবনে শেষ না হয়, তবে উহার কোন এক স্থানে অবশ্যই হইবে। সেই স্থানই পরকাল বা পরজন্ম।

বর্ত্তমান থাকিলে, অতীত ভবিষ্যৎও অবশ্যই থাকিবে। বর্ত্তমানের পূর্ব্বে যেমন ভবিষ্যৎ ছিল, তেমনি আবার বর্ত্তমানের পর অতীতও আসিবে। সেই ভাবী জন্মে অচেতন কর্ম্ম বা অদৃষ্ট স্বয়ং কালোৎপাদন করিতে অসমর্থ বিধায়, উহার সহকারী চেতন আত্মা অবশ্যই স্বীকার না করিবে কেন? সচেতন পুরুষেরা হস্ত ধৃত কুঠারাদি যেমন চেতন পুরুষের প্রযত্ন বলে কার্য্য সম্পাদন করে। অদৃষ্টও তদ্রূপ চেতন আত্মার সহকারিতায় কার্য্য সম্পাদন করিতে কেন না সমর্থ হইবে? আরও দেখা যায়, কার্য্য কারণের পরম্পরা অপেক্ষিত্ব কার্য্য কারণের অনাদিত্ব বিশ্বের বৈচিত্র্য পরকামীর যাগাদিতে প্রবৃত্তি প্রত্যেক ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ ভোগাদি বিনা কারণে হয় না।

অতএব ঐ সমস্তের সকারণত্ব মানিতে হইবে। নচেৎ অকারণ কার্য্যোৎপত্তি দোষ ঘটে। কার্য্যও কারণের সম্বন্ধ অবচ্ছিন্ন ইহা কেন। স্বীকার করিবে?

শিষ্য। সমস্ত পদার্থের কার্য্য কারণ ভাব মানিয়া লইয়া সকারণত্ব প্রতিপন্ন

হইলেও নিখিল কার্য্যের একটা মাত্র কারণ প্রকৃতি বা ব্রহ্ম স্বীকার করাই কর্ত্তব্য। ব্রহ্ম বা প্রকৃতি কারণ হইলে, কার্য্য নাশে নিত্য সম্বন্ধ বিধায় কারণও নষ্ট হইতে পারে।

গুরু। কারণ নাশে সর্ব্বত্রই কার্য্য নষ্ট হয় না। দেখ কোন শিল্পী কোন একটি বস্তু নির্ম্মাণ করিয়া মরিয়া গেল, শিল্পী ঐ বস্তুর কারণ শিল্পী মরিয়া গেল বলিয়া কি তাহার নির্ম্মিত বস্তুও নষ্ট হইয়া যাইবে? অতএব বিশ্বনাশে বিশ্বপতির নাশ হইবে পারে না!

শিষ্য। কোন সময় অনুষ্ঠিত যাগাদি সমাপ্ত হইবার পর কালান্তরে কিরূপে স্বর্গাদি প্রাপ্তি সাধন করে বুঝি না—অনুগ্রহ পূর্ব্বক বুঝাইয়া দিন।

গুরু। যাগাদি অনুষ্ঠান জন্য শুভাদৃষ্ট উৎপন্ন হয়। ঐ অদৃষ্ট আত্মাশ্রিত হইয়া কালান্তরে স্বর্গাদি ফল উৎপাদন করে।

শিষ্য। অদৃষ্ট, সুখ দুঃখাদি তুল্য দেশবৃত্তি না বলিয়া অদৃষ্ট ভোগ্য বস্তু আশ্রয় করিয়া থাকে, ইহা বলিলে কি ক্ষতি হয়?

গুরু। তাহা হইলে কার্য্য কারণের ভিন্ন দেশ বর্ত্তিত দোষ ঘটে এবং অদৃষ্ট যদি ভোগ্য বস্তুগত হয় তাহা হইলে ভোগজনক কারণ বিদ্যমান থাকায় একের ভোগ্য বস্তুতে অন্যেরও ভোগ জন্মিতে পারে। অতএব প্রত্যেক পুরুষের অদৃষ্ট ও সুখ দুঃখাদি একদেশ বর্ত্তী অর্থাৎ একই ব্যক্তি সঙ্গত হওয়াই যুক্তি সঙ্গত। অদৃষ্ট স্বীকার করিতে উহার আশ্রয় আত্মাও স্বীকার করা কর্ত্তব্য। যেহেতু অদৃষ্ট সচেতনের সহায়তা ব্যতীত কালোৎপাদনে অসমর্থ।

শিষ্য। ক্ষণিক উৎপন্ন বস্তু মাত্রেই যে কারণ মূলক—তাহার প্রমাণ কি? বিনা কারণেও ভাব পদার্থ উৎপন্ন হইতে দেখা যায় গগন ও কণ্টকের তীক্ষ্ণতা বিনা কারণেই উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

গুরু। পদার্থ মাত্রেই অকস্মাৎ উৎপন্ন হয়। ইহা যদি বল, তাহা হইলে অকস্মাৎ শব্দের অভাব অর্থ ধরিলে, পদার্থ সৃষ্ট নহে—এই অর্থ করিতে হয়। আর অকস্মাৎ শব্দের অহেতুক অর্থ ধরিলে পদার্থ কারণ জন্য নহে, এই অর্থ করিতে হয়, কিন্তু অকারণ বস্তুর উৎপত্তি অসম্ভব। অকস্মাৎ শব্দের স্বভাব অর্থ ধরিলেও সকারণত্বই প্রতিপন্ন হয়। যেহেতু স্বভাবই কারণ স্থলাভিষিক্ত হয়। তাহা হইলে কার্য্য কারণ ভাবই কল্পিত হইয়া উঠে। তাহাতে কোনই আপত্য নাই।

শিষ্য। কার্য্যের প্রতি কার্য্যই কারণ হউক না কেন? অন্য কারণ কল্পনার প্রয়োজন কি?

শাস্ত্রের প্রামাণ্য বিধায় বেদেরও প্রমাণ্য স্থিরীকৃত হইয়াছে। সেই বেদ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন। অতএব ঈশ্বর অপ্রামাণ্য নহে।

শিষ্য। কার্য্য কারণ ভাব স্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু কর্ত্তারূপে ঈশ্বরের বিশ্বকারণত্ব স্বীকার করা যুক্তি বহির্ভূত। বেদ পৌরুষেয়, সুতরাং বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না। বেদে মন্ত্র স্রষ্টা ঋষিদিগের উল্লেখ আছে, সুতরাং তাহা পৌরুষেয়, প্রমাণ মূলক নহে, এ কারণ ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান নহে। নিশ্চয় জ্ঞানের বিষয় নহে বলিয়া ঈশ্বর প্রমাতা বা প্রামাণ্য নহে।

গুরু। সকল কালে সকল বিষয়ে ঈশ্বরের নিশ্চয় জ্ঞান আছে, উহাই ঈশ্বর জ্ঞানের উপযুক্ত কারণ। অতীন্দ্রিয় পদার্থ অনুভব ব্যতীত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বলে প্রমাণিত হয় না। সুতরাং বাক্য মনের অতীত জগদীশ্বর কিরূপে অমীস বুদ্ধিশালী মানবের কল্পিত প্রমাণ বলে স্থিরীকৃত হইবে? সুতরাং প্রমাণের অতীত হইলেই বস্তু অসিদ্ধ হয় না।

শিষ্য। যোগ্য অর্থাৎ উপযুক্ত কারণ ব্যতীত অনুভবও হয় না, যোগ্য কারণের অভাবে ঈশ্বরের অনুভব অসিদ্ধ।

গুরু। আদি বিশ্বোৎপত্তি কালে মনুষ্যাভাবে তদুৎপাদকরূপে অবশ্যই ঈশ্বরের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

শিষ্য। কারণ কদাচ বিলয় হয় না, সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের বিকাশ হয়। সুতরাং মহাপ্রলয়াভাবে জগৎ কর্ত্তারূপে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে পারি না। বিশেষ বদ্ধ বা মুক্তের একতরের দ্বারা সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব বিধায়, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে পারি না।

গুরু। জড়ের অন্তরে যে ক্রিয়া দৃষ্ট হয়, উহা চৈতন্যেরই শক্তি। ব্রহ্ম স্বয়ই বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াছেন। ইহা কি বিশ্বাস করিতে পার?

শিষ্য। তাহাও অসম্ভব, যেহেতু অবিকারী ব্রহ্মের পরিণামে জগৎ সৃষ্ট হইতে পারে না। দ্বিতীয়ত নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিরাকার ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব।

গুরু। জন্মান্তর স্বীকার করিলে অদৃষ্টাশ্রয় আত্মাও স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে আত্মা ঈশ্বরাংশ বলিয়া ঈশ্বরও স্বীকার করিতে হয়।

শিষ্য। জন্মান্তর একটা প্রমাণ বলে প্রমাণীকৃত নহে, সুতরাং তাহা অস্বীকার্য্য। সুতরাং তদাশ্রয় আত্মাও অস্বীকার্য্য।

গুরু। জন্মান্তর না থাকিলে মানব মণ্ডলী মধ্যে ঘোর বৈষম্যের কারণ কি?

শিষ্য। জন্ম, শিক্ষা, বংশ, সঙ্গ, পিতা মাতার মনোবৃত্তির অবস্থা ভেদ, বিবিধ স্থূল সূক্ষ্ম কারণে মানব মণ্ডলীর মধ্যে বৈষম্য লক্ষিত হয়। তজ্জন্মান্তর স্বীকারের প্রয়োজন দেখি না।

গুরু। বাল্য দেহোৎপন্ন সংস্কার যৌবনে লক্ষিত হয়, আত্মা বলিয়া যদি স্বতন্ত্র কিছু না থাকে, তবে বাসনা সংক্রম অস্বীকৃত বিধায় কিরূপে তাদৃশ সংস্কার জন্য জ্ঞান সিদ্ধায়?

শিষ্য। বাল্যদেহের পরমাণু যুক্ত যৌবন দেহে সংস্কার উৎপাদন করিয়া দিয়া বিনষ্ট হয়। তাহা হইলে বাল্য সংস্কার জন্য জ্ঞানের কোনই বাধা হইতে পারে না।

গুরু। দেখা যায় তিরস্কার বা প্রহার বশতঃ স্থূল দেহের কোনরূপ বিকৃতি ঘটে না, চিত্তেরই বিকৃতি ঘটে। তবে দেহাতিরিক্ত আর একটা কিছু স্বীকার করিবে না কেন? সেই আর কিছুই আত্মাপদ বাচ্য।

শিষ্য। দেহ ভিন্ন জ্ঞান আছে, মনও আছে, মন সূক্ষ্ম বাহ্যীয় ইন্দ্রিয় তিরস্কারাদি জন্য বিকৃতি মনেরই ঘটে, দেহ অবিকৃতই থাকে। তাহাতে আত্মা স্বীকৃত হইল কিরূপে?

গুরু। আত্মা ও মনের সংযোগ ব্যতীত জ্ঞান জন্মে না। জ্ঞান মানিতে হইলে অবশ্যই আত্মা স্বীকার করিতে হইবে।

শিষ্য। মন, অন্তঃকরণ ও বুদ্ধি এই তিন অংশে বিভক্ত, বুদ্ধ্যংশ হইতে ইন্দ্রিয় সাহায্যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। স্বতন্ত্র আত্মার প্রয়োজন কি?

গুরু। কোন বস্তুর অভাব ধারতে হইলে, যাহার অভাব ধরা যায়, তাহার অস্তিত্ব থাকা আবশ্যক। নচেৎ অলীক বস্তুর অভাব গৃহীত হয় না। আকাশ কুসুম নাই এমত অভাব কেহই গ্রহণ করেন না। যেহেতু উহা স্বতই অলীক পদার্থ। নাই, নাই এমত কদাচ প্রয়োগ হয় না। যাহা আছে তাহাই নাই হইতে পারে। ঈশ্বর যদি বস্তুত অলীক পদার্থ হন, তবে তাহার অভাব অর্থাৎ "ঈশ্বরোনাস্তি" ইত্যাদি কিরূপে বলা যায়? অতএব ঈশ্বর নাই বলিলেই, তাহার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়া উঠিতেছে।

শিষ্য। শিল্পীগণ বিশ্বকর্ম্মাকে ঈশ্বর বলে, ভূপতি ঈশ্বর পদবাচ্য, জীবন্মুক্ত পুরুষ বা সিদ্ধ ব্যক্তি ঈশ্বর পদবাচ্য। তাদৃশ ঈশ্বর লইয়া ঈশ্বরাভাব সিদ্ধ হইতে পারে। ঈশ্বরাভাব অসঙ্গত হইবে কেন?

গুরু। অভ্রান্ত বেদশাস্ত্র যখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছে, তখন স্বল্পবুদ্ধি মানব তুমি তাহা স্বীকার না করিবে কেন?

শিষ্য। বেদ, শাস্ত্র প্রমাণ বলিয়া তৃতীয় প্রমাণ মধ্যে গণ্য। প্রত্যক্ষ, অনুমান, এই দুইটীই প্রধান। তন্মধ্যে অনুমান ও প্রত্যক্ষোপজীবী। প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতেই ভূয়োদর্শন বলে, অনুমান সিদ্ধ হয়। প্রত্যক্ষে যাহা পাওয়া যায় না, তাহা অনুমানেও পাওয়া যায় না, তৃতীয় প্রমাণ শব্দ, সর্ব্ববাদী সম্মত নহে, সুতরাং তাহা অগ্রাহ্য।

গুরু। বাক্য, মনের অতীত পদার্থ তুমি কিরূপে প্রত্যক্ষ করিবে?

শিষ্য। বাক্য মনের অতীত বস্তু যদি প্রমাণীকৃত হইতে পারে, তবে তুল্য যুক্তি বলে তাহা অপ্রমাণীকৃত না হইবে কেন?

গুরু। সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, ইচ্ছাময় পূর্ণব্রহ্মের ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনে সম্ভাবনাই অধিক। তাঁহার কোন বিষয়েই অসম্ভাবনা নাই।

ক্রমশঃ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম ও স্ত্রী চরিত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লেখক,—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ।

কালিদাসের রতি বিলাপ।

এইবার কালিদাসের রতিবিলাপ তুলি, যাহার তুল্য শোকোচ্ছ্বাস জগতে এখনও হয় নাই। চন্দ্রশেখরের দুর্ভাগ্য যে তিনি অজ বিলাপও পড়েন নাই। রতিবিলাপও পড়েন নাই। তিনি কুমার সম্ভবের তৃতীয় সর্গ—মদন ভস্ম অবধি পড়িয়া ছিলেন,—সে কলেজের পড়া, রসপান নাই। আর একটু পড়িলেই রতি বিলাপ পাইতেন। তাঁহার দুর্ভাগ্য!!!

স্মরসি স্মর মেখলা গুণৈ
স্রুত গোত্র স্খলিতেষু বন্ধনং।
চ্যুত কেশর দূষিতে ক্ষণা
ন্যবতং শোৎপল তার নানিক? কুমার ৪।৮
স্মরিছ কি স্মর! মেখলা গুণেতে
রেখেছিনু তোমা সে গোত্র স্খলিতে?
চ্যুত কেশরেতে দূষিত ঈক্ষণ
অনতং সোৎপল তারন জানিতে॥ কুমার ৪।৮

একটু জয়দেব শুনুন—

হৃদবিসলতা হারো
নায়ং ভূজঙ্গম নায়কঃ
কুবলয় দল শ্রেণী কণ্ঠে
নসঃ গরল দ্যুতি
মলয়জ রজো নেদং
ভস্ম প্রিয়ারহিতে ময়ি
প্রহর নহর ভান্ত্যা নঙ্গো
মুধা কিমুধাবসি॥

জয়দেবের এই কবিতা বহু আলংকারিক উদ্ধার করিয়াছেন ও অনুকরণ করিয়াছেন।

নিম্নে বিদ্যাপতির মৌলিক সমাস্তব দিলাম—

কতি হুঁ মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহুঁ শঙ্কর, হউ বর নারী॥

---

* আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে ব্রহ্মা আদি কবি, বাল্মীকি কবি গুরু, আর কালিদাস মহাকবি। কর্ণাটরাজ দ্বিতীয় পুলিকেসিন্ এর মহিষীর মতে, নলিনজ ব্রহ্মা আদি কবি, পুলিনজ ব্যাস দ্বিতীয় কবি, বল্মীকজ রত্নাকর জগতের তৃতীয় কবি। ইহাদের জন্ম সময় আমার অনুসন্ধানে এইরূপ—

নলিনজ বেদের অনুবাদক ব্রহ্মা (বেদব্যাস)		সম্বৎপূর্ব্ব	১৫২২	অব্দাঃ।
পুলিনজ ব্যাস (বৈশম্পায়ন)	...	,,	১০৭২	,,
বল্মীকজ রত্নাকর	...	,,	৪০০	,,
রঘুকর কালিদাস	...	সম্বৎ	৬০০	,,

নহি জটা ইহ বেণী ত্রিভঙ্গ ।
মালতী মাল শিরে নহ গঙ্গ ॥
জোতম বদ্ধ মৌলী নহ ইন্দু
ভালে নয়ন নহ সিন্দুর বিন্দু
কণ্ঠে গরল নহ মৃগ মদ সার
নহ ফণিরাজ উরে মণি হার ॥
নীল পটাম্বর নহ বাঘছাল
কেলিক কমল ইহ না কর্ণ কপাল
বিদ্যাপতি কহে এ হেন সুছন্দ
অঙ্গে ভসম নহ মলয়জ পঙ্ক ॥

একটু চণ্ডীদাসের বিরহ শুনবেন না ?

মাথ গরল ভখি ।
তাহার বিরহে ভাবিতে গণিতে
পরাণ হারাব দেখি ॥
কালিয়া বরণ ধরয়ে যে জন
সে জন কঠিন বড় ।
পরের পীরিতি সুখের আরতি
এ যে সে জনল গাঢ় ॥
পরের পরাণ সহিতে কি দুখ
সুখের নাহিক লেশ ।
ভাবিতে গণিতে মলিন হইল
অল্প হইল দেহা ॥
অনেক যতনে সে পুহু রতনে
আছিল মিলতি কোরে ।
বিহি নিকরণ তাহে ভেল বাদ
সকল হইল ভোর ॥
পাইলা পীরিতি যখন করিলে
হাতে আনি দিলা চাঁদ ।
কুল তেয়াগি কলঙ্ক সাগর
লাগাইলা প্রেম ফাঁদ ॥

চণ্ডীদাস শুনি রাধার বিরহ
উঠিল দারুণ দুঃখ ।
নিরমল বর রসের সাগর
হেরব তাকর মুখ ॥

চণ্ডীদাস ২৮৫ ।

তাঁহার একজন সমদুঃখ সুখ সম্পন্ন, সম সাময়িক বন্ধুও সহযোগীর কান্না এইরূপ :—

"ওরে দুষ্ট দেশাচার কি করিলে অবলার
কার ধন কারে দিলি আমার সে ছলনা
লোক লজ্জা মান ভয়ে মাবাপ নিদয় হয়ে
আমার প্রাণের নিধি অন্য কারে সঁপিল,
অভাগার যত আশা জন্মের শোধ ঘুচিল ॥
মরি মরমের কথা আমার প্রাণের লতা
পতি তারে অন্য জনে প্রাণনাথ বলিল,—
মরমের কথা মোর মরমেই রহিল ॥
তদবধি ধরাসনে একস্থানে শূন্য মনে—
থাকি পড়ি ভাবি সেই হৃদয়ের ভাবনা ;
কিযে ভাবি দিবা নিশি তাও কিছু জানিনা ॥
এ যন্ত্রণা ছিল ভাল কেন পুন দেখা হল
দেখে বুক বিদারিল
কেন সেদিনের কথা পুন মনে পড়েরে ॥
সে দেখে আমার পানে আমি দেখি তার পানে
চিত্তহারা দুইজনে বাক্য নাহি সরে রে—
কতক্ষণে অকস্মাৎ বিধবা হয়েছি নাথ
বলে প্রিয়তমা ভূমে লুটাইয়া পড়ে পরে,
কোন শশী পুনরায় গগনে উদিল রে ॥

এখানে আর একটি তত্ত্ব বুঝা গেল—বাঙ্গালায় উকিল হইয়া কবি হইলে তাহাকে অনাহারে হাঁসপাতালে মরিতে হয়। বাঙ্গলায় তিনি উকিল কবি হাসপাতালে মরিয়াছিলেন।

আপনাদের একটু চন্দ্রশেখরের টপ্পা শুনাই—

বন পোড়ে সকলে দেখে
মন পোড়ে কেহ দেখে নারে ॥

এই সকল কোটেশন তুলিয়া আমি বুঝাইতে চাহি যে, বাঙ্গালা দেশে মোটে তিনটি স্বভাব কবি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং তৃতীয় বিহারীলাল সরকার। "গুপ্তি পশ্চাৎ কবি বিষ্ণুঃ মধুবেশো মহাকবিঃ" একথা এখানে খাটে। আর সব কেবল নকল নবীশ, কাহারই ভাবের অভিব্যক্তি নাই।

আরও একটা এখানে বক্তব্য হচ্ছে—এত যে বকিলাম, এত যে পুরাতন লোকের কান্না তুলিলাম, ইহার উদ্দেশ্য কি? উদভ্রান্ত প্রেম সমালোচনা করিতে বসিয়া, পরের কান্না তোলা কেন? এর একটা কারণ আছে—উদভ্রান্ত প্রেম পড়িয়া আমার মনে হইল, যেন বহরমপুর কলেজের সাহেব প্রিন্সিপাল, কলেজের নিম্ন প্রবাহী গঙ্গার সান বাঁধান ঘাটে বসিয়া, "প্রিয়ে কেরো লাইনা আমার"—(নবীন) বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পশ্চিম পারের বৈষ্ণব কীর্ত্তনীয়াদের "সখিরে ভাল করি পেখন, না ভেল" (বিদ্যাপতি) ইত্যাদি করুণ নিকণ শুনিয়া, স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। চন্দ্রশেখর বঙ্কিম যুগের লোক ছিলেন। সে যুগের অবস্থাই এইরূপ ছিল। তখনকার শিক্ষিত লোকের শিক্ষা লাভ হইয়াছিল যে, ভারতবর্ষ একটি কেবল ভীল সাঁওতালের দেশ। Scotland হইতে হেয়ার সাহেব বাঙ্গালা দেশে আসিয়া, স্বীয় রুমাল খুলিয়া, বাঙ্গালীর হাত ঝাড়িয়া, বাঙ্গালীকে A B C D শিখাইয়া সভ্য করিয়াছেন। সেই শিক্ষা এবং আব হাওয়ায় পরিবর্দ্ধিত, চন্দ্রশেখরের উদভ্রান্ত প্রেম পড়িয়া, আমি দেখিলাম, এরসবই ইংরাজী। বাঙ্গালা অক্ষরে ইউরোপীয় জনমণ্ডলীর রীতির ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র। ইহার মধ্যে বাঙ্গালীর এক বোঠাও নাই। ইহা ইংরাজী ছাঁচে ঢালা মৌলিক কান্না মাত্র।

শেষ আক থানায় তিনি তাঁহার পারিপার্শ্বিক বিদ্যাপতির কীর্ত্তন শুনিয়া গলিয়া গেলেন, তাই দুটো একটা কোটেশন তুলিয়াছেন মাত্র। আমরা যে চারি যুগের একটা প্রাচীন জাতি, অন্ততঃ চতুর্দ্দশ শাস্ত্র বর্ষের সুখ দুঃখের স্মৃতি বুকে করিয়া, কালের করাল বাতাবর্ত্ত সহ্য করিয়া, এখনও দাঁড়াইয়া আছি, তাহা তাঁহার গ্রন্থ পড়িয়া বুঝা যায় না। আমরা Scence Phesus Cherety Engeenereng ভাল না জানিলেও, আত্মীয় স্বজনের সুখ দুঃখে ভীশোক ক্রোধ হর্ষের ভাব ব্যক্ত করিতে পারিতাম, এ কথাটাও তাহার গ্রন্থ

পড়িয়া বুঝা যায় না। তাঁহার যদি সে ধারণা থাকিত, তবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য রঘু কুমার পড়িয়া, তাহার মধ্য হইতে অজবিলাপ বা রতিবিলাপের একটুও কোটেশন, ভাব সঞ্চয় বা অনুকরণও করিতেন। তিনি একেবারে স্বদেশীয় সাহিত্যের নাম গন্ধও করেন নাই, কাজেই আমি এতগুলি কবিতা তুলিয়া দেখাইলাম—তাঁহার ইংরাজি ছাঁচের কান্না, আমাদের অজবিলাপকে ছাড়াইতে পারে নাই। তিনি শেষ পাতায় একটু কালিদাসের নাম করিয়াছেন, —"সেই সর্ব্বোপমাদ্রব্য সমুচ্চয়েন নির্ম্মিত মুখখানি।" আরও একটা ক্ষুদ্র কারণও আছে—সমান্তর ভাব না পড়িলে ভাবের পরিস্ফুটতা হয় না।

আতিথেয়তা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ।

লাভালাভের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আগন্তুক অথবা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে গৃহে স্থান দান করা ও অকপটচিত্তে প্রাণপণে তাঁহার পরিচর্য্যা করাকে আতিথেয়তা বলে।

প্রাচীন হিন্দুগণ আতিথেয়তা গুণের আদর্শ ছিলেন। পূর্ব্বকালে কোনও গৃহস্থের বাটিতে অতিথি উপস্থিত হইলে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া যাইত। গৃহস্বামী সর্ব্বদা শঙ্কিত হইয়া থাকিতেন, পাছে অতিথি আসিয়া বিমুখ হইয়া প্রত্যাগমন করেন। গৃহে অতিথি আসিলে গৃহস্বামী অতি বিনয় সহকারে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন। যদি অতিথি গৃহ প্রস্তুত অন্নাদি আহার করিতে চাহিতেন, তাহা হইলে নিজেরা অনাহারে থাকিয়াও তাঁহাকে আহার করাইতেন; আর যদি স্বপাকে খাইতে চাহিতেন,—তাহা হইলে শুদ্ধ ভাবে সমস্ত আয়োজন করিয়া দিতেন ও যতক্ষণ না তাঁহার আহার সমাপন হইত,—ততক্ষণ অবধি কেহ আহার করিতেন না। প্রাচীন হিন্দুগণ কখনও অতিথির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেন না। কারণ তাঁহাদের মতে আগন্তুকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা উক্ত ব্যক্তিকে অবিশ্বাস করার চিহ্ন। তাঁহারা অতিথিকে দেবতার অংশ বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং যে কাজ করিলে অতিথির অবমাননা অথবা বিরক্তির উদ্রেক হয়, তাহা করিতেন না।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ঈদৃশ আতিথেয়তার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখা যাইবে। কর্ণ স্বীয় পুত্রকে বলি দিয়া অতিথির তুষ্টিসাধন করিয়া ছিলেন। তাই আজ তিনি ভারতের ইতিহাসে "দাতাকর্ণ" নামে কথিত হইয়াছেন।

কিন্তু কালের কি বিচিত্র পরিবর্ত্তন। সভ্যতা স্রোতে আজ ভারতের সেই বহুদিন সঞ্চিতগুণ তৃণ খণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া যাইতে বসিয়াছে। কোনও ভারতবাসীই পিতৃ পিতামহের সেই অমূল্য সম্পত্তি, হিন্দুজাতির আজন্মোপার্জ্জিত সম্পত্তি রক্ষার্থে যত্নবান হইতেছেন না। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে ভারত হইতে ক্রমেই আতিথ্য ধর্ম্মের হ্রাস হইতেছে। আধুনিক সমাজের মতে আতিথেয়তা আলস্যতার প্রশ্রয় দিতেছে। এক্ষণে যদি কোনও গৃহস্থের বাটিতে অতিথি আসেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ভর্ৎসনা ও গালি দিয়া দূর করিয়া দিতে পারিলে গৃহস্থ যেন কিঞ্চিৎ সুস্থতা বোধ করেন। অবশ্য পল্লী-গ্রামে ভারতের অতীত গৌরবের কিছু কিছু চিহ্ন আছে। এখন ও পল্লীবাসী অতিথি আসিলে তাঁহাকে স্থানদান ও তাঁহার পরিচর্য্যা করেন বটে, কিন্তু অতিথি গৃহস্থের নিকট পূর্ব্বকালের ন্যায় আর সমাদর পান না। পূর্ব্বকালে হিন্দুরা যেমন অতিথির পরিচয় জিজ্ঞাসা করা ঘৃণার কার্য্য মনে করিতেন, তেমনি আজ কাল পরিচয় না লইয়া অপরিচিত ব্যক্তিকে গৃহে স্থান দিতে সাহস হয় না। অতিথিকে এরূপ অবিশ্বাস করিবার কারণও যথেষ্ট আছে। পূর্ব্বে তীর্থ যাত্রি ও ভদ্রলোকেই আতিথ্য গ্রহণ করিতেন; কিন্তু আজকাল এই মহার্ঘের দিনে নিজ নিজ আহার সঞ্চয় করিতে অক্ষম হইয়া যত নীচ ব্যক্তি আতিথ্য গ্রহণ করে ও অবকাশ পাইলেই গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করিয়া পলায়ন করে। সুতরাং আজকাল অতিথিকে গৃহস্থের বাটিতে যাইয়া, নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়। তজ্জন্য ভদ্রলোকে সহজে কাহারও আতিথ্য গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন না।

আমাদের শাস্ত্রে কথিত আছে—

"অপূজিতোঽতিথি র্যস্য গৃহাদ্‌যাতি বিনিশ্বসন্।
গচ্ছন্তি বিমুখাস্তস্য পিতৃভিঃ সহ দেবতা।"

অর্থাৎ অতিথি অসৎকৃত হইয়া যাঁহার গৃহ হইতে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গমন করেন, তাঁহার গৃহহইতে পিতৃলোক ও দেবতাগণ বিমুখ হইয়া প্রস্থান করেন।

হিন্দুরা প্রকৃতই গৃহ হইতে অতিথি বিমুখ হইলে একান্ত ক্ষুন্ন হইতেন। ইহাকে অমঙ্গলের চিহ্ন মনে করিতেন।

পূর্ব্বকালে হিন্দুগণ স্বীয় শত্রুও অতিথি হইলে প্রাণপণে তাঁহার পরিচর্য্যা ও তাঁহাকে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করিতেন।

অতিথি শত্রু হইলেও হিন্দু তাঁহার অনিষ্ট করেন না, কারণ আমাদের শাস্ত্রে কথিত আছে—

"গৃহং শত্রুমপিপ্রাপ্তং বিশ্বস্তমকুতোভয়ম্।
যো হন্যাৎ তস্য পাপং স্যাচ্ছত ব্রাহ্মণ ঘাতজম্॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি গৃহাগত, বিশ্বাস পরায়ণ, অকুতোভয় শত্রুকেও বিনাশ করে, তাহার শত ব্রাহ্মণ হত্যা জনিত পাপ হয়।

আতিথেয়তা একদিকে যেরূপ শতশত বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তিকে অনাহারের কবল হইতে রক্ষা করিতেছে, অন্যদিকে সেইরূপ অধিক পরিমাণ আতিথেয়তা চৌর্য্যের ও আলস্যতার প্রশ্রয় দিতেছে। আতিথেয়তা প্রত্যহ শত শত ব্যক্তিকে বিপন্মুক্ত করিতেছে। মনে কর, এক ব্যক্তি বিদেশে গিয়াছেন। সেই স্থানে তাঁহার পরিচিত কেহ নাই। সন্ধ্যা উপস্থিত। তিনি যদি কোনও স্থানে আশ্রয় না পান তাহা হইলে তাঁহার প্রাণসংশয় হইবে। এরূপ সময়ে তিনি যদি কিঞ্চিৎ আহার ও আশ্রয় পান তাহা হইলে তাঁহার কত উপকার হয়।

অতিথি সৎকার করা আমাদের সকলের অবশ্য করণীয়। আতিথেয়তা ভাল কি মন্দ, তাহা বিচার করিবার অধিকার আমাদের নাই। কারণ আমাদের পূজনীয় পিতৃ পিতামহ আতিথেয়তা হিন্দুদিগের ধর্ম্ম বলিয়া জানিতেন। তাঁহারা যে কার্য্য কোনও দ্বিধা না করিয়া পালন করিয়াছেন, সে কার্য্যের উপর মন্তব্য প্রকাশ করিবার আমরা কে? পিতৃ পুরুষদিগের আজন্মোপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্য যদি আমরা লইতে পারি, তাহা হইলে তাঁহাদের এই গুণটিও কি আশ্রয় করা উচিত নহে?

জীবন কানু।

লেখক,—শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়।

নবীন নিরদ শ্যামের বরন তাহাতে চন্দন মাখী
শিখি পুচ্ছচূড়া পীতধটি পরা রাধিকার প্রাণ পাখী।

মধুর অধরে মোহন বাঁশরী রাধিকা নামেতে সাধা
বন ফুলে ঘেরা চাঁচর চিকুর তাহে শিখি পাখা বাঁধা।
রাধিকা জীবন গোপিনী মোহন দুর্ব্বাদল শ্যাম তনু
নয়ন রঞ্জন ভুবন মোহন যশোদা জীবন কানু।

উৎপল জিনিয়া সুন্দর লোচন তদুপরে যুগ ভুরু
আজানু লম্বিত বাহু সুবলিত সুকদলি জিনী উরু।
মৃগেন্দ্র জিনীয়া ক্ষিণ কটিতট নবীন কিশোর কালী
চাঁদিনী জিনীয়া নখেরি বরণ গলে শোভে বন মালী।
দেহের লাবণ্য কিবা অপরূপ নবোদিত যেন ভানু
নয়ন রঞ্জন ভুবন মোহন যশোদা জীবন কানু।

রক্তিম কপোলে ফুল রেণু মাখী হৃদয়ে কৌস্তুভ মণি
হাতেতে বলয় চরণে নুপুর রূপ দুর্ব্বাদল যিনি।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সুন্দর ললাট গণ্ড কুণ্ডলীক্রান্ত
শুক চন্দ্র যিনি নাসিকা সুন্দর বদন কিবা প্রশান্ত।
প্রতি গচ্ছ তার কিবা অপরূপ অধরে শোভিত বেণু
নয়ন রঞ্জন ভুবন মোহন যশোদা জীবন কানু।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

জগন্নাথ দাস।

লেখিকা,—শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী।

(গল্প)

এক বৃদ্ধা আর তার একটী পুত্র ছিল। সেই ভিন্ন তাহার আপনার বলিবার আর কেহ সংসারে ছিল না। বৃদ্ধার সম্বলের মধ্যে ছিল একটা দু-কুঠুরী কুঁড়ে ও একটী ছোট তাঁত। সে নিজে হাতে সূতা কাটিয়া কাপড় বুনিত; আর একখানি করিয়া কাপড় তৈয়ারী হইলে বাজারে গিয়া তাহা বিক্রয় করিয়া আসিত। তাহার কাপড়ের দর বাঁধা ছিল—পাঁচসিকা। সে কিছুতেই সেই পাঁচ সিকার অধিক দাম লইত না। কারণ পাঁচসিকাতেই তাহার একখানা

কাপড়ের জন্য সূতা কিনিয়া যাহা থাকিত তাহাতেই তাহাদের মাতা পুত্রের এক সপ্তাহের আহার সুসম্পন্ন হইয়া যাইত।

সে দিন বৃদ্ধার শরীরটা একটু খারাপ ছিল! সেই জন্য কাপড় বিক্রয় করিতে নিজে বাজারে যাইতে পারিল না। কাপড়টী পুত্রের হস্তে দিয়া বলিল, "বাবা আজ তুমি বাজারে গিয়া এই কাপড় বিক্রয় করিয়া আইস। আর একটু শীঘ্র আসিও; চাল বাড়ন্ত; না কিনিয়া আনিলে ত আর কিছু পেটে পড়িবে না!"

বৃদ্ধার পুত্র বাজারে গিয়া বসিয়া রহিল, কিন্তু কেহই তাহার কাপড় কিনিল না। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল; কাপড় আর কেহই লয় না। কি মুস্কিল! কাপড় বিক্রয় না হইলে আজ মাতাপুত্রের উপবাস ভিন্ন যে উপায় নাই। পুত্র ভাবিল, শুধু হাতেই বা গৃহে ফিরি কি করিয়া?

বেলা বাড়িতে লাগিল, ক্রমে দুপুর হইয়া গেল, বৃদ্ধার পুত্র আর গৃহে ফেরে না; বৃদ্ধা ত পুত্রের জন্য 'ঘর আর বার' করিতে লাগিল। "এই বুঝি আসে, এই বুঝি আসে।" কিন্তু কৈ ছেলে আর আসে না। কি হইলো বাছার আমার? এই রৌদ্রে গিয়া হাঁপাইয়া পড়িয়াছে বোধ হয়। ছেলে মানুষ কি পারে। বুড়ি শেষে ঘরে গিয়া ভাবিতে লাগিল, আর ভগবানের কাছে মনে মনে পুত্রের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল। ভগবানের বুড়ির দুঃখ দেখিয়া দয়া হইল। ভগবান ভাবিলেন, আহা বৃদ্ধা বড় দুঃখী উহার পুত্রটী এখনও কাপড় বিক্রয় করিতে পারে নাই, আমি উহাদের কিছু সাহায্য করিয়া আসি। ভগবানের ইচ্ছা ও কার্য্য একই। তৎক্ষণাৎ এক চাষার বেশ ধরিয়া মাথায় এক মোট লইয়া বৃদ্ধার কুঁড়ের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধা তখন ঘরের ভিতর ছিল! কাজেই চাষাবেশী ভগবান আসিয়া দরজা ঠেলিতে লাগিলেন। দরজার শব্দে বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল, মনে করিল, বুঝি তাহার পুত্রই আসিয়াছে, কিন্তু বাহিরে আসিয়া দেখিয়া তাহার সে আনন্দ চলিয়া গেল। বৃদ্ধা বলিল, "হাঁগা তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? আমার ছেলেকে কি পথে দেখিতে পাইয়াছ?" চাষা বলিলেন, "হাঁ মা তিনি একটু দূরে কাজ করিতে গেলেন, তাই আমাকে দিয়া এই জিনিষ পত্রগুলি ফিরিয়া পাঠাইয়া দিলেন কোথায় রাখি মা?" তখন বৃদ্ধা তাহার ঘর হইতে ধামা, চুবড়ী, চাঙ্গারী যাহা কিছু ছিল সব বাহির করিয়া দিল। চাষা তখন একটি একটি করিয়া জিনিষ দিতে লাগিলেন, আর বৃদ্ধা ধামায় রাখিতে

লাগিল। দেওয়ার আর শেষ হয় না। বুড়ি শেষ কালে বিরক্ত হইয়া উঠিল, বলিল, "আরও আছে নাকি?" চাষা বলিল, "না মা আর নেই।" সন রাখা হইলে বৃদ্ধা বলিল, "বাতাসা খেয়ে জল খাও বাবা! বড়ই কষ্ট হ'য়েছে এই দুপুরের রোদে।" চাষা বলিলেন, "না মা আর দেরী করিতে পারিব না, এখন আর কিছু খাইব না। ক্ষেতে লাঙ্গল ছাড়িয়া আসিয়াছি শীগ্‌গীর যাই।" বুড়ির অনুরোধেও চাষা যখন জল খাইলেন না, তখন বুড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি বাবা?"

"শ্রীজগন্নাথ দাস।"

"তোমার বাড়ী কোথায় বাবা?"

"বৃন্দাবনে মা! আমি চল্‌লেম, বড় দেরী হইয়া গেল।" এই বলিয়া চাষা-বেশী ভগবান চলিয়া গেলেন। বুড়ি পুনরায় দরজা বন্ধ করিয়া ঘরে আসিয়া বসিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল! বৃদ্ধার পুত্র কাপড় কোন রকমে বেচিতে না পারিয়া মনের দুঃখে বাড়ী ফিরিয়া দাওয়ায় বসিয়া রহিল। মাকে মুখ দেখাইতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল, তাই সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অনেক্ষণ হইয়া গেল, তখন আর কি করিবে আস্তে আস্তে কড়া নাড়িতে লাগিল। বৃদ্ধা দরজা খুলিয়া পুত্রকে শুষ্ক মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে দেখিয়া বলিল, "কাপড় বেচিয়া এই সব জিনিষ পত্র পাঠাইয়া কোথায় গিয়াছিলে? সারাদিন না খাইয়া মুখ একেবারে কালি হইয়া গিয়াছে।" বৃদ্ধার পুত্র আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে বলিল, "আমিত সমস্ত দিন ধরিয়া কাপড় বিক্রয় করিতে পারিলাম না! তাইত আমার ফিরিতে এত দেরী হইয়া গেল। কে সব জিনিষ এখানে পাঠাইয়াছে।" বৃদ্ধা বলিল, "কেন, একজন চাষা এ সব দিয়া বলিল, "তুমি সব কিনিয়া পাঠাইয়াছ।" পুত্র বলিল, "চলতো দেখি।" জিনিষ দেখিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল, এযে অনেক টাকার জিনিষ। তবে কি ভগবান তাহাদের দুঃখ দেখিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিল, "তার নাম কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? বাড়ী কোথায় কি কিছু বলিয়াছিলেন তিনি?"

"হাঁ নাম বল্লেন জগন্নাথ দাস, আর বাড়ী বৃন্দাবনে।"

বৃদ্ধার পুত্র আনন্দে উচ্চ স্বরে বলিয়া উঠিল, "মা তুমি ধন্য; স্বয়ং ভগবান তোমাকে আসিয়া দেখা দিয়াছে, না তুমি বুঝিতে পার নাই। আমাদের সব

দুঃখ আজ হইতে দূর হইল, আর কাপড় বেচিয়া খাইতে হইবে না।" তাহাদের আর কোন কষ্টই রহিল না। পুত্রের বিবাহ দিয়া ছেলে বৌ লইয়া বৃদ্ধা সুখে ঘর কন্না করিতে লাগিল।

অধ্যয়ন।

লেখক,—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেন এম, এ।

পঞ্চম মহাযজ্ঞাদি গৃহস্থের নিত্যকর্ম্ম। যিনি গৃহিণী তিনি absolute mistress of the household গৃহের একমাত্র কর্ত্রী। গৃহের কার্য্যে তাহার অখণ্ড অধিকার। তিনি তাহার সম্পাদন করিয়াই স্বামীকে সাহায্য করিবেন। গৃহের কোনও কার্য্যকে যেন গৃহিণী হীনকার্য্য বলিয়া মনে না করেন, এ বিষয়ে পূর্ব্বেই সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আজ কাল অনেক সম্পন্ন গৃহস্থপত্নী দাস দাসীর দ্বারা অনেক কার্য্য চালাইয়া থাকেন, কোন কোনও পোষ্যবহুল পরিবারে একমাত্র গৃহিণী সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া উঠিতে পারেন না,—একথা স্বীকার করি, কিন্তু বাস্তবিক যদি অভিমান বা অহঙ্কারের বশবর্ত্তিনী হইয়া আপন সাধ্যমত কর্ত্তব্য কর্ম্মেও কেহ অবহেলা প্রকাশ করেন, তবে তাহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

আজ কাল অনেক স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে তাহার কার্য্যক্ষেত্রে থাকিতে বাধ্য হন। প্রবাসী চাকুরীজীবী বাবুদের পরিবারে স্ত্রী বা অন্য কোনও গৃহকর্ম্ম নিপুণা পরিজন না থাকিলে নিতান্তই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। স্ত্রীর অভাবে মাতাই প্রবাসে আপন পুত্রের স্নেহ ও যত্ন করিয়া থাকেন। অনেক বৃদ্ধা মাতা স্বীয় স্বামী ও শ্বশুর কুলের ভিটা ছাড়িয়া যাইতে প্রস্তুত হন না। সুতরাং স্ত্রী অল্প বয়স্কা হইলেও এবং তাহার বিদেশে গৃহকার্য্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষমতা না থাকিলেও পতি শুশ্রূষার জন্য তাহার সহিত বিদেশ গমনে বাধ্য হন। এইক্ষণে বিদেশে আসিয়া, বয়স্থা অভিভাবিকাগণ কর্ত্তৃক দূরে থাকিয়া অনেকে আপনার গৃহ কার্য্যের দায়িত্ব ভুলিয়া যান। স্ত্রী দেশেই থাকুন বা পতির সহিত বিদেশেই থাকুন, সর্ব্বত্রই গৃহকার্য্য স্ত্রীর উপর অর্পিত হইয়া থাকে। দায়িত্বহীনতা প্রকাশ করিলে সংসার চলিবে কেন?

প্রাতরুত্থান।

বিদেশে স্থিত নারীগণ আজকাল আর প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিতে অভ্যস্ত নহেন। কেবল যে বিলম্বে শয্যাত্যাগ করেন তাহা নহে, অনেকের প্রত্যহ চা বিস্কুট না হইলে শয্যাত্যাগ বিষম দায় হইয়া উঠে। গৃহলক্ষ্মীগণের এরূপ অভ্যাস বড়ই নিন্দনীয়।

প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ একদিকে যেমন স্বাস্থ্যের অনুকূল, তেমনই বিলাসিতা দোষ সংস্পর্শের অন্তরায়। অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচারী কতকটা রাত্রি থাকিতে শয্যাত্যাগ করিবেন। ভিক্ষু সম্বন্ধেও সেই নির্দ্দেশ। বানপ্রস্থও সেই নিয়ম পালন করিবেন, গৃহী সম্বন্ধেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। দুই চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে শয্যাত্যাগ করিলে নানা কারণে শরীরের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। মনের স্ফূর্ত্তি বিহিত হয়। অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করা শাস্ত্রের বিধান এবং পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহাতে ব্রহ্মচর্য্যে সহায়তার দ্বারা শরীর ও মন বেশ প্রফুল্ল থাকে। প্রাচীন আর্য্য-ঋষিগণ এই কারণেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিবার বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন।

স্ত্রী স্বামীর পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিবেন। আমাদের দেশে নববধূগণ এ নিয়মের কখনই ব্যতিক্রম করেন না। ইহাকে শাস্ত্রের নির্দ্দেশ মনে করিয়া যে তাহারা শয্যাত্যাগ করেন তাহা নহেন, লোক নিন্দার ভয়েই তাহাদিগ কর্ত্তৃক এরূপ আচরিত হইয়া থাকে। কিন্তু যে কারণেই হউক উহা যে পারিবারিক স্বাস্থ্য বিধান করিতেছে, ইহা সুখের বিষয় লোকাচার যে পরোক্ষে শাস্ত্রের শাসন শিরোধার্য্য করিয়া যুগ যুগান্তের মহিমা প্রচার করিতেছেন, এ জন্য লোকাচারের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

প্রাতঃকৃত্যাদি ও স্বাস্থ্যসূত্র।

যথা সময়ে শয্যাত্যাগ পূর্ব্বক মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করতঃ দেহশুদ্ধি বিধেয়। প্রাতঃকালে মলমূত্রাদি ত্যাগ করিলে শরীর ভাল থাকে। ইহা একটি প্রধান স্বাস্থ্যসূত্র। প্রাচীন কালে মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করিবারও বিশেষ নিয়ম ছিল। কোন্ মুখী হইয়া মলত্যাগ করিতে হয়, কোন মুখ হইয়া মূত্র ত্যাগ করিতে হয় ইত্যাদি বিষয় অবগত না হইলেও আজকাল ততদূর ক্ষতি নাই। তবে এই টুকু জানিয়া রাখাই যথেষ্ট যে কোনও জলাশয়ে বা তাহার তীরে বা কোনও পবিত্র স্থানে বা গৃহকোণাদিতে মলমূত্র ত্যাগ করিতে নাই। এ সমস্ত অতি

বাল্যকাল হইতেই শিক্ষা করা উচিত। এই সমস্ত বিধানের সহিত স্বাস্থ্যসূত্রের যে সম্বন্ধ তাহা সহজেই বুঝা যায়। যাহাদের মিউনিসিপালিটির পায়খানায় মলাদি ত্যাগ করিবার সুবিধা আছে, তাহাদের উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করিয়া পায়খানা প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য।

মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া দেহশুদ্ধি হইয়া গেলে গোময় দ্বারা গৃহশুদ্ধি করা কর্ত্তব্য। যাহারা দালানে থাকেন, তাঁহাদের গোময়ের ততদূর দরকার হয় না।

আজ কাল অনেকেই গোময়কে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। 'ফিনাইল' ইত্যাদি থাকিতে গোময়ের ব্যবহার যেন অসভ্যতার চিহ্ন বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। কিন্তু তাহাদের অবগতির জন্য মাত্র বলা যাইতে পারে যে, বিদেশীয় ডাক্তার-গণও টাটকা গোময়ের শুদ্ধি বিধায়ক গুণের যথেষ্ট প্রশাসা করিয়াছেন।

শিক্ষিত গৃহিণীগণ কেবল বাসগৃহ মার্জ্জিত করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন না। বাটীর প্রাঙ্গণও রীতিমত ঝাঁট গোময়ের 'ছড়া' দিবেন। ঝাঁট ও ছড়ায় উঠান পরিষ্কার থাকে, গৃহের ও স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকে। উঠান পরিষ্কার রাখা একটু কষ্টসাধ্য হইলেও কর্ত্তব্য পরায়ণা গৃহিণীগণ কখনও তাহাতে উপেক্ষা করিবেন না।

এস্থলে একটি কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। পূর্ব্বে যে সমস্ত কার্য্যের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হয় ত আজ কাল অনেক শ্রমবিমুখা নারী একটা অসম্ভবের গণ্ডীর মধ্যে বলিয়া বিবেচনা করিবেন। কিন্তু বাস্তবিক যাঁহারা রীতিমত এ সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের এ সমস্ত কার্য্য অসম্ভব বলিয়া কখনও মনে হয় না। পরন্তু তাহাদের রোজ এ সমস্ত কার্য্য না করিলে মনে সুখ হয় না। আমাদের দেশে একদল লোক আছেন—কি পুরুষ, কি স্ত্রী সূর্য্যোদয় না হইলে শয্যাত্যাগ করিতে পারেন না, ইহা যে তাহাদের শারীরিক অক্ষমতা বশতঃ তাহা নহে, তাহারা শেষ রাত্রিতে শয্যা-ত্যাগ করিতে একটু—একটু না, বিষম ভয় পান। তাহাদিগের যে ইহা মানসিক দুর্ব্বলতা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা তাহাদের শিক্ষার দোষ বলিতে হইবে। কিন্তু যাহাই হউক, এ দোষ তাহাদের পরিত্যাগ করিতেই হইবে। ব্যক্তি বিশেষের জন্যও সমস্ত পরিবার বা সমগ্র সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে না। এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত করিবার অধিকার কাহারও নাই।

উপরে যে সমস্ত কার্য্যের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা নিষ্পন্ন হইলে

চুল্লী পরিষ্কার করিয়া পাক আরম্ভ করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। চুল্লী পরিস্কৃত না করিলে নানা রূপ স্বাস্থ্য ভঙ্গের আশঙ্কা। আমাদের দেশে প্রত্যহ গোময়ের দ্বারা চুল্লী লেপনের প্রথা আছে। গোময়ের শুদ্ধি বিধায়কতার উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে।

যথা সময়ে চুল্লীতে অগ্নিপ্রদান করতঃ পাকারম্ভ করাই বিধি। পাক শেষ হইলে তাহা যথা সময়ে পতিকে জানান কর্ত্তব্য। পতি স্বীয় কুল ও ধর্ম্মানুসারে দেবতাদিকে সেই সোপকরণ অন্ন নিবেদিত করিয়া দিলে স্ত্রী শিশু, রোগী, আর্ত্ত প্রভৃতি পোষ্যগণকে যথারীতি ভোজন করাইবেন। আজ কাল আফিসের বেলা হইলে, এ সমস্ত নিয়ম চলে না। শাস্ত্রের কথা মনে রাখিয়া কায কয়া যায় না। যিনি গৃহস্থ ও যিনি গৃহিণী তাহার সর্ব্বাগ্রে আহার সমাপন করিলে গৃহস্থধর্ম্মের সম্যক পরিপালন হয় না। কিন্তু আজ কাল দেশের যে অবস্থা তাহাতে এই নীতির উল্লঙ্ঘন করাই যেন ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে। দশটায় আফিসে বা অন্য কার্য্যস্থলে যাইতে হইবে, সুতরাং শাস্ত্র মানিয়া চলা ঘটে কৈ? আফিসের কর্ত্তা শাস্ত্রের দোহাই শুনিবেন কেন এবং শুনিতে বাধাই বা কিসে? সুতরাং এস্থলে বাধ্য হইয়া যখন একটা কায করিতে হইতেছে, ইহাতে দোষ ধরিলে চলে না। তবে যে একটা শাস্ত্রের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতেছি, তাহা যেন মনে থাকে।

গৃহস্বামীর প্রথমতঃ বালক বালিকাগণকে এবং নববধূ (পুত্রের হউক বা অন্য কাহার হউক) থাকিলে নববধূকে ভোজন করান যুক্তি সঙ্গত। বালক বালিকাদের ক্ষুধার প্রকোপও বেশী। নববধূও আমাদের সমাজে বালিকার মধ্যে গণ্য। স্বামিগৃহে আসিয়া তাহারা মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলেন না, ক্ষুধা লাগিলেও তাহা প্রকাশ করিতে পারিবেন না, কোনও অভাব থাকিলে সে অভাব জ্ঞাপন করাও আমাদের সমাজে নির্লজ্জতার পরিচয়। তাহাদের স্থান বিবেচনা করিয়া পরিবারস্থ বৃদ্ধাগণ তাহাদের প্রতি যথোচিত যত্ন করিয়া থাকেন।

আতুরগণও অগ্রে যাহাতে আহার সমাধা করিতে পারেন তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। তাহাদের রীতিমত ও সযত্নে আহার্য্য সংগ্রহ না করিলে সবিশেষ বিপদের সম্ভাবনা। আহার্য্যাভাবে সহজেই তাহাদের দেহ ক্ষীণ হইয়া যায়।

অতিথি ও গর্ভিণী ইহারা গৃহস্থের সর্ব্বাপেক্ষা দৃষ্টির পাত্র। শাস্ত্রে উক্ত

হইয়াছে,—"সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ।" যে কেহই অতিথি যে, কোন বর্ণ যে, কাহরাও অতিথি হউন না কেন, তিনি সর্ব্বথা যত্নের পাত্র। আর্ত্ত অতিথিকে সর্ব্বদা অন্নদান করিতে হইবে। অতিথি যেন কখনও বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া না যান। শাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে,—

"অতিথির্যস্যভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥"

যে অতিথি নিরাশ হইয়া গৃহস্থের নিকট হইতে ফিরিয়া যান, তিনি গৃহস্থের সমস্ত পুণ্যভাগী, নিজের যতটুকু পাপ তাহা সমস্ত গৃহস্থের স্কন্ধে যাইয়া চাপে।

আমাদের দেশে অতিথি সেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সমূহ বর্ত্তমান আছে। অনেক সময় অনেকে অনেক অতিথি পরায়ণ ব্যক্তির গৃহে তাঁহাকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়েও গমন করিয়াছেন, এরূপও অনেক ঘটনার কথা শুনা যায়।

যাহা হউক সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে তাঁহার যতদূর সাধ্য অতিথি সেবার কোনও রূপ ত্রুটি না হইলেই মঙ্গল। অতিথির অবস্থারও পদমর্য্যাদার বিষয় সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন। উপযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁহারই পদোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়। আবার কিঞ্চিৎ হীন পদস্থ অতিথিকে একটু কম সম্মান প্রদর্শন করিলেও ততদূর দোষ হয় না।

"উত্তমেষুত্তমং কুর্য্যাৎ হীনে হীনং সমে সমম্॥"

উপরে গৃহিণীর যে সমস্ত কার্য্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা কতকটা গহিণীর নিজের কর্ত্তব্য ও কতকটা স্বামীর সহিত একচিত্ত হইয়া করিবেন। ব্যাস সংহিতায় নারীধর্ম্মের দৈনিক ব্যাপার সমূহ লিখিত হইয়াছে। তাহা সুবিস্তৃত। এখানে তাহার উল্লেখ প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।

অথ যোষিতো নিত্যধর্ম্ম :—

পত্যুঃ পূর্ব্বং সমুত্থায় দেহশুদ্ধিং বিধায় চ।
উত্থাপ্য শয়নাদীনি কৃত্বা বেশ্ম বিশোধনম্॥
মার্জ্জনৈ র্লেপনৈঃ প্রাপ্য সাগ্নিশানং স্বমঙ্গলম্।
শোধয়েদগ্নি কার্য্যাণি স্নিগ্ধান্যুষ্ণেন বারিণা॥
প্রোক্তৈরিতিতান্যেব যথাস্থানং প্রকাশয়েৎ।
দ্বন্দ্বপাত্রাণি সর্ব্বাণি ন কদাচিৎ বিয়োজয়েৎ॥

শোধায়ত্বা তু পাত্রাণি পুরয়িত্বা তু ধারয়েৎ।
মহানমস্য পাত্রাণি বহিঃ প্রক্ষাল্য সর্ব্বথা ॥
মৃদ্ভিশ্চ শোধয়েচ্ছ্রীং তত্রাগ্নিং বিন্যসেত্ততঃ।
স্থিত্বা নিয়োগেপাত্রাণি রসাংশ্চ দ্রাবণানি চ ॥
কৃত পূর্ব্বাহ্নকার্য্যা চ স্বগুরূন ভিবাদয়েৎ।
তাভ্যাং ভর্ত্তৃপিতৃভ্যাং বা ভ্রাতৃমাতুল বান্ধবৈঃ ॥
বস্ত্রালঙ্কাররত্নাদি প্রদত্তানেব ধারয়েৎ।
মনোবাক্‌কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতিরেশানুবর্ত্তিনী ॥
ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব স্থিতকর্ম্মসু।
দাসীবাদিষ্ট কার্য্যেষু ভর্ত্তুর্ভার্য্যাসদাভবেৎ ॥
ততোঽন্ন সাধনং কৃত্বা পতয়ে বিনিবেদ্য তৎ।
বৈশ্বদেব কৃতৈরন্নৈ র্ভোজনীয়াংশ্চ ভোজয়েৎ ॥ ইত্যাদি।

অদৃষ্ট পুরুষাকার।

লেখক,—শ্রীযুক্ত শিবেশনারায়ণ ঠাকুর।

আমরা হিন্দু, কেবল অদৃষ্ট বাদী। তার দোষে কর্ম্ম জগতে ভাল কর্ম্মী হইতে পারি না। আমরা যদি ঋষিদের বাক্য মানিয়া চলিতাম, তাহা হইলে জীবনকে অনেক উন্নত করিতে পারিতাম দেশের ও দশের উন্নতি সাধনে সহায়ক হইয়া জীবনকে ধন্য করিতে পারিতাম। গীতা বলিয়াছেন, "কর্ম্ম করিয়া যাও—ফলের জন্য উৎকণ্ঠিত হইও না" কিন্তু আমরা কয়জন এই নীতি মানিয়া চলি। এই নীতি মানিয়া চলি না বলিয়াই না আমরা অধঃপতিত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত এবং শ্রমবিমুখ হইয়াছি। তাই আজ—আমাদের কর্ম্মে উৎসাহ নাই, দেহে জীবনের সাড়া নাই। ইউরোপীয়েরা অদৃষ্ট বলিয়া কোন জিনিষ আদৌ বিশ্বাস করে না—তাহারা নিজেদের হাতেই নিজ নিজ অদৃষ্ট গড়িয়া লয়, তাই তাহারা আমাদের চেয়ে কর্ম্মী ও জীবনশক্তিতে বলীয়ান্।

না-দৃষ্ট অদৃষ্ট। যাহা দেখা যায় না; তাহাই অদৃষ্ট। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম-ফলকেই এ জন্মে আমরা অদৃষ্টরূপ এবং এ জন্মের কর্ম্মফলকে পুরুষকার রূপে গণ্য করিয়া থাকি। কর্ম্ম করিলেই তাহার একটা ফলপ্রাপ্তির আশা আছে। তাহার কোন কোন সময়ে সদ্য সদ্যই প্রাপ্তি ঘটে, কোন কোন সময়ে বিলম্বেও ঘটে—বিলম্বে যেটা পাওয়া যায় সেইটাই অদৃষ্ট। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

"উদ্যোগীনাং পুরুষ সিংহমুপৈতি লক্ষ্মী
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষাঃ বদন্তি।"

যাহারা উদ্যোগী পুরুষ, তাহারা পুরুষকার অবলম্বনে লক্ষ্মীলাভ করিয়া থাকে—আর যাহারা কাপুরুষ, তাহারা দৈবকেই নির্ভর করিয়া ম্রিয়মান অবস্থায় কাল যাপন করে।

দৈব বলিয়া যে একটা জিনিষ আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কিন্তু পুরুষকার বলে বলিয়ান ব্যক্তিরা দৈবকেও অপহৃত করিয়া নিজ ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারে। দৈবকে আশ্রয় করিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়া পুরুষকারের আশ্রয়েই তাহা করা উচিত এবং সমীচীন।

আমাদের দেশে একশ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা দৈবাধীনে থাকিতে ভালবাসেন, 'ভাগ্য ছাড়া পথ নাই' বলিয়া নিশ্চিষ্ট ভাবে জীবনাতিবাহিত করিয়া থাকেন। হিন্দুরা অদৃষ্ট বাদী বলিয়াই তাঁহারা অল্পে তুষ্ট—নিজ নিজ ভাগ্যে সন্তুষ্ট। আর ইউরোপীয়েরা পুরুষকারের পক্ষপাতী বলিয়াই কেহ কেহ নিজেকে স্বল্পে সন্তুষ্ট রাখিতে সক্ষম নহে। তাই তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহও প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।

সংসারে অদৃষ্ট এবং পুরুষকারের সংমিশ্রণেই মানব জীবনের উন্নতি বা অবনতি! আমার বিশ্বাস, কেহ শুধু একটীর বলে বলীয়ান হইয়া সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না।

কালিদাস দৈববলেই বলীয়ান্—তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল ভাল ছিল, তাই তিনি ভাগ্যবান; কিন্তু যদি তিনি পুরুষকারের সাহায্য না পাইতেন, তবে কি তিনি অত শীঘ্র মূর্খ কালীদাস হইতে পণ্ডিত কালীদাস হইতে পারিতেন? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষিগণ পুরুষকার বলেই জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

জগত কর্ম্মময়। কর্ম্ম করিতে আসিয়াছ, কর্ম্ম করিয়া যাও—কর্ম্মে

উৎসাহ দিতে পুরুষকারই সক্ষম, অদৃষ্ট নহে। তোমার পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম ফল এই জন্মের পুরুষকারের সংযোগে মার্জ্জিত হইয়া তোমাকে জগদ্বরণ্য করিবে। তুমি দেশের ও দশের উপকার সাধন করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

সতী পরীক্ষা।

(১)

মফঃস্বলের এক গণ্ডগ্রামে একজন দীক্ষা গুরুর বাস; সেই গুরুর সংসারে গুরু নিজে, বয়স্কা গৃহিণী আর ষোড়শবর্ষীয় একটি পুত্র। গ্রামে একজন রাজা আছেন, তিনিও ব্রাহ্মণ; সেই রাজাও ঐ গুরুদেবের মন্ত্র শিষ্য।

গুরু পুত্রটি ব্যাকরণ পড়েন; পিতার নিকটেই শিক্ষা হয়। পিতার সঙ্কল্প—ব্যাকরণ পড়া সমাপ্ত না হইলে পুত্রের বিবাহ দিবেন না,—বিবাহের নামও কানে শুনিবেন না।

গুরুদেবের ঐরূপ সঙ্কল্প হইতে পারে, কিন্তু যাহাদিগের অবিবাহিত কন্যা আছে, তাঁহারা তেমন অদ্ভুত সঙ্কল্পকে মনে স্থান দিতেও ভয় পান। একটি অবিবাহিতা কন্যার পিতা একটি পাত্র অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার নাম ভবতারণ ভট্টাচার্য্য; দশ কর্ম্মান্বিত পণ্ডিত,—ধন সম্পত্তিও অতি কম, এখনকার কালে যেরূপ লোকের কন্যাদায় সহজে উদ্ধার হইবার উপায় নাই, কায়স্থ ব্রাহ্মণ পাঠক মহাশয়গণকে সে পরিচয় দিতে হইবে না। ভবতারণের মনে মনে ইচ্ছা,—পূর্ব্বোক্ত গুরুপুত্রটিকে কন্যা দান করা; অতএব ভবতারণ একদিন গুরুদেবের বাড়ীতে আসিয়া ঐ প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। দুই কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া গুরুদেব বলিলেন, রাম—রাম—রাম! ও কথা আমার কাছে তুলিও না। আমার ছেলে এখন ব্যাকরণ পড়িতেছে, পাঠ সমাপ্ত না হইলে তাহার বিবাহের নাম আমি শুনিব না।" হাতে পৈতা জড়াইয়া, বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া ভবতারণ সজল লোচনে বিস্তর অনুরোধ করিলেন, প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল গুরুদেব মৌন হইয়া বসিয়া রহিলেন, কর্ণ হইতে অঙ্গুলী সরাইলেন না; ভবতারণের অনুরোধ বৃথা হইল।

ভবতারণ অগত্যা বিদায় হইলেন; পথে ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন,—"কি করা যায়! ওরকম খাম খেয়ালি গুরুর মন ফিরানো সহজ ব্যাপার নয়! ছেলেটি কিন্তু বেশ সুন্দর, বিদ্যাও বেশ হইতেছে, ঐটিকে জামাই করাই আমার পণ। আচ্ছা দেখা যাউক, কিসে কি হয়।" ভাবিতে ভাবিতে ভট্টাচার্য্যের মনে হইল, ঐ গুরুটি এই গ্রামের রাজারও গুরু, রাজাকে ধরিয়া তাঁহার দ্বারা অনুরোধ করাইয়া, কার্য্য সিদ্ধ করিবার সুবিধা হইতে পারে।

ভবতারণ ভট্টাচার্য্য রাজবাড়ীতে গমন করিলেন, ব্রাহ্মণ রাজাকে নমস্কার করিয়া, দুই পাঁচটা কথার পর, ছল্ ছল্ চক্ষে চাহিয়া, বিনীত বচনে বলিলেন, "মহারাজ! আমার একটি নিবেদন আছে। আমার একটি অনূঢ়া কন্যা বিবাহ যোগ্যা হইয়াছে, বয়স দশবৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, শীঘ্র বিবাহ না দিলে জাতি যাইবার ভয়। আমি কন্যাদায় গ্রস্থ; এখনকার বাজারে মাতৃ পিতৃদায় অপেক্ষাও কন্যাদায়টা বড়, একথা বোধ হয়, মহারাজের কর্ণগোচর হইয়া থাকিবে; আমি গরীব, আমার মত অবস্থার লোকে এ অবস্থায় অর্থলোলুপ বরকর্ত্তাদের মুখের কাছে দাঁড়াইলেই—দু-একটা লম্বা লম্বা কথা শুনিলেই, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া মুর্চ্ছা যায়, মহারাজ হয় ত ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছেন। আমার ইচ্ছা আপনার গুরুদেবের পুত্রকে কন্যাদান করা; আজ আমি গুরুদেবের কাছে গিয়াছিলাম, কথাটা তুলিয়াছিলাম, কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া বধির সাজিয়া তিনি বলিলেন, "পুত্র ব্যাকরণ পড়িতেছে, ব্যাকরণ পড়া শেষ না হইলে বিবাহের নাম করিবেন না, অপরের মুখেও শুনিবেন না। এক্ষেত্রে মহারাজ অনুগ্রহ করিয়া মধ্যস্থ না হইলে আর অন্য উপায় দেখি না; মহারাজ অনুগ্রহ করুন। নতুবা ব্রাহ্মণের জাতি যায়।

এইস্থানে ভবতারণ ভট্টাচার্য্য সত্য সত্য কাঁদিয়া ফেলিলেন। রাজার দয়া হইল। গুরুদেবকে তিনি ডাকিয়া পাঠাইলেন, ভট্টাচার্য্যকে আশ্বাস দিয়া বসাইলেন। গুরুদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক আসন দিয়া সর্ব্বপ্রথমেই ভবতারণের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক গুরুপুত্রের বিবাহের কথা তুলিলেন। ব্যাকরণ পড়া শেষ না হইলে পুত্রের বিবাহ দিবেন না, গুরুদেবের এই ধনুর্ভঙ্গ পণ।

রাজা বলিলেন, "ব্রাহ্মণের কন্যাটির দশবৎসর বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, ব্যাকরণ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা অসম্ভব; আপনি সম্মত হউন। উত্তম উপায় আছে। যে আশঙ্কা আপনি করিতেছেন, অতি সহজেই

সে আশঙ্কা দূর করিতে আমি পারিব। আপনার পুত্রের বয়স শোড়রবর্ষ,—ধরুন—এই ব্রাহ্মণের কন্যাটি দশম বর্ষিয়া,—এ বয়সে বিবাহ হইলে উভয়ে অন্ততঃ চারিবৎসর পৃথক থাকিতে পারিবে, তাহাতে কোন ব্যতিক্রম ঘটিতে পারিবে না। বলিলাম চারিবৎসর, আমি বরং আরও বেশীদিন নির্দ্ধারণ করিতে পারি। যদবধি গর্ভাধানের অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহের সময় উপস্থিত না হয়, প্রথম বিবাহের পর তদবধি আপনি নব বিবাহিতা পুত্রবধূকে স্বগৃহে আনয়ন করিবেন না, এই ব্রাহ্মণও ততদিন কিছু বলিবেন না,—আপনিও ততদিন আপন পুত্রকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবেন না, তাহা হইলেই ব্যাকরণ পড়ার কোন ব্যাঘাত হইবে না। শোড়ষবর্ষিয় পুত্রের উপর এক বৌ আসিয়া আধিপত্য করিবে, সেই যে ভয় আপনি করিতেছেন; তাহাও অক্লেশে ঘুচিয়া যাইবে। আপনি রাজী হউন। বিবাহের অগ্রে যত টাকা আপনার খরচ, সমস্তই আমি দিব, আপাততঃ আজ আপনি হাজার টাকা গ্রহণ করুন, ইহার পর যখন যত টাকা আবশ্যক হইবে, তখনি তাহা আমাকে জানাইবেন। কেমন —আর কোন আপত্তি অছে কি ?"

টাকার লোভে গরীব গুরুর মন ফিরিল; একবার অধোমুখী; মাথা চুলকাইয়া গুরুদেব মৃদুস্বরে বলিলেন,—"বাপুহে! তুমি আমার সর্ব্বপ্রধান শিষ্য,—পরম ধার্ম্মিক,—কর্ণের মত দাতা,—তোমার অনুরোধ আমি এড়াইতে পারিব না।" রাজাকে এই কথা বলিয়া, ভবতারণের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "আচ্ছা বেহাই মশয়, বিবাহের পর চারিবৎসর আপনার কন্যাকে আমি আনিব না, চারিবৎসর আপনার জামাইকেও আপনি লইয়া যাইবেন না, এই অঙ্গিকারে আপনার কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দিতে আমি সম্মত হইলাম; রাজা বাহাদুরের যেরূপ অনুমতি আমারও অভিপ্রায় সেইরূপ আপনি এখন পঞ্জিকা দেখিয়া দিন স্থির করুন, যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল।

রাজার বিচারে তুষ্ট হইয়া ভবতারণ ভট্টাচার্য্য প্রফুল্ল মুখে গৃহে গেলেন, গুরুদেবও অনেক টাকা পাইবার আশায় তুষ্ট হইয়া, স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। মাঘ মাস,—সেই মাসের শেষেই পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

(২)

চারি বৎসর অতীত। ভবতারণ ভট্টাচার্য্যের কন্যার নাম আদর মণি। অঙ্গের পূর্ণতা দর্শনে বিবাহ সভায় বিজ্ঞলোকেরা অনুমান করিয়াছিলেন, কন্যাটি দ্বাদশী তাঁহাদের অনুমান ঠিক; আসর মণি এক্ষণে শোড়ষী।

৩০শে চৈত্র (চড়কপূজার দিন) গর্ভাধানের দিন স্থির। ভবতারণের বাড়ী হইতে তাঁহার জামাই বাড়ী প্রায় চারিক্রোশ দূর; অতএব চড়কপূজার পূর্ব্বদিনের পূর্ব্বদিন ভট্টাচার্য্য মহাশয় জামাই আনিতে গেলেন, ২৯শে চৈত্র সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে জামাইকে লইয়া ঘরে ফিরিলেন। জামাইটি দেখিতে বেশ সুশ্রী, কিন্তু আধুনিক জামাইবাবুদের মত নয়। পরিধানে একখানি সাদাথান ধুতি, স্কন্ধে একখানি সেই রকম থানের দোবজা, গলদেশে যোগ্য পবিত্রের সহিত তুলসীমালা, মস্তকে টিকি, নাকে তিলক পায়ে চটি জুতা। চারিক্রোশ পথ হাটিয়া আসিয়া গুরুপুত্র ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে না বসাইয়া শ্বশুর তাঁহাকে সরাসর বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন। বাড়ীর ভিতর একখানি কোঠাঘর, একতলায় একটি কামরা মাত্র, জামাই গিয়া সেই কামরার রকে গিয়া বসিলেন, আদরমণি নিজে গাড়ু করিয়া জল লইয়া পা ধুইয়া দিলেন, আঁচলঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া নিজের আচল দিয়া পা দুখানি মুছাইয়া দিলেন, তাহার পর হাত ধরিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গেলেন। সেইখানে জল খাইবার আয়োজন; স্বয়ং সন্ধ্যা সমাপন করিয়া, গুরুপুত্র খানকতক বাতাসা খাইয়া একঘটি জল খাইলেন। যতক্ষণ জল খাওয়া, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কাছে বসিয়া আদরমণি ঘন ঘন বাতাস করিলেন। যদিও চৈত্র মাসের শেষ, কিন্তু সে দিন মেঘ বৃষ্টি ছিল, সমস্ত দিন সূর্যদেব দেখা দেন নাই, সকলেরই অল্প অল্প শীতানুভব হইতেছিল; গুরু পুত্রেরও শীত করিতে ছিল, অচেনা স্ত্রীকে বাতাস করিতে নিষেধ করিলেন, আদরমণি সে নিষেধ শুনিলেন না, আরও জোরে জোরে ঘন ঘন পাখা চালাইতে লাগিলেন। জামাই গিয়া বিছানার উপরে বসিলেন।

ভট্টাচার্য্যের সংসারে তিনটি মাত্র প্রাণি;—ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী আর ঐ কন্যাটি। গরীব মানুষ,—বাড়ীতে দাসী চাকর নাই, ব্রাহ্মণ নিজেই গরু বাঁধেন গরুর জাব দেন, হাটবাজার করেন, এক কথায় বাহিরের সমস্ত কার্য্য তাঁহাকেই নির্ব্বাহ করিতে হয়,—রন্ধনাদি সমস্ত গৃহে কার্য্য ব্রাহ্মণী নিজ হস্তে নির্ব্বাহ করেন। নূতন জামাই আসিয়াছেন, আগামী কল্য দ্বিতীয় বিবাহ, অনেকটা পথ চলিয়া আসিয়াছেন, একটু সকাল সকাল শয়ন করাইয়া দিতে হয়, রাত্রি চারিদণ্ড হইতে না হইতেই অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত; আদরমণি নিজেই থালাখানি ধরিয়া আনিলেন, গুরুপুত্র আহারে বসিলেন, ব্রাহ্মণী আসিয়া দুগ্ধের বাটী আর বাতাসার বেকাব রাখিয়া গেলেন। আদরমণি সন্ধ্যাকালের মত

পাখা হাতে করিয়া অচেনা স্বামীকে বাতাস করিতে আরম্ভ করিলেন, যেন কতকালের চেনা, সেই রকম ভাব জানাইয়া "এটা খাও, ওটা খাও, মাছের মুড়াটা আগে খাও, দুধের বাটীতে ধোঁয়া উড়িতেছে, বাতাস দিয়া আমি ঠাণ্ডা করিয়া দি, তুমি ততক্ষণ"—

আর তাহাকে কিছু বলিতে হইল না, আর বেশী সোহাগ জানাইতে হইল না, তৎক্ষণাৎ গণ্ডূষ করিয়া নূতন জামাই উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ঘোমটার ভিতর হইতে ফুস্ ফুস্ করিয়া শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাওয়া হইল না কেন?" দুই তিনটি প্রশ্নোত্তরের পর প্রকাশপাইল, গুরুপুত্র মাছ খান্ না।

খাওয়া হইল না, আচমন করিয়া গুরুপুত্র শয়ন করিলেন, আদরমণি পান সাজিয়া তামাক সাজিয়া আনিয়া হাজির করিলেন, বৃথা,—গুরুপুত্র পানও খাননা তামাকও খাননা; কাপড়ের পুটুলীতে একটা শামুক বাঁধা ছিল, সেইটি বাহির করিয়া, তাহার ভিতর হইতে এক টিপ্ নস্য লইয়া নাকে দিয়া বার কতক হাঁচিলেন; পুনর্ব্বার শয়ন। "আহা! খাওয়া হইল না! সারা রাত উপোস!" হায় হায়, করিতে করিতে বার বার ঐ কথা বলিতে বলিতে আদরমণি আবার বাতাস জুড়িয়া দিলেন। "শীত করে—শীত করে।" বলিয়া গুরুপুত্র বারম্বার বাতাস করিতে নিষেধ করিলেন, আদর মণি সে কথায় কাণ দিলেন না, আরত বরং জোড়ে বাতাস ছুটিল!

গুরুপুত্র একবার বলিলেন, "যাও আহার কর—বাতাস দরকার নাই।" আদরমণি বলিলেন, "আহা কত পথ চলে এসেছ; কত কষ্টই হয়েছে, তাতে আবার খাওয়া হলোনা, আগে তুমি একটু ঘুমোও, তারপর যা হয়"—এই রকম একটা একটা কথা আর ঘন ঘন পাখার বাতাস।

(৩)

গুরুপুত্র ব্যাকরণ পড়েন। ব্যাকরণ পড়িলে বুদ্ধি জমাট হয়, সরু বুদ্ধি খেলে না, একথাটা মিথ্যা; গুরুপুত্র শীঘ্রই বুঝিয়া লইলেন, তাঁহাকে শীঘ্র ঘুম পাড়ান ঐ ভক্তিলতী অচেনা স্ত্রীটির বড়ই দরকার! সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে ইহাই বুঝিয়া তিনি পাশ ফিরিয়া শুইলেন, জোর করিয়া দুই চক্ষু বুজিলেন, ঘড় ঘড় করিয়া নাক ডাকাইতে লাগিলেন।

আরও আধঘণ্টা। আরও কিছুক্ষণ বাতাস করিয়া, অচেনা পতির

নাকে মুখে বুকে হাত দিয়া নিশ্বাস পরীক্ষা করিয়া, আদরমণি নিঃশব্দে তক্তা-পোষ হইতে নামিলেন, দেয়ালের দাড়িতে কালো বনাতের মত কি একখানা কাপড় ছিল, ধীরে ধীরে সেইখানা টানিয়া লইয়া সর্ব্বাঙ্গে জড়াইলেন, কেবল পক্ষ দুটী খোলা রহিল; ঐ প্রকারে বহুরূপী সাজিয়া আদরমণি আর একবার কপট নিদ্রিত পতির মুখ চক্ষু নাসিকার পরীক্ষা করিলেন, গাঢ়নিদ্রা স্থির করিয়া আস্তে আস্তে কপাট খুলিয়া, বাহিরে আসিয়া আবার কবাট ভেজাইয়া দিয়া, বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। ঘরের ভিতর প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল।

ব্যাকরণ পড়া বুদ্ধি আপনা হইতেই জাগিয়া উঠিল; বুদ্ধির জাগরণে গুরুপুত্রের জাগরণ। গুরুপুত্র ঘুমান নাই; তাঁহাকে ঘুম পাড়াইবার জন্য ধূর্ত্ত ভট্টাচার্য্য কুমারী কেন ততটা ব্যস্ত হইয়াছিল, মনে মনে তাহাও কতকটা তিনি অনুভব করিয়া লইলেন; বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া শয্যা হইতে নামিলেন, নিঃশব্দে ভেজানো কপাট একটু ফাঁক করিলেন, কোন দিকে কোন শব্দ আছে কিনা, কাণ পাতিয়া শুনিলেন, বামে দক্ষিণে সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না; মেঘ ঢাকা চাঁদ এক একবার অল্প অল্প আকাশ পথে উঁকি মারিতে ছিলেন, সেই তিমির আলোক প্রভায় গুরুপুত্র দেখিলেন খিড়কির দিকে দরজা খোলা; সেই দরজার পরেই একটা পুষ্করিণী। "ছুঁড়িটা ধারবাজী খেলিয়াছে, আমাকে ঘুম পাড়াইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে"—মনে মনে ইহাই বিবেচনা করিয়া ব্যাকরণের পণ্ডিত ছাত্র দ্রুতপদে খিড়কির দরজা দিয়া বাহির হইলেন; পুষ্করিণীর পশ্চিম পাড়ের দিকে একবার দূর দৃষ্টি চালাইলেন, সেই স্তিমিত আলোকে দেখিলেন, একটা লোক চলিয়া যাইতেছে, সর্ব্বাঙ্গ কালোকাপড়ে ঢাকা, কেবল পায়ের গোড়ালির উপরি ভাগের কাপড়টুকু সাদা। তাহা দেখিয়াই—দন্তে দন্ত পেষণ পূর্ব্বক গুরুপুত্র আপন মনে উচ্চারণ করিলেন, "ঠিক! ঐ বটে! ধরিবই ধরিব!"

পদাঙ্গুলীর উপর ভর রাখিয়া, পথের পাশ কাটাইয়া কাটাইয়া, যথা সম্ভব দ্রুতবেগে গুরুপুত্র ছুটিলেন। পথের বাম দিকে একখানা বাগান; চারদিকে প্রাচীর, একজোড়া থামগাঁথা ফটক। যে মূর্ত্তি আগে আগে যাইতেছিল, সেই মূর্ত্তি সেই বাগানের ভিতর প্রবেশ করিল। অনুসরণ করিয়া গুরুপুত্র দেখিলেন, বাগানের মাঝখানে গেরিমাটীর রং দেওয়া ছোট একখানা আটচালা ঘর, সেই ঘরে আলো জ্বলিতেছিল; ঘরের পূর্ব্বদিকে সারি সারি গোটা কতক বড় বড় আমগাছ; গুরুপুত্র নিঃশব্দে একটা গাছের ডালে উঠিয়া

বসিলেন। আটচালার ভিতর হইতে গভীর ব্যঙ্গ বিদ্রূপস্বরে আওয়াজ আসিতে লাগিল, "তোমাদের বাড়ীতে কে এসেছে, তাকে চেন না, জান না, আমার সঙ্গে কারসাজী! শুয়ামী এসেছে বলে আমার উপর অবহেলা—সেই রঙ্গে এত রাত বুঝি?"

(৪)

যাহার সহিত এইরূপ কথোপকথন, পাঠক মহাশয় অবশ্যই তাহাকে চিনিয়াছেন। মিনতি বচনে আদরমণি প্রতিবাসী সঙ্গিনী ইন্দুবালাকে বলিতে লাগিল, "দেখ ভাই তুমি আমায় বিদ্রূপ কোরো না—তুমি আমায় মিথ্যাবাদী বলো না—শোন আগে আমার কথা। এসেছে বটে—কে? তাত ভাই তুমি জানো, তাকে ঘুম পাড়িয়ে তোমার কাছে আসবার জন্যে দুটো প্রাণের কথা কইতে, কত সৃষ্টি আমি কোরেছি, তা যদি শোন, হেসে হেসে দম আটকাবে। এই বৃষ্টি বাদলের দিন সকল লোকেই শীতে কাঁপছে, আমি তাঁকে ক্রমাগত পাখার বাতাস দিয়ে দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে এসেছি! সে এসেছে বলে তোমার উপর আমার অবহেলা! কেন গা?' সে আমার কে? কবে তাকে আমি দেখেছি! সেই একরাত্রে একটা ফুলফেলে আমার আইবুড় নাম ঘুচিয়ে গিয়েছিল, তারপর এই চার বছর আর উদ্দেশ নেই। কে সে! তাকে আমি চিনি না! তুমিই আমার প্রাণ—তুমিই আমার প্রাণের প্রাণ—তুমিই আমার সর্ব্বস্ব—তুমিই আমার জীবন সঙ্গিনী!"

আর বেশী কথা বলিতে না দিয়া ইন্দুবালা বলিল, "তাই নাকি? তাই বটে নাকি? তাকে তুই চিনিস না! আচ্ছা সে যদি কেউ নয়, তার উপর যদি মায়া দয়া নেই, তবে যা দেখি, তার কানটা ধরে টেনে নিয়ে আয় দেখি?"

যেন কতই উল্লাসে আদরমণি চঞ্চল স্বরে ইন্দুবালাকে বলিল, "এখনি যাব—এখনি তার কাণ ধরে টেনে আন্‌বো—কেমন আমি পারি কিনা দেখ্‌বে এস? সে আমার কে? ইন্দুবালাকে টানিয়া লইয়া আদরমণি স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিল।

(৫)

গুরুপুত্র ওদিকে বৃক্ষ শাখা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ছুট! এক দৌড় শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া তিনি তখনি পূর্ব্বের সেই ঘরে সেই বিছানায় শুইয়া

পূর্ব্বের ন্যায় চক্ষু মুদিয়া নাক ডাকাইতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, এ মেয়েটা আমার সহধর্ম্মিণী নহে, নিশাচরী। রোজ রাত্রে এই রকম কাজ করে! আজ রাত্রে সঙ্গে একটা মেয়ে নিয়ে কাণ ধরে আমায় অপমান করিতে আসিতেছে! দেখি দেখি, কেমন করিয়া আমার কাণ ধরে! এই সব ভাবিতে ভাবিতে বেশ তালে তালে নাসিকা গর্জ্জন।

একটু পরে আদরমণি ও ইন্দুবালা আসিয়া আস্তে আস্তে ঘরের দ্বার খুলিয়া অগ্রে দেখিল, গুরুপুত্র ঠিক সমভাবে নিদ্রাগত; দেখিয়াই আদরমণির সাহস বাড়িল, উৎসাহ বাড়িল, মনে মনে হাসিতে হাসিতে বিছানার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। সেই কালো কাপড়খানা গায়ে দিয়া ইন্দুবালা দ্বারের পশ্চাতে গুপ্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

কাঁচা ঘুমে হঠাৎ জাগিলে লোকে যেমন হাই তুলিয়া পাশমোড়া খাইয়া মিট মিট করিয়া চায়, গুরুপুত্র সেইরূপে পাশমোড়া দিয়া বিছানায় উপর উঠিয়া বসিয়া, দুই হস্তে চক্ষু রগড়াইয়া চমকিত ভাবে জড়িত স্বরে বলিলেন, "একি! ঐ খানে তুমি? এখনও তুমি শোও নাই? এত রাত্রি পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া রহিয়াছ!"

কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া আদরমণি বলিল, "আহা কত কষ্টই পেয়েছ, কত পথ চলে এসেছ, কতক্ষণ ছট্ ফট করে একটু ঘুমিয়েছ, আমি ওখানে গিয়ে শুলে পাছে তোমার ঐ ঘুম টুকু ভেঙ্গে যায়, সেই ভয়েই দাঁড়িয়ে আছি। তুমি এখনি উঠিলে কেন? আর শোও—আবার ঘুমাও।"

চারিদিকে চাহিয়া গুরুপুত্র বলিলেন, "এই ত আমি ঠিক আছি! কেন তুমি ভয় পাইতেছিলে? তোমার আবার ভয় আছে? এসো এসো—যা কর্ত্তে এসেছ, সেই কাজটা কোরে ফেলো! ভয় কি? কিছুই আমি বল্‌বো না,—যা কর্ত্তে এসেছ, তাই কর।"

একটু যেন থতমত খাইয়া, কতই যেন ভাল মানুষ ঠিক সেই রকমে আদুরে আদুরে কথায় আদরমণি বলিতে লাগিলেন, "ওমা! কি কর্ত্তে আমি এসেছি! কি, আমি কোরবো! কেন তুমি ওসব কথা বল? স্বপ্ন দেখেছ বুঝি? ভুলে যাও—ভুলে যাও—ঘুমাও"—

গুরুপুত্র বলিলেন, "ন্যাকা সাজিলে চলিবে না, যেখানে তুমি গিয়েছিলে, তা আমি জানি, যা কর্ত্তে এসেছ, তাও আমি জানি. আমি তোমার কেও নই, সেই লোকের কাছে তুমি বলেছ, সব আমি জানি, কাণ ধরে বার করে দিবে দাও।"

গুরুপুত্রে মুখের কথা গুলি শুনিয়া ইন্দুবালা ভয়ে পলায়ন করিল, যাইবার সময় গোপনে বলিয়া গেল, দেখ ভাই আগন্তুক তোমার না কাণ ধরে!

গুরুপুত্র মনে মনে কি ভাবিলেন, তারপর ঘর হইতে বাহির হইয়া চো চা দৌড়ে খিড়কির পথ দিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িলেন,—দোপজা, পুটুলী, চটিজুতা, কিছুই সঙ্গে লইবার অবসর হইল না; সমস্তই পড়িয়া রহিল।

আদরমণি এদিকে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বাড়ী মাথায় করিল; বাবা গো মা গো—তোমাদের জামাই বলে লোকটা কি চুরি করবার মতলবে এসেছিল পালিয়ে গেল গো!

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ঘুমের ঘোরে উঠিয়া আসিয়া, মেয়ের সঙ্গে যোগ দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। গুরুপুত্র ওদিকে খালি পায়ে সারা পথ ছুটিয়া ঠিক ঊষা কালে বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন, অনবরত মুখে বুলি "অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ! অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।"

গুরুপত্নী ঊষা কালে উঠিয়া প্রাঙ্গণ মার্জ্জন করিতে ছিলেন, ছেলের মুখে ঐ নূতন বুলি শুনিয়া, ঝাড়ু ফেলিয়া, হায় হায় করিতে করিতে স্বামীকে জাগাইলেন, ললাটে করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হায় হায় ছেলে আমার একরাত্রে শ্বশুর বাড়ী গিয়া পাগল হইয়া আসিয়াছে।

ভট্টাচার্য্য উঠিয়া আসিয়া দেখিলেন, সত্যই পাগল বটে, একটু বেলা হইলে পাগলের বৈদ্য ডাকিয়া দেখাইলেন, চার পাঁচ জন বৈদ্য জড় হইল, কেহই কিছু রোগ নির্ণয় করিতে পারিল না, গুরুদেব শেষকালে পাগল ছেলেকে লইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। ভবতারণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কেও সংবাদ দেওয়া হইল।

কন্যার নিকটে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ভবতারণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাজসভায় উপস্থিত হইয়া আদরমণি ও ইন্দুবালা ঘটিত রহস্যালাপের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন। সকলেই গুরুপুত্রকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল এবং ছাত্র জীবনে বাল্য বিবাহের নিন্দা বাদ করিতে লাগিলেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

প্রেতাত্মার আবির্ভাব।—মার্কিণ-নিউইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ, মার্কিণের সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও প্রেততত্ত্বের আলোচক স্যার আর্থার কেনন ডয়েলস্ কারনেগি হলে প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করার সময়ে একটা ফটোগ্রাফ সহসা স্ফুরিত হইয়া উঠে। যুদ্ধ স্থগিতের বার্ষিক স্মৃতি-অনুষ্ঠান সময়ে লণ্ডনে ঐ ফটোগ্রাফ তোলা হইয়াছিল। ছবিতে শত শত প্রার্থনায় রত লোকের মুখ প্রতিফলিত হইয়া উঠিল; ঐ মুখগুলি যুদ্ধে হত সৈন্যগণের মুখ বলিয়াই অনুমিত হয়া দর্শক মণ্ডলি এই ব্যাপারে স্তম্ভিত হইয়া যায় এবং স্ত্রীলোকগণ ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠে। এদেশেও এইরূপ ব্যাপার নূতন নহে। একবার একটী ভদ্রলোক এবং তাহার নবপরিনীতা পত্নীর ফটোগ্রাফ লইবার কালে তাহার পরলোকগতা পত্নীর প্রতিমূর্ত্তিও তৎসহ প্রকটিত হইয়াছিল। সেই সময় ইহা লইয়া একটা খুবই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। হিন্দুর প্রেততত্ত্বে এবং প্রেতশ্রাদ্ধে আহার বিশ্বাস করেন না, তাহারা এ সম্বন্ধে কি যুক্তি দেখাইবেন?

দাড়ি গোঁফের প্রদর্শনী।—সপ্রতি মার্কিণ মুল্লুকে লম্বা দাড়ি গোঁফের এক প্রদর্শনী হইয়াগিয়াছে। এই মেলায় ছয় হাজার গোঁফ আর দুই হাজার দাড়ি দেখান হইয়াছিল। নানা রকমের নানা আকারে অনেক অদ্ভুত ধরণের দাড়ি গোঁফ ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা গোঁফের জন্য যিনি প্রথম পুরস্কার পাইয়াছিলেন তাহার নাম হান্স ল্যাংসেথ। ইহার বাড়ী মার্কিণ যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ ডাকোটা রাষ্ট্রের বার্লী সহরে এর গোঁফের দৈর্ঘ ছিল বার হাত। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে ইহাকে 'গুঁফোদের রাজা' আখ্যা দিয়া একটি রাজমুকুট পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। দীর্ঘতম দাড়ির জন্য যিনি প্রথম পুরস্কার পাইয়াছিলেন তাঁহার নাম জ্যাকিব। এর দাড়িটী তাকে কোমরের সঙ্গে জড়াইয়া রাখিতে হয়। ইহাও দৈর্ঘ্য প্রায় ছয় হাত। আমেরিকার বিখ্যাত এব্রাহিম লিঙ্কনের দাড়ি ছিল অত্যন্ত সুদৃশ্য। এক দাড়িওয়ালা তার অনুকরণে অতবড় দাঁড়ি রাখার জন্য এই প্রদর্শনী হইতে আটাত্তর হাজার এক শত পঁচিশ টাকার এক জীবন বীমা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মেদিনীপুর হিতৈষী ৩রা বৈশাখ ১৩৩০

৺ডাক্তার রঞ্জেন।—বৈজ্ঞানিক জগতের একজন যুগপ্রবর্ত্তক পুরুষ ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছেন। আজকাল 'এক্সরে' বা রঞ্জেনরশ্মির নাম অনেকেই শুনিতেছেন। ইহাতে মানবসমাজের যে কত উন্নতি হইয়াছে, চিকিৎসা-শাস্ত্র, পদার্থ বিজ্ঞান, প্রভৃতি বিষয়ে—মানবের জ্ঞানভাণ্ডার যে কতদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, তাহার সীমা নির্দ্দেশ করা কঠিন। ডাঃ রঞ্জেনই এই যুগান্তরকারী 'এক্সরে' এর আবিস্কর্ত্তা। তিনি নশ্বর দেহত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু মানবসভ্যতার ইতিহাসে চিরদিনই তিনি অমর হইয়া থাকিবেন।

দিয়াশলাইয়ের কথা।—এক শত বৎসর পূর্ব্বে প্রায় সমস্ত দেশেই চক্‌মকি ও লৌহের সংযোগ ভিন্ন আগুন জ্বলিবার আর কোর সরঞ্জম ছিল না। যদিও বর্ত্তমান যুগের দিয়াশলাইয়ের প্রধান উপাদান 'ফসফরাসের' নাম ১৬৭৭ খৃঃ হইতে ইংলণ্ডে পরিজ্ঞাত ছিল তথাপি ইহার আবিষ্কারের প্রায় এক শত বৎসরের পর ইহার ব্যবহার আরাম্ভ হয়।

প্রথম প্রথম ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার জন্য যে দিয়াশলাই ব্যবহৃত হইত তাহা অত্যন্ত অদ্ভুত ছিল। সেই সময় দুইখানি সিরিস কাগজের ভিতর ঘসিয়া আগুন জ্বালাইতে হইত। আগেকার দিয়াশলাই-গুলিতে হলুদ রংএর ফসফরাস ব্যবহৃত হইত। কিন্তু ঐ ফসফরাস এত বিষাক্ত ছিল যে, উহা দ্বারা যাহারা কাজ করিত তাহারা প্রায়ই নানা রকম সাংঘাতিক অসুখ বিসুখে ভুগিত।

আজ কাল, যে লাল ফসফরাস ব্যবহৃত হইতেছে তাহা অনেক নিরাপদ এবং আজ কাল ঐ ফসফরাসের ব্যবহারে কোন রকম অসুখ বিসুখ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এই লাল ফসফরাসেরও একটা দোষ আছে ইহা সামান্য কল্পনেই জ্বলিয়া উঠে

অনেক বিপদ আপদের পর জনৈক সুইডেনবাসী দিয়াশলাইয়ের ফসফরাসকে নিরাপদ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। এ জন্য তাঁহাকে সামন্যমাত্র পটাস ও দেয়াশলাইয়ের বহির্ভাগ সামান্য সিরীষ ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। সোজা কথায় তিনি আধুনিক 'সেফ্‌টি ম্যাচের অবিস্কারক।

কোন কোন আদিম অধিবাসী কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া আগুন পইয়া থাকে। তাহারা এক খণ্ড কাষ্ঠ উপর আর এক খণ্ড কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিতে থাকে, কাষ্ট আস্তে আস্তে গরম হইয়া উঠে এবং অগ্নি প্রজ্বলিত হয়।

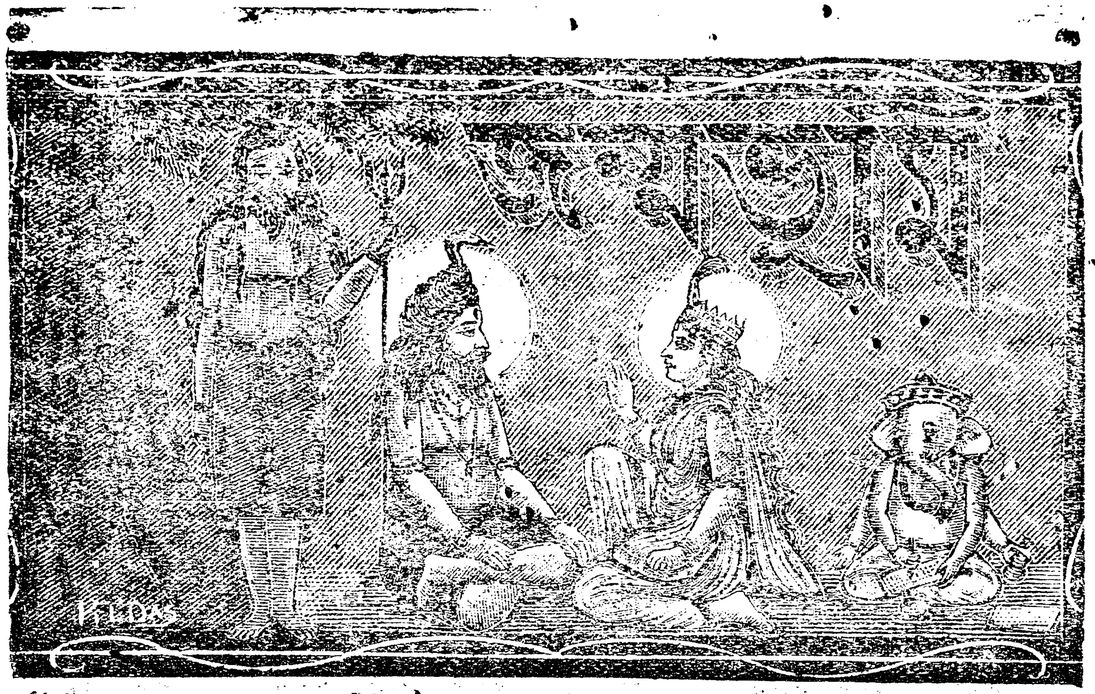

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

২৮শ, বর্ষ। ১৩২৯ সাল, চৈত্র। ১২শ, সংখ্যা।

"গুরু-শিষ্য সংবাদ।"

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

লেখক,—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন বিদ্যারিত্ন।

(ন্যায়দর্শনের অন্তর্গত কুসুমাঞ্জলী গ্রন্থের অনুবাদ।)

শিষ্য। শক্তি, জ্ঞান, ইচ্ছা কদাচ নিরাকার পদার্থে দৃষ্ট হয় না। ঈশ্বর যদি ঐ সমস্ত গুণশালী হন, তবে অবশ্যই তিনি দেহধারী হইবেন। দেহধারী মাত্রেরই জন্ম, জরা, মৃত্যু, ব্যাধি, সুখ দুঃখ থাকা সম্ভব। তাহা হইলে তাঁহার ঈশ্বরত্ব ব্যাঘাত হয়।

গুরু। ঈশ্বরের দেহ চিন্ময় ও সুখ দুঃখের অতীত, আমরা তাহা বুঝিতে অক্ষম।

শিষ্য। রাম, কৃষ্ণাদি অবতার গুলিকে যদি ঈশ্বর বলিতে চান বলুন

ক্ষতি নাই. কিন্তু তাদৃশ শক্তিশালী পুরুষাবতার সকলদেশেই সময়ে হওয়া
সম্ভব। তাদৃশ দেহে ঐশী শক্তির বিকাশের পরিবর্ত্তে মানবী শক্তিরই সমধিক
স্ফুরণ দেখিতে পাই। সুতরাং তাঁহাদিগকে ঈশ্বরাবতার স্বীকার করিব
কিরূপে ?

গুরু। জড়ের পরস্পর সংমিশ্রণে শক্তি উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু চৈতন্য
শক্তি উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছ কি ? তাহা যদি না দেখিয়া থাক, তবে স্বতন্ত্র
চৈতন্য স্বীকার করিতে হইবে।

শিষ্য। গোময় হইতে বৃশ্চিক ও জল হইতে কীটাদি উৎপন্ন হইতে
দেখিয়াছি। তবে জড়ের সংমিশ্রণে চৈতন্য উৎপন্ন না হইবে কেন ?

গুরু। জগৎ জীবাণুর সমষ্টি ভূত, সুতরাং সমস্ত বস্তু হইতেই জীব উৎপন্ন
হইতে পারে।

শিষ্য। তবে বলুন জড় বলিতে কিছুই নাই, সমস্ত চৈতন্যের সত্ত্বা।
তাহা হইতে জড় চৈতন্যের স্বতন্ত্র ভাব বিরহিত হয়।

গুরু। জড়ের অভ্যন্তরে চৈতন্য আছে, জড়, চৈতন্য নহে।

শিষ্য। জড়ের সংমিশ্রণে যদি চৈতন্যের বিকাশ হয়, তবে তাহার বিয়োগে
চৈতন্য বিলোপও সঙ্গত হইতে পারে। তাহা হইলে আর চৈতন্য, অবিনাশী
একথা বলা যায় না। বস্তুত পাঞ্চভৌতিক দেহেরই চৈতন্যবত্তা প্রমাণিত
হইয়া উঠে।

গুরু। বৎস! এই বিশাল বিচিত্র কৌশলপূর্ণ জগৎ বিষয়ে পর্য্যালোচনা
করিলে, ঈশ্বর আছেন, ইহা অনুভব বলেও সপ্রমাণ হয়। প্রমাণ, শৈশবাবস্থায়
মানব কল্পিত, তাহার প্রসার অতি সঙ্কীর্ণ। তাহা দ্বারা স্থিরীকৃত না হইলে
ঈশ্বর নাই, ইহা বলা দুঃসাহসিকের কার্য্য।

শিষ্য। যোগ্য সম্ভাবনা না থাকিলে অনুভব বলে কিছুই নিশ্চয় করা
যায় না। মানবের যাহা শক্তির অধীন, তাহাই মানব অন্বেষণ করে। যাহা
সাধ্যাতীত, তাহা আছে কিনা মানব তাহার জন্য কখনও ব্যাকুল হয় না।

গুরু। মানব কি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বিষয়েরই নির্ণয়ে সক্ষম হইয়াছে ?

শিষ্য। যতটা পারিয়াছে করিয়াছে, ক্রমশঃ আরও অগ্রসর হইতেছে।
কালে সমস্তই মানবের পরিজ্ঞাত হইতে পারে।

গুরু। যেমন অগ্নি জল সংযোগে বাষ্প উৎপন্ন হইয়া লৌহ শকটাদি
বলে স্থানান্তরে পরিচালিত করিতে পারে, কিন্তু গতি ও বিশ্রাম, চেতনের

জ্ঞান সংযুক্ত প্রযত্ন ব্যতীত কখনই সম্পাদিত হয় না, সেইরূপ জড় জগতের
অভ্যন্তরে চেতনের বিবেক সংযুক্ত প্রেরণা ব্যতীত মাত্র জড়ের দ্বারায় বিশ্বের
শৃঙ্খলা নির্ব্বাহ হইতে পারে না।

শিষ্য। মনুষ্য পরিচালিত যন্ত্রাদি পক্ষে মনুষ্যের কর্তৃত্ব থাকাই সম্ভব,
কিন্তু জগৎ সম্বন্ধে উক্ত দৃষ্টান্ত সঙ্গত নহে। জড়ের নানাবিধ শক্তি আছে।
পরমাণু পুঞ্জ সতত ক্রিয়াশীল, জড়ের পরস্পর সাহায্যে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সুচারু-
ভাবে নির্ব্বাহ হইতেছে, তজ্জন্য স্বতন্ত্র কর্ত্তা স্বীকারের কোনই আবশ্যক নাই।
জড়ের স্বকীয় শক্তিবলে অনাদিকাল বিশ্বের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, তবে
আর কর্ত্তার আবশ্যক কি ?

গুরু। তুমি যাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার কর, তাহাও মনুষ্য বুদ্ধি
কল্পিত, মনুষ্য ভ্রম প্রমাদ শূন্য নহে। সুতরাং মনুষ্য কল্পিত প্রমাণ যে ভ্রান্ত
নহে তাহা কেমন করিয়া বলিতে পার ?

শিষ্য। বহু ব্যক্তির ভূয়োদর্শন বলে যাহা প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছে, তাহা
মিথ্যা কিরূপে বলিব ? মনে করুন এমন একটি প্রতিজ্ঞা স্থির হইল যে, মনুষ্য
মাত্রেই মরণশীল। তাহার পর যে কোন মনুষ্যকে দেখিলেই সহজেই বলা
যাইতে পারে, এ ব্যক্তিও মরণশীল। যেহেতু, এ ব্যক্তি মনুষ্য। মনুষ্য
মাত্রেরই মরণশীলতা পূর্ব্বেই নিশ্চিত হইয়াছে। অতএব দেখা যায় যে, অনু-
মাণ প্রত্যক্ষোপজীবী। সুতরাং যাহা প্রত্যক্ষ বলে সিদ্ধ হয় না, তাহা,
অনুমাণ প্রমাণে সিদ্ধ হইবে কিরূপে ? প্রমাণের বহির্ভূত যদি কিছু থাকে,
তাহা মনুষ্য বুদ্ধির অতীত বিধায় প্রত্যয়ের অযোগ্য।

গুরু। প্রমাণের বহির্ভূত বলিয়া তুমি বলিতে পার যে, ঈশ্বর অপ্রত্যক্ষ বা
অসিদ্ধ। কিন্তু ঈশ্বর নাই ইহা তুমি কিরূপে বলিতে পার ?

শিষ্য। "ঘটোনাস্তি অনুপলব্ধেঃ" অনুপলব্ধি হেতু ঘট নাই। ঘট যদি
থাকিত তবে তাহার যে কোনরূপ জ্ঞান হইত, যখন তাহা হইতেছেনা তখন
ঘট নাই, ইত্যাদি দৃষ্টান্তবৎ অনুপলব্ধি বশতঃ অবশ্যই বলিতে পারা যায় যে,
ঈশ্বর নাই। যদি থাকিতেন তবে কখনও কোন পুরুষের যে কোন রূপজ্ঞান
হইত। যখন তাহা হয় না তখন তিনি অসিদ্ধ, ইহাই কেন না বলা যাইবে ?

গুরু। মহামান্য বিশ্ববরেণ্য মহাজ্ঞানী বুদ্ধ, চৈতন্য, যিশু প্রভৃতি মনস্বীগণ,
বিষয় সুখ তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।
তাঁহাদিগের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া কি তুমি বলিতে চাও।

শিষ্য শ্রম কদাচ পণ্ড হয় না, ভাল মন্দ একটা কিছু না কিছু অবশ্যই হয়। জ্ঞানোৎকর্ষ, আত্মোন্নতির জন্য চিত্ত প্রাসাদ, বিমল আনন্দ প্রভৃতি উক্ত মহাত্মাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল।

এ পর্য্যন্ত আপনার সহিত দীর্ঘ আলোচনা করিয়া আসিলাম, এক্ষণে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিয়া দেখিব যে, আমরা কতটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছি। আস্তিকেরা প্রথম দেখাইলেন যে, পরলোক সাধন কোন অলৌকিক হেতু আছে। উক্ত অলৌকিক হেতু অদৃষ্ট। অদৃষ্ট বা সংস্কার সূত্রধরের করস্থিত কুঠারের ন্যায় চেতনের আশ্রয় ব্যতীত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে না। অতএব অদৃষ্টের আশ্রয়রূপে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। বিপক্ষেরা দেখাইলেন যে অলৌকিক পরলোক সাধনের কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই, অতএব তাহা অগ্রাহ্য।

আস্তিকের দ্বিতীয় আপত্তি এই যথা—যজ্ঞাদি জন্য কর্ম্মফল যখন স্বর্গাদি সাধন তখন যাগাদির প্রথম উপদেষ্টা বলিয়া ঈশ্বর স্বীকার না করিবে কেন?

খণ্ডন একলব্য গুরুপদেশ ব্যতীত ও অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিল, বিনা উপদেশে অনেকে অনেক কার্য্য নির্ব্বাহ করে, ইহা দেখিতে পাই, সুতরাং যাগাদির উপদেষ্টারূপে ঈশ্বর স্বীকারের প্রয়োজন নাই।

আস্তিকের তৃতীয় আপত্তি এই যথা—জন্য মাত্রেই সকর্তৃক। অর্থাৎ যাহা কিছু জন্মে তাহারই একটা না একটা কর্ত্তা আছে যথা ঘট। ঘটের কর্ত্তা কুলাল, তদ্রূপ পৃথিবী পূর্ব্বে ছিল না, পরে হইয়াছে, সুতরাং জন্য। অতএব উহারও কর্ত্তা থাকা আবশ্যক। সেই কর্তৃত্ব মনুষ্যের অসম্ভব বিধায়, জগদীশ্বরই তাহার কর্ত্তা, ইহা স্বীকার করিবে না কেন?

খণ্ডন। যত্ন, চেষ্টা, ক্রিয়াবান অশরীরী কর্ত্তার প্রমাণাভাব। যাহা অশরীরী জন্য তাহা কর্তৃ জন্য নহে। অতএব পৃথিবী কর্তৃ জন্য নহে। ক্ষিতির মূল সূক্ষ্ম কারণ কদাচ বিলয় প্রাপ্ত হয় না, খণ্ড প্রলয়াদিতে সেই কারণ হইতেই কার্য্যোৎপত্তি হয়। সুতরাং পৃথিবী সৃষ্টিপক্ষে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব নাই।

যাহারা বলেন পৃথিবী এক সময় ছিল না, তাহারা প্রত্যক্ষযোগ্য স্থূল পৃথিবী দেখিতে না পাইয়া তাদৃশ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। নচেৎ যাহারা মহাপ্রলয় স্বীকার করেন, তাঁহারাও বলেন তখন জলমাত্র ছিল। জল নিরাধার হইয়া থাকে না তাহার তলে মৃত্তিকাও ছিল। এক কথায় পঞ্চভূতই ছিল,

তবে ছিল না কি তাহা বুঝি না। উপাদান বিনষ্ট হইলে সৃষ্টিকর্ত্তারও মহা বিপদ উপস্থিত হয়। সুতরাং উপাদান কদাচ বিনষ্ট হয় না, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সেই কারণ হইতে কার্য্যরূপা পৃথিবী বিকাশ হয়। উহার নির্ম্মাণের স্বতন্ত্র কর্ত্তা নাই।

আস্তিকের চতুর্থ আপত্তি এই যথা :—

কার্য্য থাকিলেই তাহার কারণ থাকিবেই, কার্য্য কারণ ভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ না হইবে কেন?

খণ্ডন। কার্য্য কারণ ভাব স্বীকার করিতে পারি, কিন্তু প্রমাণের অবিধায়ীভূত ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারি না।

আস্তিকের পঞ্চম আপত্তি এই যথা :—

সৃষ্টির প্রথমক্ষণে পরমাণুদ্বয় সংযোগ আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব। তাহার কর্ত্তারূপে এবং আদি বেদোপদেষ্টারূপে ব্যবহার শিক্ষকরূপে অবশ্যই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

খণ্ডন। মহা প্রলয়ের প্রমাণাভাব বিধায় ঐ সমস্ত আপত্তি পূর্ব্বেই নিরস্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহা পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শিষ্য। আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝা গেল যে, স্বীয় প্রমাণগুলি দুর্ব্বল দেখিয়া আস্তিক অনেক স্থলে বেদাদি শাস্ত্রের দোহাই দিয়াছেন। কিন্তু নাস্তিক স্বীয় প্রতিভাবলে, নিজ মত অখণ্ডনীয় রাখিয়াছে। ঈশ্বরকে "অবাঙ্-মনোগোচর" দুর্জ্ঞেয় মনুষ্য বুদ্ধির অতীত ইত্যাদি বলিয়া আস্তিক পুনরায় তৎপ্রতিপাদনে বহুল আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। এমত না করিয়া যদি পরমাণু বা জীবাণুপুঞ্জ বিশ্বের কারণ স্বীকার তাহার সমর্থনে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রযত্ন অনেকটা সফল হইত বিবেচনা করি। স্বর্গ, নরক, জন্মান্তর প্রভৃতি কল্পনা, মৃত্যুভয় কাতর জনগণের হৃদয়ে আশ্বাস প্রদান মাত্র। কারণ এ পর্য্যন্ত মরিয়া কেহই আত্মীয় স্বজনের নিকট ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্ব জন্ম বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন নাই বা পূর্ব্ব পরিচিত বান্ধবদিগের দর্শনে তুমিই আমার পূর্ব্ব বন্ধু এই বলিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয় নাই। এমন কি সে কিছুই পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারে না। সুতরাং শরীরোৎপন্ন ক্ষুৎ তৃষ্ণাদির প্রবৃত্তি মাত্র দর্শনে অবিজ্ঞের ন্যায় কিরূপে পূর্ব্বজন্ম এবং কল্পিত স্বর্গ নরকাদি স্বীকার করা যাইতে পারে? অমূলক পাপ ও নরকে ভীষণ ভীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক মাত্র মানবের স্বাধীন ইচ্ছা ও চেষ্টার ব্যাঘাত করিয়া যাহারা জীবনে

চিরছুদ্দিন ডাকিয়া আনিয়াছেন; তাঁহারা মিত্ররূপী শত্রু। তাঁহারা জীবনের
কি কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাহা বুঝি না।
বিচার কৌশল ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ ইচ্ছায় মানবমণ্ডলীকে ভ্রান্ত বিশ্বাসে
জড়িত করিয়া অন্ধ তমসাচ্ছন্ন পথে পরিচালিত করা বিধেয় নহে। কদাচ
জগদীশ্বর কাহাকেও সৎকর্ম্মের পুরস্কারে বা অসৎকর্ম্মের দণ্ড বিধান জন্য শরীরী
হইয়া অবতীর্ণ হন না। রাম, কৃষ্ণ বুদ্ধ প্রভৃতিকে যদি কেহ ঈশ্বরাবতার
বলিয়া মনে করেন, তাহাতে বলিবার কোন কথা নাই। কারণ অসাধারণ
শক্তি সম্পন্ন মানব যদি ঈশ্বরাবতার বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে তাদৃশ
অবতার পৃথিবীর সকল দেশেই সময়ে হইয়াছে ও হইবে ইহা স্বীকার করা
যাইতে পারে।

গুরু। বৎস! এ পর্য্যন্ত তুমি যে সমস্ত যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়াছ
তাহা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচায়ক এবং হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু তুমি ধীরচিত্তে বিবেচনা
করিয়া দেখ, নিরাকার হইয়াও শব্দ ও স্পর্শ এই দুই গুণের কারণ হইতেছে।
সুতরাং বুঝা গেল নিরবয়ব হইলেই নিগুর্ণ হয় না। সেইরূপ ঈশ্বর নিরাকার
হইলেও গুণ শূন্য নহে। পূর্ণ শক্তিশালী জগদীশ্বরের পক্ষে অসম্ভব কিছুই
নহে। তাঁহার শক্তিতে কিছু হয় না; ইহা মনে করিলে, তাঁহাকে অপূর্ণ বলা
যায়। অপূর্ণ সাধারণ মনুষ্যের ন্যায়, তাঁহার ঈশ্বরত্ব সম্ভব হয় না। যাঁহাকে
ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করি, তিনি অনন্ত শক্তি ও পূর্ণ। তাঁহার কোন অংশের
ন্যূনতা স্বীকার করিলে তাঁহার পূর্ণত্বে ব্যাঘাত হয়। অতএব সেই পূর্ণব্রহ্ম
সনাতনের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই।
বিশ্বরূপ তাঁহার নাম, কোন বস্তুই তাহা ছাড়া নহে। সুতরাং যাহা কিছু
কল্পনা কর সমস্তই তাঁহারই রূপ জানিবে। কার্য্য, কারণ, উপাদান, কর্ত্তা,
কর্ম্ম, জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, নিত্য, অনিত্য যাহা কিছু শ্রোতব্য দ্রষ্টব্য আছে,
সমস্তই তিনি, সেই একমাত্র জগদীশ্বর। জল, স্থল, তেজ, অন্তরীক্ষ, বায়ু,
পঞ্চতন্মাত্র, মাত্রা বিষয়, ভোক্তা, দ্রষ্টা সাক্ষী, নিয়ন্তা, বিধাতা স্রষ্টা, সংহর্ত্তা
রক্ষাকর্ত্তা, প্রকৃতি, পুরুষ, ব্রহ্ম, স্থূল, সূক্ষ্ম, এককথায় যাহা কিছু সমস্তই তিনি।
এক্ষণে বলদেখি বাপু তাঁহাকে বাদ দিয়া কি অপর বস্তু দেখাইতে পার?
যে জগতের প্রতি পত্রে, প্রতি পুষ্পে, ভূস্তরে, প্রস্তরে, ভূধরে, সাগরে, বিবরে
চরাচরে সর্ব্বত্র বিচিত্র কৌশল বিদ্যমান, সেই জগৎ বিবেক শূন্য জড়ের
শক্তিতে রচিত হইয়াছে ও পরিচালিত হইতেছে, ইহাকে বিশ্বাস করিতে

প্রস্তুত হইবে? নাস্তিক্য বুদ্ধি ক্ষুদ্র দৃষ্টি মাত্র, উহা পরিহাস পূর্ব্বক মহামনা
মনস্বীগণ ক্ষুণ্ণ পথ আশ্রয় কর। ভগবানের প্রতি বিশ্বাস বিহীন মানবের
অন্তরে শান্তি নাই, কোন আশ্বাস নাই, কেবল ঘোর অশান্তি। উহারা
জীবিতবস্থায়ই নিরয় যাতনা ভোগ করে। একব্বরি গজ কাটিতে যাহা মাপিয়া
পাওয়া যায় না, তাহা আঠার ইঞ্চি গজে মাপিয়া পাইবে কিরূপে? মানব
আজও শিশু, শিশুর প্রমাণ কতটুকু? সেই প্রমাণের উপরনির্ভর করিয়া,
অনন্ত অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর জগদীশ্বর নাই—একথা বলিতে সাহসী হইও
না। জগদীশ্বর নিশ্চিতই আছেন এই মত বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হও, দেখিবে
হৃদয়ে অপার আনন্দ পাইবে। ভগবান নিত্য সিদ্ধ।

ন্যাংটা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,

ন্যাংটা ভবে এসে ছিলে
ন্যাংটা চলে যাবে
কেন মিছে বসন দিয়ে
লজ্জা নিবারিবে?
কিসে লজ্জা, কারে লজ্জা
লজ্জা কারে কয়?
পবিত্রতা লজ্জাশূন্য
পাপ লজ্জাময়॥
ধার করা কৃত্রিম্ বাস
রইবে কতদিন
দুদিন পরে ঝরে যাবে
ক্রমে হবে ক্ষীণ
স্বর্গ শিশু জন্মে যবে
আলো করি মর্ত্ত

সঙ্গে যে কি নিয়ে আসে
অঙ্গ ঢাকা বস্ত্র ॥
ঐ যে বধু অন্তঃপুরে
সর্ব্ব অঙ্গ ঢেকে'
লজ্জাভরে নতআঁখি
সদা ত্রস্ত থাকে ॥
এ যে ধনী বেশ ভূষা
করে রাত্রি দিন
ভাবে সদা এ না হলে
মান হবে ক্ষীণ ॥
বোঝে না সদাই তাই
করে ঢাক্ ঢাক্।
ভাবেনা যে দুদিন পরে
সবি হবে ফাঁক ॥
কৃত্রিম সব বেশ ভূষা
সঙ্গে নাহি যাবে
মৃত্যুর পরে সব কিন্তু
পিছু পড়ে রবে
তবে কেন তার তরে
এত হাক ডাক্
প্রেত ভূমে গেলে পরে
সবি হবে ফাঁক্ ॥
ন্যাংটা ভবে এসেছিনু
ন্যাংটা চলে যাবে
কেন মিছে বসন দিয়ে
লজ্জা নিবারিবে ?

ডেপুটির দাদা।

(১)

ভোলানাথ দত্ত চৌধুরী গৌরীপুরের পত্তনী তালুকদার। বৎসরে প্রায় ছয় হাজার টাকা আয় বাড়ীতে বারোমাসে কৃষ্ণাঙ্গের প্রায় সমস্ত পার্ব্বণই অনুষ্ঠিত হয়, শিব-শক্তির আরাধনা হয়না,—কারণ ভোলানাথবাবু একজন পরম বৈষ্ণব।

ভোলানাথের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ যোগানন্দ, কনিষ্ঠ প্রেমানন্দ। ছেলে দু-টিকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য কর্ত্তা বিলক্ষণ চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছিলেন, খরচ পত্রও যথেষ্ট করিয়াছিলেন, তুল্য ফল হয় নাই; ছোট ছেলেটি কলিকাতার মিশনারি স্কুলে উচ্চশ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যায়ন করিয়াছিলেন, বড়টি গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠ পর্য্যন্ত সমাপ্ত হয় নাই। দাতাকর্ণ এবং গুরুদক্ষিণার পুঁথি পড়িতেও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম নির্গত হইত। বিদ্যার পরিচয়এই পর্য্যন্ত,—ধর্ম্মের পরিচয়ও একটু দেওয়া আবশ্যক। ছোটটি খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দির তত্ত্বজ্ঞানী। বড়টি বাহ্য ব্যবহারে আস্তিককি নাস্তিক; অন্তরের কি ভাব, তাহা কেহই জানিতে পারিত না।

ছেলেদের সত্য নাম দেওয়াহইল না পিতার নামটি ও প্রকৃত নামের বাক্যান্তর। গ্রামের নাম গৌরীপুর; এই নামটিও সত্য নামের শব্দান্তর; অতএব পাঠক মহাশয়েরা শারীরিক অথবা মানসিক কষ্ট স্বীকার করিয়া গৌরীপুর গ্রাম এবং যোগানন্দ এবং প্রেমানন্দ মধুর নামের মনুষ্য অন্বেষনের জন্য ব্যগ্র না হন, ইহাই সানুনয় নিবেদন।

(২)

পঁচাত্তর বৎসর বয়সে ভোলানাথের মৃত্যু হইল। তৎকালে যোগানন্দের বয়ঃক্রম আটত্রিশ বৎসর, প্রেমানন্দের আটাশ বৎসর মাত্র। দশ বৎসরের ছোট বড়। প্রেমানন্দ তখন সব ডেপুটি মাজিষ্টারী চাকরী করেন, যোগানন্দ বাবু বান্ধব পরিবেষ্টিত হইয়া, আম্র কাননের আটচালায় বসিয়া আমোদে স্বরিতানন্দের সেবায় পরমানন্দে জীবনাতিবাহিত করেন।

ভোলানাথের মৃত্যু হইল। একত্রিংশ দিবসে শ্রাদ্ধ হইল। কৌতুহলাক্রান্ত পাঠকবর্গ শ্রবণ করিয়া হাসিবেন কিংবা কাঁদিবেন, কিংবা রোমাঞ্চিত গাত্রে শিহরীয়া উঠিবেন, তাহা আমরা—জানিনা, বলিতে বাধ্য দুই ছেলের শ্রাদ্ধ হইল দুইমতে। গ্রামে নব্য সভ্য ধর্ম্মসমাজের একটি সভা ছিল, তত্ত্বজ্ঞানি প্রেমানন্দ সেই সভায় বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া নয়ন মুদিয়া পিতৃ গুণানুকীর্ত্তন ভগবানের স্তব স্তুতি, সঙ্গীত ও পিতার অক্ষয় স্বর্গ কামনা করিয়া, ক্ষণে ক্ষণে ক্রন্দন করতঃ মানসিক সমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পাদন করিলেন; ব্যবহারে নাস্তিক হইলেও যোগানন্দ প্রাচীন হিন্দু প্রথা মত নারায়ণ শীলার সম্মুখে খোলা ডোঙা পাতিয়া প্রচলিত প্রথানুসারে বাহ্য সমারোহে শ্রাদ্ধ করিলেন।

অবশ্য পৈতৃক বিষয়ের আয় শ্রাদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি প্রেমানন্দ (মানসিক শ্রাদ্ধে শান্তি না পাইয়া পিতৃভক্তির পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে) নিজের বেতনের টাকা হইতে জ্যেষ্ঠ সহদরের হিন্দু শাস্ত্রোক্ত শ্রাদ্ধে (হিন্দুর শাস্ত্র ও আচার অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধাবান না হইলেও) সহস্রাধিক টাকা আনুকূল্য করিয়াছিলেন।

(৩)

পিতৃশ্রাদ্ধের গোলযোগ চুকিবার পর প্রেমানন্দ আপন কর্ম্মস্থলে গমন করিলেন, যোগানন্দ তখন বাড়ীর সর্ব্বে সর্ব্বা কর্ত্তা হইয়া রহিলেন। প্রত্যহ বাড়ীতে আমোদ প্রমোদের ত্রুটি হইতনা।

যোগানন্দ ঘোরতর বাবু হইয়াছেন এই সংবাদ সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইলে একজন বিদেশস্থ পুরাতন বন্ধু হাঠৎ সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। যোগানন্দ তখন বেশ টেরি বাঁকাইয়া, বক্ষে স্বর্ণ শৃঙ্খল ঝুলাইয়া দিব্য একটি নব্য সভ্য বাবু সাজিয়া, সোণা বাধা ছড়ি হাতে করিয়া, চিরপরিচিত বিহার কানন দর্শন করিতে যাইতে ছিলেন; পথেই সাক্ষাৎ হইল। মুখামুখি সাক্ষাৎ নহে, পুরাতন বন্ধুটি তিন চার হাত পশ্চাতে। যোগানন্দ মদগর্ব্বে মত্ত হইয়া বন্ধু শূকরের মত গোঁ ভরে চলিয়াছেন, তিন চারি হাত পশ্চাতে একটি পুরাতন বন্ধু, সে দিকে ভ্রুক্ষেপও নাই।

পুরাতন বন্ধু পশ্চাৎ হইতে —"যোগা—যোগা" বলিয়া দুই তিনবার উচ্চ কণ্ঠে ডাকিলেন, ভ্রুক্ষেপও নাই। চতুর্থ ডাকে মুখ ফিরাইয়া, বাবু যোগানন্দ (লোকটিকে না চিনিয়াই) হস্ত সঞ্চালন পূর্ব্বক সহসা বলিয়া উঠিলেন, "চুপ-চুপ! কে তুমি? ও সব নাম এখন আমার নাই; আমি এখন ডেপুটির দাদা।

মানসম্ভম কত বড়। আগেকার পুরাতন নামে ডাকিলে মান সম্ভ্রম সমস্তই মাটি হইয়া যাইবে; হয় আমাকে "বাবু" বল, না হয়ত বল "ডেপুটির দাদা"।

কথাটার সুমীমাংসা হইবার অগ্রেই উভয়ে চেনাচিনি হইয়া গেল। আগত বন্ধু কহিলেন, "বেঁচে থাক ভাই! খুব বাহাদুর বটে! নাম ধরিয়া আমি ডাকি, লোকে যদি শুনিতে পায়, তবেত অনর্থ বাঁধিবে! কেহত আর তোমাকে "ডেপুটির দাদা" বলিবে না সুতাই তুমি মাটি হইয়া যাইবে! এ কথাত সত্যই বটে, কিন্তু ভাই,—যোগা—নানা, ও নাম আর বলিবনা, তোমার অপমান হইবে, ভাই ডেপুটির দাদা! এখন বল দেখি, আজ কাল চলিতেছে কেমন?

(৪)

ভাগ্য লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইলে, আশাধিক অর্থের অধিকারি হইলে নিতান্ত মুর্খেরও জ্ঞান বুদ্ধি বৃদ্ধি হয়। সংসারে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই এখন-কার দৃষ্টান্ত বাবু যোগানন্দ ওরফে ডেপুটির দাদা, এই ডেপুটির দাদা বাগানের পথে যাহার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন, তাঁহার নাম গদাধর রায় মহাশয় গদাধর সংক্ষেপে আপন মৌতাতের পাঁচ সাতটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালা গাহিলেন। যোগানন্দ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাগান দর্শনে চলিলেন, চলিতে চলিতে বলিলেন, প্রসাদ পাওয়া পরম সুখ, আজ শুভ দিন, পুরাতন বন্ধুর সম্মিলনে আজ একটু আনন্দ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।"

"অবশ্য—অবশ্য—অবশ্য"; পুনরুক্তি করিয়া গদাধর তিনবার কহিলেন "অবশ্য—অবশ্য—অবশ্য" উভয়ে উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। সেই সখের আটচালাবর খান সাম হাজির তরল, কঠিন, ধূম্র, এই তিন প্রকার মহাদ্রব্য সেবনের পর কথোপকথন আরম্ভ।

প্রথমেই হাস্য করিয়া গদাধর জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই হে! তুমিত লইয়াছ ডেপুটির—দাদা—নাম, গৃহিনীটির উপাধি এখন কি রকম হইয়াছে? "ডেপুটির দিদি বাবু" বুঝি?

হাস্য করিয়া যোগানন্দ কহিলেন, "ও সব ঠাট্টার কথা এখন রাখ, কাজের কথা শোন। ডেপুটির দাদা হওয়া বড় কম যন্ত্রনা নয়! মান যেমন বেশী, খরচ পত্রও সব রকমে সেই রকম বেশী বেশী। গদাধর কহিলেন এই এক—দিদি বাবুর কথা এখন থাকুন, তোমার নিজের কথা গুলি বেশ মিষ্ট লাগিতেছে, অগ্রে তাহাই তুমি বল।

নিশ্বাস ছড়িয়া যোগানন্দ বলিলেন, বড় জ্বালা, এই এক আমাকে ধরিয়া দেখ, পেমা যখন ডেপুটি হয় নাই, তখন আমি পাঁচি ধূতি পরিয়া বাজারে গিয়াছি, লজ্জা হইত না, কেহই কিছু বলিত না; এখন আমি ডেপুটির দাদা বেশী দামের কাপড় পরিয়া না গেলে মান থাকেনা। বাজারে যাইতে চিরদিন আমি বড়ই ভালবাসি, জান তাহা; এখনও মধ্যে মধ্যে যাই, সকল দিন যাই না; গেলেই বেশী খরচ। এখন আমি ডিপুটির দাদা, আগে আমি দুই পয়সার মাছ কিনিয়াছি, এখন চারি আনার মাছ কিনিতে লজ্জা করে; নূন্য কল্পে একটি টাকার কমে মাছের বাজারে ঠাই পাই না; সকল জিনিষেই ঐ রকম। ডিপুটির দাদা আমি মান যাহাতে না যায়, তাহাই করিতে হয়; টাকা গ্রাহ্যই করি না।

গদা। টাকা যদি রোজকার করিতে হইত, তাহা হইলে বুঝিতে গ্রাহ্য করিতে হইত কি না? আচ্ছা, বীরত্ব যতদূর দেখাইয়াছ; বলিয়া যাও।

যোগা। বীরত্ব কিছুই নাই, মান সম্ভ্রম রক্ষার জন্য অপব্যয়কে অপব্যয় মনে করিতে নাই। আমি এখন ডিপুটির দাদা, কত স্থান হইতে নিমন্ত্রণ পত্র আসে, কত লোক বড় বড় চাঁদার খাতা লইয়া আমার কাছে উপস্থিত হয়, মান রক্ষার জন্য এক এক খাতায় অতিকম একশ টাকাও দস্তখত করিতে হয়। তাহা ছাড়া, কত প্রকার সভা সমিতির সভ্য হইয়াছি, এতদ্ভিন্ন পিতৃদায়, কন্যা-দায়, বিদ্যাদায়, কাব্যদায় ইত্যাদি জড় হয়, কোনটা ঝুট্টা কোনটা সাচ্চা চিনিয়া উঠাই দায়।

গদা। দায় যদি বোধ কর, তবে কর কেন? বন্ধ করিয়া দিলেই ত সচ্ছন্দে পার;—প্রেমানন্দ বাঁচিয়া থাকুক, দিন দিন চাকরী বাড়ুক, তোমার "ডিপুটির দাদা" উপাধিটি কেহই কাড়িয়া লইতে পারিবে না।

যোগা। (নিশ্বাস ফেলিয়া) কাড়িয়া লইলে ইত আমি বাঁচি। কিঞ্চিত মানের লোভে এত ঝঞ্ঝাট—এত খরচ, কে সহ্য করে।

গদা। তুমি ইচ্ছা করিলেই উপাধিটি ছাড়িয়া দিতে পার না; প্রেমানন্দ যত দিন সুস্থ শরীরে ডিপুটি থাকিবে, ততদিন তোমারও এই মান্যবান উপাধি কেহটি ঘুচাইবে না। দুরভাগ্য বশে ছোট ভায়ার চাকরীটি যদি ছুটিয়া যায়, তবেই ত গোলমাল।

যোগা। কিসের গোলমাল? পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি রহিয়াছে, বংশের মান সম্ভ্রমের কমি নাই, সে মানের অপেক্ষা কি একটা চাকরী করার বেশী মান?

গদা। পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি যদি বজায় রাখিতে পার তবেই ত থাকিবে, নতুবা অসত্য দোষে, কিংবা অভাব দোষে, কিংবা কাহারও বিশ্বাস ঘাতকতায় পত্তনী স্বত্বনিলামে হইয়া যাইতে পারে; এই সমস্ত বুঝিয়া পেমা একটি রাজকীয় বিচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যতদিন সমর্থ, স্বগৌরব রাজ সেবায় ততদিন অর্পিত রাখিয়া যথা সম্ভব অর্থ সঞ্চয় করা সহদরের ইচ্ছা; তোমার স্নেহাস্পদ কনিষ্ট সহোদর বিচার সনে বসিয়াছে, সেটা কি তুমি গৌরব বিবেচনা কর না? সহদর একজন ডিপুটি হয়, সেটা কি তুমি সত্য সত্য ভালবাস না?

যোগা। না বাসিলে ডিপুটির দাদা হইব কি প্রকারে? ভালবাসি; তবে কি জান, বাজে খরচ বেজায় বেশী পড়ে! ঝঞ্ঝাটও অনেক বেশী। পাড়ায় কাহারও পরস্পর বিরোধ হইলে আগে ভাগে আমাকেই শালীসী মান্য করে; আদ্যশ্রাদ্ধের অধ্যক্ষতা করিবার দরকার হইলে লোকে সর্ব্বাগ্রে আমাকেই ধরিয়াবসে, গ্রামে কাহারও গৃহে চুরি ডাকাতি হইলে আমাকে আসিয়া জানায়, আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিনা, আর নূতন জঞ্জালে জড়াইয়া পড়ি এই রকম নানা ফাঁসাদ!

গদা। যতই ফাঁসাদ থাকুক, পঞ্চুর কল্যাণে কিছু কালের জন্য দাদা তোমার উপাধিটি অটুট; কোন চিন্তা নাই; বৌদাদাকে বাকি রাখিও না; মর্য্যাদার খাতিরে বৌটি এখন ডিপুটির দিদি বাবু। তুমি আছ দাদা বাবু, তিনি হন এক দিদিবাবু। দিদিবাবুকে বাহির কর, দুইজনেই বিখ্যাত হইবে। অন্দরে বাহিরে চাঁদার খাতা, আর ভিক্ষা পত্র কিছু বেশী আসিবে বটে, সভ্য ভিখারির সংখ্যাও কিছু বাড়িবে বটে, ভয় কি, অঙ্গিকার করিও, দস্তখত করিও পালন করিবার সময়ে বাতে ধরিয়াছে বলিয়া অন্দর হইতে দিন কতক বাহির হইও না, দন্ত শূলের অছিলায় বউ দিদিকেও অন্য গৃহে শয়ন করাইয়া রাখিও; ভিখারিরা আসিলে চাকরেরা বলিবে, দাদাবাবুর বাত ছব্বণ, দিদি বাবুর দাঁত কন্‌কন্‌। কোন উৎপাত থাকিবে না। দিদি বাবুকে বাহির কর।

অধিকারী হইয়াছ তুমি; কিন্তু ভাই ডিপুটির দাদা, মোনে কর, তোমায় কেহ ইচ্ছা করিয়া উপাধি দেয় নাই ছোট ভাইটি ডিপুটি হইল, তখনি তখনি তোমার ইচ্ছা হইল, সাধ করিয়াই নিজেই তুমি উপাধি লইলে, ডিপুটির দাদা, এখন বিবেচনা কর, বউ দিদির কি তেমন ইচ্ছা, তেমন সাধ, আসলেই হইতে পারে না? বাহির কর, বাহির কর, কিছু লজ্জা নাই, ব্যাকারণের ভয় নাই, সভ্য সংসারে এ পদ্ধতিটা আজ কাল বেশ চলে!

যোগা। দেখাও।

গদা। দেখিবে? নয়ন মুদিয়া মনে কর, সাহেবের দৌলতে একটি ভাই রাজা উপাধি পাইলেন, অপর ভাই গুলি তৎক্ষণাৎ মেজ রাজা সেজ রাজা ছোট রাজা সাজিলেন; বৌরাণী অথবা বৌরাজা অন্দরে অন্দরে প্রস্তুত হইল। রায় বহাদুরের স্ত্রী রায় বাহদুর উপাধি লইল, তবে কেন তোমার স্ত্রীটি ডিপুটির দিদি না হইতে পারিবেন।

যোগা। হিরা মুক্তায় সর্ব্বাঙ্গ মুড়িতে হইবে! তত টাকা আমার দুই পুরুষেও রোজগার করিতে পারিবেনা।

গদা। তোমার নিচে অতি কম পাঁচ পুরুষেও হয়ত অত রোজকার করিতে পারিবে না।

আহ্লাদে হাস্য করিয়া ডিপুটীর দাদা সুর ধরিলেনঃ—

ডিপুটি সোনার শশী, অপরূপ শোভা,
চকোর চকোরী উড়ে, মত্ত সুধা লোভা;
ঠোট ভেঙ্গে ক্ষুধা হরে সুবর্ণের চাঁদা,
হয়ো না কেহ ডিপুটির দাদা।

বাবু।

হাতি বাগানে ষ্টার থিয়েটারে এই নামে একখানি নক্সার অভিনয় হইত। যে অংশ স্পর্শ করিয়া যে ধরণের সে খানি লেখা, নক্সাকার সে অংশ সে ধরণের কৃত কার্য্য হইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু মূলতত্ত্বে বাবু কাহাকে বলে, এখনকার বাবু কাহারা পণ্ডিত অমৃত লালের নক্সায় তাহার কোন উল্লেখ নাই, পণ্ডিত পুরন্দর তত্ত্ব নিধি সেই বিষয়ের এইরূপ আলোচনা করিয়াছেন:—

হিন্দুস্থানের ধনবান ক্ষত্রিয়গণের জ্যৈষ্ঠ পুত্রেরা বংশ প্রথায় বাবু উপাধি ধারণ করেন। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী একটি রাজ পরিবারে স্ত্রীলোকের নামের সঙ্গে বাবু উপাধির যোগ আছে; যথা—কামিনী বাবু, রমণী বাবু, শ্যাম বাবু, ইত্যাদি ইত্যাদি সহরের এক একটি গৃহস্থ পরিবারেও মাসি বাবু, পিসি বাবু,

বৌবাবু, দিদি বাবু, ইত্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মাবাবু এখনও হয় নাই; সভ্যতার স্রোত আর একটু বেশী জোরে বহিলে বোধ হয় সেটিও বাকি থাকিবেনা। এখনকার সাধারণ অর্থে সহরের বাবু কাহারা, মাথার টেরিতে, ফরসা ফরসা কামিজে মাঞ্চিষ্টারের মল মলে এবং গরাণ হাঠার জুতাতে তাহার পরিচয় হয়। সাহেবের আফিসে ছোট বড় কেরাণীরা এবং ১০৲ বেতনের বিল সরকারেরা বাবু উপাধিতে অলঙ্কৃত অথবা লাঞ্ছিত। তাহা ব্যতীত সংসারে কত খোকা বাবু আছেন, তাহার হিসাব করে কে? পুরোহিত স্মিথ সাহেব যখন শ্রীরামপুরের ফেণ্ড অফ ইণ্ডিয়ার সম্পাদক ছিলেন, কলিকাতা বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের নামে ব্যঙ্গকরিয়া সেই সময় এক দিন তিনি লিখিয়াছিলেন, "এসোসিয়েসনের বাবু অথবা তৎতুল্য উচ্চারণের আর কিছু। (The Babus of the British Indian Assosiaser. somthing like same soun)

এই পদের কি অর্থ, একটু চিন্তা করিলেই বিজ্ঞ পাঠক অক্লেশে তাহা বুঝিয়া লইতে পারিবেন। বাবু কথাটার উপর সাহেব লোকের এতদূর ঘৃণা! শব্দের ব্যুৎপত্তিটি জানা না থাকাতে এবং শব্দ ধারির বিচার না থাকাতে এই অনর্থ ঘটিতেছে।

বাবু শব্দটি আর্ব্বি ভাষার মূল হইতে উৎপন্ন। বা—অর্থে উত্তম, বু অর্থে গন্ধ, বাবু—উত্তম গন্ধ; অর্থাৎ যাহাদের উচ্চ সম্ভ্রম আছে, তাঁহারাই বাবু। পাত্র বিবেচনায় এই শব্দটি প্রযুক্ত হইলে যথার্থ মানায়, অজ্ঞ অজ্ঞ সাহেবরাও ঘৃণা করিতে পারেন না। রাজ পথে কাপড় মোড়া বাবুর দল পুষ্টি দর্শনে বংশ বিচার, গুণ বিচার, মর্য্যদা বিচার, উঠিয়া যাইতেছে, সেই কারণেই বাবু নামে লঞ্চনা রাজা প্রজা কাহারও যদি ক্ষমতা থাকে পাত্র বিশেষকে বাবু উপাধিতে ভূষিত করিতে ব্যবস্থা করুন; হারু বাগ্দি ছিরু ধোপা মধু কলু এবং পাঁচু ডোমকে বাবু বলিবার হুজুক থাকিলে বাস্তবিক বাবু পদের আরও দুর্দ্দশা বাড়িয়া উঠিবে। এখনও সাবধান হইবার সময় আছে।

তত্ত্বনিধি মহাশয়কে আমরা ভক্তিভাবে প্রণাম করিলাম। তাঁহার আলোচনার গুরুত্ব আছে। ব্যবস্থাটি নির্ণিত হইলেই সুখের হয়। তাহা না হইলে যদি বিড়ালের গলায় ফাঁসি দিবার জন্য মুষিক সম্প্রদায়র পরামর্শের মত ফল দাঁড়য়, তাহা হইলেই একাকার,—তাহা হইলেই আশা বিফল।

বঙ্কিম প্রশস্তি।

১৩৩০ সাল ২রা আষাঢ় কাঁঠালপাড়া বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত।

লেখক, শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ দত্ত বি-এ।

(ডি, এল্ রায়ের সুর)

আজি, গভীর পুলকে মিলেছি সকলে
গাহিতে তোমার বিজয় গান,
প্রেমসিক্ত হৃদয়ে আজিকে
ভক্তি-অর্ঘ্য করিতে দান।
প্রতিভা আলোকে হে সাধক কবি,
ফুটালে বাণীর অপরূপ ছবি,
তোমারি অমর লেখণী প্রভাবে
জাগিল বঙ্গ ভাষার প্রাণ।
বাণীর পুত্র! সাধনা তোমার ধন্য করেছে বাঙ্গালী প্রাণ
নবীন ছন্দে, তরুণের দল কীর্ত্তি তোমার করিছে গান॥

কুহেলিকাময় জ্ঞানের আকাশ
ফুটীল যখন প্রতিভা তব;
কাটিল চকিতে সে মহা তমসা
ছেরিল জগত দীপ্তি নব!
নবসুরে তুমি বাঁধিলে যন্ত্র,
আনিলে জ্ঞানের নবীন তন্ত্র,
জড়ের মাঝারে ধ্বনিলে মন্ত্র,
মন্ত্রিত করি নিখিল প্রাণ!
বাণীর পুত্র! সাধনা তোমায় ধন্য করেছে বাঙ্গালী প্রাণ।
নবীন ছন্দে, তরুণের দল কীর্ত্তি তোমার করিছে গান॥

দীনা বঙ্গজননীর তরে
কেঁদেছিল তব মহান প্রাণ,
গাহিলে অমর বন্দনা গীত
"সুজলা সুফলা" মাতার গান,

প্রাণের আবেগে মরম তুলিতে
আঁকিলে যে ছবি, কে পারে ভুলিতে
ফুটিয়া উঠুক হে কবি তোমার
মর্ম্মের আঁকা প্রতিমা খান।
বাণীর পুত্র। সাধনা তোমার ধন্য করেছে বাঙ্গালী প্রাণ।
নবীন ছন্দে তরুণের দল কীর্ত্তি তোমার করিছে গান॥

কাব্য ও কবি।*

লেখক,—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য।

ভারতীর বীণার ঝঙ্কার কাব্য, কবিভারতীর প্রিয়তম পুত্র। কাব্য অমৃত পূর্ণ কলস, কবি দেবতা, অকবি অসুর, মন্দ কবি সাহিত্য জগতের রাহু ও কেতু, কবির কাছে কাব্য বাণীর হস্ত ঝঙ্কৃত বীণার রাগিণীর অপেক্ষা সঙ্গীতময়, পুষ্পের কোমলতার অপেক্ষা কোমল, ঈশ্বরের নামে ঝঙ্কৃত দেবর্ষির বীণার রাগিণীর অপেক্ষা পবিত্র। কাব্য কি? শব্দ ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মের মুখচ্চারিত গদ্যপদ্যময়ী ভাষা, যে ভাষার কোমল শব্দাবলীর বিন্যাসে শ্বেতবরণা দেবীর কনক রাগরঞ্জিত মুকুটকে আরও উজ্জ্বল করে, যে ভাষার তুষারশুভ্র কমলাসনার কমলকে আরও শুভ্রতর রূপে জগতে প্রতিফলিত করে, যে ভাষায় প্রাণে আনন্দ অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে উপমার ছটায় অজ্ঞাত পদার্থ, অজ্ঞাত আনন্দ ও অপরিচিত দেব দেবীর মূর্ত্তিকে নয়নের প্রত্যক্ষের মত প্রতিবিম্বিত করে, তার নাম ভাষা বা কাব্য। সাহিত্য দর্শনকার বলিয়াছেন, "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং" যড় রসযুক্ত বাক্যই কাব্য নামে জগতে পরিচিত, জনসমাজে সমাদৃতও কবিগণের আদরণীয়।

অনেকে হয়ত বলিতে পারেন যে, কাব্যের উপকারীতা অপেক্ষা আধুনিক যুগে অপকারিতাই অধিক, হয়ত বলিতে পারেন কাব্য যতক্ষণ হৃদয়ে আকাঙ্খা থাকে, যতক্ষণ প্রাণে ভোগ লিপ্সা থাকে, যতক্ষণ সংসার বাসনা থাকে ততক্ষণ

* ১৩৩০ সাল ২রা আষাঢ় কাঁটালপাড়া বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত।

এ শাস্ত্র আলোচনা করা উচিৎ নয়। এ বৃদ্ধ বয়সে আলোচনার জিনিষ, যখন মানবের জগতের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার রমণীতে আসক্তি থাকেনা, যখন জীবনের সংক্ষিপ্ত দিনগুলি হিসাবের মধ্যে পড়িয়া যায়, যখন মানবের সংসার বাসনায় অবসান হয়, এ শাস্ত্র তখনই নিভৃতে আলোচনার জিনিষ, অন্যথা ফল যে বিষময় হইবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তাহাতে আমার বলিবার আছে, অবশ্য প্রথমে দেখিতে হইবে যে আমাদের শাস্ত্রকারেরা ইহার কি উত্তর দিয়াছেন। সাহিত্য দর্পণকার বলিয়াছেন, "কটু কৌষধো পশমনীয়স্য রোগস্য শীতশর্করোপ শমনীয়ত্বে কস্য বা যোগিগঃ শীতশর্করা প্রবৃত্তি সা ধীয়সী নস্যাৎ" তিক্ত ঔষধে উপশমনীয় ব্যাধির যদি সুমিষ্ট শর্করার দ্বারা আরোগ্যের উপায় থাকে তাহা হইলে কোন ব্যাধি পীড়িত ব্যক্তি তিক্ত ঔষধ পানের ইচ্ছা করেন?

"কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।" ঈশ্বর গুপ্ত।

যে ব্যক্তি কখন কাব্যের মধুরাস্বাদ নিজের হৃদয়ের মাধুর্য্যের সহিত মিলাইয়া নয়নের সৌন্দর্য্যের দ্বার উজ্ঘাটিত করিয়া, মনের সৌকুমার্য্য নয়নে প্রতিফলিত করিয়া কাব্য রসের আস্বাদন না করিয়াছেন, সে ব্যক্তি কাব্যের উপকারিতা, কাব্যের প্রয়োজনীয়তা, কাব্যের মনোস্বাদ কারিতা শক্তির উদ্দীপনায় যে উদ্দীপিত হইবেন না তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

আমাদের রুচি অনুসারে আমরা চাই কাব্য, সংসার চায় কাব্য, দেবতা চান কাব্য। আমাদের দেবতা, যার অপেক্ষা প্রসন্ন মূর্ত্তি, যার অপেক্ষা ভক্তবৎসল, যার অপেক্ষা আশুতোষ দেববৃন্দের ইতিহাসের মধ্যে পাওয়া যায় না, সেই দেবাদিব মহাদেবের উপাসনা করিতে হইলে প্রথমেই কাব্য। "ধ্যায়েৎ নিত্যং মহেশং রজত গিরিনিভং চারু চন্দ্রাবতংসং" উপাসনায় ভোলানাথ সন্তুষ্ট, আর আমাদের মনেও সেই অপরিচিত দেবতার রূপ বিশেষণ দ্বারে কাব্য নয়নে প্রতিফলিত করিয়া দিয়া ভক্তি, স্নেহ ও ভালবাসাকে আকর্ষণ করে।

উপাসনা জিনিষটাই যে একটা কাব্য তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, কারণ উপাসনার পূর্ব্বেত কেহই দেব দেবীর দর্শন লাভে সমর্থ হন না। পূর্ব্বে একটা কাল্পনিক মূর্ত্তি মানস পটে অঙ্কিত করিয়া কেহ ধবল তুষার শুভ্র সদা প্রসন্ন নীলকণ্ঠের উপাসনা করেন, কেহ দশভুজা পুত্রকন্যা সমাযুক্তা সর্ব্বসিদ্ধি দায়িনী দেবী দানবদলনীর উপাসনা করেন, কেহ বা বৃন্দাবন কেলি কুঞ্জের ননীচোরা গোবর্দ্ধনধারী কংসারি যশোদা দুলালের উপাসনা করেন। বিশেষণ কিম্বা

কল্পনা ভিন্ন কোনও দেব দেবীর উপাসনার বাসনা থাকেনা।

অভ্রভেদী প্রাসাদ শিখরে সিংহাসনোপরি আরূঢ়, শত্রুর আক্রমনে চিন্তিত রাজেন্দ্র উপাসনা করেন,—"মা! দশভুজা! মহিষাসুর বিধ্বংসী জননী! আমায় জয়দান কর।" পর্ণ কুটীর বাসী দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ভিক্ষার জন্য সমস্ত দিন প্রখর অরুণ কিরণে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ঘুরিয়া বিফল মনোরথে যখন রজনীতে জঠর জ্বালায় দেবীর নিকট মর্ম্মবেদনা জানান,—'মা অন্নপূর্ণে! আমায় অন্নদান কর।" তখন সেই একই দেবী মহামায়া তাঁকে ভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখা দেন। বিশেষণ ও কল্পনা ভেদে দেব দেবীর মূর্ত্তি কখনও বজ্রের ন্যায় কঠোর, কখন বা পুষ্পের অপেক্ষা কোমল।

কাব্য কবিকে ছায়ার ন্যায় অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়, আর কবি অন্ধের মত, লক্ষহীনের মত, পথ ভ্রষ্টের মত উদাম আবেগ লইয়া তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন। যেখানে মনোন্মাদকারী নীরব নিকুঞ্জে ভ্রমরার মধুময় গুঞ্জন, সেইখানেই কাব্য ও কবি, যেখানে রাজেন্দ্রের পূর্ণচন্দ্রবৎ শুভ্র অট্টালিকায় কামিনীর কলকণ্ঠ জ্যোৎস্না লোকে সুরের তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিয়া পাপিয়ার কলকণ্ঠকে ধিক্কার দিয়া, শ্রোতার প্রাণে উন্মাদনা জাগাইয়া দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে সেইখানেই কাব্য অন্ধ কবির হাত ধরিয়া লইয়া চলিয়াছে, যেখানে নব যৌবনাম্মুখী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী অনূঢ়া বালিকা সখির সহিত অন্তঃপুরোদ্যানে জল ক্রীড়া করিতেছেন, কাল জল কখনও তাঁর বক্ষের উপর উচ্ছলিত হৃদয়ের আবেগে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, কখনও আবেশে সুন্দর গণ্ডে বারে বারে আঘাত করিতেছে, শিথিল বসনা আবেগ উৎফুল্ল নয়না বালিকার মৃদু মৃদু করতাড়নে জলরাশী মৃদু হাসিতে হাসিতে নাচিয়া ফিরিয়া যাইতেছে, সেই প্রহরী বেষ্টিত মানবের অগম্য পথে কাব্য তার সাধের সঙ্গী লক্ষহীন কবিকে সকলের অলক্ষে লইয়া চলিয়াছে। যেখানে পুণ্যসলিলা ভাগীরথী পুলিনে সয়না নির্ম্মলা কুমারী আকাঙ্ক্ষিতের দর্শন আসায় উদাস মনে হৃদয়ের নিভৃত দেবতাকে জানাইতেছে তারও অলক্ষে যে একবিন্দু অশ্রুতার কপোলে গড়াইয়া পড়িল, অমনি সেখানে কাব্যতার পথভ্রষ্ট সঙ্গীটীকে লইয়া আসিল, কবি তার মনের ভাব জগতের সম্মুখে স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত করিয়া দিলেন।

কবির সমদর্শিতা জগদ্বিখ্যাত, রামপ্রসাদের অনন্ত ভোগ বিলাসের মধ্যে কবির যেমন দৃষ্টি, জীর্ণ দীর্ণ পর্ণকুটীর নিবাসী দরিদ্রের কষ্টের সংসারেও কবির তেমনি লক্ষ্য। রমণীর অট্টালিকায় ধনীর ভোগবিলাস ও গর্ব্বের প্রতি যেমন

দৃষ্টি. শ্মশানে চিতা শয্যায় শায়িত দরিদ্রের শবের প্রতিও তেমন লক্ষ্য। সুকবির কবিতা ভাবুক পাঠককে কখনও ভাবের তরঙ্গে তরঙ্গে নাচায় কখনও বন্যা-স্রোতের মত নয়নে অশ্রুরাশী আনিয়া দেয়, কখন বা প্রাণে শ্মশান বৈরাগ্য আনিয়া দেয়।

কাব্য সুধার কলসহস্ত দেবতা, কবি সেই মন্দিরের অমর উপাসক। রাজা মরেন, কালের স্রোতে সে নাম লুপ্ত হয়, ধনী মরেন তাঁর নাম জগতের গতিতে কিছুদিন পরে অনন্তে মিলাইয়া যায়; কিন্তু কবি মরেন, তাঁর নাম জগতে আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। তবে কাব্যের অপকারিতা কিসে? যে শাস্ত্রে শোকাতুরা জননীর প্রাণে শান্তি আসে, যে শাস্ত্রে বিচ্ছেদ কাতর দম্পতীর প্রাণে বিমল আনন্দ টানিয়া আনে, যে শাস্ত্রে অশান্ত প্রাণকে শান্ত করে, সে শাস্ত্রে অনুপ-যোগী কিসে?

অনেকে বলিতে পারেন যে কাব্যে চরিত্রে আবিলতা আনয়ন করে, অতএব এ শাস্ত্র অনুপযোগী। তাহা যদি হয় তবে সোনা পোড়াইয় দোষ গুণ পরীক্ষা করা হয় কেন? তার নির্ম্মলতার উপর সন্দিহান হওয়াই তার প্রধান কারণ নয় কি? কাব্য চরিত্রের আবিলতার মেঘকে নির্ম্মলতার ব্যাতায় উড়াইয়া দিয়া চরিত্রের পবিত্রতাকে ফুটাইয়া তোলে। আমাদের জগৎপূজ্যা জননী জানকীর চরিত্র এত উজ্জ্বল হইল কেন? রাবণ হরণ করিয়াছিল বলিয়াইত আজ তিনি জগতের আদর্শ সতী। স্বর্ণের পুরী লঙ্কা, ত্রিদিবের ঐশ্বর্য্য লইয়া সুপুরুষ দশানন তাঁর সম্মুখে রমণীর শ্রেষ্ঠ প্রলোভন ধরিয়াছিলেন, আর সেইপ্রলোভন ঘৃণাভরে, অবজ্ঞাভয়ে, পদাঘাতে দূরে ফেলিয়াছিলেন বলিয়াইত আজ তিনি জগতের আদর্শ সতী, জলন্ত সতীত্বের পুণ্যময়ী প্রতিমা। সাবিত্রী রাজারকন্যা ভোগ বিলাস বর্জ্জন করিয়া দরিদ্র তাপস কুমারকে বরণ করিলেন কেন? তিনিও অনায়াসে একজন রাজকুমারকে বরণ করিতে পারিতেন, কিন্তু দারিদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ না করিলে পূতচরিত্রা সাবিত্রীর পূতচরিত্রের উৎকর্ষ হইতনা, বা ভোগ বিলাসের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলে তাঁর সতীত্ব গরিমা আসমুদ্র হিমাচল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতনা।

কাব্যই জীবনের উৎকর্ষ সাধন করে, আবিলতাকে দূর করে অতএব কাব্য যে আমাদের আধুনিক যুগে শিক্ষার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আবিল চরিত্রকে অনাবিল করিতে এমন উৎকৃষ্ট দ্রব্য আর নাই।

বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বরবাদ।

লেখক,—শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী।

অনেকে এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, প্রাচীন বৈশেষিক শাস্ত্রে ঈশ্বর-বাদ ছিল না—পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ ঈশ্বরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। কণাদ সূত্রে কুত্রাপি ঈশ্বরের উল্লেখ নাই, প্রশস্তবাদ ভাষ্যেও আত্মনিরূপণ প্রস্তাবে জীবাত্মার কথাই বলা হইয়াছে, পরমাত্মার নাম গন্ধও নাই। বৈশে-ষিক, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা ও বেদান্ত—এই ষড়দর্শনের মধ্যে পর পর নিরীশ্বর ও ঈশ্বরবাদ সমর্থিত হইয়াছে। বৈশেষিক নিরীশ্বর, ন্যায়, ঈশ্বর, সাংখ্য নিরীশ্বর, পাতঞ্জল ঈশ্বর, মীমাংসা, নিরীশ্বর, বেদান্ত ঈশ্বর। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ ঝা এম, এ, তাঁহার হিন্দীভাষায় লিখিত 'বৈশেষিক দর্শন' নামক পুস্তকে স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—"ঔর প্রাচীন বৈশেষিক শাস্ত্রকে গ্রন্থোমেঁ ঈশ্বর কী চর্চ্চা নঁহী পাই জাতী।"

এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রশস্তপাদ ভাষ্য," কিরণাবলী, ও উপস্কার প্রভৃতি গ্রন্থে বৈশেষিক শাস্ত্র প্রণয়নের যে ইতিবৃত্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে জানিতে পারা যায় যে, কণাদ যোগার্দ্ধির প্রভাবে মহেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহারই বর প্রসাদে বৈশেষিক শাস্ত্র রচনা করেন। প্রশস্তপাদ লিখিয়াছেন,—

"যোগাচার বিভূত্যা য সন্তোষয়িত্বা মহেশ্বর।
বক্রে বৈশেষিকং শাস্ত্রং তস্মৈ কণভূজে যেঃ॥"

উদয়ন লিখিয়াছেন,—"স্মর্গাতৈ যৎ কণাদা মুণি হীশ্বর নিয়োগে প্রসাদা দধিগর্য্য শাস্ত্রং প্রণীতবান্॥" উপস্কারে শঙ্কর মিশ্রও এই শব্দের কথা বলিয়াছেন। "উধবচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্" এই সূত্রে 'তৎ' শব্দে ঈশ্বরই কণাদের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়। ঈশ্বরের প্রণীত বলিয়া বেদের প্রামাণ্য এইরূপ অর্থই 'উপস্কার' প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হইয়াছে। 'বিবৃত্তিতে' জয়নারায়ণ,—"ওঁ তৎসাদতি নির্দ্দেশেন ব্রহ্মস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ" এই গীতার প্রমাণ দেখাইয়া তর্কপঞ্চানন বলিয়াছেন,—এখানে ব্রহ্মচারী 'তৎ' শব্দই প্রযুক্ত হইয়াছে। 'তৎ' যে ব্রহ্মপর্য্যায়শব্দ, তাহা আমার "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" এই বাক্যেতে দেখিতে পাই। "তদ্বচনাৎ—ইত্যাদি সূত্রে কণাদ অন্য অর্থ তাৎপর্য্যে 'তৎ' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, এ কথা বলা চলে না। বৈদ্যক শাস্ত্রে 'নাড়ীবিজ্ঞান" নামক একখানি গ্রন্থ, কণাদমুনি প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই গ্রন্থের প্রথমেই

রচিত হইয়াছে; 'যদবক্তেভ্যঃ পঞ্চ সধ্যাগতেভ্যো জাতা বেদা ঋক যজুঃ সাম-বেদাঃ। আয়ুর্ব্বেদা স্থাপ্যদেবাস্থ তস্মিন্নাস্তাং শম্ভৌ শ্রীকণাদস্ত ভক্তিঃ॥ এই লোকে মহেশ্বরের মুখ হইতে যে বেদের উৎপত্তি, তাহা স্পষ্টই বর্ণিত হইয়াছে। বৈশেষিক শাস্ত্রকার কণাদ যে অসন্ত দিতধক ছিলেন, তাহা আমার প্রশস্তপাদ ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে জানিতে পারি। উদ্ধৃত শ্লোকেও গ্রন্থকার কণাদ নামে আত্ম পরিচয় দিয়া মহেশ্বরের প্রতি ভক্তি থাকিবার প্রার্থনা করিয়াছেন। কাজেই বৈশেষিক শাস্ত্রকার কণাদ মুণিই যে, "নাড়ীবিজ্ঞানে"র প্রণেতা তাহা সিদ্ধান্ত করিলে অসঙ্গত হয় না। "সংজ্ঞা কর্ম্ম ত্বস্মদ্বি নির্ম্মানাং লিঙ্গম্" এই সূত্রেও কণাদ কার্যত্ব হেতু দ্বারা ক্ষিত্যঙ্কুরাদিতে সকর্ত্তৃত্ব সিদ্ধির অনুমানের ইঙ্গিত করিয়াছেন।

প্রশস্তপাদ ভাষ্যে আত্ম নিরূপণের প্রস্তাবে রমাত্মপার উল্লেখ না থাকিলেও ভাষ্যকার, "প্রণম্য হেতুমীশ্বরং মুনিং কণাদ স্রষ্বঃ। পদার্থ ধর্ম্মসংগ্রহঃ প্রণস্যতে মহেশ্বরঃ॥ এই মঙ্গলাচরণ শ্লোকে জগৎ কর্তৃত্ব রূপে সিদ্ধ ঈশ্বরকেই প্রণাম করিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞান বা নিঃপ্রয়মের কারণ নির্দ্দেশের সময়েও ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"তবেবশ্বরবোদ নাতিব্যশদ ধর্ম্মাদেব।" সৃষ্টি সংহার নিরূপণের প্রস্তাবেও ঈশ্বরেচ্ছার প্রভাবে কিরূপে সৃষ্টি সংহার হয়, প্রশস্তপাদ তাহা স্পষ্ট ভাবেই প্রদর্শন করিয়াছেন, দ্রব্য পদার্থের মধ্যে প্রশস্তপাদ পৃথক্ উল্লেখ না করায় ভাষ্যের টীকা "ন্যায় কন্দলী"তে আচার্য্য শ্রীধর বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের ইচ্ছা বুদ্ধিগুণত্বাদা স্মৈব।" ঈশ্বরের যখন বুদ্ধি একটী গুণ, তখন তাহা আত্মারই অন্তর্ভূত। সুতরাং কি করিয়া বুদ্ধি বলে, প্রাচীন তৎকালক শাস্ত্রে ঈশ্বরের উল্লেখ নাই।*

আর্য্য দর্শনে বেদের স্থান *

লেখক, শ্রীযুক্ত শ্রী জীব ন্যায়তীর্থ এম, এ

সমগ্র আর্য্যজাতির শিক্ষা সভ্যতা যাহাকে কেন্দ্র করিয়া স্মরণাতিত কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত হইতেছে—সেই বেদ শাস্ত্রের আলোচনা ভারতে

* বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত।

ক্রমশঃই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। জানিনা এই বেদ শাস্ত্রের সহিত আমাদের জাতীয় জীবন কোন অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা আছে কিনা—চিত্ত বিস্ময়ের কথা এই বেদ প্রবাহ মন্দিভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের জাতীয় জীবনও ক্রমেই জীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। চতুর্ব্বেদ কণ্ঠস্থ—এমন শত শত ব্রাহ্মণ কোনদিন এই ভারত অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন—আজ চতুর্ব্বেদের চারটী ঋক্ অভ্রান্ত ভাবে বলিবার লোক ও বিরল। তখন পুথি লিখিয়া পড়িতে হইত—এখন ঘরে ঘরে মুদ্রিত পুস্তক, তথাপি একটী ঋক্ও কণ্ঠস্থ নহে। ইহার কারণ আমাদের সেই শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা অবহেলা। এ দিকেও দেখি—জাতীয় জীবনে শুধু আত্ম-অবমাননা। যেটী জাতীয় জীবনের ধংসের কারণ, সেই আত্ম-অবমাননা আজ জলে জলে ফুটিয়া উঠিতেছে। মনু বলিয়াছেন—'আত্মান অবমন্যেত'। সে কথা শুনে কে? এ আত্ম অবমাননার বল বড় কম নহে—অবসাদ, শক্তি-হীনতা আজ এই জাতীর মধ্যে দেখা যাইতেছে। এখন দেখি—শুধু অশ্রদ্ধা নহে বেদ অভ্যাস রাখিবার শক্তিও লুপ্ত হইতেছে। সে মেধা নাই, সে ধারণা-শক্তি নাই—সে মনীষা নাই,—সে পরিশ্রম নাই,—সে কণ্ঠ নাই, সে উদাত্ত অনুদাত্ত শরীরের ভেদকল্পনা করিয়া পাঠ করিবার সামর্থ নাই। অনেকের এমনও ধারণা যে বেদের মন্ত্র গুলি সাপের মন্ত্রের মত অর্থহীন সুতরাং আমাদের পক্ষে নিস্প্রয়োজন। এ কথার উত্তর আর্যকে নুতন করিয়া দিতে হইবেনা—আচার্য সায়ণ তাঁহার ঋগ্বেদের উপোদ্‌ঘাতে বেদ বিরোধীর সর্ব্ববিধ সংশয়ের প্রকৃষ্ট উত্তর দিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজেই পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন—

ন স্বস্ত নাম বেদাখ্যঃ কশ্চিৎ পদার্থঃ।
তথাপি নাসৌ ব্যাখ্যা নমর্হতি।
অপ্রমাণাত্বেনা নুপচুক্তত্বাৎ।
তত্র মন্ত্রাঃ কে বিদ বোধকাঃ।
অম্যক্সাত ইন্দ্র ঋষ্টৈরিত্যেকো মন্ত্রঃ।
যাদৃশ্মিন্ধারি তময়স্য যা বিদ্ ইত্যন্তঃ।
সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতু ইত্যপরঃ
আপাং তমন্যু তৃফল প্রভর্ষ্টা ইত্যাদয়
উদাহার্য্যাঃ।.........

এই ভাবে সমস্ত সংশয় উত্থাপন করিয়া আচার্য সায়ণ তাহার নিরাকরণ করিয়াছেন এবং একটী কথা বড় বলিয়াছেন—

নৈষ স্থানোপরাধো যদেন মক্ষো ন পশ্যতীর্থ।

পথে যদি খোঁটা থাকে, সে খোঁটা না দেখিয়া চলিলে অপরাধ কাহার? খোটার না দেখার? মন্ত্রের অর্থ আছে কি নাই—এ নির্দ্ধারণ করিতে গেলে বেদের ব্যাখ্যা গ্রন্থ পাঠ কর—দেখিবে কোন সংশয় থাকিবেনা। আচার্য্য সায়ণ এই উপোদ্‌ঘাতে অনেক প্রয়োজনীয় কথার অবতারণা করিয়াছেন এবং আমার মনে হয় যে উপোদ্‌ঘাত আলোচনা করিলে বেদের স্বরূপ বুঝিতে কাহারও বিলম্ব ঘটে না। আচার্য্য সায়ণ মীমাংসামতের অনুবর্ত্তি। তিনি বেদে অপৌরুষেয়ত্ব বাদী। মীমাংসাদর্শনের সিদ্ধান্ত বেদ নিত্য এবং অপৌরুষের বেদই ঈশ্বর; মন্ত্র দেবতা শব্দই জগতের উৎপাদন। বেদ অপৌরুষের বলিবার তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই,—জগতের অন্য যত কিছু গ্রন্থর পরিচয় পাওয়া যায় সকলেরই রচয়িতার সন্ধান আছে। কিন্তু বেদের রচয়িতা কোন্ পুরুষ? ইহার কোন সন্ধান আছে কি? মনুসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি অতি প্রাচিন গ্রন্থেরও রচয়িতা আছে—কিন্তু বেদ সেরূপ কোন পুরুষের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত নহেন। বেদ কাহারও দ্বারা রচিত নহেন বলিয়াই রচয়িতার সন্ধান নাই। নতুবা অন্যান্য গ্রন্থের মত ইহারও নিষ্টাতার নাম থাকিত। তবে যে, পাণিনীর একটী সূত্র আছে "তেন প্রোক্তম্" তদ্বারা পাঠক কৌমূক প্রভৃতি পদ সিদ্ধ হয় এবং "কঠ, চেমুখ কর্ত্তৃক উস" এই অর্থে বেদের বিভিন্ন শাখার বোধ হয়, ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে,—কঠ কুসুম প্রভৃতি পুরুষগণ এক একটী বেদ শাখার সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা বেদ রচনা করেন নাই; কারণ, কঠ কুসুমাদি কর্ত্তৃক বিভিন্ন শাখা সম্প্রদায়ে প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেও সেই সেই বেদ মন্ত্রের অস্তিত্ব দেখা যায়। আরও একটী বিশেষ যুক্তি এই যে, যদি বেদ কোন পুরুষ কর্ত্তৃক রচিত হইতেন, তাহা হইলে তাহাতে

'জ্যোতিষ্টোসেন স্বর্গকামো যজেত'

স্বর্গকামনায় জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ করিবে, এইরূপ কথা কোনও পুরুষ লিখিতে পারেনা। কেন না—কোন পুরুষেরই স্বর্গরূপ অদৃষ্ট বস্তুর সহিত এই দৃষ্ট বস্তু যাগযজ্ঞাদির কার্য্য কারণ ভাব জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। তবে এক পাগলে বলতে পারে বটে। কিন্তু তাহাই বা বলাযায় কি প্রকারে॥ লৌকিক দৃষ্টান্তে দেখা যায়—যে, ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে—এবিধি শুনিলেই যাঁহারা পাগল ন'ন, তাঁহাদের স্বভাবতই জিজ্ঞাসা হয়—কেন এবং কি প্রকারে ভোজন করাইতে হইবে। তাহার সদুত্তর পাইলে কার্য্য প্রবৃত্তি জন্মে তেমনি

জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ করিবার বিধি যেখানেই আছে, সেখানেই—কেন এবং কেমন করিয়া যজ্ঞ করিতে হয়, তাহা বেশ সুচারুরূপে ব্যবস্থাপিত আছে। পাগলের বাক্য হইলে—এইরূপ ব্যবস্থা কখনই হইতে পারিত না। সুতরাং বেদ আপৌরুষের।

বেদান্তদর্শনের মতে ও বেদের নিত্যতা স্বীকৃত বটে,—তবে ব্যবহারিক নিত্যতা, যেমন আকাশাদির নিত্যতা ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন বস্তুরই পারমার্থিক সত্তা নাই। যতদিন পর্য্যন্ত সৃষ্টি আছে এবং থাকিবে ততদিন পর্য্যন্তই বেদ আছেন এবং থাকিবেন—ইহাই ব্যবহারিক নিত্যতার অর্থ। বেদান্ত মতে বেদের ব্যবহারিক নিত্যতার আর একটু তাৎপর্য্য এই যে বেদ ব্রহ্ম কাষ্ঠ। সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম হইতেই বেদের আবির্ভাব "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই ব্যাস ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। সুতরাং বেদান্ত মতেও বেদ একরূপ অপৌরুষেয়। নৈয়ায়িক মতে বেদ পৌরুষেয়। তবে যে সে পুরুষ নহেন—স্বয়ং ভগবানের রচিত। পুরুষোত্তমের বাক্যই বেদ। প্রলয়ের বেদের ধ্বংস হইলেও ভগবান স্বয়ং বেদ উপদেশ করেন। বৈশেষিক মতেও বেদ পৌরুষেয়। বেববক্তা স্বয়ং ভগবান। তবে বৈশেষিকের কোন টীকাকারের মতে সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণই অন্যায় বক্তা। আম্নার অর্থে শ্রুতি স্মৃতি উভয়ই গৃহীত হইয়াছে। নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিক উভয় মতেই বেদ যে পৌরুষেয় তাহার যুক্তি এই যে, বেদ যেখন বাক্য তখন পৌরুষেয়। লৌকিক বাক্য যেমন বক্তার স্মরণ করাইয়া দেয়, তেমনই এই বেদ বাক্যও বক্তার স্মরণ করাইয়া দেন।

নৈয়ায়িক মতে বেদবাক্যও লৌকিক বাক্যের অন্য কোন বিশেষত্ব নাই, কেবল মাত্র লৌকিক বাক্যে ভ্রমপ্রমাদ সংস্কার আছে বেদবক্যে অভ্রান্ত। এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার যুক্তিও নৈয়ায়িকগণ এইরূপে দিয়াছেন,—যে, বাক্যে ভ্রম প্রমাদ যুক্ত অনৃতবাদী হন তাহা হইলেই তাহার বাক্যেরও তাদৃশ দোষের সংশয় হয়। কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ তাঁহার ভ্রম প্রমাদ নাই, এইজন্য তাঁহার বাক্যও ভ্রম প্রমাদ শূন্য।

সাংখ্য পাতঞ্জল মতেও বেদের অপৌরুষেয়তা সমর্থিত হয়। কিন্তু দর্শনের মধ্যে আপাত দৃষ্টিও একটী বড়ই বৈষম্য বলিয়া মনে হয়। এক দর্শনকার বলিতেছেন—পৌরুষের একপক্ষ সত্য হইবেন সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয়, অপর পক্ষ অসত্য। কিন্তু যে ষড়দর্শন আস্তিক বলিয়া আমাদের সতত মাননীয় সেই দর্শনকারের মধ্যেই এরূপ বিরোধ স্বতঃই সন্দেহ জনক। এক্ষণে সূক্ষ্ম

ভাবে আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারিব এ বিরোধ প্রকৃত বিরোধ হবেনা। এই অপৌরুষেয়ত্ববাদ বা পৌরুষেয়ত্ববাদ, ইহার মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়—নাস্তিক পক্ষ বেদকে অপ্রমাণ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। তাহাদের অভিপ্রায় এই যে বেদের বিধিবাক্য যখন বাক্য তখন তাহাতে নির্ভর করা যায় কিরূপে? বিশেষতঃ অদৃষ্ট বস্তু বেদের বিষয়, সে বিষয়েই বা প্রমাণ কি? তাহাতে মীমাংসা প্রভৃতি দর্শন বেদের পৌরুষেয়ত্ব খণ্ডন করিয়া আপৌরুষেয়ত্ববাদ স্থাপন করিলেন, এবং বেদই স্বয়ং ঈশ্বর, মন্ত্রই দেবতা এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া বেদের সর্ব্বজ্ঞতা নিবন্ধন অদৃষ্ট বিষয়েও প্রামাণ্য অব্যাহত ইহা প্রতিপাদন করিলেন। লৌকিক বাক্যের মত বেদবাক্য অনিত্য নহে, ইহা নিত্য এবং সত্য ইহাই দেখাইয়াছেন।

নৈয়ায়িকগণ বেদের বাক্যত্ব এবং পৌরুষেয়ত্ব উভয়ই মানিয়া লইলেন। কিন্তু পৌরুষেয়ত্ব—অস্মাদৃশ অজ্ঞ পুরুষ সম্বন্ধ বেদে রাখেন নাই। যিনি জগৎস্রষ্টা, যিনি জীবগণের অদৃষ্ট নিয়ন্তা সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষোত্তমই এই বেদ শাস্ত্রের উপদেশক। নাস্তিকগণের বেদের প্রতি অপ্রামাণ্য শঙ্কা যাহা পুরুষ-দোষ নিমিত্ত ধরিতে পারে। তাহার আর অবসর রহিল না। ফলতঃ আস্তিক দর্শনকারগণ সকলেই যিনি যে পথেই যান সর্ব্বতোভাবে বেদের অপ্রামাণ্য শঙ্কা দূর করিয়াছেন। বেদ নিত্যই মান আর অনিত্যই মান—অপৌরুষেয়ই বল আর পৌরুষেয়ই বল বেদের প্রামাণ্য অব্যাহত।

শ্রী শ্রীবিশ্বনাথাষ্টক।

লেখক, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সমাজদ্বার বিদ্যারত্ন।

(১)

প্রথমে যখন আমি জননী জঠরে,
কত পাপ করিয়াছি থাকি অন্ধকারে।
মল মূত্র মেধ্য মধ্যে রইয়া জড়িত,
দিয়াছি মায়েরে আমি যাতনা বহুত।

ক্ষমা কর অপরাধ ওহে বিশ্বনাথ।
করজোরে করি প্রভু তোমায় প্রণিপাত॥

(২)

ভূমিষ্ঠ হয়েছি যবে এ মহীমণ্ডলে,
কোন জ্ঞান ছিল নাকো ইন্দ্রিয় সকলে।
মল মূত্র মেখে আমি হামাগুড়ি খেয়ে,
কত পাপ করিয়াছি কুভক্ষ খাইয়ে॥
ক্ষমা কর অপরাধ ওহে বিশ্বনাথ।
করজোরে করি প্রভু তোমায় প্রণিপাত॥

(৩)

বাল্যেতে কৌতুক বশে ভেক্ পাখী আদি,
ধরিয়াছি মারিয়াছি নাহিক অবধি।
কত কটু বলিয়াছি ভিক্ষাপ্রার্থী জনে,
উপহাস করিয়াছি কাতরোক্তি শুনে।
ক্ষমা কর অপরাধ ওহে বিশ্বনাথ।
করজোরে করি প্রভু তোমায় প্রণিপাত॥

(৪)

শৈশবে শিক্ষার ছলে পিতা মাতাগণে,
বলেছেন হিতবাণী শুনি নাই কাণে।
হইয়ে রোষের বশ দয়াময়ী মায়ে,
আঘাত করেছি আমি মসীপাত্র দিয়ে॥
ক্ষমা কর অপরাধ ওহে বিশ্বনাথ।
করজোরে করি প্রভু তোমায় প্রণিপাত॥

(৫)

শৈশবে কুসঙ্গে মিশে সদাই রয়েছি,
করি নাই বিদ্যাশিক্ষা কুকাজ ভেবেছি।
কুশাসন না করিয়ে আপাত মধুরে,
পীযুষ ভাবিয়ে পান করেছি বিষেরে।
ক্ষমা কর অপরাধ ওহে বিশ্বনাথ।
করজোরে করি প্রভু তোমায় প্রণিপাত॥

(৬)

যৌবনে রিপুর বশে রূপের গৌরবে,
ডরি নাই কভু আমি বিষম রৌরবে।
কামাদি রিপুর সাধ পূরাবার তরে,
কত পাপ করিয়াছি আত্মসুখ তরে।
ক্ষমা কর অপরাধ ওহে বিশ্বনাথ।
করজোরে করি প্রভু তোমায় প্রণিপাত॥

(৭)

দুরন্ত সংসার চক্রের বিষম ঘূর্ণনে,
পূজ্যপাদ পিতৃদেবে কুৎসিত বচনে।
কত কটু বলিয়াছি, ন্যায্য ভাবি মনে,
বুক ফেটে যায় প্রভু সে কথা স্মরণে।
ক্ষমা কর অপরাধ ওহে বিশ্বনাথ।
করজোরে করি প্রভু তোমায় প্রণিপাত॥

(৮)

দারিদ্র দহনে আমি সদাই দাহিত,
পরিজন পোষ্যবর্গে যাতনা বহুত!
দিয়াছি দিতেছি বিভো করুণা সাগর।
মনস্তাপে দগ্ধ আমি হই নিরন্তর॥
ক্ষমা কর অপরাধ ওহে বিশ্বনাথ।
করজোরে করি প্রভু তোমায় প্রণিপাত॥